বাংলায় ভ্রমণ

—: প্রথম খণ্ড :—

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের
প্রচার বিভাগ হইতে
প্রকাশিত।

—১৯৪০—

মূল্য প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

(২৯)	হাওড়া ও হুগলীর ইতিহাস	বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য
(৩০)	বীরভূমের ইতিহাস	গৌরীহর মিত্র
(৩১)	মেদিনীপুরের ইতিহাস	যোগেশ চন্দ্র বসু
(৩২)	তমলুকের ইতিহাস	ত্রৈলোক্য নাথ পাল
(৩৩)	বিষ্ণুপুরের ইতিহাস	অভয়পদ মল্লিক
(৩৪)	বাঙ্গালীর বল	রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য
(৩৫)	আমরা বাঙ্গালী	হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়
(৩৬)	Archaeological Survey of India No. 55 Excavations at Paharpur, Bengal.	Rai Bahadur K. N. Dikshit
(৩৭)	The Changing Face of Bengal	Dr. Radhakamal Mukerjee.
(৩৮)	Folk Art of Bengal	Ajit Coomar Mookerjee.

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগের শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহাশয় এই গ্রন্থ সঙ্কলনে অক্লান্তভাবে ও নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন। ইহা তাঁহার সরকারী কর্ত্তব্য কর্ম্মের অন্তর্গত ছিল না। বাংলাভাষার প্রতি মমতা বশতঃই তিনি আনন্দের সহিত তাঁহার অবসর সময়ের বহুভাগ পুস্তকটির প্রাথমিক পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয় করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

এই পুস্তক পাঠে যদি বাঙালীর নিজের ঘরের খবর লইবার কিছু আগ্রহ ও উৎসাহ হয়, তাহা হইলে এই উদ্যম সার্থক হইবে।

উপসংহারে বিনীত নিবেদন এই যে পুস্তকখানিতে যে সকল ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটী বিচ্যুতি রহিয়া গিয়াছে, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া সে সকল পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের পাব্লিসিটি অফিসারের গোচরে আনয়ন করেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে "বাংলায় ভ্রমণ"কে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা সহজ হইবে। এবিষয়ে বাঙালী শিক্ষিত সমাজের অকুণ্ঠিত সাহায্য অবশ্যই পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা রাখি।

পুস্তকটির মুদ্রণকালে ইউরোপ মহাদেশে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় বাজারে যথেষ্ট পরিমাণ আর্ট পেপারের অভাব ঘটে; সেজন্য ইহাকে দুই খণ্ডে প্রকাশ করিতে হইল এবং পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের উত্তর বিভাগের কিয়দংশ ও ঢাকা বিভাগ এবং অপর তিনটি রেলপথের বিবরণ সম্বলিত দ্বিতীয় খণ্ডটি অন্য কাগজে ছাপিতে হইল।

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ, প্রচার বিভাগ,
৩ কয়লাঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা।
১লা মার্চ্চ ১৯৪০।

অমিয় বসু
সম্পাদক।
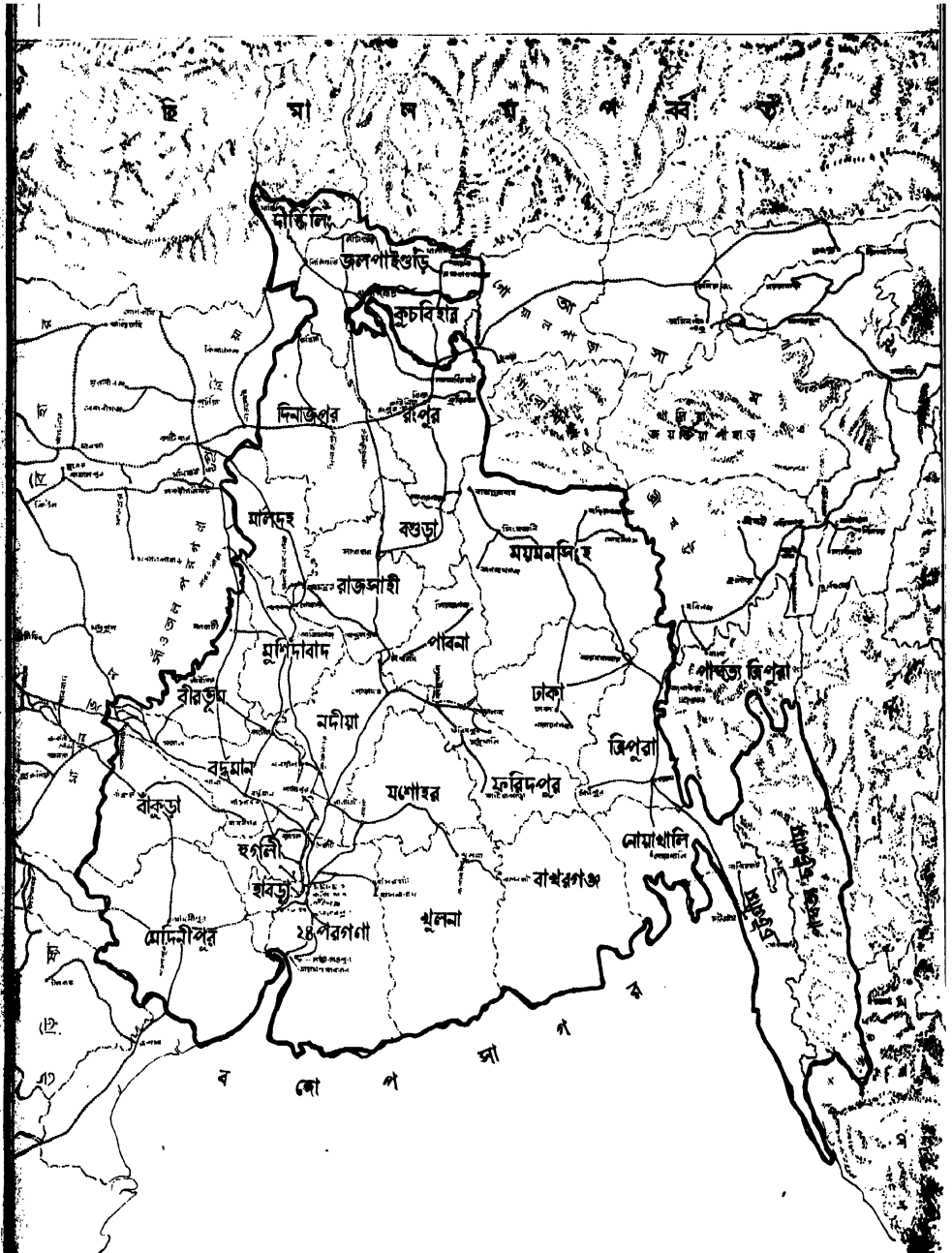
কলিকাতার মানচিত্র।

পূর্ব্ব বঙ্গ রেলপথের মানচিত্র।
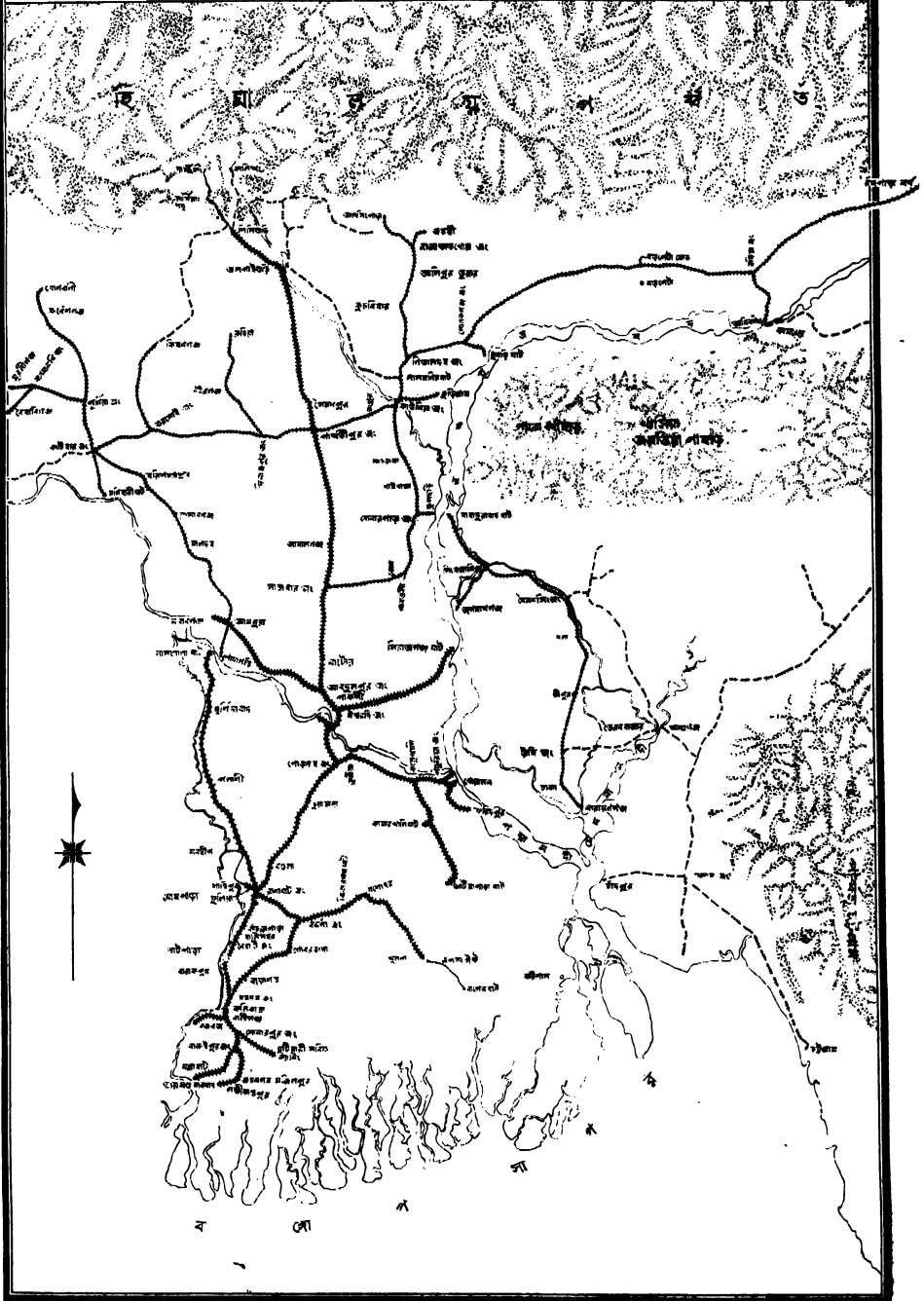
নদীমাতৃকা বাংলা
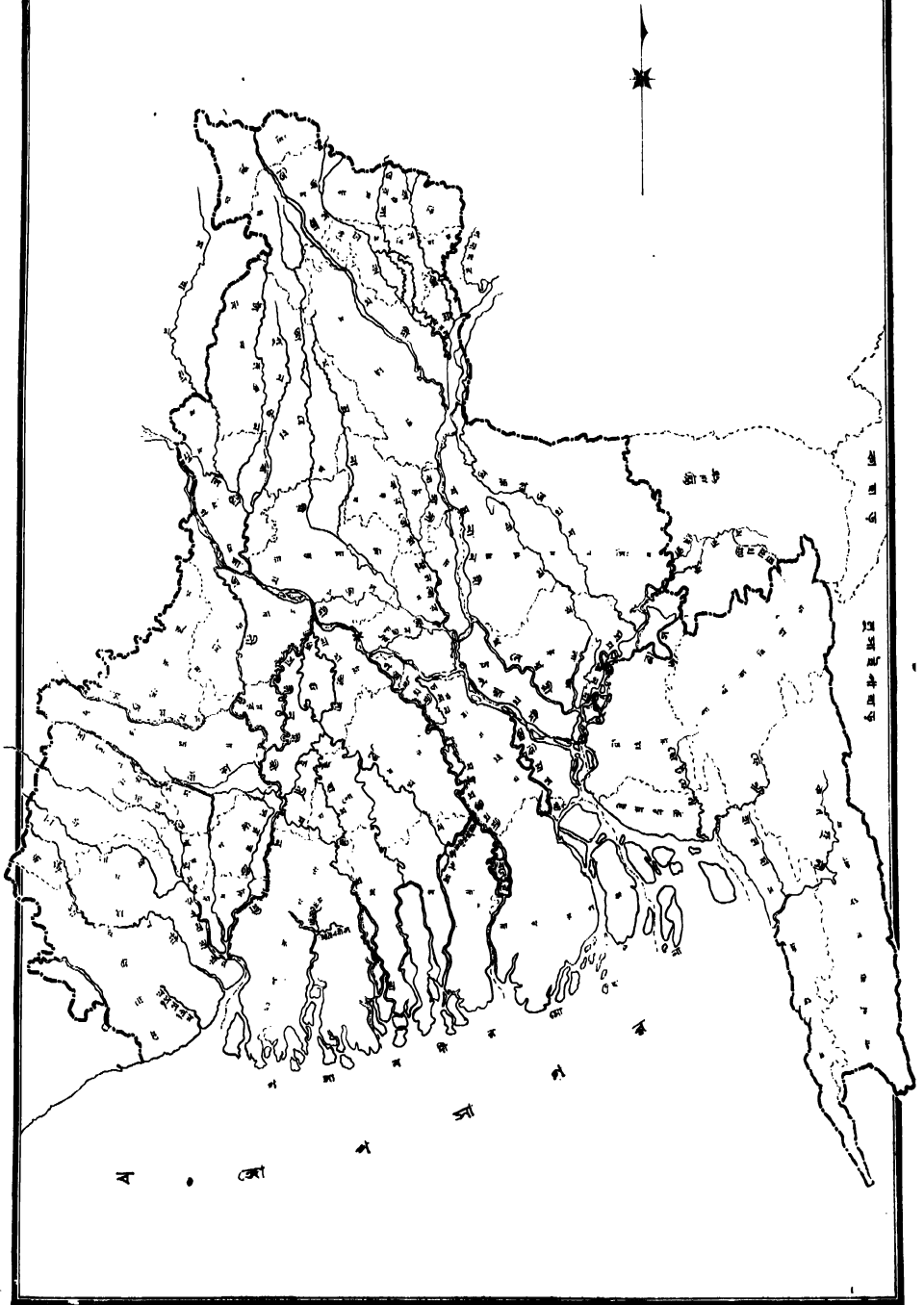
বাংলার সাধারণ পরিচয়

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ—বাংলা বা বঙ্গদেশ অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদের অনুগামী ঐতরেয় আরণ্যক, বৌধায়নসূত্র, পাতঞ্জল মহাভাষ্য, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, হরিবংশ, মনুসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ প্রভৃতি মহাপুরাণ ও বহু উপপুরাণে, শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে, কালিদাসকৃত রঘুবংশে এবং বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আরণ্যক, সূত্র ও সংহিতা গ্রন্থে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে যেরূপ উল্লেখ আছে তাহাতে মনে হয় যে তৎকালে বাংলাদেশে আর্য্য সমাগম হয় নাই। রামায়ণের যুগে বঙ্গদেশ ধনধান্য সমন্বিত ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। মহাভারতের সময়ে বঙ্গদেশ কতকগুলি বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তৎকালীন পুণ্ড্র বা উত্তরবঙ্গের রাজা পৌণ্ড্রক শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও বাহুবলের কথা ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে বিবৃত হইয়াছে যে চন্দ্রবংশীয় নৃপতি যযাতির অন্যতম পুত্র অনুর বংশে বলিনামে এক সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ রাজা জন্মগ্রহণ করেন। বৈদিক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি দীর্ঘতমা গৌতমের বরে বলিরাজার মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র নামক পরাক্রমশালী পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উত্তরকালে এই পঞ্চভ্রাতার নামে ভারতের পাঁচটি জনপদের নামকরণ হয়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক বিভাগ অনুসারে অঙ্গদেশের অবস্থান বিহারের ভাগলপুর বিভাগে, বঙ্গের বর্ত্তমান বাংলার ঢাকা বিভাগে, কলিঙ্গের দক্ষিণ ওড়িষ্যায়, সুহ্মের রাঢ়দেশ বা বর্দ্ধমান বিভাগে এবং পুণ্ড্রের অবস্থান উত্তরবঙ্গ বা রাজশাহী বিভাগে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

কালিদাস ও মেগাস্থিনিসের বর্ণনা—মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে বঙ্গদেশীয় নৃপতিগণ বহু রণতরী লইয়া রঘুরাজের সহিত জলযুদ্ধ করিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে গ্রীক্ রাজদূত মেগাস্থিনিস্ পাটলিপুত্রের পূর্ব্বভাগে ও গঙ্গার পশ্চিম তীরে গঙ্গারিডি বা গঙ্গারাঢ় নামক একটি বৃহৎ ও পরাক্রমশালী জনপদের বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে মেগাস্থিনিস্ বর্ণিত গঙ্গারিডি বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগ বা রাঢ়দেশ হইতে অভিন্ন। মেগাস্থিনিস্ লিখিয়াছেন যে গঙ্গারিডি দেশে বহুসংখ্যক দুর্ব্বার হস্তিবাহিনী থাকার জন্য এই দেশ কখনও বৈদেশিকগণের দ্বারা বিজিত হয় নাই। বীরকেশরী আলেক্জাণ্ডার সমগ্র এসিয়া জয় করিয়াও দুর্দ্ধর্ষ গঙ্গারিডিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই।

বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে উল্লেখ—সিংহলের মহাবংশ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতকে "লালরট্ঠ" বা রাঢ়দেশের সিংহপুরে বিজয়সিংহের পিতা সিংহবাহু রাজত্ব করিতেন। জৈনদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ "আয়ারঙ্গ সুত্ত" বা আচারাঙ্গসূত্রে উল্লিখিত আছে যে জৈন তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান স্বামী "লাঢ়" বা রাঢ়দেশে

দ্বাদশবর্ষ বাস করেন। উত্তরকালে রাঢ়দেশ দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল। অজয়নদের উত্তরপ্রদেশ উত্তররাঢ় এবং দক্ষিণ বিভাগ দক্ষিণরাঢ় নামে পরিচিত ছিল।

গৌড় নামের প্রসিদ্ধি—এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়া বাংলার প্রায় অধিকাংশ ভূভাগ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। রাজধানী গৌড়ের সমৃদ্ধি হইতেই সমগ্র দেশ গৌড় নামে আখ্যাত হইয়াছিল। পাণিনিসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ, মহাকবি ভারতচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, এমন কি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাংলা দেশকে বুঝাইতে গৌড় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

বিভিন্ন যুগের বিভাগ—বর্ত্তমানে বাংলাদেশ বলিতে যে ভূভাগকে বুঝায়, তাহার সমগ্র এবং তৎসন্নিহিত কোন কোন অঞ্চল পূর্ব্বকালে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মহাভারতের যুগে বাংলাদেশ মোদাগিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকীকচ্ছ, সুহ্ম, প্রসুহ্ম, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বঙ্গরাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক বঙ্গরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। শশাঙ্কের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্য্যটক য়ুয়ান্ চোয়াঙ্ ভারত পর্য্যটন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে তৎকালে বঙ্গরাজ্য কামরূপ, পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি এই পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল। শশাঙ্ক কামরূপ জয় করিয়া নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপতি বল্লালসেন মিথিলা জয় করেন। তাঁহার সময়ে বঙ্গরাজ্য মিথিলা, রাঢ় (পশ্চিম বঙ্গ), বরেন্দ্র (উত্তর বঙ্গ), বগড়ি বা বকদ্বীপ (মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গ) ও বঙ্গ (পূর্ব্ব বঙ্গ) এই পাঁচ অংশে বিভক্ত ছিল। মুসলমান শাসনকালে মুঘলযুগে সুবে বাংলা সাতগাঁ, খলিফাতাবাদ, মামুদাবাদ, ফতেহাবাদ প্রভৃতি আঠারটি সরকার বা বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বাংলাদেশ বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম এই পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত। এই পাঁচ বিভাগে মোট ২৭টি জেলা আছে। এই সকল জেলা খাস্ ইংরেজ সরকারের অধীন। ইহা ছাড়া উত্তরবঙ্গে কোচবিহার ও বাংলার পূর্ব্বসীমান্তে ত্রিপুরা এই দুইটি দেশীয় রাজ্য আছে।

বর্ত্তমান আসাম ও বিহার প্রদেশের সহিত বাংলার কিছু কিছু অংশ যথা শ্রীহট্ট, কাছাড়, গোয়ালপাড়া, মানভূম জেলা ও সিংহভূমের ধলভূম পরগণা প্রভৃতি সংযুক্ত আছে।

সীমা ও বর্গফল—বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক বাংলার উত্তরে নেপাল, সিকিম, ভুটান ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলা এবং গারো পাহাড়; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পশ্চিমে বিহার ও ওড়িষ্যা; এবং পূর্ব্বদিকে আসামের শ্রীহট্ট জেলা ও লুসাই পাহাড়।

বাংলাদেশ উত্তর দক্ষিণে লম্বা। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৈর্ঘ্যের পরিমাণ প্রায় চারি শত মাইল। পূর্ব্ব-পশ্চিমে ইহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি প্রায় ৩৭৫ মাইল। ইহার সমগ্র পরিমাণফল প্রায় ৮৩ হাজার বর্গ মাইল।

প্রাকৃতিক গঠন—বাংলাদেশ একটি বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। ইহার দক্ষিণ দিক ভিন্ন অপর তিন দিক পাহাড়ের প্রাচীরে বেষ্টিত। উত্তরদিকে হিমালয় পর্ব্বতের সানুদেশ ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া জলপাইগুড়ি জেলা পর্য্যন্ত আসিয়াছে; গারো, খাসি ও জয়ন্তিয়া পাহাড় ময়মনসিংহ জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। পশ্চিমদিকে ছোট নাগপুরের মালভূমি বাঁকুড়া জেলার মধ্যে ও রাজমহল পাহাড় বীরভূম জেলার মধ্য পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। বাংলার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ওড়িষ্যার পাহাড় শ্রেণী অবস্থিত। উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর জেলার দক্ষিণাংশ, রাজশাহীর উত্তরাঞ্চল, বগুড়ার পশ্চিমাংশ, রংপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম ও মালদহ জেলার পূর্ব্বাঞ্চল ব্যাপিয়া অবস্থিত একটি উচ্চ ভূভাগ দৃষ্ট হয়। ইহা "বরিন্দ্" (উচ্চভূমি) বা বরেন্দ্র নামে পরিচিত। ইহার মৃত্তিকা সাধারণতঃ লাল ও স্থানে স্থানে হরিদ্রা রঙের এবং কঙ্করময়। ভূতত্ত্ববিদগণের মতে বাংলাদেশের এই অঞ্চল অন্যান্য স্থানের তুলনায় বহু প্রাচীন।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনার মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রায় দুইশত মাইল বিস্তৃত ত্রিকোণাকার ভূখণ্ড গাঙ্গেয় "ব" দ্বীপ নামে পরিচিত। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্ত্তনের ফলেই এই সমতল চরভূমির উদ্ভব হইয়াছে। এই ভূখণ্ডে বহু নদী নালা ও খাল বিল প্রভৃতি আছে। বাংলাদেশের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় এই অঞ্চল অপেক্ষাকৃত নবীন বলিয়া বিবেচিত হয়। বাংলার রাজধানী কলিকাতা এই গাঙ্গেয় "ব" দ্বীপের উপর অবস্থিত। এই "ব" দ্বীপের প্রাচীন নাম বকদ্বীপ বা বগড়ি।

অরণ্য—বাংলার দক্ষিণদিকে বঙ্গোপসাগরের উপকূল দিয়া গঙ্গা ও মধুমতী এই দুই নদীর মোহনার মধ্যে প্রায় ২০০ মাইল দীর্ঘ এক গভীর অরণ্য অবস্থিত। এই অরণ্য সুন্দরবন নামে পরিচিত। ইহার প্রস্থ স্থানভেদে ৬০ হইতে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত। এই অরণ্যে সুঁদরী, গরাণ, ওড়া, বচ, পশুরি প্রভৃতি গাছ পাওয়া যায়। গোলপাতা ও হোগলাও এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই অরণ্যের ভূমি অতি নিম্ন ও বহু খাল, নালা ও নদীর দ্বারা পরিপূর্ণ। জোয়ারের সময় ইহার নিম্নপ্রদেশ জলপ্লাবিত হইয়া যায়। এই অরণ্যে ব্যাঘ্র, গণ্ডার, মহিষ, শূকর, হরিণ ও নানাজাতীয় অজগর ও সর্প প্রভৃতি বাস করে। ইহার নদীনালাতে বহু কুমীর দেখিতে পাওয়া যায়। সুন্দরবনের বাঘ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ জন্তু। সমগ্র জগতে "রয়াল বেঙ্গল টাইগার" নামে এই বাঘ সুপরিচিত। সুন্দরবনের উত্তরাঞ্চলে ক্রমশঃ লোকের বসবাস ও চাষ-আবাদ হইতেছে। সুন্দরবন ছাড়া বাংলাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অরণ্যের নাম মধুপুরের জঙ্গল। এই জঙ্গল ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত। এই জঙ্গলেও বহু হিংস্র প্রাণী বাস করে। এই জঙ্গল হইতে প্রচুর পরিমাণে গজারি কাঠ, মধু ও মোম সংগৃহীত হয় এবং এখানে বহু ভেষজ তৃণলতাদি পাওয়া যায়। জলপাইগুড়ি জেলার তরাই অঞ্চল অর্থাৎ হিমালয়ের পাদদেশস্থ ভূভাগও অরণ্য সমাবৃত ও হিংস্র জন্তু দ্বারা পরিপূর্ণ।

নদনদী—বাংলা নদী মাতৃক দেশ। এই দেশের ন্যায় এত অধিক সংখ্যক নদ নদী ভারতের আর কোন প্রদেশেই নাই। বাংলা দেশের নদ নদীর মধ্যে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা সর্ব্বপ্রধান। এই নদীত্রয়ের গতি পরিবর্ত্তনের সহিত বাংলার বহু-স্থানের উত্থান ও

পতনের ইতিহাস বিজড়িত। গৌড়, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ, হুগলী প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী জনপদগুলির ভাগ্য গঙ্গা প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এই তিনটি নদীর প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

পদ্মা ও ভাগীরথী ঃ—হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গা সংযুক্ত প্রদেশ ও বিহারের মধ্য দিয়া রাজমহলের অনতিদূরে মালদহ জেলার পশ্চিম অংশে বাংলাদেশে প্রথম প্রবেশ করিয়াছে। মালদহ জেলা হইতেই গঙ্গা তুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একভাগ দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং অপরভাগ দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। গঙ্গার পূর্ব্বধারার নাম পদ্মা এবং পশ্চিমধারার নাম ভাগীরথী। পদ্মার ন্যায় প্রবলস্রোতা নদী অতি অল্পই আছে। এই পদ্মার ভাঙ্গা-গড়ার খেলার ফলে বহু প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থানের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। রাজা রাজবল্লভের বহু কীর্ত্তি নাশ করিয়া ঢাকা জেলায় পদ্মা কীর্ত্তিনাশা আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে। গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হওয়ার পরও এই সম্মিলিত জলস্রোত "পদ্মা" নামে পরিচিত হইয়া চাঁদপুরের নিকট মেঘনা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত এই নদীত্রয়ের সম্মিলিত জলরাশি মেঘনা নামে পরিচিত। পদ্মার উপনদী সমূহের মধ্যে পাগলা, মহানন্দা, মাথাভাঙ্গা, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ ও চন্দনা নদীর নাম উল্লেখযোগ্য।

গঙ্গার মূল প্রবাহ হইতে পৃথক্ হইয়া ভাগীরথী (হুগলী নদী) মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলার প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইয়া কলিকাতা হইতে প্রায় ১০০ মাইল দূরে সাগরদ্বীপের নিকটে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় অধিকাংশ প্রসিদ্ধ স্থান ভাগীরথীর উভয় তীরে অবস্থিত।

ভাগীরথীর মোট দৈর্ঘ্য ৩১০ মাইল। ইহার উপনদী সমূহের মধ্যে নদীয়া জেলায় ভৈরব, জলাঙ্গী, মাথাভাঙ্গা ও চূর্ণি; বর্দ্ধমান জেলায় অজয়, ব্রাহ্মণী, বাবলা, খাড়ি ও বাঁকা; হুগলী জেলায় বেহুলা, কাণানদী, কুন্তী ও বৈদ্যবাটী খাল এবং হাওড়া জেলায় দামোদর ও রূপনারায়ণ নদ উল্লেখযোগ্য। ত্রিবেণীর নিকট হইতে যমুনা ও সরস্বতী নদী গঙ্গা হইতে পৃথক্ হইয়া যথাক্রমে ২৪ পরগণা এবং হুগলী ও হাওড়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই তুইটি নদীই এখন ক্ষীণস্রোতা হইয়া খালের আকারে পরিণত হইয়াছে। নিম্ন বা দক্ষিণ অংশে যমুনা নদীর প্রবাহ খরতর দেখা যায়, কিন্তু সরস্বতী নদীর প্রায় সর্ব্বত্রই এক অবস্থা। হাওড়া জেলার সাঁকরাইলের নিকট সরস্বতী নদী ভাগীরথীর সহিত পুনরায় মিলিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র ঃ—ব্রহ্মপুত্র নদ পৃথিবীর বৃহত্তম নদনদীগুলির মধ্যে অন্যতম। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮০০ মাইল। তিব্বতের অন্তর্গত মানস সরোবর এই নদের উৎপত্তি স্থান। হিমালয় পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া এই নদ ডিব্রুগড় জেলার মধ্য দিয়া আসামে প্রবেশ করিয়াছে এবং ধুবড়ী শহর হইতে ৮ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে রংপুর জেলার উত্তর পূর্ব্ব

কোণ দিয়া বাংলা দেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই নদ রংপুর, বগুড়া ও পাবনা জেলার পূর্ব্ব প্রান্ত এবং ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার কিয়দংশের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত। বগুড়া জেলার মধ্যদিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের যে অংশ প্রবাহিত উহা স্থানীয় অধিবাসিগণের নিকট "দাওকোবা" নামে পরিচিত। পাবনা জেলার সীমান্তে ব্রহ্মপুত্র নদ পুরাতন খাত ত্যাগ করিয়া এক নূতন খাত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই খাতের নাম যমুনা বা নূতন ব্রহ্মপুত্র। এই নূতন প্রবাহ গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত মিশিয়াছে এবং পুরাতন প্রবাহ ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া ভৈরববাজারের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। যমুনার উপনদী সমূহের মধ্যে তিস্তা (ত্রিস্রোতা), করতোয়া ও আত্রাই (আত্রেয়ী) উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মপুত্র নদ বহুবার খাত পরিত্যাগ করায় এবং সেই সকল খাত উর্ব্বরা পলিমাটির দ্বারা পূর্ণ হওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গ বিশেষ শস্য সমৃদ্ধ হইয়াছে।

তিস্রোতা বা তিস্তা নদী বহুবার গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে। ইহার পুরাতন খাতগুলি স্থান বিশেষে ছোট তিস্তা, বুড়ী তিস্তা ও মরা তিস্তা নামে পরিচিত। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে এই সকল খাতে নৌকা চলাচল করিতে পারে না। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ জল প্লাবনের ফলে তিস্তা ও আত্রাই নদীর গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং পূর্ব্বে যে স্থান দিয়া নদী প্রবাহিত ছিল তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত একরূপ লোপ পাইয়া যায়।

মেঘনা—সুরমা ও বরাক নামে পরিচিত শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার দুইটি নদীর মিলিত স্রোত ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভৈরববাজারের নিকট পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়া মেঘনা নাম ধারণ করিয়াছে এবং ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলার প্রান্তদিয়া বঙ্গোপসাগরে গিয়া পড়িয়াছে। মেঘনার উপনদী সমূহের মধ্যে শীতলাক্ষী, বুড়ীগঙ্গা, ধলেশ্বরী, তিতাস ও ডাকাতিয়া নদীর নাম উল্লেখযোগ্য।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিনটি নদীকে বাংলা দেশের প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিমালয় পর্ব্বত হইতে পলিমাটি বহন করিয়া আনিয়া ইহারা সমগ্র বঙ্গদেশকে ঋদ্ধিমান করিয়া তুলিতেছে। বাংলা দেশ যে "সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা" সে শুধু এই নদীত্রয়ের জন্য।

অন্যান্য নদনদী—পূর্ব্বে যে সকল নদনদীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ছাড়া বাংলাদেশে ছোট বড় আরও প্রায় শতাধিক নদনদী আছে। তাহাদের মধ্যে বর্দ্ধমান বিভাগে দারুকেশ্বর, বরাকর, ময়ূরাক্ষী, কাঁসাই, শিলাই ও সুবর্ণরেখা; প্রেসিডেন্সি বিভাগে বিদ্যাধরী, পিয়ালী, ইছামতী, রূপসা, রায়মঙ্গল, কপোতাক্ষ, মালঞ্চ, কুমার, নবগঙ্গা ও চিত্রা; রাজশাহী বিভাগে বড়াল, টাঙ্গন, কালিন্দী, পুনর্ভবা, কুলিক, কাঞ্চন, ধরলা ও মহানদী; ঢাকা বিভাগে কীর্ত্তনখোলা, বলেশ্বর, ঝিনাই ও মগরা, এবং চট্টগ্রাম বিভাগে কর্ণফুলি, শঙ্খ, মাতামুড়ী, ফেণী, ও গোমতী উল্লেখযোগ্য নদনদী।

জলজন্তু ও মৎস্য—বাংলা দেশের প্রায় অধিকাংশ নদীতে কুম্ভীর, শুশুক, কচ্ছপ ও মৎস্যাদি বাস করে। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদীগুলিতে সময়ে সময়ে হাঙ্গরের দৌরাত্ম্য হয়। নদীজাত মৎস্যগুলির মধ্যে রুই, কাতলা, চিতল, ভেটকি, ইলিশ, চিংড়ি, পারশে প্রভৃতি মাছ সমধিক বিখ্যাত। পদ্মা ও ভাগীরথী নদীতে প্রতিবৎসর বহু ইলিশ মাছ ধরা পড়ে। বিল ও জলাশয়ে জাত মৎস্যের মধ্যে কই, মাগুর, শিঙ্গি, খয়রা, শোল, টেংরা ও নাত্তস মাছ প্রভৃতির সংখ্যাই অধিক।

পশুপক্ষী ও সরীসৃপ—বাংলা দেশের বন্য পশুর সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গরু, মহিষ, ঘোড়া, প্রভৃতি সাধারণ গৃহপালিত পশু ভিন্ন উত্তরবঙ্গের কোন কোন স্থানে লোকে হাতী পুষিয়া থাকে এবং মালদহ, দিনাজপুর ও বাঁকুড়া জেলার কোন কোন অঞ্চলে গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলার প্রায় সর্ব্বত্র বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে বিস্তর হনুমান ও বানর দেখা যায়। পল্লীগ্রামের জঙ্গলে খট্টাস, খরগোস, সজারু, নেউল, কাটবেড়ালী, শৃগাল, গো-সাপ ও নানাজাতীয় সাপ বাস করে। বাংলার বিষধর সর্পগুলির মধ্যে কেউটিয়া, গোক্ষুর, রাজসাপ ও উদয়কাল প্রভৃতি প্রধান। ময়াল, চন্দ্রবোড়া, চিতি, দাঁড়াস, ঢোঁড়া ও অন্যান্য জাতীয় সাপও বাংলা দেশে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

কাক, চিল, শকুনি, সিঞ্চান, বাজ, পেচক, শালিক, কোকিল, শ্যামা, দোয়েল, নীলকণ্ঠ, পারাবত, ঘুঘু, চড়ুই, টিয়া, ময়না, ফিঙা, চাতক, মাছরাঙ্গা, বৌকথাকও, "গৃহস্থের খোকা হোক" প্রভৃতি, বহু প্রকারের পাখী বাংলা দেশে দৃষ্ট হয়। দোয়েল ও মাছরাঙাকে বাংলা দেশের নিজস্ব পাখী বলিতে পারা যায়। প্রাতঃকালে দোয়েল পাখীর সুমিষ্ট স্বরে গান বাংলা দেশের বাহিরে বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। বাংলার বিলে ডাহুক, জলপিপি, বিলহাঁস, কোড়া, কাণ প্রভৃতি নানাজাতীয় পাখী বাস করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি যাযাবর পাখী; বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা বাংলায় আসে এবং বর্ষার অন্তে অন্যত্র চলিয়া যায়।

বৃক্ষ ও ফলপুষ্প—বাংলা দেশের অধিকাংশ স্থানের মৃত্তিকা আর্দ্র ও সরস। সুতরাং এই প্রদেশে বৃক্ষাদিকে বিশেষ সতেজ দেখা যায়। বাংলার অরণ্যভূমিতে জাত বৃক্ষাদির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রাম্য বৃক্ষাদির মধ্যে অশ্বত্থ, বট, দেবদারু, তেঁতুল, বেল, আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, তাল, খেজুর ও সুপারির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঘন সন্নিবিষ্ট বাঁশের ঝাড় বাংলা দেশের বহুস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলার পার্ব্বত্য অঞ্চলের সন্নিহিত ভূভাগে বহু শাল, সেগুণ ও শিশুগাছ জন্মে। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার পশ্চিমাঞ্চলে বিস্তর মহুয়া গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। বড় বড় নদীর চরভূমিতে বিস্তর বাবলাগাছ জন্মে। বিল ও জলাভূমির বহুস্থানে পদ্ম ও শালুক ফুটিয়া থাকে। কলমীলতার ফুলও জলজ পুষ্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। স্থলজ পুষ্পের মধ্যে স্থলপদ্ম, শিউলি, জুঁই, মালতী, গাঁদা, দো-পাটি, করবী, চাঁপা, গোলাপ, গন্ধরাজ, টগর, বেল, মল্লিকা, বকুল ও জবা প্রভৃতি প্রধান পর্য্যায়ে পড়ে। স্থলপদ্ম ও শিউলি বাংলা দেশের নিজস্ব ফুল।

বাংলার ফলের মধ্যে নারিকেল প্রথম স্থান অধিকার করে। আম, জাম, লিচু, পেয়ারা, পেঁপে, কলা, বাতাবী লেবু, আনারস, কাঁঠাল প্রভৃতিও বাংলা দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

খনিজ দ্রব্য—বাংলার খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লাই সর্ব্ব প্রধান। বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল ও রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থান কয়লার খনির জন্য বিখ্যাত। বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার কোন কোন অংশেও কয়লার খনি আছে। তাহা ছাড়া বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ ও রাইপুর থানার এলাকায় অভ্র ও অল্প পরিমাণে তাম্র পাওয়া যায়। বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার পাহাড় অঞ্চলে লৌহ, প্রস্তর ও ঘুটিং যথেষ্ট পরিমাণে মিলে।

কৃষিজাত দ্রব্য—বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের অধিবাসিগণের প্রতি চারিজন লোকের মধ্যে তিনজন কৃষি কার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের দ্বারা আনিত পলিমাটির দ্বারা বাংলাদেশের ভূমি সকল বিশেষ উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হয় এবং ঐ সকল ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি জন্মে। বাংলার কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান ও পাট সর্ব্ব প্রধান। ধান বাংলার প্রায় সকল জেলাতেই জন্মে। পলি-পড়া সরস ভূমি ও গরম বাতাস পাট চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা ও রংপুর জেলার আবহাওয়া অনেকটা এইরূপ হওয়ার দরুণ ঐ সকল জেলাতে বিস্তর পাট জন্মে। পৃথিবীর সকল দেশের পাটের চাহিদা একমাত্র বাংলা দেশই মিটায়। বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও পাটের চাষ হয় না বলিলেই চলে। বাংলাদেশ হইতে প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকার পাট বিদেশে চালান যায়।

ধান ও পাট ছাড়া বাংলা দেশে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু, তিল, তিসি, তামাক, সরিষা ও নানাবিধ ডাইল, কার্পাস ও চা জন্মে। নিত্য ব্যবহার্য্য শাক সব্জীর মধ্যে আলু, পালং, পটল, বেগুন, মূলা, ঢেড়স, টমাটো, লাউ, কুমড়া, উচ্ছে, কপি, থোড়-মোচা প্রভৃতি প্রধান।

শিল্পজাত দ্রব্য—কুটীর শিল্পের জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাংলার খ্যাতি আছে। বয়ন-শিল্প এক সময়ে এ দেশে উৎকর্ষের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। ঢাকার মস্‌লিন সুদূর রোমসাম্রাজ্যে পর্য্যন্ত সমাদৃত হইত। বর্ত্তমানেও ঢাকা, চন্দননগর, শান্তিপুর ও টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থান সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের জন্য, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বাঁকুড়া ও বীরভূম রেশমী বস্ত্রের জন্য এবং ফরিদপুর, কুমিল্লা ও নোয়াখালি মোটা তাঁতের কাপড়ের জন্য বিখ্যাত। শাঁখার ও সোনারূপার সূক্ষ্ম কাজের জন্য ঢাকা ও মৃৎ শিল্পের জন্য কৃষ্ণনগরের খ্যাতি আজিও অক্ষুণ্ণ আছে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদহ ও ময়মনসিংহের পিতল ও কাঁসার বাসন বিখ্যাত। আজকাল বাংলাদেশে বহু কাপড়ের কল, দেশলাইএর কল, চিনির কল, কাগজের কল, চীনামাটি, এলুমিনিয়াম ও কাঁচের কারখানা এবং সাবান ও গন্ধ দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অধিবাসী—বাংলাদেশের অধিবাসিগণকে বাঙালী বলে। বিগত শতকে অনেক অ-বাঙালী ব্যবসায় বা কার্য্যব্যপদেশে বাংলায় আসিয়া বসবাস করিয়াছেন এবং ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে আচারে, ব্যবহারে ও সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণভাবে বাঙালী হইয়া গিয়াছেন। বাংলার অধিবাসিগণ ধর্ম্মভেদে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। কলিকাতা শহরে এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় অল্প সংখ্যক জৈন, চট্টগ্রাম জেলায় লক্ষাধিক বৌদ্ধ ও বাংলার নানা স্থানে কিছু কিছু দেশীয় খৃষ্টানের বাস আছে। বাংলায় কয়েকটি আদিম জাতিরও বসবাস আছে। বর্দ্ধমান, বীরভূম ও উত্তর বঙ্গের বরিন্দ এলাকায় নানা স্থানে সাঁওতাল জাতি বাস করেন, ইঁহারা প্রধানতঃ কৃষিজীবী। দার্জ্জিলিং জেলায় নেপালী, ভুটিয়া ও লেপচা নামক পার্ব্বত্য জাতির বাস আছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরার পাহাড়ে নাগা, কুকি, টিপরা ও চাকমা প্রভৃতি আদিম জাতির বাস। ইঁহারা কৃষিকার্য্য ও শিকার প্রভৃতির দ্বারা জীবিকার সংস্থান করেন।

ভাষা—বাংলা দেশের ভাষার নাম বঙ্গ ভাষা বা বাংলা। এই দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে শতকরা ৯২জন এই ভাষায় কথাবার্ত্তা বলেন। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে "ইণ্ডো এরিয়ান" ভাষার "মাগধী" শাখা হইতে এই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, অর্থাৎ এই ভাষা প্রধানতঃ সংস্কৃতমূলক। উত্তরকালে প্রাকৃত, হিন্দী, মৈথিলী, ফারসি, উর্দ্দু, পর্ত্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা হইতে বহু শব্দাবলী এই ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া ইহার শব্দ-সম্পদকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়াছে। বাংলা ভাষায় রচিত প্রায় সহস্রাধিক বর্ষের পুরাতন পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে অপর কোন ভাষার সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ন্যায় উন্নত ও ঋদ্ধিমান নহে। এই ভাষা প্রায় পাঁচ ক্রোর লোকের মাতৃভাষা। ভারতের আর কোন প্রাদেশিক ভাষাকে এত অধিক সংখ্যক লোকে মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করে না।

সংস্কৃতি—বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্য্য সভ্যতামূলক হইলেও উহার এমন কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা ভারতখণ্ডের অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। উত্তরাধিকার আইন, দেবপূজার পদ্ধতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্মচিন্তার ধারা, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত—প্রত্যেক বিষয়েই বাঙালীর একটা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। বাংলার মন্দির, মসজিদ্ ও প্রাসাদ প্রভৃতির নির্ম্মাণ প্রণালীতে, দেবমূর্ত্তির পরিকল্পনা ও গঠনে, প্রস্তর বা ইষ্টকের উপর ক্ষোদিত চিত্রে, চিত্রপটে, দারুশিল্পে, পিত্তল ও কাংস্য নির্ম্মিত দ্রব্যাদিতে, লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রাদিতে, বয়নশিল্পে, লোক সাহিত্যের উপাখ্যানভাগে, সঙ্গীতাদিতে নব নব রাগ রাগিনীর সন্নিবেশে, ধর্ম্ম সাধনায় নব নব ভাবের প্রবর্ত্তনে—সর্ব্বত্রই বাঙালীর সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। যাঁহারা বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন অথবা এই সকল বিষয় অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে এই সকল বিষয়ের আলোচনা সম্ভবপর নহে।

বাংলায় ভ্রমণের প্রয়োজন—পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে সারা বাংলার প্রসিদ্ধ স্থানগুলির বিবরণ, কিংবদন্তী, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করা হইল। বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই নিজস্ব রূপটিকে বুঝিতে হইলে বাংলা দেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করা আবশ্যক। কানে শোনা ও চোখে দেখার মধ্যে পার্থক্য যে কত সে শুধু চোখে দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং বাঙালী মাত্রেরই উচিত সুযোগমত বাংলাদেশের এক একটি অংশ দেখিয়া আসা। এক একটি করিয়া দেখিলে ছোট ছোট কয়েকটি অবকাশ-গুলির সুযোগেই বাংলার সহিত ঘনিষ্ঠ ও সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করা যায়। ইহার জন্য দীর্ঘ অবকাশের প্রয়োজন হইবে না। বাঙালীর পক্ষে ইহা ব্যয়সাপেক্ষও নহে। দূরত্বের স্বল্পতাহেতু ও নানারূপ সুলভ মূল্যের টিকিটের সুবিধা থাকায় অল্প ব্যয়েই বাংলার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া আসা যায়।

ইহা সত্যই দুঃখের বিষয় যে এমন সোনার বাংলার অধিবাসী হইয়াও অনেকে বাংলাকে চেনেন না ও জানেন না, দেখিবার সুযোগ থাকিতেও দেখেন না। এদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব আধার। দেশভক্ত বাঙালী কবির গানে ও কবিতায়, নানা গল্পে ও উপাখ্যানে বাংলার রূপ ও সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী মাত্রেই তাহা পাঠ ও শ্রবণ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন, আনন্দ লাভ করেন। কিন্তু অনেকেরই বাংলার সহিত পরিচয় শুধু পুঁথির পাতার ভিতর দিয়া। নিজ জন্মপল্লী এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দুই চারি খানি গ্রাম এবং কলিকাতা, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মত দুই একটি বড় শহরের মধ্য দিয়াই বাংলার সহিত অধিকাংশ বাঙালীর পরিচয়। বাংলার অধিবাসিগণের মধ্যে এমন বহু লোক আছেন যাঁহারা হয়ত দিল্লী, লাহোর, হরিদ্বার, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান বার বার দেখিয়াছেন, কিন্তু বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় কোথায় অবস্থিত তাহার সংবাদই রাখেন না। দূর দূরান্তর ভ্রমণ করা অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু এই সকল ভ্রমণ হইতে সম্পূর্ণ ফললাভ করিতে হইলে বাংলার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়েরও প্রয়োজন। এই পরিচয় থাকিলে তবেই অভিজ্ঞতা তুলনামূলক ও পূর্ণ হইবে এবং সত্যকার কাজে লাগিবে। অনেকের ধারণা যে বাংলাদেশে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই; ইঁহারা যদি একবার গৌড়-পাণ্ডুয়া, মুর্শিদাবাদ, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ষাটগুম্বজ, বিষ্ণুপুর, তমলুক, নবদ্বীপ, গঙ্গাসাগর, সুন্দরবন, চন্দ্রনাথ, চট্টগ্রাম, আদিনাথ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি দেখিয়া আসেন তবে তাঁহাদের ভুল ধারণা নিশ্চয়ই দূর হইবে।

বাংলায় ভ্রমণ করা সকলের পক্ষে আবশ্যক হইলেও, সব চেয়ে প্রয়োজন স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের পক্ষে। কেবল মাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। চাক্ষুষ পরিচয়ে আনন্দও হয় যেরূপ, শিক্ষালাভও ঘটে তাহার চেয়ে অনেক বেশী। য়ুরোপ প্রভৃতি উন্নতিশীল দেশে ছাত্রগণকে লইয়া ভ্রমণ অভিযানে বাহির হওয়া শিক্ষাপদ্ধতির একটি নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ। শারীরিক ও মানসিক পরিপুষ্টি সাধনে ইহা যে বিশেষ ফলপ্রদ তাহা বিস্তারিত ভাবে বলার অপেক্ষা রাখেনা। য়ুরোপের ছাত্রদল এক একটি রেল স্টেশনকে কেন্দ্র করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী বিখ্যাত স্থানগুলি পদব্রজে বা স্থান বিশেষে

অপর যান-বাহনের সাহায্যে দেখিয়া আসে। এই সকল ভ্রমণ অভিযানে বাহির হইয়া ইহারা সর্ব্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জ্জন করে। ইহার দ্বারা তাহাদের চরিত্রগঠন ও শারীরিক উন্নতি সাধিত হয় এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার শক্তি জন্মে। বর্ত্তমানে এদেশেও ছাত্রগণের মধ্যে ভ্রমণ স্পৃহা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ছাত্রগণের ভ্রমণ অভিযানের সংবাদ মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশ-দর্শনার্থী ছাত্রদলের মধ্যেও বাংলায় ভ্রমণ সম্বন্ধে তাদৃশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। এখানেও মূলে সেই ধারণা, যে বাংলা দেশে দেখিবার মত তেমন কিই বা আছে! ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সাধারণ বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শনের ছাত্রের অধ্যয়ন ও গবেষণার বিষয় বাংলা দেশে আছে অসংখ্য! দেখিবার আগ্রহ লইয়া একবার বাহির হইয়া পড়িলেই এই বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

বাংলার রাজধানী কলিকাতা।

অবস্থান ও আয়তন—

বাংলার রাজধানী কলিকাতা বাঙালীর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র। ইহা গঙ্গা বা ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বতীরে ২৪ পরগণা জেলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য এই মহানগরীকে ২৪ পরগণা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি স্বতন্ত্র জেলারূপে গণ্য করা হয়। ভাগীরথী নদীর সাগর সঙ্গম হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় এক শত মাইল।

মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাধীন কলিকাতা শহর বর্ত্তমানে খাস্ কলিকাতা, কাশীপুর, চিৎপুর, মাণিকতলা, ইটালী, বালীগঞ্জ, আলিপুর, খিদিরপুর, ভবানীপুর ও কালীঘাট লইয়া গঠিত। ইহার পরিমাণফল প্রায় ৩০ বর্গ মাইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শহরতলী ধরিয়া "বৃহত্তর কলিকাতা" হুগলী জেলার ত্রিবেণী হইতে ২৪ পরগণা জেলার বজবজ পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয় তীর লইয়া বিস্তৃত। এই অঞ্চলের জনবহুল শহরতলী, কল-কারখানা, বাঁধা ঘাট, বাগানবাটী, দেবালয়, জেটি ও ডক্ প্রভৃতি কলিকাতা মহানগরীরই অংশ বিশেষ। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪৫ মাইল ও বিস্তারে গঙ্গার উভয়কূলে এক মাইল হইতে দুই মাইলের মধ্যে।

প্রাচীন কলিকাতা—

কলিকাতা মহানগরীর প্রাচীন গৌরব বিশেষ কিছুই নাই। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থান একটি নগণ্য গণ্ডগ্রাম মাত্র ছিল। ইহার বহু স্থান তখন অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি ও ঝোপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বাংলায় তথা ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই নগরীর প্রতিষ্ঠা ও অভ্যুদয় ঘটিয়াছে।

কলিকাতা নামের সর্ব্ব প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের "মনসা মঙ্গল" কাব্যে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত "আইন-ই-আক্‌বরী" গ্রন্থে রাজা টোডরমলের রাজস্ব তালিকায় মহাল কলিকাতার নাম পাওয়া যায়। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে চিৎপুর, কলিকাতা ও কালীঘাটের উল্লেখ আছে।

কলিকাতা নামের উৎপত্তি—

কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন, কালীক্ষেত্র বা কালীঘাট হইতে "কলিকাতা" নাম হইয়াছে। কবিরামের গ্রন্থে "কিলকিলা" নামক গ্রামের উল্লেখ আছে। স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেবের মতে উহা হইতেই কলিকাতা নাম হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে পূর্ব্বে এই স্থান কলিচুণ

বিক্রয়ের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল বলিয়া ইহার নাম হয় কলিকাতা। ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বে জনৈক ওলন্দাজ পর্য্যটক এই স্থানে বহু মড়ার মাথার খুলি দেখিতে পাইয়া ইহাকে নরককুণ্ডের স্থান বা "গলগথা" নামে উল্লেখ করায় ইহার নাম কলিকাতা হইয়াছে, এইরূপ অনুমানও কেহ কেহ করেন। জন সাধারণের মধ্যে এইরূপ একটি গল্পও প্রচলিত আছে যে, একজন ইংরেজ জনৈক ঘেসেড়াকে এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করায় সে ব্যক্তি মনে করে, "ঘাস কবে কাটা হইয়াছে" সাহেব বুঝি এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছে, এবং উত্তর দেয় "কাল কাটা" এবং এই "কাল কাটা" হইতেই "ক্যালকাটা" বা কলিকাতা নাম হইয়াছে। অপরপক্ষে খালকাটা হইতে ক্যালকাটা ও কলিকাতা নাম হইয়াছে বলিয়াও প্রবাদ আছে।

কালীঘাটের মন্দির

গোবিন্দপুর ও সুতানুটী—

এখন খাস্ কলিকাতা বলিতে যে স্থানকে বুঝায় পূর্ব্বে উহা সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি বিভিন্ন গ্রাম ছিল। বাগবাজারের খাল হইতে নিমতলা পর্য্যন্ত স্থান সুতানুটী, নিমতলা হইতে চাঁদপাল ঘাট পর্য্যন্ত কলিকাতা ও চাঁদপাল ঘাট হইতে আদিগঙ্গা পর্য্যন্ত স্থান গোবিন্দপুর নামে পরিচিত ছিল। কলিকাতায় ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে সুতানুটীতে সুতা বিক্রয়ের একটি বড় হাট ছিল এবং আর্মেনীয় ও পর্ত্তুগীজগণ

তথায় বাণিজ্য করিতেন। গোবিন্দপুরের শেঠ ও বসাকেরা এই হাট বসাইয়াছিলেন। শেঠ ও বসাকগণের পূর্ব্ব নিবাস ছিল হুগলীতে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রিক বিপ্লবের জন্য তাঁহারা হুগলী ত্যাগ করিয়া গোবিন্দপুরে আসিয়া বসবাস করেন। শেঠদের গৃহদেবতা গোবিন্দজীর নামানুসারে গ্রামের নাম গোবিন্দপুর রাখা হয়, অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। সুতা বিক্রয়ের হাটই সুতানুটী নামে পরিচিত হয়।

জব চার্ণকের আগমন—

ইংরেজেরা ভারতবর্ষে আগমন করিয়া সর্ব্বপ্রথম মাদ্রাজ প্রদেশে পদার্পণ করেন ও সেইখানেই বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলার শাসন-কর্ত্তা শাহ সুজার নিকট হইতে তাঁহারা বার্ষিক তিন হাজার টাকা খাজনার বিনিময়ে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করিয়া হুগলীতে কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই হুগলীতে পর্ত্তুগীজগণের ও চুঁচুড়ায় ওলন্দাজগণের বাণিজ্য-কুঠি ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলীর ফৌজদারের সহিত বিবাদ হওয়ায় ইংরেজ ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির তৎকালীন এজেন্ট্ জব চার্ণক ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে হুগলী শহর লুণ্ঠন করেন। তাঁহার বিরুদ্ধে নবাবী ফৌজ প্রেরিত হইলে চার্ণক হুগলী পরিত্যাগ করিয়া সুতানুটীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। অতঃপর নবাবের সহিত আপোষ হওয়ায় ইংরেজ বণিকগণ পুনরায় হুগলীতে ফিরিয়া যান। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জব চার্ণক পুনরায় সুতানুটীতে আসিয়া অবস্থান করেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই সুতানুটীতে পাকাপাকিভাবে বাণিজ্য-কুঠি নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয়। তিনি দেখিতে পান যে হুগলী অপেক্ষা সুতানুটীতে কুঠি নির্ম্মাণের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। প্রথমতঃ তখনকার দিনে আদিগঙ্গার উত্তরে বড় বড় মাল বোঝাই জাহাজ যাইতে পারিত না। খিদিরপুর হইতে ছোট জাহাজ বা নৌকায় করিয়া হুগলী পর্য্যন্ত মাল আনা-নেওয়া করিতে হইত। সুতানুটীতে কুঠি স্থাপন করিলে এই অসুবিধাটি আর থাকে না। দ্বিতীয়তঃ সুতানুটী গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত হওয়ায় এবং ইহার পূর্ব্বদিকে ধাপার প্রকাণ্ড বিল থাকায় এই স্থানে মাহারাট্টা দস্যু ও মুঘলদিগের উৎপাতের তত সম্ভাবনা ছিল না। তৃতীয়তঃ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে এই স্থান হইতে জাহাজযোগে সহজে সমুদ্রাভিমুখে যাওয়ার সুবিধা ছিল। এই সকল কারণে সুতানুটীর উপর জব চার্ণকের বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

হুগলীতে ফিরিয়া গেলেও মুঘল কর্ম্মচারীদিগের সহিত ইংরেজ বণিকগণের বিশেষ বনি-বনা হইতে ছিল না। সুতরাং ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪এ অগষ্ট তারিখে জব চার্ণক সঙ্গিগণসহ চারিখানি বাণিজ্য-জাহাজযোগে হুগলী পরিত্যাগ করিয়া সুতানুটীতে আগমন করেন। মহানগরী কলিকাতার প্রথম পত্তন প্রকৃতপক্ষে এই দিন হইতেই আরম্ভ হয়। সুতানুটীতে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপনের পর জব চার্ণক স্বয়ং সেই কুঠির ও কুঠির এলাকাভুক্ত উপনিবেশের অধ্যক্ষ হন। কোম্পানির এলাকায় যাহাতে বহু লোক আসিয়া বসবাস করে সেই জন্য জব চার্ণক অধিবাসিগণকে নানাপ্রকার সুবিধা প্রদান করেন।

চার্ণক সাহেব একটি যুবতী ও সুন্দরী হিন্দু বিধবাকে সতীদাহ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই মহিলাটির মৃত্যু হইলে তাঁহার দেহ সেণ্ট জন্ গির্জ্জার

প্রাঙ্গনে (বর্ত্তমান চার্চ্চ লেনের পার্শ্বে) সমাহিত করা হয়। পত্নীর মৃত্যুতিথি উপলক্ষে চার্ণক সাহেব প্রতিবৎসর তাঁহার সমাধির উপর একটি করিয়া মোরগ বলি দিতেন। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি তারিখে জব চার্ণকের মৃত্যু হয়। তাঁহার পত্নীর সমাধির পার্শ্বে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়। চার্ণকদম্পতীর সমাধির উপর একটি স্মৃতি-সৌধ আছে। কলিকাতার মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্মৃতি-সৌধ।
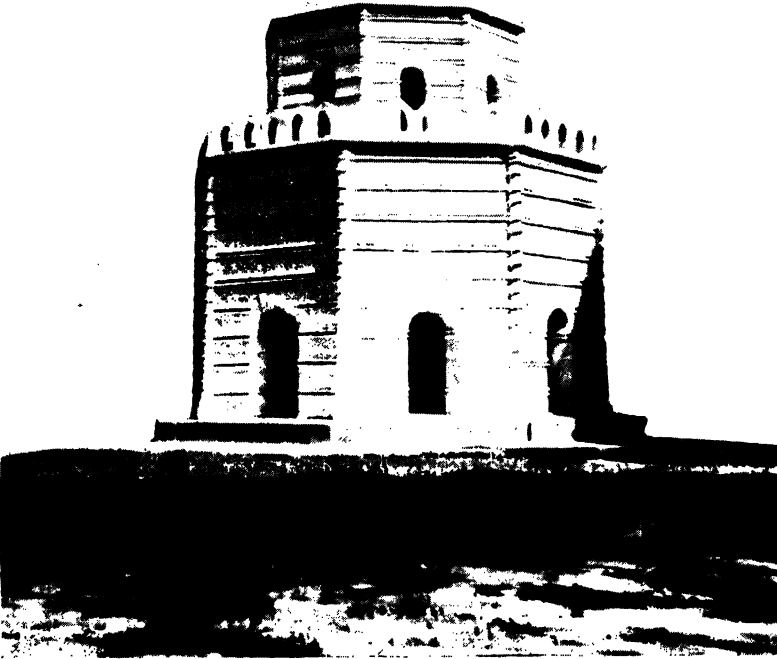
চার্ণক-স্মৃতি সৌধ

কলিকাতার প্রসার—

সুতানুটীতে কুঠি স্থাপনের পর ইংরেজ কোম্পানির ব্যবসা ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস্-শানের নিকট হইতে ১৬,০০০৲ টাকার বিনিময়ে সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের মালিকানা স্বত্ব ক্রয় করিবার অধিকার লাভ করেন এবং উক্ত খৃষ্টাব্দের ১০ই নবেম্বর তারিখে মাত্র ১৩০০৲ টাকা মূল্যে তৎকালীন মালিকগণের নিকট হইতে এই গ্রামত্রয় ক্রয় করেন। এই তিনখানি গ্রামের জন্য কোম্পানিকে মুঘল সরকারে বার্ষিক ১২৮১৷৷০ খাজনা দিতে হইত।

সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের অধিকার লাভ করার পর হইতে কোম্পানি দপ্তরের কাগজপত্রে কেবলমাত্র কলিকাতার নাম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন এবং সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের নাম ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যায়। বর্ত্তমানেও কলিকাতার বাংলা দলিল প্রভৃতিতে পরগণা সুতানুটী এই নামটি কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কলিকাতা নামের প্রাধান্য সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে পর্ত্তুগীজগণ "কালীকটের" দ্রব্যাদি য়ুরোপে বহু মূল্যে বিক্রয় করিত বলিয়া ইংরেজ কোম্পানিও কালীকট নামের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত "ক্যালকাটা" বা কলিকাতার নাম নিজেদের সেরেস্তায় পত্তন করেন।

ফোর্ট বা দুর্গ—

কলিকাতায় অবস্থানের পর হইতেই ইংরেজ কোম্পানি নিজেদের এলাকায় একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। কিন্তু নবাবের অনুমতি না পাওয়ায় বহুদিন যাবত এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। অতঃপর চেতোয়া-বরদার রাজা শোভা সিংহের বিদ্রোহ উপলক্ষ করিয়া তাঁহারা নবাবের নিকট হইতে বাণিজ্য-কুঠি সুরক্ষিত করিবার

জলহস্তী, আলিপুর চিড়িয়াখানা

অনুমতি লাভ করেন এবং ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথীর তীরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। লালদীঘির পশ্চিম পাড়ে বর্ত্তমান জেনারেল পোস্ট অফিস ও ঈস্ট্ ইণ্ডিয়ান রেলের প্রধান কার্য্যালয় যে স্থানে অবস্থিত এই দুর্গটি সেই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা কলিকাতা আক্রমণ করিয়া এই দুর্গটি অধিকার করেন ও ইহার

কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া দেন। কিন্তু ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ জয় করিয়া ইংরেজ যখন কার্য্যতঃ বাংলার আধিপত্য লাভ করিলেন তখন ক্লাইভ একটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণের আয়োজন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন দুর্গটি পরিত্যক্ত হইল। নূতন বা বর্ত্তমান দুর্গটির নির্ম্মাণকার্য্য ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে শেষ হয় এবং ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা চতুর্থ উইলিয়মের নামানুসারে উহার নাম রাখা হয় "ফোর্ট উইলিয়ম।"

কলিকাতায় রাজধানী—

পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা বাংলাদেশে ইংরেজ অধিকারের রাজধানী ছিল। অতঃপর বিলাতের পার্লামেণ্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী বাংলার ইংরেজ শাসনকর্ত্তা "গভর্ণর জেনারেল" আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং তৎসঙ্গে মাদ্রাজ ও বোম্বাই ভিন্ন কোম্পানির অধিকারভুক্ত ভারতের অন্যান্য স্থানের শাসনভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল বা বড় লাট ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময়ে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট নামক সর্ব্বোচ্চ বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পুরাতন রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে সরকারী খাজনাখানা কলিকাতায় উঠাইয়া আনা হয়। এই সময় হইতে কলিকাতা বাংলার সর্ব্বপ্রধান নগর ও ভারতের রাজধানী হইবার গৌরব লাভ করে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৩১এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ইহা ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইলেও বাংলার রাজধানী কলিকাতা আজিও সর্ব্ববিষয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শহর।

লোকসংখ্যা—

জব চার্ণক যখন কলিকাতায় কুঠিস্থাপন করেন তখন ইহার লোকসখ্যা ছিল মাত্র ১২,০০০। কিন্তু ইহার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার লোকসংখ্যা ছিল ৮,৪৭,৭৯৬; ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ছিল ৯,০৭,৮৫১ এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ১১,৯৬,৭৩৪। কলিকাতার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা বোম্বাই শহরের লোকসংখ্যা অপেক্ষা ৩৫ হাজার বেশী। ইহা শুধু কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকাভুক্ত স্থানের লোকসংখ্যা। বেহালা, টালীগঞ্জ ও হাওড়া এই তিনটি স্থানকে কলিকাতার অন্তর্ভুক্তরূপে গণনা করিলে কলিকাতার মোট লোকসংখ্যা হইবে প্রায় **সতেরো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার।**

কলিকাতার নাগরিক প্রতিষ্ঠান—

কলিকাতাবাসীর নাগরিক জীবনের সর্ব্বপ্রকার সুখসুবিধার ভার কলিকাতা কর্পোরেশনের হস্তে ন্যস্ত আছে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৭ জন কমিশনার লইয়া এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমান কলিকাতা কর্পোরেশন একজন মেয়র, একজন ডেপুটি মেয়র, ৩ জন অলডারম্যান ও ৭৫ জন কাউন্সিলর লইয়া গঠিত। কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীন কলিকাতা শহরে পাকা বাড়ীর সংখ্যা সত্তর হাজারেরও উপর। কর্পোরেশনকে ইহার বত্রিশটি বিভাগ বা ওয়ার্ডে যে রাস্তাগুলির তত্ত্বাবধান করিতে হয় উহাদের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় চারশত মাইল। কলিকাতার অধিবাসিগণের ব্যবহারের জন্য

কর্পোরেশনকে প্রত্যহ অন্যূন ৬৬,৫৩৩,০০০ গ্যালন পানীয় জল সরবরাহ করিতে হয়। টালায় লৌহস্তম্ভের উপর পানীয় জলের যে ট্যাঙ্ক আছে, উহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জলাধার। কলিকাতা শহরে কর্পোরেশনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রায় ২৩০টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের বার্ষিক আয় প্রায় দুই কোটি টাকা।

কলিকাতার শিক্ষায়তন—

কলিকাতার মত উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ভারতবর্ষে আর নাই। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, স্থাপত্য শিক্ষা, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, অর্থকরী শিক্ষা প্রভৃতি সকল প্রকার শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় আছে। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সিনেট হাউস

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে উচ্চ শিক্ষামূলক সর্ব্বপ্রকার গবেষণার ব্যবস্থা আছে। এক সময়ে ইহার পরিধি সমগ্র উত্তরভারত, মধ্যভারত ও ব্রহ্মদেশব্যাপী ছিল। বর্ত্তমানে ইহার ক্ষেত্র বাংলা ও আসামের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলেও ইহা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তনরূপে সম্মানিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনগুলি কলিকাতা শহরের তিনটি বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। কলেজ স্কোয়ারে সিনেট হাউস, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং ও আশুতোষ বিল্ডিং; পার্শীবাগানে সার্কুলার রোডের উপর বিজ্ঞান কলেজের ভবন এবং বালীগঞ্জে বিজ্ঞানকলেজ সংশ্লিষ্ট লেবরেটরী ও মিউজিয়ম অবস্থিত। পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব স্যর রাসবিহারী ঘোষ ও স্যর তারকনাথ পালিত মহাশয়দ্বয়ের বিপুলদানে বিজ্ঞানকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহাদের মর্ম্মরমূর্ত্তি পার্শীবাগান বিজ্ঞানকলেজের বারান্দায় রক্ষিত আছে।

সাধারণ শিক্ষার জন্য কলিকাতার ১৬টি কলেজ, অন্যূন ১২২টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও পাঁচশতের উপর প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ইহা ছাড়া মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও স্কুল, কমার্শিয়াল কলেজ, ভেটারিনারী কলেজ, আর্ট স্কুল, সঙ্গীত বিদ্যালয়, শিল্প শিক্ষালয়, মূকবধির বিদ্যালয়, অন্ধ বিদ্যালয় প্রভৃতি বহু প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। কলিকাতার প্রায় প্রত্যেক পাড়ায় গ্রন্থাগার ও অবৈতনিক পাঠাগার এবং নানারূপ সভা-সমিতি আছে।

কলিকাতার বন্দর—

বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে কলিকাতা ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর। বাংলা-নাগপুর, পূর্ব্বভারত ও পূর্ব্ববঙ্গ, —এই তিনটি প্রধান রেলপথ কলিকাতার সহিত বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রদেশের সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। ভাগীরথী নদী দিয়া বৎসরের সকল সময় ধরিয়াই মাল বোঝাই জাহাজ কলিকাতা বন্দরে যাতায়াত করিতে পারে। কলিকাতার বন্দরে পৃথিবীর প্রায় সকলদেশ হইতে মালের আমদানি ও রপ্তানি হয়। এই বন্দর কোন্নগর হইতে বজবজ পর্য্যন্ত ২১ মাইল স্থান লইয়া অবস্থিত এবং এই স্থান পোর্টট্রাস্ট্ রেলওয়ে নামক বড় মাপের রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। চিৎপুর হইতে তক্তাঘাট পর্য্যন্ত ৬ মাইল ব্যাপী স্থানে গঙ্গার তীরে কলিকাতার জেটিগুলি ও বড় বড় মালগুদাম অবস্থিত। ইহার মধ্যে তক্তাঘাট, প্রিন্সেপঘাট, আউট্রামঘাট ও চাঁদপালঘাটের জেটিতে জাহাজের যাত্রিগণ উঠা-নামা করেন, বাকীগুলিতে মাল বোঝাই ও মাল খালাস হয়। খিদিরপুর ডকে ২৭টি এবং কিংজর্জ ডকে ৫টি বার্থ জাহাজের মাল বোঝাই ও খালাসের জন্য আছে। তাহা ছাড়া গার্ডেনরীচে মালের জন্য ৫টি নূতন জেটি নির্ম্মিত হইয়াছে। বোম্বাই শহর সমুদ্রতীরে অবস্থিত হইলেও বন্দর হিসাবে কলিকাতা বোম্বাই অপেক্ষা অনেক বড়। বোম্বাই-এ সমস্ত বৎসর ধরিয়া যত মালের আমদানি-রপ্তানি হয়, কলিকাতা হইতে তাহার প্রায় দ্বিগুণ পাট ও কয়লা চালান যায়। কলিকাতা বন্দরের পরিচালনার ভার পোর্টট্রাস্ট্ নামক একটি সঙ্ঘের হস্তে ন্যস্ত আছে।

কলিকাতার আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া—

কলিকাতায় চৌদ্দ লক্ষের উপর লোকের বাস. ইহার মধ্যে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোক আছে। ইঁহাদের শিক্ষা, দীক্ষা, আচার, ব্যবহার ও রুচি অনুযায়ী কলিকাতায় নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুকের ব্যবস্থা আছে। থিয়েটার, সিনেমা, নাচ, গান, জলসা, রেডিও প্রভৃতি কলিকাতার দৈনন্দিন ব্যাপার। কলিকাতার ময়দানে ও অনেকগুলি পার্কে ঋতু বিশেষে ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস, হকি, ও কপাটি প্রভৃতি খেলা হয়। মুষ্টি যুদ্ধ, অসি ক্রীড়া, ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শন, সাঁতার প্রতিযোগিতা, কুস্তি, যাদুবিদ্যা ও লাঠি খেলা প্রভৃতির আয়োজনও মধ্যে মধ্যে হয়।

কলিকাতার দ্রষ্টব্য—

বৈদেশিক পর্য্যটকগণ কলিকাতাকে "সিটি অব্ প্যালেসেস্" বা সৌধ-নগরী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিক কলিকাতার ন্যায় এরূপ সুদৃশ্য অট্টালিকাবলী পূর্ণ

প্রশস্ত রাজপথ ও সুসজ্জিত বিপণি শোভিত নগরী কেবল মাত্র ভারতবর্ষে বলিয়া নহে সমগ্র এসিয়া মহাদেশে এক মাত্র জাপানের রাজধানী টোকিও ভিন্ন আর একটিও নাই। আলোকমালায় সজ্জিত রাত্রিকালের কলিকাতার দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। চোখে না দেখিলে কেবল মাত্র বর্ণনা পাঠের দ্বারা তাহা উপলব্ধি করা যায় না। কলিকাতার সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, "জগতের সেরা দ্বাদশ নগরী, গণনা ইহার তাদেরই সাথে।" কলিকাতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ নগরীর মধ্যে অন্যতম এবং সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একমাত্র লণ্ডন শহরের পরবর্ত্তী দ্বিতীয় মহানগরী। এই মহানগরীতে দেখিবার বস্তু এত বেশী আছে যে কেবল মাত্র তাহাদের নামোল্লেখ করিতে গেলে কয়েক পৃষ্ঠা লাগিবে। যাঁহারা বাহির হইতে কলিকাতায় ভ্রমণ করিতে আসেন তাঁহারা সাধারণতঃ কলিকাতার যে সকল স্থান দেখিয়া থাকেন, অথবা যে সকল স্থান না দেখিলে কলিকাতা দেখা অসম্পুর্ণ থাকিয়া যায়, নিম্নে কেবল মাত্র সেইরূপ কয়েকটি দ্রষ্টব্য বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

(১) **পরেশনাথের মন্দির**—বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট্ নামক রাস্তার উপর অবস্থিত। চলিত কথায় লোকে ইহাকে পরেশনাথের বাগান বলে। একটি মনোরম উদ্যান মধ্যে এই মন্দিরটি অবস্থিত। বিবিধ বর্ণের প্রস্তর ও কাচের দ্বারা সুসজ্জিত এই
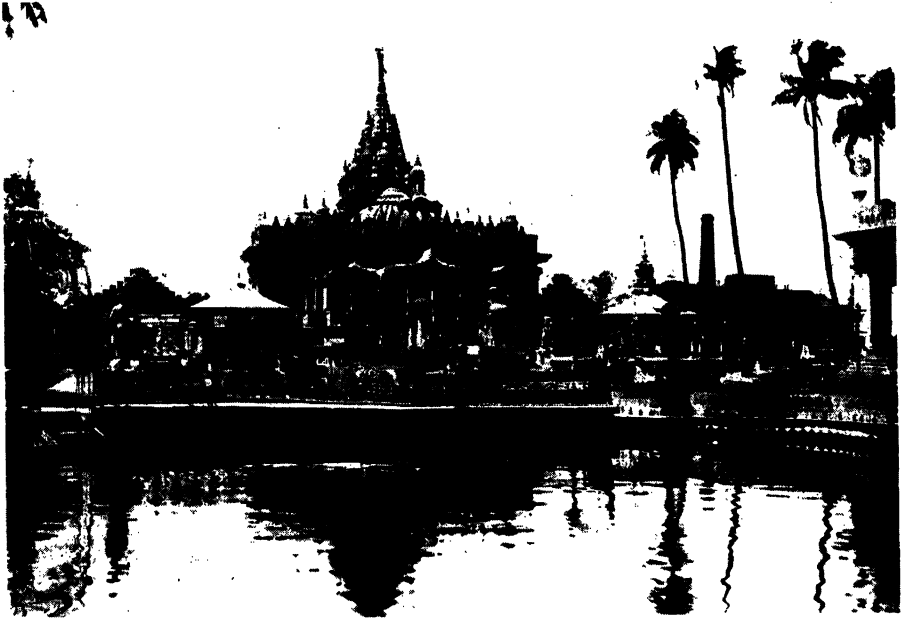
পরেশনাথের মন্দির

মন্দিরটির সৌন্দর্য্য অতি অপূর্ব্ব আছে। উদ্যান মধ্যে মর্ম্মর নির্ম্মিত বহু বসিবার স্থান আছে। একটি সুন্দর মন্দিরের মধ্যে জৈন তীর্থঙ্কর শীতলানাথজীর মূর্ত্তি

ফোয়ারার মধ্যে লাল, নীল, হলুদ প্রভৃতি নানা রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য আছে। প্রত্যহ বিকাল বেলায় বহু লোক এই স্থানে বেড়াইতে যান। জ্যোৎস্না রাত্রিতে এই স্থানটি অতি সুন্দর দেখায়। কলিকাতায় নবাগন্তুকের পক্ষে এই স্থানটি অবশ্য দ্রষ্টব্য।

(২) **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও রমেশ ভবন**—হালসী বাগানে অপার সার্কুলার রোডের উপর অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থানে ইতিহাস প্রসিদ্ধ উর্মিচাঁদের বাগান ছিল। ইহা বাঙালীর সাহিত্য সাধনার সর্ব্ব প্রধান কেন্দ্র। ১৩০১ সালে শোভা-বাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে মাত্র ৩০ জন সভ্য লইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সূত্রপাত হয়। ১৩১৫ সালে স্বর্গীয় দানবীর মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহোদয়ের প্রদত্ত জমির উপর বর্ত্তমান বাটী নির্ম্মিত হয়। সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগারে

রমেশ ভবন

বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রায় যাবতীয় পুস্তকই আছে। বাংলা দেশের আর কোথাও এত অধিক সংখ্যক বাংলা গ্রন্থ নাই। বর্ত্তমানে ইহার পুস্তক সংখ্যা ৫০ হাজারেরও উপর এবং পুঁথির সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। সাহিত্য পরিষৎ বহু অপ্রকাশিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিতেছেন। বাংলা ও বাংলার বাহিরে বহু স্থানে সাহিত্য পরিষদের বহু শাখা পরিষৎ আছে।

সম্প্রতি পরিষদ্ ভবনের সংলগ্ন "রমেশ ভবন" নামক অপর একটি সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি পরলোকগত মনীষী রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা কল্পে ইহা নির্ম্মিত। এই ভবনে বহু পুরাতন প্রস্তর ও ধাতু মূর্ত্তি, শিলালেখ, ইষ্টক ও দুষ্প্রাপ্য মুদ্রাদি রক্ষিত আছে। এখানকার তিনটি সুন্দর ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি বাংলার শিল্প নৈপুণ্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। প্রসিদ্ধ কলারসিক উইলিয়ম রদেনষ্টীনের মতে এই মূর্ত্তিগুলি অতুলনীয়। এ সকল ছাড়া এখানে রাজা রামমোহন রায়ের কেশগুচ্ছ ও পাগড়ি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিবার টেবিল, বঙ্কিমচন্দ্রের দোয়াত, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের প্রতিকৃতি, কবিতার পাণ্ডুলিপি, ব্যবহৃত চশমা, ঝরণা কলম ইত্যাদি, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিপিনচন্দ্র পালের চশমা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জামা, স্বর্ণকুমারী দেবী, কামিনী রায় ও গিরীন্দ্রমোহিনী দেবীর দোয়াতদানী প্রভৃতি সংগৃহীত আছে।

(৩) **বসু বিজ্ঞান মন্দির**—৯৩, অপার সার্কুলার রোডের উপর অবস্থিত। ইহা জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পরলোকগত আচার্য্য স্যর জগদীশ চন্দ্র বসুর গবেষণা মন্দির। এই বিজ্ঞান মন্দিরে বসিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ জীবনের অনেক অজ্ঞাত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া সমগ্র সভ্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন। এই
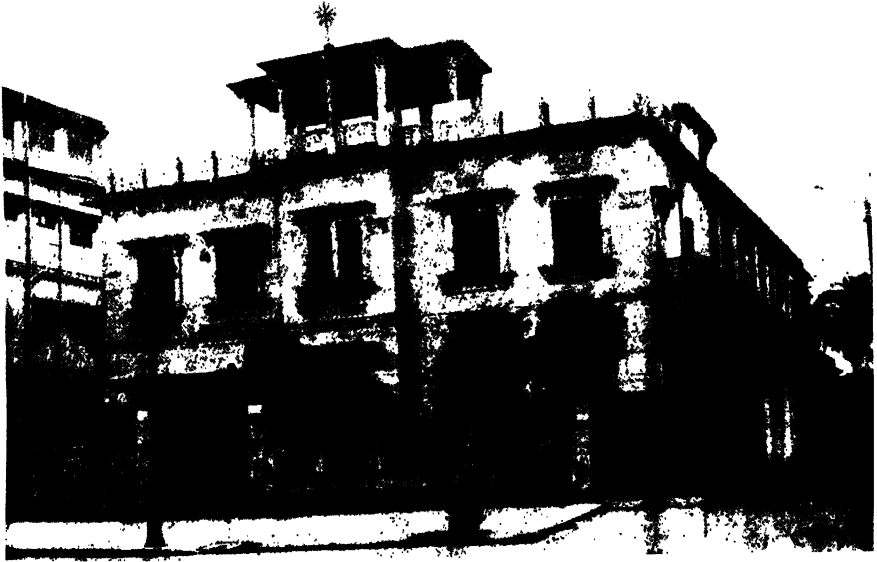
বসু বিজ্ঞান মন্দির

ভবনটি প্রাচ্য স্থাপত্য প্রথায় নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে দেড় হাজার লোকের বসিবার উপযোগী একটি কক্ষ আছে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই কক্ষে তাঁহার নব নব আবিষ্কারের সম্বন্ধে যন্ত্রাদি সহযোগে বক্তৃতা দিতেন। এই কক্ষের ভিতরকার প্রাচীর ও ছাদে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত বহু সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে। বিজ্ঞান মন্দিরের পার্শ্বেই আচার্য্য বসুর বাস ভবন এবং নিকটেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ, ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, মূক-বধির বিদ্যালয় ও রামমোহন লাইব্রেরী অবস্থিত।

(৪) **কলেজ স্কোয়ার**—ইহার চলিত নাম গোলদীঘি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্য্যালয় সিনেট হাউস, দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং ও আশুতোষ বিল্ডিং ইহার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। সিনেট হাউসের গোলাকার স্তম্ভগুলি দর্শক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার বারান্দায় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি আছে। সিনেট হাউসের প্রধান কক্ষের আয়তন দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ ফুট এবং প্রস্থে প্রায় ৬০ ফুট। এই কক্ষে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির আলেখ্য ও আবক্ষ প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। এখানে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র একসঙ্গে বসিয়া পরীক্ষা দিতে পারে। সিনেট হাউসের পশ্চিম দিককার কক্ষে "আশুতোষ স্মৃতি চিত্রশালা" নামে একটি চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতীয় চারু শিল্পের বিশেষতঃ বাংলার চারুকলার বিভিন্ন ধারার পরিচায়ক দ্রব্যাদি এখানে সংগৃহীত হইতেছে।

দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংটি দ্বারবঙ্গের পরলোকগত মহারাজা স্যর রামেশ্বর প্রসাদ সিংহের আংশিক অর্থ সাহায্যে নির্ম্মিত। এই পাঁচতলা বাটীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল গ্রন্থাগার, আইন কলেজ ও আইন কলেজ সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও গ্রন্থশালা অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের প্রাচীর গাত্রে কৃতী বাঙালী চিত্রকরগণের দ্বারা অঙ্কিত অতি প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত ভারতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক চিত্রাবলী আছে। ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু।

গোলদীঘির পূর্ব্বতীরে বিগত মহাযুদ্ধে নিহত বাঙালী সৈনিকগণের একটি স্মৃতি-স্তম্ভ আছে। ইহার অতি নিকটে রাস্তার ঠিক অপর পারে "শ্রীধর্ম্মরাজিকা চৈত্য বিহার" নামে একটি বৌদ্ধ মন্দির আছে। এই মন্দির মধ্যে একটি হস্তিদন্তের পেটিকায় বুদ্ধদেবের একখণ্ড অস্থি রক্ষিত আছে। "মহাবোধি সোসাইটি" নামক বৌদ্ধ সমিতির কার্য্যালয় এই বিহারে অবস্থিত। এই মন্দিরের হল ঘরের প্রাচীর গাত্রে অজন্তা গুহার আদর্শে অনেক সুন্দর চিত্র অঙ্কিত আছে। গোলদীঘির দক্ষিণতীরে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ারের সমাধি বিদ্যমান ও পশ্চিমকূলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি অবস্থিত।

কলেজ স্কোয়ারের সন্নিকটে মেডিক্যাল কলেজ ও হাঁসপাতাল, ট্রপিক্যাল স্কুল অব্ মেডিসিন, অল্ ইণ্ডিয়া ইনস্টিট্যুট্ অব্ হাইজিন্ এণ্ড পাবলিক হেল্থ্, হেয়ার ও হিন্দু স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, ইউনিভারসিটি ইন্‌টিট্যুট্ ও অনতিদূরে হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের সংযোগস্থলে মনীষী কৃষ্ণদাস পালের প্রস্তর মূর্ত্তি অবস্থিত।

ট্রপিক্যাল স্কুলের গবেষণাগারে বসিয়া বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যর রোণাল্ড রস্ আবিষ্কার করেন যে এনোফিলিস্ জাতীয় মশকেরাই ম্যালেরিয়ার বাহন।

হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ের সন্নিকটে কলেজ স্ট্রীট্ বাজারে কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ম অবস্থিত; এখানে ভারতের কৃষি ও শিল্পজাত বহু দ্রব্যের নমুনা রক্ষিত আছে।

(৫) **রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের মর্ম্মর প্রাসাদ**—চোরবাগানে মুক্তারাম বাবুর স্‌ট্রীটের উপর বিখ্যাত ধনী রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের মার্ব্বেল হাউস বা মর্ম্মর প্রাসাদ নামক সুরম্য অট্টালিকা অবস্থিত। এরূপ সুন্দর ও সুসজ্জিত সৌধ বাংলায় অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। দেশ বিদেশের বহুমূল্য চিত্র, প্রস্তর মূর্ত্তি ও আসবাব পত্র দ্বারা এই প্রাসাদ সুসজ্জিত। একটি বৃহৎ মনোরম উদ্যান মধ্যে এই ভবনটি অবস্থিত। উদ্যানের মধ্যে একটি কৃত্রিম পাহাড় ও ফোয়ারা আছে, ইহার এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র চিড়িয়াখানাও আছে। এই চিড়িয়াখানায় নানা দেশের নানা জাতীয় ও নানা বর্ণের পক্ষী আছে। মল্লিক পরিবারের গৃহদেবতা জগন্নাথদেবের মন্দির এই উদ্যান মধ্যে অবস্থিত। ইহার প্রাঙ্গনে প্রত্যহ ২।৩ শত কাঙালীকে খাইতে দেওয়া হয়।

হাওড়ার পুল

(৬) **হাওড়ার পুল**—হ্যারিসন রোডের পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গার উপর এই বিখ্যাত ভাসমান সেতু অবস্থিত। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি ভাসমান নৌকার (পন্‌টুন) উপর অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ এই পুলটি নির্ম্মিত হয়। ইহার উপর দিয়া বাস, লরী, মোটর, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী প্রভৃতি চলিবার প্রশস্ত রাস্তা ও দুইদিকে লোক চলাচলের জন্য "ফুট পথ" আছে। মধ্যের দুইখানি নৌকা ইচ্ছামত সরাইয়া লইয়া গিয়া পুল খুলিয়া বড় বড় স্‌টীমার ও জাহাজ যাতায়াতের পথ করিয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি এই পুলের উত্তর দিকে একটি প্রকাণ্ড ঝুলান সেতু নির্ম্মিত হইতেছে। এই সেতুর নির্ম্মাণ শেষ হইলে স্‌টীমার যাতায়াতের জন্য পুল খুলিবার আবশ্যক হইবে না। এই সেতুটি কেবল মাত্র কলিকাতার বলিয়া নহে, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটি দ্রষ্টব্য বস্তু হইবে।

(৭) **টাকশাল**—হাওড়ার পুলের কিছু উত্তরেই স্ট্র্যাণ্ড রোডের উপর কলিকাতার টাকশাল অবস্থিত। ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ টাকশাল বলিয়া কথিত। এখানে প্রবেশের জন্য অনুমতি আবশ্যক হয়।

(৮) **লালদীঘি বা ডালহৌসী স্কোয়ার**—নামক উদ্যান ও পুষ্করিণীর উত্তরে রাইটার্স বিল্ডিং বা বাংলা সরকারের দপ্তরখানা অবস্থিত। দীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে রাস্তার উপর অন্ধকূপ হত্যার একটি স্মারক স্তম্ভ আছে। ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাটিকে সর্ব্বৈব কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে করেন। লালদীঘির পশ্চিমে জেনারেল পোস্ট্ অফিস বা বড় ডাক ঘরের সুদৃশ্য ভবন, দক্ষিণে সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস বা বড় তার ঘর এবং পূর্ব্বদিকে কারেন্সী অফিস অবস্থিত। এই দীঘির নিকটে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের হেড্ অফিস, ঈস্টর্ণ্ বেঙ্গল রেলওয়ের হেড অফিস, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও ক্লাইভ স্ট্রীটের প্রসিদ্ধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গুলি অবস্থিত। লালদীঘির পশ্চিম তীরে সম্প্রতি বিখ্যাত বাঙালী ব্যবসায়ী পরলোকগত স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বড় ডাকঘর

(৯) **নাখোদা মস্‌জিদ**—লোয়ার চিৎপুর রোড ও জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে অবস্থিত। প্রকাণ্ড গম্বুজ ও সু-উচ্চ মিনার শোভিত এই মসজিদটি কলিকাতার মধ্যে মুসলমান ভজনাগার। এখানে একসঙ্গে বহু শত লোক নমাজ পড়িতে পারে।

(১০) **গড়েরমাঠ বা ময়দান**—ইহাকে কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য বলিলেও চলে। কলিকাতার গড় বা দুর্গ এই মাঠের এক প্রান্তে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এত বড় খোলা মাঠ ভারতের অপর কোন শহরে নাই। কলিকাতার অনেকগুলি দ্রষ্টব্য এই মাঠের মধ্যে ও আশেপাশে অবস্থিত। মুক্ত হাওয়া উপভোগ ও খেলাধুলা দেখিবার জন্য

এখানে প্রত্যহ বিকাল বেলায় সহস্র সহস্র নরনারীর সমাবেশ হয়। এই মাঠের মধ্য দিয়া তরুবীথি শোভিত সুন্দর সুন্দর কয়েকটি রাজপথ আছে ও ইহার স্থানে স্থানে খ্যাতনামা সৈনিক ও রাজপুরুষগণের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে।
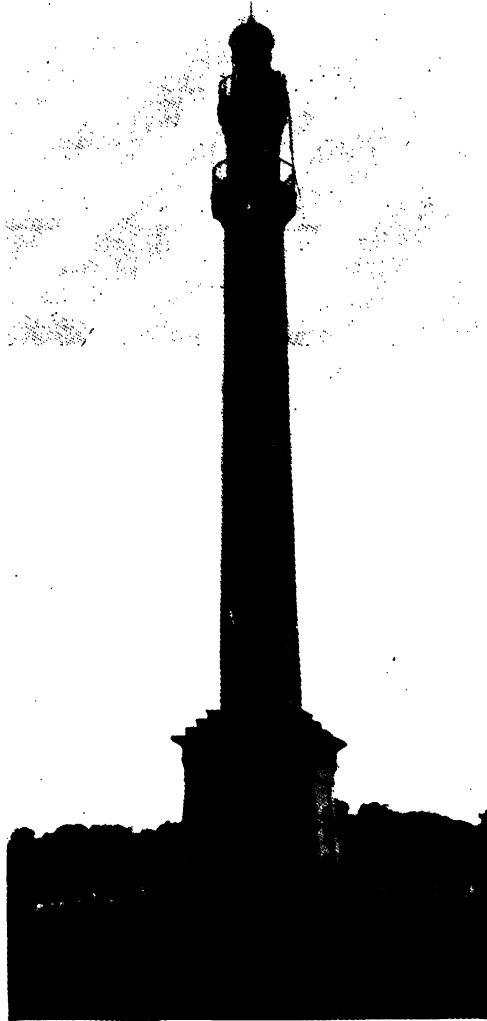
মনুমেণ্ট

গড়ের মাঠে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে সু-উচ্চ মনুমেণ্ট্। নেপালযুদ্ধজয়ী স্যর ডেভিড্ অক্টারলোনির স্মৃতি রক্ষার্থে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহার উচ্চতা ১৫২ ফুট। ইহার মধ্যস্থ ঘুরানো সিঁড়ি দিয়া উপরের রেলিং ঘেরা দুইটি ব্যালকনিতে

পৌঁছানো যায়। ইহার উপর হইতে কলিকাতা মহানগরী ও আশেপাশের দৃশ্য ছবির মত সুন্দর দেখায়। মনুমেণ্টে উঠিতে হইলে লালবাজারের পুলিশ অফিস হইতে ছাড়পত্র লইতে হয়।

কেল্লা—ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গাতীরে "ফোর্ট উইলিয়ম" তুর্গ অবস্থিত। এই তুর্গটি অষ্টকোণ বিশিষ্ট ও পরিখার দ্বারা বেষ্টিত। ইহার চারিদিকে ঢালু মৃত্তিকার প্রাচীর দ্বারা বেষ্টনী দেওয়া আছে। এই তুর্গটিকে একটি ছোট খাট শহর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার ভিতর প্রায় দশ হাজার সৈনিকের বাসোপযোগী ব্যারাক, গোলাগুলি ও অস্ত্রশস্ত্রের গুদাম, গির্জা, প্যারেডের মাঠ, দোকানপশার ও বাঁধানো রাস্তা আছে। এই তুর্গে যাতায়াত করিবার ছয়টি ফটক আছে। তুর্গ দেখিতে হইলে ছাড়পত্রের প্রয়োজন। প্রতিদিন বেলা একটার সময় এই তুর্গ হইতে তোপধ্বনি করা হয়।

সেনোটাফ্—মনুমেণ্ট্ ও কেল্লার মধ্যবর্ত্তী রেড্ রোডের মোড়ে বিগত মহাযুদ্ধে নিহত সৈনিকগণের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি সেনোটাফ্ বা স্মৃতি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সেনোটাফ্
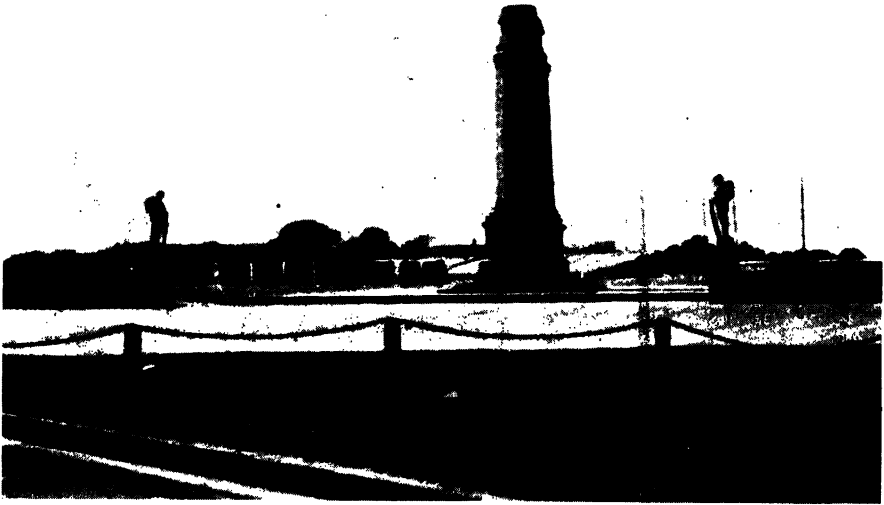
ঈডেন উদ্যান—কলিকাতার অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য ঈডেন গার্ডেন ময়দানের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। লর্ড অক্ল্যাণ্ডের ভগিনী মিসেস্ ঈডেনের উদ্যোগে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার রচনা কৌশল অতি সুন্দর। এই উদ্যানটি সুন্দর সুন্দর তড়াগ, কুঞ্জ, পুষ্পবীথি, সেতু ও প্রশস্ত বর্ত্ম দ্বারা সুশোভিত। ইহার মধ্যে একটি ব্রহ্মদেশীয় প্যাগোডা আছে। উহা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধের পর প্রোম হইতে আনীত হয়। শীতকালে ঈডেন উদ্যানে ক্রিকেট খেলা ও নানাপ্রকার প্রদর্শনীর আয়োজন হয়।

আউট্রাম ঘাট—ঈডেন উদ্যানের পশ্চিম দিকে আউট্রাম ঘাট। এই ঘাটে প্রকাণ্ড জেটির উপর কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটি দ্বিতল গৃহ আছে। এই ঘাট হইতে রেঙ্গুণগামী যাত্রী জাহাজ ছাড়ে। গঙ্গার মধ্যে অবস্থিত বলিয়া অনেকে এই জেটির উপর অপরাহ্নে বেড়াইতে যান। আউট্রাম ঘাটের চৌমাথার উপর পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্যাগোডা, ঈডেন গার্ডেন

ঈডেন উদ্যানের উত্তর দিকে হাইকোর্ট, টাউন হল, কাউন্সিল গৃহ ও লাট ভবন অবস্থিত।

হাইকোর্ট—হাইকোর্টের সু-উচ্চ চূড়াগুলি বহুদূর হইতে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই সুবৃহৎ বিচারালয়টি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নির্ম্মাণ প্রণালী বিলাতের ইপ্রেস্‌নগরীর সুপ্রসিদ্ধ টাউনহল হইতে গৃহীত।

হাইকোর্ট

টাউন হল—১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতাবাসীর অর্থে টাউন হল নিম্মিত হয়। এখানে কলিকাতার নাগরিকগণের বড় বড় সভা হয়। ইহার বিস্তৃত সোপানাবলী ও স্তম্ভশ্রেণী দর্শক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কাউন্সিল ভবন—টাউন হলের বিপরীত দিকে প্রকাণ্ড গম্বুজবিশিষ্ট কাউন্সিল ভবনে বাংলার আইন সভার অধিবেশন হয়। ইহার উত্তর দিকের প্রাঙ্গনে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদকারী লর্ড বেন্টিঙ্কের ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি আছে। ইহার শিল্পীর নাম ওয়েস্টম্যাকট্। এই মূর্ত্তির পাদপীঠে উত্তর ভারতের সতীদাহের একটি সুন্দর চিত্র ব্রোঞ্জে উৎকীর্ণ আছে। সদ্য

লর্ড বেন্টিঙ্কের প্র

বিধবার চিতায় প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হওয়া, তাহার কোলে একটি শিশুর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ব্যস্ততা, অপরটির আতঙ্কে একটি আত্মীয়কে জড়াইয়া ধরা, পুঁথিহস্তে পুরোহিতের বিমর্ষ ও চিন্তামগ্ন মুখভাব,—ইহার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি শিল্পী গভীর সহানুভূতির সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

লাটভবন—গবর্ণমেণ্ট্ হাউসটি ১৮০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি কর্ত্তৃক প্রায় তের লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিলাতের "কেডেলস্টোন" প্রাসাদের আদর্শে নির্ম্মিত হয়। ইহা এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, যেদিক্ হইতেই বায়ু প্রবাহিত হউক না কেন ইহার প্রত্যেক কক্ষেই বাতাস পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই বাড়ীতে বড়লাট বাস করিতেন, ইহা এখন বাংলার শাসনকর্ত্তার বাসভবন। এই বাটীতে সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই।

টিপু স্থলতানের মস্‌জিদ—ময়দানের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ধর্ম্মতলা স্‌ট্রীটের উপর যে স্থন্দর মস্‌জিদ্‌টি দেখিতে পাওয়া যায়, উহা টিপু স্থলতানের মস্‌জিদ নামে পরিচিত। টিপু স্থলতানের পুত্র নবাবজাদা গোলাম মহম্মদ কর্ত্তৃক ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়। টিপু স্থলতান মস্‌জিদের নিকটে চিত্তরঞ্জন এভিনিউর মোড়ে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৃহৎ ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।
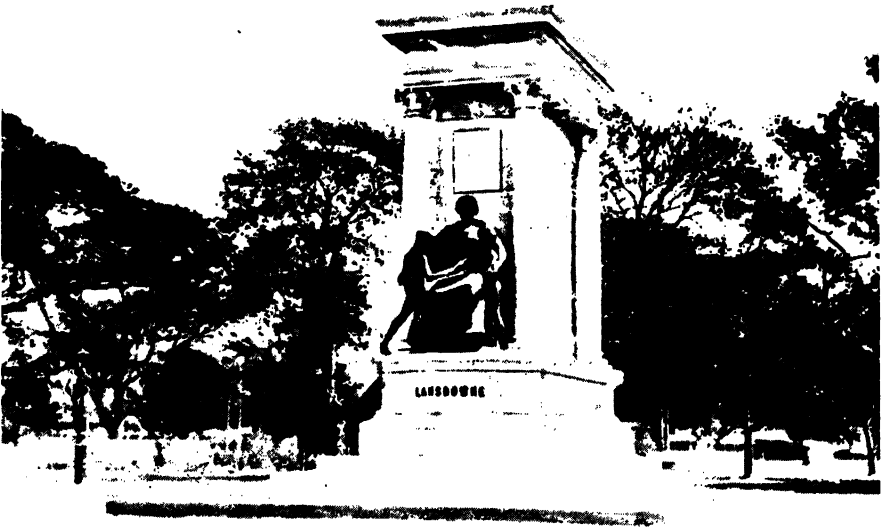
ল্যান্‌স্‌ডাউন মূর্ত্তির পাদপীঠ

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী—ময়দানের উত্তরে এস্‌প্লানেড্ ট্রাম স্টেশনের নিকটেই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নামক বৃহৎ সরকারী গ্রন্থাগার অবস্থিত। এত বড় গ্রন্থাগার ভারতবর্ষে আর নাই, ইহার পুস্তক সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষের উপর। সর্ব্বসাধারণ ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

চৌরঙ্গী—ময়দানের পূর্ব্বদিকে কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা স্থসজ্জিত রাজপথ চৌরঙ্গী রোড অবস্থিত। প্রবাদ, বর্ত্তমান কলিকাতার যখন সৃষ্টি হয় নাই, তখন এই অঞ্চলের

অরণ্য মধ্যে চৌরঙ্গীনাথ নামক একজন সিদ্ধযোগী বাস করিতেন। তাঁহার নামানুসারে এই রাজপথের নাম হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সন্ধ্যার সময় আলোক মালায় ভূষিত হইয়া চৌরঙ্গী অতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে।

যাদুঘর—চৌরঙ্গীর উপরেই সুবিখ্যাত যাদুঘর অবস্থিত। এখানে নানাপ্রকার ভূতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যা সম্পর্কিত প্রাচীন ও আধুনিক বস্তু সংগৃহীত আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে এত বড় ও এরূপ বৈচিত্র্য পূর্ণ মিউজিয়ম আর নাই। বিবিধ খনিজ পদার্থ, কৃষিজাত দ্রব্য, মৃত পশুপক্ষী ও জীবজন্তুর নমুনা, প্রাচীন হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধযুগের শিল্প সাধনার নিদর্শন, সহস্র বৎসরেরও অধিক পুরাতন মিশর দেশীয় মমি বা শবদেহ, ব্রহ্মরাজ থিবোর স্বর্ণসিংহাসন, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা হইতে আবিষ্কৃত পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন দ্রব্য ও অনার্য জাতির ব্যবহৃত বহুবিধ বস্তু প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত এই বৃহৎ ভবনটি দেখিলে একাধারে আনন্দ ও শিক্ষা উভয়ই লাভ হয়। ঐতিহাসিকযুগের নিদর্শনের মধ্যে সারনাথের অশোকস্তম্ভের চূড়া ও একটি প্রকাণ্ড প্রস্তর পেটিকা বিশেষ দ্রষ্টব্য। ইহার মধ্যে অন্যান্য দ্রব্য ব্যতীত খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতকের প্রস্তর কৌটার মধ্যে বুদ্ধদেবের অস্থি পাওয়া গিয়াছিল।
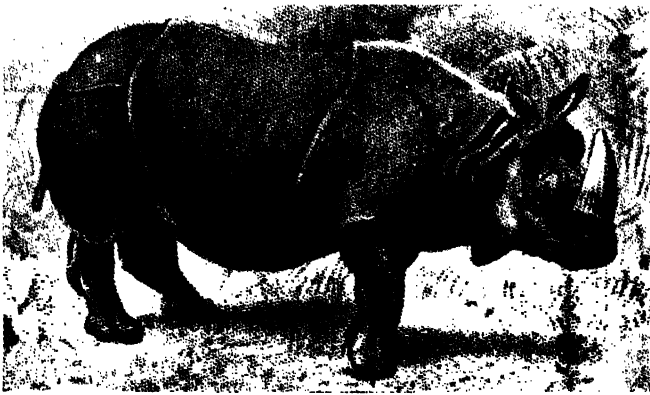
গণ্ডার—আলিপুর চিড়িয়াখানা

মুদ্রাকক্ষে বহু ভারতীয় মুদ্রা এবং মূল্যবান জহরত ও প্রস্তরাদি রক্ষিত আছে। ইহার মধ্যে সম্রাট সাজাহানের একটি পান্নার পেয়ালা আছে। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠনকালে এই পেয়ালাটি লইয়া গিয়াছিলেন।

যাদুঘরে প্রায় পাঁচশত উল্কাপিণ্ড রক্ষিত আছে। উল্কাপিণ্ডের এত অধিক সংগ্রহ এসিয়া মহাদেশে আর কোথাও নাই। এই সংগ্রহটি সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

সপ্তাহে শুক্রবার ছাড়া অন্যান্য দিন যাদুঘরে বেলা ১০টা (বৃহস্পতিবারে বেলা ১২টা) হইতে অপরাহ্ণ ৪।৫টা পর্য্যন্ত সকলেই বিনামূল্যে প্রবেশ করিতে পারেন। শুক্রবারে চারি আনা করিয়া দর্শনী লাগে।

হগ্ সাহেবের বাজার—যাদুঘরের নিকটে লিনড্‌সে স্ট্রীটের উপর কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুসজ্জিত বাজার হগ্‌মার্কেট অবস্থিত। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনার স্যর ষ্টুয়ার্ট হগ্ কর্ত্তৃক এই বাজারটি স্থাপিত হয়। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এই বাজারটির খ্যাতি আছে। এখনকার সুপরিচ্ছন্ন ও বিবিধ পণ্যের দ্বারা সুশোভিত দোকানগুলি দেখিলে যেন চোখ জুড়ায়। এখানে পাওয়া যায় না এরূপ দ্রব্য অতি অল্পই আছে। সকালে ও বিকালে এই বাজারে বহু সাহেব মেম ও ভারতীয় ধনী ব্যক্তিগণের সমাগম হয়।
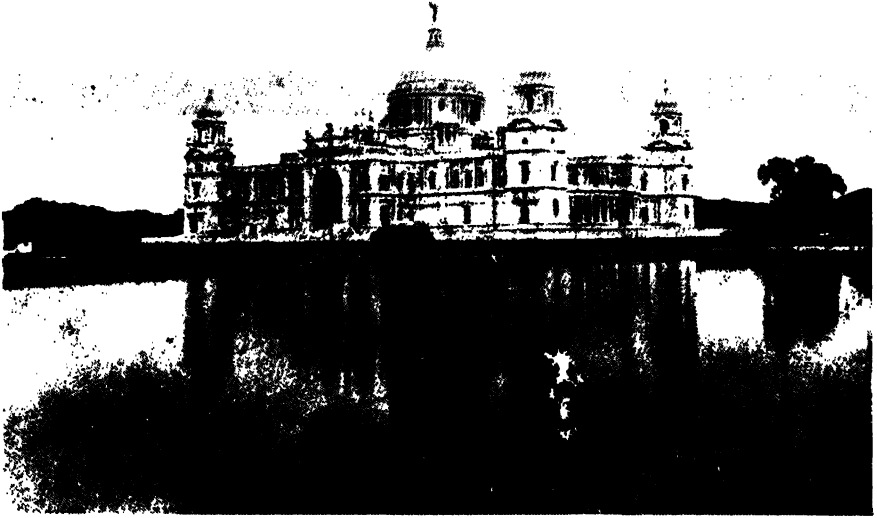
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল—ময়দানের দক্ষিণদিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল অবস্থিত। লর্ড কার্জনের পরিকল্পনায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি রক্ষা কল্পে এই সুন্দর সৌধটি নির্ম্মিত হয়। ইহা আগাগোড়া শ্বেত প্রস্তরে মণ্ডিত; তড়াগ ও কুঞ্জপরিশোভিত একটি সুরম্য উদ্যান মধ্যে এই বিশাল সৌধটি অবস্থিত। ইহা আধুনিক জগতের প্রসিদ্ধ এবং প্রধান সৌধগুলির মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার ভিতরে বহু অর্থব্যয়ে সংগৃহীত দেশী ও বিদেশীয় চিত্রাবলী, প্রাচীন অস্ত্র শস্ত্র, ঐতিহাসিক দলিল পত্র, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ব্যবহৃত টেবিল, পিয়ানো প্রভৃতি কতিপয় সামগ্রী, তাঁহার অভিষেক কালের একটি অতি সুন্দর মর্ম্মরমূর্ত্তি ও মুর্শিদাবাদের

নবাব নাজিমের প্রাচীন মসনদ প্রভৃতি বহু দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সুরক্ষিত আছে। পশ্চিম দিকের বারান্দায় শিল্পী ওয়েস্টম্যাকৃট্ কৃত ওয়ারেন হেষ্টিংসের অতি সুন্দর একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি আছে। ইহার পাদপীঠের দক্ষিণ দিকে পুঁথিহস্তে দণ্ডায়মান এক প্রশান্তমূর্ত্তি চিন্তাশীল ব্রাহ্মণের চিত্র এবং বামদিকে পাঠনিরত একজন মৌলবির চিত্র আছে। এই চিত্রযুগলের দ্বারা শিল্পী ভারতীয় সংস্কৃতির দুইটি বিভিন্ন ধারা গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সহানুভূতির সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

সিংহ, আলিপুর চিড়িয়াখানা

এই স্মৃতি-সৌধের শীর্ষদেশে একটি ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত বিজয়-দেবতার মূর্ত্তি আছে। উহা ১৬ ফুট উচ্চ ও তিন টন ভারী। ইহার একটি বিশেষত্ব এই যে হাওয়ার গতির সহিত ইহা বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়া থাকে। প্রধান গম্বুজটি জমি হইতে ১৮২ ফুট উচ্চ। কলিকাতার বহিস্থ বহু স্থান হইতে এই গম্বুজটি দৃষ্টি গোচর হয়। এই গম্বুজে উঠিতে হইলে সৌধ মধ্যস্থিত অফিস হইতে অনুমতি লইতে হয়। বাহির ও ভিতরের গম্বুজের

মধ্যবর্ত্তী অলিন্দ এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে এখানে মৃদুস্বরে কথা বলিলে তাহার প্রতিধ্বনি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রিয়া করে। উদ্যানের মধ্যে মহারাণীর একটি বৃহৎ ব্রোঞ্জমূর্ত্তি ও ঠিক্ বাহিরেই লর্ড কার্জনের একটি ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত মূর্ত্তি আছে।

সোমবার ও শুক্রবার ব্যতীত অন্যান্য দিন বেলা ১০টা হইতে ৪।৫ টা পর্য্যন্ত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল জনসাধারণের জন্য বিনা মূল্যে খোলা থাকে। শুক্রবারে আট আনা করিয়া দর্শনী লাগে। ইহার সংলগ্ন যে ছবির গ্যালারী আছে তাহা দেখিতে হইলে চারি আনা করিয়া দর্শনী দিতে হয়।
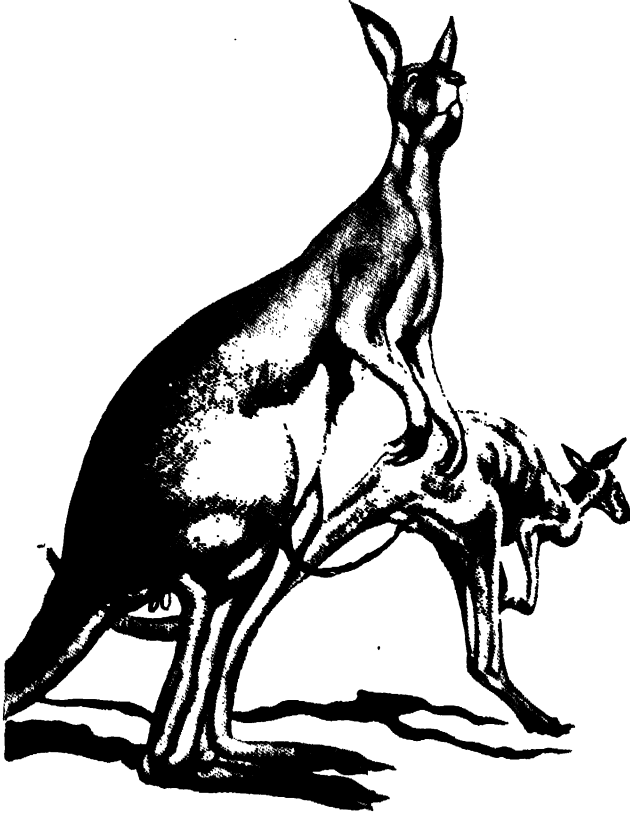
কাঙ্গারু, আলিপুর চিড়িয়াখানা।

ঘোড়দৌড়ের মাঠ—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পশ্চিম দিকে কলিকাতার প্রসিদ্ধ রেস্‌কোর্স বা ঘোড়দৌড়ের মাঠ অবস্থিত। এরূপ সুন্দর রেস্‌কোর্স প্রাচ্য ভূখণ্ডে কমই আছে।

বড় গির্জ্জা—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান গির্জ্জা সেণ্ট্ পল্‌স্ ক্যাথিড্রাল অবস্থিত। ইহার উচ্চ চূড়াও বহুদূর হইতে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এসিয়াটিক সোসাইটি---ইহাও ময়দানের নিকটে পার্ক স্ট্রীটের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ইহা এদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শিক্ষা-পরিষদ। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মনীষী স্যর উইলিয়ম জোন্স কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির মর্ম্মরমূর্ত্তি ও প্রতিকৃতি আছে। ইহার গ্রন্থাগারে হস্তলিখিত প্রায় ১৬,০০০ সংস্কৃত ও ৫,০০০ ফারসি পুঁথি এবং বহু দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থাদি আছে। এই সমিতির উদ্যোগেই যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক প্রাচীন লোকে এই জন্য যাদুঘরকে এখনও "সোসাইটি" নামে অভিহিত করেন।

(১১) **আলিপুরের চিড়িয়াখানা**—ইহা আদিগঙ্গার তীরে খিদিরপুর ব্রীজের নিকটে অবস্থিত। ইহা একাধারে একটি মনোরম উদ্যান ও পশুশালা। ভারতবর্ষে এতবড় পশুশালা আর নাই। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, ভল্লুক, বানর প্রভৃতি আমাদের দেশের জন্তু ব্যতীত আফ্রিকার সিংহ, জলহস্তী (হিপো), জিরাফ, জেব্রা, ওরাংওটাং, কাঙ্গারু ও নানাদেশের দুর্ল্লভ পশুপক্ষী সযত্নে রক্ষিত আছে। অপরাহ্নে বেলা প্রায় ৩টার সময় সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জানোয়ারকে কাঁচা মাংস খাইতে দেওয়া হয় এবং উহা দেখিবার জন্য ঐ সময়ে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। রবিবার ভিন্ন অন্য দিন বেলা ১০টা হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত চিড়িয়াখানায় জন প্রতি এক আনা করিয়া দর্শনী লাগে।

(১২) **বেলভেডিয়র**—ইহা চিড়িয়াখানার সম্মুখেই অবস্থিত। বড়লাট কলিকাতায় আসিলে এইখানে অবস্থান করেন। ১৮৫৮ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা ছোট লাটের বাসভবন ছিল। কথিত আছে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম্ উস্ শান কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহা তৎকালীন সুবেদারের মৃগয়া-ভবন ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

(১৩) **খিদিরপুরের ডক্**—ইহাও কলিকাতার একটি প্রধান দ্রষ্টব্য। গঙ্গা হইতে খাল দিয়া এই ডকে ইচ্ছামত জল সরবরাহ করা হয়। এখানে সর্ব্বদাই নানা দেশীয় বড় বড় জাহাজকে মাল বোঝাই ও মাল খালাস করিতে দেখা যায়। এখানে চারটি শুষ্ক বা জলহীন ডক আছে। এই ডকগুলিতে জাহাজ আনিয়া পরে সমস্ত জল বাহির করিয়া দিয়া ইহাকে শুষ্কখাতে পরিণত করা হয় এবং তথায় জাহাজগুলির মেরামত কার্য্য চলে। ডকের মুখে গঙ্গার উপর একটি ঘড়িসংযুক্ত উচ্চ আলোকস্তম্ভ আছে। খিদিরপুরের দক্ষিণ হইতে মেটিয়াবুরুজ পর্য্যন্ত ছোট ছোট জাহাজ মেরামতের অনেকগুলি ডক্ আছে। নিকটেই গার্ডেনরীচে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বড় দপ্তর বা প্রধান কার্য্যালয় অবস্থিত।

(১৪) **কালীঘাট**--হিন্দু দর্শকগণের নিকট কালীঘাট কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান দ্রষ্টব্য। কালীঘাট একটি মহাপীঠ, এখানে সতীর দক্ষিণ পদের চারিটি অঙ্গুলি পড়িয়াছিল; দেবীর নাম কালিকা, ভৈরব নকুলেশ্বর। দেবীর মন্দিরের অনতিদূরে নকুলেশ্বরের মন্দির। কালীঘাটের প্রান্ত দিয়া আদিগঙ্গা প্রবাহিতা। কালীঘাটের কালীর মূর্ত্তি পাষাণময়ী।

এই মূর্ত্তির অধোভাগ অদৃশ্য, কটীদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অঙ্গ বহুবিধ মূল্যবান অলঙ্কারে ভূষিত ও জিহ্বা স্বর্ণমণ্ডিত। কালীঘাটকে লক্ষ্য করিয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কলিকাতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"এই কলিকাতা কালিকাক্ষেত্র কাহিনী ইহার সবার শ্রুত।
বিষ্ণুচক্র ঘুরেছে হেথায়, মহেশের পদধূলে এ পূত॥"

কালীঘাটের আদি মন্দির যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান মন্দির বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায় কর্ত্তৃক ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। তৎপরে এই মন্দিরের বহু সংস্কার সাধিত হইয়াছে। প্রবাদ, বহু প্রাচীনকালে আদিগঙ্গার তীরে বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী জেলের দক্ষিণে কালীর অতি প্রাচীন আদি মন্দির ছিল এবং বর্গীরা এখানে নরবলি দিত। কালীমন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দির প্রায় সব সময়েই চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি কার্য্যে নিরত লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। ইহার দক্ষিণে পশুবলির স্থান। এখানে প্রত্যহ বহু ছাগ বলি হয়। কালীঘাটে নিত্যই লোকের ভিড়, নিত্যই মহোৎসব। তবে শনি ও মঙ্গলবারে, প্রতি অমাবস্যা ও সংক্রান্তিতে, গঙ্গাস্নানের যোগে, কালীপূজার দিন ও মহাষ্টমী উপলক্ষে এখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনসমাগম হয়। মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করিবার প্রধান ফটকের বামদিকে অপর একটি মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। বাওয়ালীর জমিদার উদয়নারায়ণ মণ্ডল ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির ও বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি পর্ণকুটীরের অনুকরণে বিশুদ্ধ বাংলা পদ্ধতিতে নির্ম্মিত। কালীঘাটের বর্ত্তমান সেবাইত হালদারগণ এই দেবস্থানের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

কালীঘাটে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে। বাহির হইতে আগত যাত্রিগণ তথায় থাকিয়া গঙ্গাস্নান, দেবীদর্শন ও কলিকাতার অন্যান্য দ্রষ্টব্য দেখিতে পারেন।

কথিত আছে, কোম্পানির আমলের প্রথমযুগে কোম্পানির তরফ হইতে এই মন্দিরে পূজা দেওয়া হইত। "Life and Times of Carey, Marshman and Ward" নামকগ্রন্থে লিখিত আছে যে একবার ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এদেশে তাঁহাদিগের সাফল্যের জন্য পাঁচ হাজার টাকার নৈবেদ্য দিয়া এখানে পূজা দিয়াছিলেন।

কালীঘাটের পটুয়াদের অঙ্কনপদ্ধতি বাঙালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য; অধুনা ইহা শিল্প-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

কালীঘাটের নিকটবর্ত্তী সাহানগর বা কেওড়াতলার মহাশ্মশান একটি দ্রষ্টব্য স্থান। স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মহাপ্রাণ অশ্বিনী কুমার দত্ত, বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের নশ্বরদেহ এইখানেই পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

দেশবন্ধুর চিতার উপর একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর স্মৃতিসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ প্রাচ্য প্রথায় নির্ম্মিত ও ৫৬ হাত উচ্চ। বাঙালী মাত্রেরই এই স্মৃতিসৌধটি দর্শন করা কর্ত্তব্য।

কেওড়াতলার শ্মশানের দক্ষিণে মহিষুরের রাজার স্মৃতিসৌধ ও দেবমন্দির অপর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। সুন্দর উদ্যান মধ্যে অবস্থিত এই সৌধ ও মন্দিরটি দক্ষিণ ভারতীয় প্রথায় নির্ম্মিত।
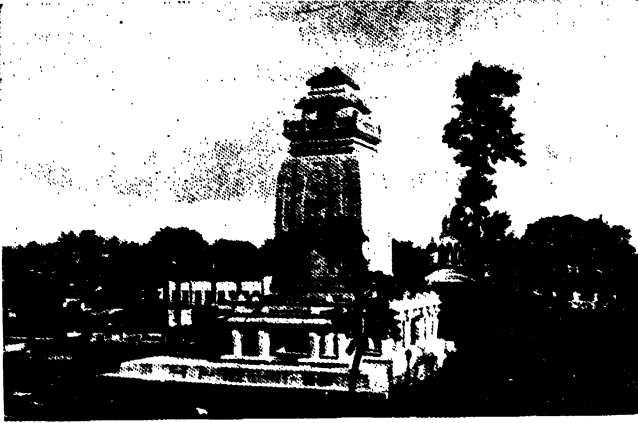
দেশবন্ধু স্মৃতিসৌধ

(১৫) **ঢাকুরিয়া হ্রদ**—কয়েক বৎসর হইল কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলে ঢাকুরিয়া পল্লীর নিকটে কলিকাতার ইম্প্রুভমেণ্ট্ ট্রাস্ট কয়েকটি কৃত্রিম হ্রদ প্রস্তুত করিয়াছেন। পূর্ব্বে এই অঞ্চল জলাভূমি ছিল। বহু অর্থব্যয়ে এই স্থানকে এখন মনোরম প্রমোদ ভ্রমণের স্থানে পরিণত করা হইয়াছে। প্রধান হ্রদের তীরে একটি য়ুরোপীয় ও একটি ভারতীয় নৌকা-বিহার সমিতি আছে। হ্রদের চতুর্দ্দিকে একটি প্রশস্ত রাজপথ ও কতকগুলি দূর্ব্বাদল-আচ্ছাদিত মাঠ প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রত্যহ বৈকালে এই স্থানে বায়ু সেবনার্থী বহু নরনারীর সমাগম হয়। হ্রদের মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে এবং উহাদের একটির উপর একটি সুন্দর মসজিদ আছে। একটি সেতুর উপর দিয়া এই দ্বীপে যাওয়া যায়। সম্প্রতি প্রধান হ্রদের দক্ষিণতটে জাপানীরা একটি বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই মন্দিরটিও হ্রদ অঞ্চলের একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

(১৬) **হাওড়া**—ইহা গঙ্গার পশ্চিমতীরে কলিকাতা শহরের ঠিক্ বিপরীতদিকে অবস্থিত। ইহা একটি স্বতন্ত্র জেলা হইলেও এবং এখানে পৃথক মিউনিসিপ্যালিটি থাকা সত্ত্বেও ইহাকে কলিকাতার অংশ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। হাওড়ার পুল নামে পরিচিত সুবিখ্যাত ভাসমান সেতু দ্বারা ইহা কলিকাতার সহিত সংযুক্ত।

হাওড়া নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকের মত এই যে "হাওড়" বা কর্দ্দমাক্ত জলাভূমি হইতেই ইহার নাম হাওড়া বা হাবড়া হইয়াছে। বস্তুতঃ এই জেলায় নিম্নভূমির সংখ্যা খুব বেশী। হাওড়া স্টেশন ছাড়িয়া রেলগাড়ী সামান্য দূর অগ্রসর হইলেই লাইনের দুইদিকে বহু জলাভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে হাওড়া পৃথক জেলা হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে ইহা কখনও বর্দ্ধমান, কখনও হুগলী এবং কখনও বা ২৪ পরগণা ও নদীয়া জেলার এলাকাধীন ছিল।

হাওড়ার রেল স্টেশন ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। পূর্ব্বভারত রেলপথ ও বাংলা নাগপুর রেলপথের গাড়ীগুলি এখান হইতে ছাড়ে। বাংলা দেশ হইতে উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে যাইবার ইহাই সিংহদ্বার।
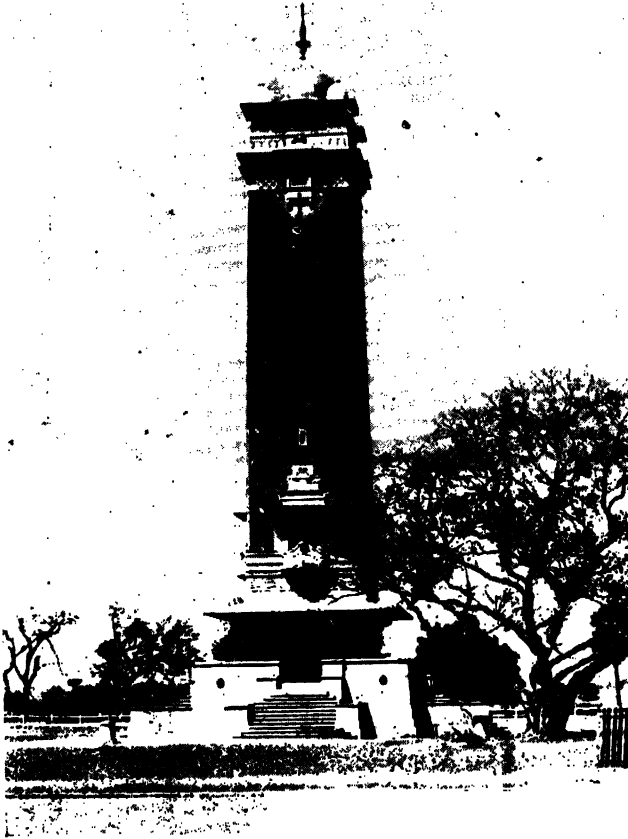
লস্কর স্মৃতিস্তম্ভ, কলিকাতা ময়দান

হাওড়া শহরের দক্ষিণাংশে বেতোড় নামে একটি স্থান আছে। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত বিপ্রদাসের "মনসা-মঙ্গল" কাব্যে এই স্থানের উল্লেখ আছে। বিপ্রদাস লিখিয়াছেন যে বাণিজ্য যাত্রাকালে চাঁদসদাগর এই স্থানে নৌকা লাগাইয়া বেতাই চণ্ডীর

পূজা করিয়াছিলেন। বেতোড় তখন একটি বড় বন্দর ছিল। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সিজার ফ্রেডারিক নামক ইউরোপীয় পর্য্যটক বাংলায় আসেন। তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণী হইতে জানা যায় যে সে সময়ে পর্তুগীজগণ প্রতিবৎসর বর্ষাকালে এখানে বাণিজ্য করিতে

গৌড়ীয় মঠ— বাগবাজার

আসিত। তাহারা বেতোড়ে বহু খড়ের চালা নির্ম্মাণ করিয়া সমস্ত বর্ষাকাল অতিবাহিত করিত। বাণিজ্য শেষে চলিয়া যাইবার সময় তাহারা খড়ের ঘরগুলি পোড়াইয়া দিয়া যাইত।

(১৭) **কলিকাতার অন্যান্য দ্রষ্টব্যঃ**—কলিকাতার অসংখ্য দেখিবার বস্তুর মধ্যে উপরে মাত্র কয়েকটি প্রধান বস্তুর উল্লেখ করা গেল। যাঁহাদের অবসর অধিক তাঁহাদের পক্ষে কলিকাতার নিম্নলিখিত বস্তুগুলিও দর্শনীয়। (ক) গঙ্গাতীরে প্রিন্সেপ ঘাটের নিকট ব্রোঞ্জনির্ম্মিত গম্বুজবিশিষ্ট শ্বেত প্রস্তরমণ্ডিত গোয়ালিয়র স্মৃতিস্তম্ভ; ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র যুদ্ধে নিহত সৈনিকগণের স্মৃতি রক্ষার্থে ইহা নির্ম্মিত হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজগণ ৬৪টি কামান দখল করিয়াছিলেন, উহা গলাইয়া এই স্মৃতি স্তম্ভের গম্বুজ নির্ম্মিত

লর্ড রবার্টসের প্রতিমূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ চিত্র

হয়। ইহার অল্পদূরে পিতলের গম্বুজবিশিষ্ট গত মহাযুদ্ধে নিহত লস্করদিগের একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। (খ) পোস্তায় জগন্নাথদেবের মন্দির, (গ) নিমতলায় আনন্দময়ী কালী, অতিকায় শিবলিঙ্গ ও মহাশ্মশান; (ঘ) বাগবাজারে গৌড়ীয় মঠ, মদনমোহন ও সিদ্ধেশ্বরী কালী। কথিত আছে, বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় দামোদর সিংহ তাঁহার গৃহদেবতা মদনমোহন বিগ্রহকে বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্রের নিকট বন্ধক রাখিয়া এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ লন। রাজা যখন উহা ফেরত লইতে আসেন গোকুল মিত্র তখন ঠিক

তদ্রূপ আর একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া আসল বিগ্রহের পরিবর্ত্তে রাজাকে উহা প্রদান্ করেন। রাজা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আসল মদনমোহন মিত্র মহাশয়ের গৃহেই থাকিয়া যান। সিদ্ধেশ্বরী কালীর সম্বন্ধে জনশ্রুতি যে ইহা একজন সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পূর্ব্বে এখানে নরবলি হইত। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দরাম মিত্র ওরফে "কাল জমিদার" ইহার জন্য একটি সু-উচ্চ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উহা অক্টারলোনী মনুমেণ্ট্ অপেক্ষাও উচ্চ ছিল বলিয়া কথিত। ইংরেজেরা এই মন্দিরকে "ব্ল্যাক্ প্যাগোডা" বা গোবিন্দরাম মিত্রের প্যাগোডা বলিতেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে এই মন্দির পড়িয়া গেলে গোবিন্দরামের বংশধর অভয়চন্দ্র মিত্র বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করান।

(ঙ) চিৎপুরে চিত্তেশ্বরী সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির, (চ) টালার জলের ট্যাঙ্ক, (ছ) বেল-গেছিয়ায় দিগম্বর জৈন মন্দির, ভেটোরিনারী কলেজ ও কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ। (জ) শ্যামবাজারে দেশবন্ধু পার্ক। (ঝ) এজরা স্ট্রীটে পার্শীদের অগ্নিমন্দির। (ঞ) মুর্গি-হাটায় ইহুদীদের সিনাগগ্ বা গির্জ্জা। (ট) রেড রোডে অবস্থিত লর্ড রবার্টস্, হার্ডিং, কিচনার, ল্যান্স্ডাউন, মিণ্টো প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তিগুলি দেখিবার মত। অশ্বারূঢ় লর্ড রবার্টসের মূর্ত্তিটি আফগান্ যুদ্ধে অধিকৃত ১৪টি কামান হইতে ঢালাই করা, লর্ড রবার্টস্ আফগান্দের মেষচর্ম্মের কোট পরিহিত। মূর্ত্তির পাদপীঠের চারিদিকে সৈনিকগণের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। ইহার পশ্চাদ্দিকে যুদ্ধের ও সম্মুখভাগে যুদ্ধজয়ের যে চিত্র আছে তাহা ভাস্কর্য্যশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। (ঠ) চৌরঙ্গী ও পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে আউট্রামের মূর্ত্তি। ইহা গত শতাব্দীতে নির্ম্মিত পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অশ্বারূঢ় মূর্ত্তিগুলির অন্যতম। ভাস্করের নাম জন্ হেন্‌রী ফোলী, ইঁহার নির্ম্মিত অনেক মূর্ত্তি বিলাতে আছে।

(ড) বালীগঞ্জে মহানির্ব্বাণ মঠ। (ঢ) ভবানীপুরে আশুতোষ ইন্স্টিটিউট্ ও চিত্তরঞ্জন সেবাসদন। (ণ) লোয়ার সার্কুলার রোডে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধি। (ত) আলিপুরে হর্টিকাল্চারাল গার্ডেন। (থ) টালীগঞ্জে ঘোড়দৌড়ের মাঠ ও রাস-মন্দির। (দ) ঢাকুরিয়ায় যোধপুর ক্লাব। (ধ) পার্ক স্ট্রীটের সমাধিক্ষেত্রে হিন্দু স্টুয়ার্টের স্মৃতি-সৌধ ইত্যাদি। স্টুয়ার্ট সাহেব প্রথমে সৈনিক বিভাগে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পুরা নাম ছিল মেজর জেনারেল চার্লস্ স্টুয়ার্ট। আয়ার-ল্যাণ্ডের ডাবলিন শহর তাঁহার জন্মস্থান। হিন্দু ধর্ম্মের উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ন্যায় সাত্ত্বিকভাবে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার সমাধির উপর স্মৃতি-সৌধটি হিন্দু মন্দিরের প্রথায় নির্ম্মিত।

এই সকল ছাড়া বাংলার গৌরব বিখ্যাত মনীষিগণ যে সকল স্থানে বাস করিতেন তাহাও শ্রদ্ধার সহিত দর্শনীয়।

রাজা রামমোহন রায় ৮৫ নং আমহার্ষ্ট স্ট্রীটে বাস করিতেন। এখানে মর্ম্মর-ফলক স্থাপিত আছে। ইহার পূর্ব্বে তিনি ১১৩ নং আপার সার্কুলার রোড ভবনে বাস করিতেন। বর্ত্তমানে এখানে পুলিশের থানা অবস্থিত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাসভবন ছিল বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর স্ট্রীটে। এখানেও মর্ম্মর-ফলক আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে ৫নং প্রতাপচন্দ্র চ্যাটার্জ্জি লেনে বাস করিতেন। মর্ম্মর-ফলকে ইহা উৎকীর্ণ আছে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় খিদিরপুর পদ্মপুকুরের দক্ষিণে বাস করিতেন। এখানেও মর্ম্মর-ফলক আছে

হিন্দু স্টুয়ার্টের সমাধি

কেশবচন্দ্র সেন ৭৮ নং আপার সার্কুলার রোড কমল কুটীরে বাস করিতেন। এখানেও স্মৃতি-ফলক আছে।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকো ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে বাস করিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁহার পুত্রগণের ইহা বসতবাটী।

কলিকাতার পারিপার্শ্বিক দ্রষ্টব্যঃ—

(ক) **বোটানিক্যাল গার্ডেন, শিবপুর**—হাইকোর্টের নিকটবর্ত্তী চাঁদপাল ঘাট হইতে ফেরী স্টীমারযোগে অথবা হাওড়া হইতে ট্রামে শিবপুর হইয়া বোটানিক্যাল

গার্ডেনে যাইতে হয়। এই উদ্যানটি গঙ্গার ঠিক উপরেই ২৭২ একর জমির উপর অবস্থিত। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঞ্জিনীয়ার কর্ণেল কিডের দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে সকল প্রকার বৃক্ষ ও লতার নমুনা আছে। গঙ্গাতীর হইতে উদ্যান মধ্যবর্ত্তী পামবীথিযুক্ত প্রশস্ত পথটি, মনোরম অর্কিড হাউসগুলি ও দেড়শত বৎসরের প্রাচীন একটি বিশাল বটবৃক্ষ এখানকার প্রধান আকর্ষণ। এই বটবৃক্ষের কাণ্ড হইতে প্রায় ৩০০ জট বা শিকড় বাহির হইয়া মৃত্তিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ৯০০ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট এক খণ্ড জমির উপর এই বটবৃক্ষটি দণ্ডায়মান। কথিত আছে এই স্থানে উদ্যান নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে এই বটবৃক্ষের তলায় জনৈক সন্ন্যাসী বাস করিতেন।

প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষ—বোটানিক্যাল উদ্যান

বোটানিক্যাল উদ্যানটি বেশ নিরিবিলি। প্রত্যহ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইহা বিনা দর্শনীতে সাধারণের জন্য খোলা থাকে। এই উদ্যানের নিকটেই শিবপুরের বিখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ অবস্থিত। কলেজ রোড নামক রাজপথের উপর "নিম্বার্ক আশ্রম" নামে একটি বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠান আছে। পরলোকগত বাঙালী সন্ন্যাসী মহন্ত সন্তদাসজী ইহার প্রতিষ্ঠাতা। সংসারাশ্রমে সন্তদাসজীর নাম ছিল তারাকিশোর চৌধুরী। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি বৃন্দাবনস্থ চারি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের অধিনেতা বা মহন্তের পদে বৃত হন। তাঁহার পূর্ব্বে অপর কোন বাঙালী সন্ন্যাসী এই সম্মান লাভ করেন নাই।

(খ) বরাহনগরের শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ-মন্দির—কলিকাতার উত্তর উপকণ্ঠে অবস্থিত বরাহনগরের মালিপাড়া নামক পল্লীতে ভাগবত আচার্য্যের পাটবাড়ী নামে পরিচিত একটি বৈষ্ণব শ্রীপাট আছে। চৈতন্যদেব এই পাটবাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এখানে একটি মন্দিরে গৌর-নিতাই-এর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির সংলগ্ন প্রশস্ত নাটমন্দিরে প্রত্যহ অপরাহ্ণে বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ হয়। পাটবাড়ীর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির ও বৈষ্ণব মিউজিয়ম একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। এই গ্রন্থাগারে বহু মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বৈষ্ণব গ্রন্থ আছে। তাহা ছাড়া শ্রীচৈতন্য দেবের হস্তাক্ষর, বৈষ্ণব মহাজনগণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও বহু তীর্থের রজ ও স্মৃতিচিহ্ন এখানে সংগৃহীত আছে। ইহা একটি দেখিবার মত প্রতিষ্ঠান। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে এখানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন স্মরণ উপলক্ষে একটি বিরাট মহোৎসব হয়।

(গ) **দমদম**—পূর্ব্বে এখানে ছাউনি ছিল। উড়োজাহাজে উঠানামার জন্য এখানে একটি প্রকাণ্ড এরোড্রোম আছে।

(ঘ) **দক্ষিণেশ্বর**—শিয়ালদহ হইতে ট্রেণ ও মোটর বাস যোগে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া যায়। ট্রেণে গেলে সুবিখ্যাত ওয়েলিংডন ব্রিজের নিকটে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে নামিতে হয়। রেল স্টেশন ও বাস স্ট্যাণ্ড হইতে দক্ষিণেশ্বরের সুবিখ্যাত কালীবাড়ী মাত্র দুই তিন মিনিটের পথ। কালীবাড়ী গঙ্গার ঠিক্ উপরেই অবস্থিত। বাঁধাঘাট, চাঁদনী ও দ্বাদশ শিবমন্দিরযুক্ত এই কালীবাড়ীর দৃশ্য গঙ্গাবক্ষ হইতে অতি সুন্দর। কলিকাতা জানবাজারের পুণ্যশীলা রাণী রাসমণি এই কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠা করেন। মহামানব রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধন পীঠ হিসাবে বর্ত্তমানযুগে এই কালীবাড়ী তীর্থের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। রামকৃষ্ণদেবের বাস-কক্ষটিতে তাঁহার শয্যা ও ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সুসজ্জিত করিয়া রাখা আছে। রামকৃষ্ণদেবের সাধন বেদী ও পঞ্চবটী এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য। কালীমন্দিরের চূড়ার সংখ্যা নয়টি, ইহার সম্মুখে নাটমন্দির ও উত্তরদিকে রাধাকৃষ্ণের মন্দির অবস্থিত। মন্দির প্রাঙ্গনের বিস্তৃত স্থান লালরঙের টালির দ্বারা আবৃত। দক্ষিণেশ্বরে যাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কালীবাড়ী হইতে কিছু দূরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামের মধ্যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ কর্ত্তৃক পরিচালিত আদ্যাপীঠ ও তৎসংলগ্ন মাতৃ-আশ্রম, বালক-আশ্রম প্রভৃতি বিদ্যালয়গুলি দক্ষিণেশ্বরের অপরাপর দ্রষ্টব্য।

(ঙ) **ওয়েলিংডন ব্রিজ**—দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ঠিক পার্শ্বে এই প্রকাণ্ড রেলওয়ে সেতুটি অবস্থিত। ইহার চলিত নাম বালী ব্রিজ। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইহার নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শেষ হয় এবং ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড ওয়েলিংডন ইহার উদ্বোধন করেন। তাঁহারই নামানুসারে ইহার নামকরণ হয় ওয়েলিংডন ব্রিজ। গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত ৩৫০ ফুট অন্তর সাতটি স্তম্ভের উপর ইহা নির্ম্মিত। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহা একটি বিখ্যাত রেলওয়ে সেতু। প্রায় চারি কোটি টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত। ইহার উপর দুইটি রেলওয়ে লাইন ছাড়া দুই দিকে মোটরগাড়ী প্রভৃতি যাতায়াতের পথ ও পদচারীদের জন্য ফুটপথ আছে। গ্রীষ্মকালের বৈকালের দিকে অনেকে ইহার উপর বেড়াইতে যান। পদচারীদিগকে এই সেতু অতিক্রম করিতে হইলে দুই পয়সা মাশুল দিতে হয়।

(চ) **ওয়েলিংডন রীচ** বালী ব্রিজের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গঙ্গাগর্ভে জলের উপর বিমান যান অবতরণ করিবার জন্য একটি স্থান আছে, উহা ওয়েলিংডন রীচ নামে পরিচিত।

(ছ) **বেলুড়মঠ**:—ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে দক্ষিণেশ্বরের অনতিদূরে বেলুড়মঠ অবস্থিত। রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ এই স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্য্যালয় স্থাপন করেন। সম্প্রতি এখানে একটি প্রস্তর মণ্ডিত বৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত হইয়া তন্মধ্যে রামকৃষ্ণদেবের চিতাভস্মের উপর সুন্দর মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলাদেশে এত বড় মন্দির আর নাই। নিকটেই স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি মন্দির অবস্থিত। (পূর্ব্বভারত রেলপথের "বেলুড়" স্টেশন দ্রষ্টব্য।)
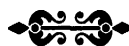
কলিকাতা ও হাওড়ার সহিত লাইট রেলওয়ের দ্বারা সংযুক্ত প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(ক) বারাসাত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ে

কলিকাতার বেলগাছিয়া (ট্রাম ডিপোর নিকট) হইতে মার্টিন কোম্পানির এই ছোট মাপের রেলপথটি ৪৩ মাইল দূরবর্ত্তী ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলের হাসনাবাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। রেল স্টেশনটি বেলগাছিয়ায় অবস্থিত হইলেও উহার নাম শ্যামবাজার। এই স্থান হইতে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী বেলিয়াঘাটা ব্রীজ হইতে এই রেলপথের এক শাখা ৯ মাইল দূরবর্ত্তী পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের খুলনা শাখার বারাসাত জংশনে গিয়া মিলিত হইয়াছে। এই রেলপথে হাড়োয়াখাল, দেগঙ্গা, ধানকুড়িয়া গাইন গার্ডেন, আড়বালিয়া, শীকরা-কুলীনগ্রাম, বসিরহাট, দণ্ডীরহাট, টাকী রোড ও হাসনাবাদ উল্লেখযোগ্য স্টেশন।

হাড়োয়াখাল কলিকাতা হইতে ১১ মাইল দূর। হাড়োয়ায় বিখ্যাত পীর গোরাচাঁদ বা গোড়াই গাজীর সমাধি অবস্থিত। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের ১২ই তারিখে গোড়াই গাজীর মৃত্যু তিথিতে এখানে মুসলমানগণের একটি বৃহৎ মেলা হয়। গোড়াই গাজী সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ জানা যায় নাই। জনশ্রুতি যে তিনি একজন বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন ও তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি বালাণ্ডা পরগণার রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানী দেউলিয়ায় উপস্থিত হন ও তাঁহাকে মুসলমান হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। চন্দ্রকেতু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে স্বীকার না করায় তিনি তাঁহাকে স্বীয় অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বশীভূত করিতে চেষ্টা করেন। কথিত আছে তাঁহার প্রভাবে একটি লৌহখণ্ড একটি সুপক্ক কদলীতে পরিণত হয় ও একজন মৃতব্যক্তি পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হয়। ইহা দেখিয়াও কিন্তু চন্দ্রকেতুর মন টলিল না। তিনি গোড়াই গাজীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। চন্দ্রকেতুর সহিত আটিয়া উঠিতে না পারিয়া গোড়াই গাজী সুন্দরবনের হাতিয়াগড় অঞ্চলে ইসলামধর্ম্ম প্রচার করিতে গমন করেন। সেখানে তখন রাজা মহীদানন্দ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র অকানন্দ ও বকানন্দ মহাবীর ছিলেন। তাঁহাদের সহিত গোড়াই গাজীর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে বকানন্দ গোড়াই গাজীর হস্তে নিহত হইলেন, কিন্তু গোড়াই গাজীও গুরুতররূপে আহত হইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইবার জন্য তাঁহার অনুচরের নিকট একটি পান চাহিলেন। হাতিয়াগড়ে তখন পান না মিলায় আহত গোড়াই গাজী রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কুলটি-বিহারী নামক গ্রামে আসিয়া এক নির্জ্জন স্থানে শয়ন করিয়া রহিলেন। কালুঘোষ নামক জনৈক গোয়ালার গাভী আসিয়া প্রত্যহ তাঁহার মুখে দুগ্ধধার বর্ষণ করিয়া যাইত। কথিত আছে, যে অন্যের অলক্ষিতে সপ্তাহকাল এইরূপে দুগ্ধ পান করিতে পারিলে তিনি নাকি সুস্থ হইয়া উঠিতে পারিতেন। কিন্তু সপ্তম দিনে কালু ঘোষ গাভীর অনুসরণে আসিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করায় গোড়াই গাজী বুঝিলেন

যে তাঁহার মৃত্যু অবধারিত। তখন কালু ঘোষকে তিনি উপদেশ দিলেন যে সে যেন তাঁহার মৃত দেহ হাড়োয়ায় আনিয়া সমাধি দেয়। গোড়াই গাজীর হাড় হইতে স্থানের নাম হাড়োয়া হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কালু ঘোষ হিন্দু হইয়াও একজন মুসলমানকে কবর দিয়াছিল এই অপরাধে তাহার জনৈক প্রতিবেশী তাহাকে প্রায়ই ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কালু ঘোষ একদিন তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। নরহত্যার অপরাধে ধৃত হইয়া কালু ঘোষ গৌড়ের শাসনকর্ত্তা আলাউদ্দীনের নিকট নীত হইলে তাহার স্ত্রী পীর গোরাচাঁদের সমাধির পার্শ্বে বসিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। কথিত আছে পীর গোরাচাঁদ কবর হইতে উঠিয়া গৌড়ে গমন করেন এবং কালু ঘোষকে মুক্তি দিবার জন্য আলাউদ্দীনকে অনুরোধ করেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া আলাউদ্দীন অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং কালু ঘোষকে মুক্তি দেন। অতঃপর তিনি গোরাচাঁদের সমাধির উপর একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং ১৫০০ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। কালু ঘোষের বংশধরগণ বহুকাল ধরিয়া এই সমাধির সেবায়েত ছিল। বর্ত্তমানে এই বংশের অস্তিত্ব নাই। বাংলা দেশের নানা স্থানে পীর গোরাচাঁদের আস্তানা দেখিতে পাওয়া যায়।

দেগঙ্গা—বা দ্বিগঙ্গা কলিকাতা হইতে ২১ মাইল দূর। ইহা একটি প্রাচীন স্থান। অনেকে অনুমান করেন যে প্রাচীন গ্রীক্ ইতিহাস পেরিপ্লাসে উল্লিখিত গঙ্গে বা গঙ্গারেজিয়া নগরী এই স্থানেই অবস্থিত ছিল। দেগঙ্গা শব্দটি দেবগঙ্গা, দ্বীপগঙ্গা অথবা দীর্ঘগঙ্গা শব্দের অপভ্রংশ। দেগঙ্গার নিকটে বহুবিস্তৃত ধ্বংসস্তূপ ও প্রাচীন দীর্ঘিকা ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। ইহা দেউলিয়ার রাজা চন্দ্রকেতুর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া কথিত। চন্দ্র-কেতুর সহিত গোড়াই গাজীর সংঘর্ষের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দ্রকেতুকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া গোড়াই গাজী গৌড়ের বাদশাহের সহায়তা প্রার্থনা করেন। বাদশাহ পীরশাহ নামক জনৈক ব্যক্তিকে বালাণ্ডা পরগণার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। পীরশাহ আসিয়াই গোড়াই গাজীর পরামর্শমত চন্দ্রকেতুকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। চন্দ্রকেতু এই প্রস্তাব উপেক্ষা করেন। তখন পীরশাহের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে চন্দ্রকেতু জয়লাভ করেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাঁহার বিজয়ের বার্ত্তাবাহী শ্বেত পারাবতের পরিবর্ত্তে পরাজয়ের নিদর্শন কৃষ্ণ পারাবত উড়িয়া অন্তঃপুর অভিমুখে গমন করে। যুদ্ধে চন্দ্রকেতু পরাস্ত হইয়াছেন মনে করিয়া অন্তঃপুরবাসিনীরা দীঘিতে ডুবিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করেন। বিজয়ী চন্দ্রকেতু গৃহে ফিরিয়া এই শোচনীয় ঘটনায় ক্ষুব্ধ হইয়া নিজেও আত্মহত্যা করেন। পারাবত বিভ্রাটের ফলে সেকালের বহু রাজবংশের এইভাবে ধ্বংস হওয়ার কাহিনী অবগত হওয়া যায়। রাজারা যুদ্ধযাত্রার সময়ে একটি শ্বেত ও একটি কৃষ্ণ কবুতর সঙ্গে লইয়া যাইতেন। শ্বেত কবুতরটি জয়ের ও কৃষ্ণ কবুতরটি পরাজয়ের বার্ত্তাবহরূপে গণ্য হইত। যখন যুদ্ধজয়ের আর কোনই আশা থাকিত না তখন রাজার নির্দ্দেশক্রমে তাঁহার কোন প্রিয় অনুচর কৃষ্ণ কবুতরটিকে ছাড়িয়া দিত। শিক্ষিত কবুতর উড়িয়া অন্তঃপুরে আগমন করিলে রাণী ও অন্যান্য পুরবাসিনীগণ সাধারণতঃ নিকটবর্ত্তী কোন দীর্ঘিকায় ডুবিয়া মরিয়া অত্যাচারীগণের হাত হইতে নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন।

দেগঙ্গার নিকটবর্ত্তী বালাণ্ডাও একটি প্রাচীন স্থান। মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে ইহা নিম্নবঙ্গের "বালবল্লভী" রাজ্যের রাজধানী ছিল। বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী প্রসিদ্ধ নিবন্ধকার ভবদেব ভট্ট বালাণ্ডার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ভবদেব যেরূপ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন তেমনই দক্ষ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি "বালবলভীভূজঙ্গ" উপাধিতে আখ্যাত ছিলেন। ভবদেব ভট্টের পদ্ধতি অনুসারে এখনও ব্রাহ্মণগণের দশকর্ম্মাদি সম্পন্ন হয়। ভুবনেশ্বরে তৎপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরে তাঁহার বংশের প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে। পূর্ব্বকালে বালাণ্ডা অতি উৎকৃষ্ট মছলন্দ বা মাদুরের জন্য বিখ্যাত ছিল।

ধানকুড়িয়া—কলিকাতা হইতে ২৭ মাইল দূর। এখানকার রেল স্টেশনের নাম ধানকুড়িয়া গাইন গার্ডেন। স্টেশনের সম্মুখেই ইংরেজী ক্যাস্‌ল্‌এর অনুকরণে নির্ম্মিত গাইন বাবুদের সুন্দর বাগান বাটী দেখিতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত দানবীর শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয় ধানকুড়িয়ার অধিবাসী ছিলেন। সততা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা শ্যামাচরণ অতি দীন অবস্থা হইতে বিশেষ ধনশালী হইয়া উঠেন। পাটের ব্যবসায়ে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করেন। তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর দয়ালু ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। একবার ২৪ পরগণা জেলায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তিনি স্বীয় পত্নীর উৎসাহে নিজের বাড়ীতে একটি অন্নসত্র খুলেন এবং এক বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া প্রত্যহ অন্যূন দুই হাজার নরনারীকে অন্নদান করেন। ধানকুড়িয়া গ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি অতিথিশালা আছে। ১৩০৫ সালে শ্যামাচরণ বল্লভ মহাশয় পরলোক গমন করেন। মদনমোহনের মন্দির ধানকুড়িয়ার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

আড়বালিয়া ও শীকরাকুলীন গ্রাম—কলিকাতা হইতে যথাক্রমে ২৮ ও ৩০ মাইল দূর। এই দুই গ্রামে বহু শিক্ষিত ব্যক্তির বাস। আড়বালিয়ার জ্ঞান বিকাশিনী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ইহা ২৪ পরগণা জেলার প্রাচীনতম বিদ্যালয়গুলির অন্যতম।

বসিরহাট—কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দূর। ইহা ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম মহকুমা। শহরটি ইছামতী বা যমুনা নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থিত। বসিরহাট শহরে একটি প্রাচীন মস্‌জিদ্‌ আছে, উহা সালিক মস্‌জিদ্‌ নামে পরিচিত। মস্‌জিদ্‌টির পরিমাণ ফল ৩৬ ফুট × ২৪ ফুট; দুইটি কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর স্তম্ভের উপর ছয়টি গুম্বজ বিশিষ্ট এই মস্‌জিদ্‌টি ১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে উলুগ মজলিস্‌-ই-আজম নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত **ভাবলা** গ্রাম পরলোকগত প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্মস্থান।

দণ্ডীরহাট—কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল দূর। ইহা বসিরহাট মহকুমার একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পরলোকগত খ্যাতনামা চিকিৎসক জগবন্ধু বসু মহাশয় দণ্ডীরহাটের অধিবাসী ছিলেন। চিকিৎসা বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য প্রবাদের ন্যায় এখনও

লোকের মুখে মুখে ফিরে। কথিত আছে যে তিনি নাকি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে লক্ষ টাকা উপার্জ্জন না করিয়া সন্দেশ খাইবেন না, এবং কার্য্যতঃ সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করিয়াছিলেন।

টাকী রোড—কলিকাতা হইতে ৪২ মাইল দূর। এখানে নামিয়া ২৪ পরগণা জেলার অন্যতম বিখ্যাত স্থান টাকী যাইতে হয়। টাকীর জমিদারগণ যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের বংশধর। এই বংশের স্বর্গীয় কালীনাথ মুন্সী মহাশয় দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে জনৈক ব্রাহ্মণের ফাঁসির হুকুম হইলে কালীনাথ প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

হাসনাবাদ—কলিকাতা হইতে ৪৩ মাইল দূর। এই স্থানটি ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত ও সুন্দরবন অঞ্চলের একটি বিখ্যাত গঞ্জ। কোম্পানির আমলে এখানে একটি লবণের কারখানা ছিল। শ্রীরামপুর কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলা মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তক বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী পাদরি কেরি সাহেব এক সময়ে গুরু ঋণভারে প্রপীড়িত হইয়া হাসনাবাদের নিমক-কুঠিতে সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি ৪০ একর জমি লইয়া চাষ আবাদ আরম্ভ করেন ও একখানি পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বসতি করেন। প্রায় এক বৎসরকাল এখানে অবস্থান করিবার পর তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয় ও তিনি কোম্পানির অধীনে একটি কার্য্য পাইয়া ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সপরিবারে মালদহে চলিয়া যান। সেকালে হাসনাবাদে ব্যাঘ্রের বড় উপদ্রব ছিল। নিমক-কুঠির কুঠিয়াল শর্ট সাহেবের ও কেরির বন্দুক থাকায় ব্যাঘ্রভীতি অনেকটা নিবারিত হয় এবং দলে দলে বহুলোক আসিয়া হাসনাবাদে বসতি স্থাপন করে। হাসনাবাদ হইতে নৌকাযোগে সুন্দরবনের বহু স্থানে যাওয়া যায়।

(খ) কালীঘাট-ফলতা রেলওয়ে

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের বজবজ লাইনের মাঝের আট জংশন হইতে আরম্ভ হইয়া এই ছোট মাপের (ন্যারো গেজ্) রেলপথটি গঙ্গাতীরবর্ত্তী ফলতা পর্য্যন্ত গিয়াছে। ম্যাক্‌লাউড কোম্পানি এই রেলপথের তত্ত্বাবধারক। মাঝের আট জংশন হইতে ফলতা ২৭ মাইল দূর। এই রেলপথে ঘোলসাহাপুর, সখেরবাজার, উদয়রামপুর, আমতলা হাট ও ফলতা উল্লেখযোগ্য স্টেশন।

ঘোলসাহাপুর—স্টেশনটি **বেহালা** গ্রামের অন্তর্গত। বেহালা অতি প্রাচীন গ্রাম। কথিত আছে, ভেলার উপর মৃত পতি লখিন্দরের শবদেহ লইয়া বেহুলা অনেক দিন এই স্থানে অবস্থান করিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম অনুসারে গ্রামের নাম বেহুলা বা বেহালা হয়। "কালীক্ষেত্র দীপিকা" নামক পুস্তকে এই স্থান বহুলা নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বেহালা গ্রামে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। বেহালা হরিসভার নিকটে ধর্ম্মতলায় একটি ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির ও তন্মধ্যে কচ্ছপাকৃতি এক ধর্ম্মমূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরে যে অষ্টভুজা চণ্ডীমূর্ত্তি আছে, বিশেষজ্ঞদের মতে যবদ্বীপের ব্রহ্মবনে তদনুরূপ আর একটি মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরে একটি ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তিও আছে। মন্দিরের নিকটে একটি প্রাচীন ও বিশাল দীঘির অবশিষ্টাংশ আজিও বিদ্যমান। বেহালার অন্তর্গত চণ্ডীতলায় জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার বহু মহিলা যাত্রীর সমাগম হয়। "কলিকাতার একাল ও সেকাল" প্রণেতা বিখ্যাত ঐতিহাসিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বেহালার অধিবাসী ছিলেন। কলিকাতা হইতে বেহালা পর্য্যন্ত ট্রাম লাইন আছে। আধুনিক নাগরিক সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামটি এখন শহরে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি বেহালায় "গ্রেহাউণ্ড রেসিং ষ্টেডিয়ম" বা কুকুরদৌড়ের মাঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে ইহাই একমাত্র কুকুর-দৌড়ের মাঠ। "কলিকাতা অন্ধ বিদ্যালয়" নামক প্রতিষ্ঠানটিও বেহালা গ্রামে অবস্থিত।

সখেরবাজার—মাঝের আট জংশন হইতে ৩ মাইল দূর। ইহা **বড়িষা** গ্রামের অন্তর্গত। বেহালার ন্যায় বড়িষাও একটি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামের সাবর্ণ চৌধুরী বংশীয় সন্তোষ রায় কালীঘাটের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কালীঘাট পূর্ব্বে এই বংশের সম্পত্তি ছিল। এই বংশীয় মনোহর, রামচাঁদ ও রামভদ্র প্রভৃতির নিকট হইতে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতা ক্রয় করেন। বড়িষার নিকটে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায়ের রাজধানী ও রায়গড় নামক দুর্গ অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে উহাদের চিহ্ন মাত্র নাই। দ্বারির জাঙ্গাল নামক একটি প্রাচীন রাস্তার ভগ্নাবশেষ এখনও প্রাচীন যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

উদয়রামপুর—মাঝের আট জংশন হইতে ১১ মাইল দূর। স্টেশনের নাম উদয়-রামপুর হইলেও বিষ্ণুপুরই এই অঞ্চলের বিখ্যাত স্থান। কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ড হারবর পর্য্যন্ত যে পাকা রাস্তা আছে গ্রামটি তাহারই পার্শ্বে অবস্থিত। এখানে

"বিষ্ণুপুর শিক্ষা সঙ্ঘ" নামক খৃষ্টান মিশনারীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও উপনিবেশ আছে। শহরের বাহিরে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে এই স্থানটির অবস্থান অতি সুন্দর।

আমতলা হাট—মাঝের আট জংশন হইতে ১২ মাইল দূর। এখানে বেশ একটি বড় বাজার আছে ও সপ্তাহে দুই দিন করিয়া প্রকাণ্ড হাট বসে। কলিকাতা হইতে বহু ভদ্র লোক আসিয়া এই স্থানে বাটী নির্ম্মাণ করায় ইহা ক্রমশঃ একটি ছোটখাট শহর হইয়া উঠিতেছে।
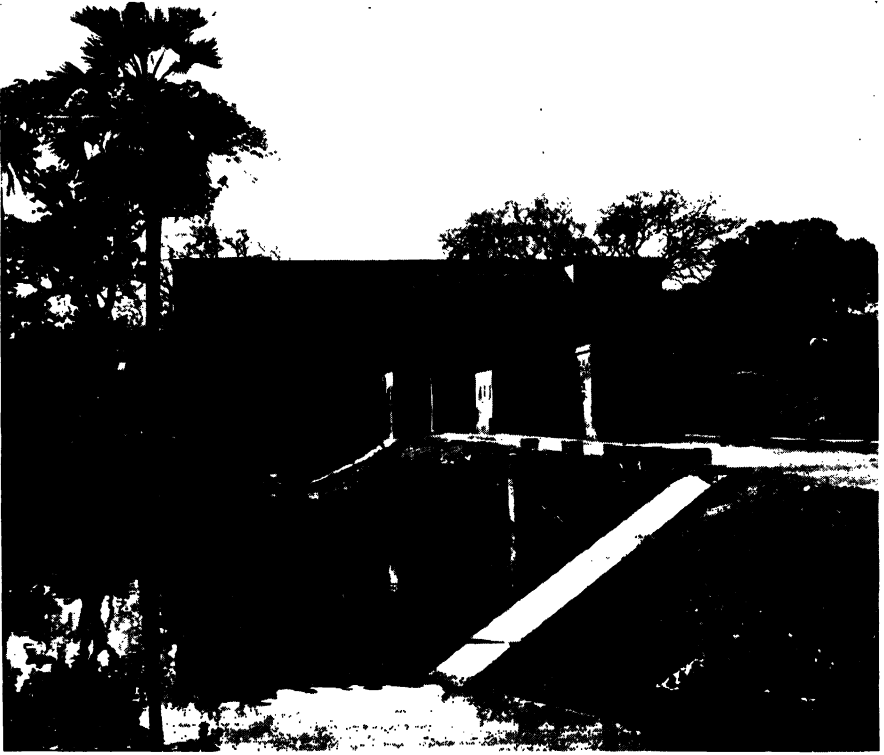
ফলতা দুর্গের প্রবেশদ্বার

ফলতা—মাঝের আট জংশন হইতে ২৭ মাইল দূর। ইহা হুগলী বা নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। ফলতা বন্দরের বিপরীত দিকে দামোদর নদ আসিয়া ভাগীরথীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ফলতার বাজার হইতে সামান্য দক্ষিণ দিকে দামোদর সঙ্গমের ঠিক সম্মুখে একটি পরিত্যক্ত দুর্গ আছে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করিলে কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসিগণ পলাইয়া গিয়া ফলতার

দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে থাকিয়াই ইংরেজগণ সৈন্যসংগ্রহ ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া কলিকাতার পুনরুদ্ধার করেন। ইংরেজ আগমনের পূর্ব্বে ফলতায় ওলন্দাজ-দিগের একটি কুঠি ও পোতাশ্রয় ছিল। ফলতার দুর্গটি প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে পরিত্যক্ত হয়। এই দুর্গটি গোলাকার, ইহার চতুর্দ্দিকস্থ পরিখায় এখনও গভীর জল থাকে। পরিখার সঙ্গে গঙ্গার সংযোগ আছে। দুর্গের প্রবেশদ্বার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। শত্রুর
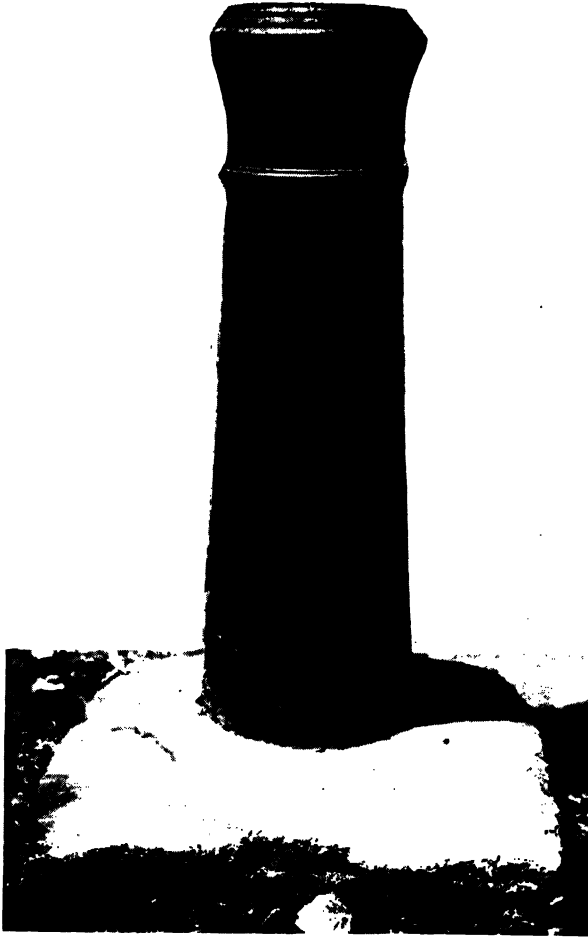
ফলতা দুর্গের পরিত্যক্ত কামান

প্রবেশ রোধ করিবার জন্য এই দ্বার ইচ্ছামত টানিয়া তুলিতে পারা যাইত। ইহার লৌহশৃঙ্খল প্রভৃতি এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। প্রবেশ তোরণের দ্বিতল গৃহটি এখন ফলতার "ইন্‌স্‌পেকশন বাংলো" রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই দুর্গের বহিঃ প্রাকার মৃত্তিকা নিৰ্ম্মিত ও ভিতরের প্রাকার ইষ্টকের দ্বারা প্রস্তুত। উভয় প্রাকারের বহু অংশ

এখনও অভগ্ন আছে, এমন কি অনেকগুলি কক্ষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমানে নানা প্রকার তৃণগুল্ম প্রভৃতির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হওয়ায় ইহা সর্প প্রভৃতির আবাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে। দুর্গের মধ্যস্থলে উচ্চ বুরুজের উপর একটি জাহাজের পথ নির্দ্দেশক স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে। এখনও বড় বড় দুইটি কামান এই দুর্গের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে।

ফলতায় অতি বিস্তৃত ধানের কারবার আছে। সম্প্রতি ইহার নিকটে কয়েকটি ধান কল বসিয়াছে। গঙ্গার ভাঙ্গন হইতে রক্ষা করিবার জন্য কলিকাতার ন্যায় ফলতা বন্দরেও পাকা পোস্ত বাঁধান আছে। ইহা বাংলা সরকারের খাস মহালের অন্তর্গত। ফলতার নীচে গঙ্গার বিস্তৃতি প্রায় দুই মাইল। এই স্থানের দৃশ্যও যেরূপ সুন্দর, স্থানটিও তেমনি স্বাস্থ্যকর।

ফলতার বন্দর

পরলোকগত বিজ্ঞানাচার্য্য স্যর জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের "মায়াপুরী" নামক কানন ফলতার অন্যতম দ্রষ্টব্য। এই মনোরম উদ্যানটি গঙ্গার ঠিক উপরেই অবস্থিত। আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র এই নির্জ্জন কাননে বসিয়া উদ্ভিদজীবন সম্বন্ধে বহু আশ্চর্য্য গবেষণা করিয়া সমগ্র সভ্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য এখানে বহু দেশের বহুবিধ তরুলতা সংগৃহীত আছে।
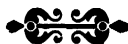
(গ) হাওড়া-আমতা ও হাওড়া-শিয়াখালা

লাইট রেলওয়ে

এই ছোট মাপের রেলপথ দুইটি মার্টিন কোম্পানি কর্তৃক নির্ম্মিত ও পরিচালিত। হাওড়াঘাট (তেলকলঘাট) হইতে আরম্ভ হইয়া ইহা হাওড়া শহরের উপকণ্ঠস্থ কদমতলা জংশনে আসিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একটি লাইন হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতা ও অপরটি হুগলী জেলার অন্তর্গত শিয়াখালা পর্য্যন্ত গিয়াছে।

হাওড়া-আমতা রেলপথে মাকড়দহ, ডোমজুড়, বড়গাছিয়া জংশন, মুন্সীরহাট ও আমতা উল্লেযোগ্য স্টেশন।

মাকড়দহ—হাওড়াঘাট হইতে ৮ মাইল দূর। এই স্থান সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার মাকড়চণ্ডীর মন্দির খুব প্রসিদ্ধ। মাকড়চণ্ডী দেবী শ্রীমন্ত সদাগরের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। পূর্ব্বকালে এই মন্দিরের পার্শ্ব দিয়াই সরস্বতী নদী প্রবাহিত ছিল। সরস্বতী এখন মজিয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বকালে এই নদী দিয়াই সপ্তগ্রাম বন্দরে বাণিজ্যপোত সকল যাতায়াত করিত।

ডোমজুড়—হাওড়াঘাট হইতে ১০ মাইল দূর। ইহাও সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থান পাটের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। এখানে আতসবাজী, সোলার টুপি ও তালাচাবী তৈয়ারী হয়। এই স্থানে বহু পানের বরজ আছে।

বড়গাছিয়া জংশন—হাওড়াঘাট হইতে ১৬ মাইল দূর। এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী **চাঁপাডাঙ্গা** পর্য্যন্ত গিয়াছে। বড়গাছিয়া একটি বর্দ্ধিষ্ণু স্থান। এখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসালয়, থানা ও সবরেজিষ্ট্রী আফিস প্রভৃতি আছে। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী কমলাপুর গ্রাম বাংলার বিখ্যাত যাদুবিদ্যাবিশারদ আত্মারাম সরকারের জন্মস্থান। কাহাকে কোনরূপ অদ্ভুত কিছু করিতে দেখিলে লোকে এখনও কথায় বলে "আত্মারাম সরকারের ভেল্কি"।

মুন্সিরহাট—হাওড়াঘাট হইতে ১৯ মাইল দূর। ইহা এতদঞ্চলের একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানকার হাট খুব প্রসিদ্ধ। এই স্থান হইতে মোটর বাস যোগে প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের রাজধানী ও মহাকবি ভারত চন্দ্রের জন্ম স্থান **পেঁড়োর গড়**

বা পেঁড়ো-বসন্তপুরে যাওয়া যায়। মুন্সীরহাট হইতে পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়া ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। পেঁড়োর গড়ের ধ্বংসাবশেষ কাণা নদীর উপর অবস্থিত। আদিশূর বংশীয় যামিনীশূর যখন অপার মন্দারের (বর্ত্তমান গড় মান্দারণ) রাজা তখন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের কায়স্থ রাজা পাণ্ডুদাস তাঁহার সামন্ত নৃপতি ছিলেন। মাদারিয়া খাল বা রোণ নদের তীরে অবস্থিত পাণ্ডুদাসের রাজধানী তাঁহার নাম অনুসারে পাণ্ডুয়া নামে পরিচিত হয়। গড়মান্দারণ হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত। বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশ-নন্দিনীতে" ইহার বর্ণনা আছে। পেঁড়ো শব্দটি পাণ্ডুয়া শব্দের অপভ্রংশ। তৎকালে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশ লইয়া গঠিত ছিল এবং বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও ধনী বণিক বা শ্রেষ্ঠীর আবাসস্থল ছিল। ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীদিগের বাসস্থান বলিয়া ইহার নাম ভূরিশ্রেষ্ঠ হয়। বর্ত্তমানে ইহা **ভুরশুট** বা **ভুরশো** নামে পরিচিত।

রাজা পাণ্ডুদাস বিশেষ ধার্ম্মিক ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বৈশেষিক দর্শনের প্রধান ভাষ্য "ন্যায়-কন্দলী" প্রণেতা প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীধর ভট্ট বা শ্রীধরাচার্য্য তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ৯৫৪ খৃষ্টাব্দে চন্দেলরাজ যশোবর্ম্মা মিথিলা ও গৌড় জয় করেন এবং ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। চন্দেল রাজের সভাকবি কৃষ্ণ মিশ্র প্রণীত "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নাটকে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের বিশেষ সুখ্যাতি আছে। পাণ্ডুদাসের বংশধরগণ হীনবল হইয়া পড়িলে বাগদী জাতীয় বীর শনি ভাণ্ডড় ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য জয় করেন। রোণ নদের তীরে **দিল্-আকাশ** নামক স্থানে তিনি তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী এক অরণ্য মধ্যে তিনি এক ভয়ঙ্করী ভৈরবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার নিকট নরবলি দিতেন। এই দেবী এখনও দিল্-আকাশে পূজিত হইতেছেন। একবার দেবীর সম্মুখে অষ্টমবর্ষীয় এক ব্রাহ্মণ কুমারকে বলি দিবার জন্য উপস্থিত করা হইলে বাগদী রাজার কাপালিক গুরু স্নেহপরবশ হইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন ও স্বয়ং তাঁহাকে পুত্রবৎ লালন পালন করেন ও যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দেন। বয়োপ্রাপ্ত হইয়া এই ব্রাহ্মণকুমার শনি ভাণ্ডড়কে পরাজিত করিয়া স্বয়ং ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের রাজা হন। ইনি চতুরানন নিয়োগী নামে পরিচিত ছিলেন। চতুরানন রাজ্য অধিকার করিয়া বর্ত্তমান পেঁড়ো হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে দামোদর নদের তীরে ভবানীপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। এই স্থান এখন গড়ভবানীপুর নামে পরিচিত। চতুরাননই ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার কোন পুত্র ছিল না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সদানন্দ মুখোপাধ্যায় রাজা উপাধি লাভ করিয়া ভূরিশ্রেষ্ঠের অধিপতি হন। এই বংশীয়গণ বহুকাল ধরিয়া গড়ভবানীপুর ও পেঁড়ো বসন্তপুরে রাজত্ব করেন। উত্তরকালে নবাব মুরশিদকুলি খাঁর সহায়তায় বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র গড়ভবানীপুরের শেষ রাজা লক্ষ্মী-নারায়ণকে বিতাড়িত করিয়া স্বয়ং গড়ভবানীপুর ও পেঁড়োর গড় হস্তগত করেন। পেঁড়োর গড়ের শেষ রাজা নরেন্দ্র নারায়ণের পুত্র মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর নষ্ট পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারে অকৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পাঠান আমলে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। মুঘলযুগে সম্রাট আকবরের সময় ইহা নামে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীন হইলেও কার্য্যতঃ স্বাধীনই ছিল। তৎকালে মুঘল দরবারে ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজকে বার্ষিক একটি স্বর্ণমুদ্রা, একটি ছাগল ও একখানি কম্বল রাজকর স্বরূপ দিতে হইত। সম্রাট আকবরের সময়ে ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ রুদ্রনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী রাণী ভবশঙ্করী ভূরিশ্রেষ্ঠের অধিশ্বরী হন। তিনি অতি তেজস্বিনী মহিলা ছিলেন। মুঘল অধিকার হইতে পাঠান সাম্রাজ্যের উদ্ধার সাধনের জন্য পাঠান সর্দ্দার ওসমান রাণী ভবশঙ্করীকে সসৈন্যে পাঠানদলে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। তিনি ইহাতে অস্বীকৃতা হইলে ওসমান বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া রাত্রির অন্ধকারে অতর্কিতে গড়ভবানীপুর হইতে প্রায় ১৪।১৫ মাইল দূরবর্ত্তী বাসডিঙ্গা গড়ের দেবমন্দির আক্রমণ করেন। ওসমান পূর্ব্ব হইতেই খবর পাইয়াছিলেন যে সেদিন অমাবস্যার রাত্রিতে রাণী ভবশঙ্করী তথাকার দেব মন্দিরে পূজা দিতে গিয়াছিলেন। অতি অল্পসংখ্যক দেহরক্ষী সৈন্যের সহায়তায় রাণী ভবশঙ্করী অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং অমিত বিক্রমে পাঠান বাহিনীকে বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত করেন। গুণগ্রাহী সম্রাট আকবরের কর্ণে এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি রাণী ভবশঙ্করীর অপূর্ব্ব বীর্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "রায় বাঘিনী" উপাধি প্রদান করেন।

কেহ কেহ বলেন যে হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী ইতিহাসবিশ্রুত কালাপাহাড় ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজকুল সম্ভূত ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল রাজীবলোচন রায় এবং তিনি ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ রুদ্রনারায়ণের সেনাপতি ছিলেন। পাঠান নবাব সুলেমান কররানি সপ্তগ্রাম আক্রমণ করিলে মহাবীর রাজীবলোচন ওড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব ও ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ রুদ্রনারায়ণ রায়ের সেনাবাহিনী লইয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। সুলেমান সন্ধি করিতে বাধ্য হন। রাজীবলোচনের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে গৌড়ে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। সেখানেও রাজীবলোচন অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন। একদিন পশুশালার পিঞ্জর হইতে একটি ব্যাঘ্র কোনরূপে বাহির হইয়া পড়ে। রাজীবলোচন উহাকে ধরিয়া পুনরায় পিঞ্জরের মধ্যে প্রবেশ করান। তাঁহার সৌন্দর্য্য ও বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া নবাবকন্যা তাঁহার প্রেমে পড়েন। বহু ইতস্ততঃ করিয়া রাজীবলোচন অবশেষে তাঁহাকে বিবাহ করেন। হিন্দু হইয়া মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করায় রাজীবলোচন স্বসমাজ কর্ত্তৃক অপমানিত ও ধিক্কৃত হন। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং দারুণ হিন্দু বিদ্বেষী হইয়া পড়েন। সুলেমানের সেনা বাহিনী লইয়া তিনি ওড়িষ্যা জয় করেন এবং তথাকার বহু দেবমন্দির কলুষিত ও দেববিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ করেন। কথিত আছে যে তাঁহার ভয়ে পাণ্ডাগণ জগন্নাথ দেবকে লইয়া চিল্কা হ্রদের মধ্যে লুকাইয়া রাখেন। তিনি চিল্কা হইতে জগন্নাথ বিগ্রহকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ত্রিবেণীতে আনিয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করেন এবং গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেন। সেই অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড উদ্ধার করিয়া পরে জগন্নাথ দেবের নূতন বিগ্রহ নির্ম্মাণ করা হয়। কালাপাহাড় পূর্ব্ব দিকে কামরূপ কামাখ্যা পর্য্যন্ত অভিযান করিয়াছিলেন। দেশের বহু স্থানে বহু অঙ্গহীন দেববিগ্রহ কালাপাহাড়ী অত্যাচারের স্মৃতি বহন করিতেছে। কথিত আছে কেবল মাত্র তাঁহার জন্মভূমি ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য তাঁহার এই অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছিল।

গড়ভবানীপুরে একমাত্র মণিনাথ মহাদেব নামক শিবের মন্দির প্রাচীন যুগের সাক্ষ্য স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। রাজবাটীর কোনরূপ চিহ্ন এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পেঁড়ো-বসন্তপুরে এখনও একটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, উহা ভারত চন্দ্রের গড় নামে পরিচিত। কয়েক বৎসর হইল মহাকবি ভারত চন্দ্রের জন্ম স্থানে "রায় গুণাকর ভারত চন্দ্র ইনষ্টিট্যুইশন" নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমতা—হাওড়াঘাট হইতে ২৮ মাইল দূর। আমতায় একটি মুনসেফী আদালত আছে। শহরটি দামোদর নদের তীরে অবস্থিত এবং একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। দামোদরের প্লাবন হইতে শহর রক্ষা করিবার জন্য উঁচু বাঁধ দেওয়া আছে। আমতার মেলাই চণ্ডীর মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। কাহারও কাহারও মতে ইহা একটি পীঠস্থান। জনশ্রুতি যে পূর্ব্বকালে মেলাই চণ্ডী দেবী দামোদর নদের অপর পারে জয়ন্তী নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। বর্ষাকালে দামোদরের প্লাবনের জন্য লোকে দেবীর পূজা দিতে যাইতে পারিত না। অতঃপর দেবী একদিন তাঁহার সেবায়েতকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলেন যে তিনি স্থান পরিবর্ত্তন করিবেন। পুরোহিত পরদিন প্রাতঃকালে একটি বটবৃক্ষ মূলে দেবীর প্রতিমা দেখিতে পান এবং সেই দিন হইতে সেই স্থানেই তাঁহার পূজা করিতে থাকেন। জনৈক বণিকের লবণ বোঝাই কয়েক খানি নৌকা দামোদর গর্ভে ডুবিয়া যায়, বণিক মানত করেন যে যদি দেবীর বরে লবণশুদ্ধ তাঁহার নৌকাগুলির পুনরুদ্ধার হয় তবে তিনি দেবীর জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। দেবীর প্রভাবে বণিকের প্রার্থনা পূর্ণ হইলে তিনি তাঁহার জন্য একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই মন্দিরটি হাওড়া জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার গাত্রে উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে জানা যায় যে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে (১০৫৬ বঙ্গাব্দে) ইহা নিৰ্ম্মিত হয়। মেলাই চণ্ডীর বিগ্রহ প্রস্তর নির্ম্মিত। মূর্ত্তিটি ৩।০ ফুট উচ্চ। এই মন্দিরের নিকটে যে শিব মন্দিরটি আছে উহা কলিকাতা হাটখোলার অধিবাসী মদনমোহন দত্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

আমতার নিকটবর্ত্তী **নারিট** গ্রাম সুবিখ্যাত পণ্ডিত কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূত-পূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি, আই, ই, মহাশয়ের জন্মস্থান। প্রধানতঃ ইঁহারই চেষ্টায় হাওড়া-আমতা রেলপথ খোলা হয়। এখানে "ন্যায়রত্ন ইনষ্টিটিউশন" নামে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে।

বড়গাছিয়া জংশন চাঁপাডাঙ্গা শাখা লাইনে জগৎবল্লভপুর, ইছানগরী ও চাঁপাডাঙ্গা উল্লেখযোগ্য স্টেশন।

জগৎবল্লভপুর—হাওড়াঘাট হইতে ১৭ মাইল দূর। ইহা কাণা নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা একটি অতি সমৃদ্ধ স্থান ছিল। কাণানদী মজিয়া যাওয়ায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ইহা এখন ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে যাইতেছে। এখানে যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়টি আছে তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির পূর্ব্বে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এখানে তাঁতের কাপড় ও গামছা প্রস্তুত হয়।

ইছানগরী—হাওড়াঘাট হইতে ১৮ মাইল দূর। এই স্টেশনের নিকটবর্ত্তী ঝিঁকরা গ্রামে গড়চণ্ডী দেবীর একটি বৃহৎ মন্দির আছে। মন্দিরটি প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। এখানে আরও কতকগুলি প্রাচীন মন্দির ও একটি সুদৃশ্য ও বৃহৎ মস্‌জিদ আছে।

চাঁপাডাঙ্গা—হাওড়াঘাট হইতে ৩২ মাইল দূর। ইহা হুগলী জেলার একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। এই স্থান হইতে হুগলী জেলার অন্যতম প্রসিদ্ধ পল্লী **খানাকুল-কৃষ্ণনগর** ও **রাধানগর** প্রায় ১২ মাইল দূর। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে গো-যানে যাওয়া যায়। বাংলা-নাগপুর রেলপথের কোলাঘাট স্‌টেশন হইতে স্‌টীমারযোগে রাণীচক্‌ হইয়া তথা হইতে নৌকা ও মোটরবাসযোগেও কৃষ্ণনগর ও রাধানগর যাওয়া যায়। খানাকুল-কৃষ্ণনগরে বহু শিক্ষিত ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির বাস। এই গ্রামের সর্ব্বাধিকারী বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও তদীয় কৃতী পুত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌ চ্যান্সেলর পরলোকগত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও খ্যাতনামা অস্ত্র চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কৃষ্ণনগর গ্রামে গোপীনাথদেবের একটি প্রকাণ্ড মন্দির ও তাহার চতুর্দ্দিকে আরও অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দির আছে। কৃষ্ণনগর গ্রামের সংলগ্ন রাধানগর গ্রাম ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ও ভারতের বর্ত্তমান যুগের জাতীয়তার প্রধান হোতা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান। ভারতের ভাবধারা ও সংস্কৃতিতে রাজা রামমোহন রায়ের দান অসামান্য। সাহিত্য, ধর্ম্ম, রাজনীতি ও সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহাকে নবভাবের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে রাধানগর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। এই বংশের কৌলিক উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। অতি অল্প বয়সে গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া রামমোহন পাটনায় গিয়া আরবী ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর কাশীতে গিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। দেশে ফিরিয়া রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয়গণের

সহিত মনোমালিন্য হওয়ার ফলে তিনি সেই সুকুমার বয়সেই গৃহত্যাগ করেন ও নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া তিব্বতে গিয়া উপস্থিত হন। তিব্বতী বৌদ্ধগণের কার্য্যকলাপ তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় তিনি পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। অর্থোপার্জ্জনের জন্য রামমোহন রংপুরের কলেক্টরি অফিসে একটি সামান্য কার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু নিজের প্রতিভাবলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হন। রংপুরে থাকিতেই তিনি ইংরেজী শিক্ষা করেন এবং গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, হিব্রু ও উর্দ্দূ প্রভৃতি ভাষাও শিক্ষা করেন। তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার মৃত্যুতে তিনি সমগ্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন এবং চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন ও তথায় কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহায়তায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। এই সময়ে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। রামমোহনই প্রথম মার্জ্জিত বাংলা গদ্য লেখক। দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ নিজের বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য রামমোহনকে বিলাতে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে "রাজা" খেতাব দেন। বাঙালীদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম বিলাত যাত্রী। বিলাতে অবস্থানকালে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর ব্রিষ্টল নগরে তিনি পরলোক গমন করেন। ব্রিষ্টলে তাঁহার সমাধির উপর এক স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। লর্ড বেন্টিঙ্কের সহায়তায় সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ সাধন রামমোহনের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি।

হাওড়া-শিয়াখালা রেলপথে বলুহাটী, চণ্ডীতলা জংশন, মশাট ও শিয়াখালা উল্লেখযোগ্য স্টেশন।

বলুহাটী—হাওড়াঘাট হইতে ৮ মাইল দূর। এই স্থান হইতে দুই মাইল দক্ষিণে গয়েশপুর গ্রামে পীর গয়েস্-উদ্-দীনের আস্তানা ও মস্জিদ আছে। এখানে পৌষ সংক্রান্তিতে বৃহৎ মেলা বসে। পীর গয়েস্-উদ-দীনের গড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। গয়েশপুরের নিকটবর্ত্তী নার্ণা গ্রামে এক বিখ্যাত পঞ্চানন ঠাকুর ও কালীর মন্দির আছে। লোকের বিশ্বাস যে নার্ণার পঞ্চানন ঠাকুরের মাটী মাখিলে বাতরোগ আশ্চর্য্যরূপে ভাল হয়। চৈত্র সাক্রান্তিতে এখানে বৃহৎ মেলা হয়।

চণ্ডীতলা জংশন—হাওড়াঘাট হইতে ১১ মাইল দূর। এই স্থান সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানেও এক প্রসিদ্ধ চণ্ডীর দেউল আছে। চণ্ডীতলা হইতে একটি শাখা লাইন তিন মাইল দূরবর্ত্তী **জনাই** পর্য্যন্ত গিয়াছে। জনাই হুগলী জেলার একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে মুখোপাধ্যায় উপাধিধারী জমিদারগণের বাস। জনাইএর

"মনোহরা" নামক মিষ্টান্ন বিশেষ প্রসিদ্ধ। জনাই হইতে প্রায় এক মাইল দূরে সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত বাক্‌সা গ্রামে একটি বিখ্যাত নবরত্ন মন্দির আছে। এই মন্দির মধ্যে রঘুনাথজীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরটি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। বাক্‌সায় ঈশানেশ্বর নামে এক বৃহৎ শিবমন্দির ও আরও দ্বাদশটি মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। বাক্‌সার মিত্র বংশীয় ভবানীচরণ মিত্র এই সকল মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরের নিকটে একটি সুন্দর পুষ্করিণী ও প্রশস্ত বাঁধা ঘাট আছে। চৈত্র সংক্রান্তির সময় এখানে মেলা হয়।

মশাট হাওড়া ঘাট হইতে ১৭ মাইল দূর। ইহাও একটি প্রাচীন স্থান। এখানে একটি অতি প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে এই শিব স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। এখানে শিবরাত্রি ও চড়কের সময় উৎসব হয়।

শিয়াখালা হাওড়া ঘাট হইতে ২০ মাইল দূর। ইহার প্রাচীন নাম শিবাক্ষেত্র। পূর্ব্বকালে এই স্থানের পার্শ্ব দিয়া কৌষিকী বা কাণা নদী প্রবাহিত ছিল। শিয়াখালার উত্তরবাহিনী দেবীর মাহাত্ম্য এতদঞ্চলে সুপরিজ্ঞাত। জনশ্রুতি যে প্রায় চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে জনৈক ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া এই স্থানে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে আসেন। দৈববাণীর নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি প্রাণ বিসর্জ্জন না দিয়া এই স্থানের নদী-গর্ভ হইতে এক পাষাণ প্রতিমার উদ্ধার সাধন করিয়া নদীতীরে এক পর্ণ কুটীরে তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবী প্রতিমার নাম উত্তরবাহিনী। দেবী উত্তরাস্যা বলিয়াই উত্তরবাহিনী নাম। প্রবাদ জনৈক ধনী ব্যক্তি বজ্‌রায় করিয়া কাণা নদী দিয়া নৃত্যগীত উপভোগ করিতে করিতে যাইতেছিলেন। গীতবাদ্যাদি শ্রবণে ইচ্ছুক হইয়া দেবী মানবীর রূপ ধরিয়া তাঁহাকে নৌকা থামাইতে বলেন। ধনী তাঁহার কথা অবজ্ঞা করায় দেবী প্রতিমা কোপভরে দক্ষিণদিক হইতে উত্তরদিকে মুখ ফিরান, সঙ্গে সঙ্গে ধনীর নৌকা নিমজ্জিত হয়। দেবী উত্তরাভিমুখী হইয়া সেই ভাবেই অবস্থান করিতে থাকেন বলিয়া তাঁহার উত্তরবাহিনী আখ্যা হয়। বঙ্গেশ্বর হোসেন শাহের প্রধান অমাত্য বা উজীর শিয়াখালা নিবাসী গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁ দেবীর একজন বিশেষ ভক্ত ছিলেন। দেবীর মন্দিরাদি তাঁহারই নিৰ্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কথিত আছে, একবার বর্দ্ধমানাধিপতি রাজরোষে পড়িয়া এই দেবীর কৃপায় সঙ্কট মুক্ত হন এবং দেবীর সেবার জন্য বহু অর্থ দান করেন। উত্তরবাহিনীর বর্ত্তমান বিগ্রহ পাষাণ নির্ম্মিত। দেবী শিবের বুকে দণ্ডায়মানা, ত্রিনেত্রা, রক্তবর্ণা ও দ্বিভুজা। এক হস্তে খড়্গ ও অপর হস্তে খর্পর; দেবীর পরিধানে বিচিত্র বসন ও ভূষণ এবং গলে মুণ্ডমালা। মন্দিরের সম্মুখে একটি

খাতের চিহ্ন আছে, উহা "ডিঙি ডোবার খাত" নামে প্রসিদ্ধ। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস যে এই স্থানেই পূর্ব্বোক্ত ধনীর নৌকা ডুবিয়াছিল।

শারদীয়া শুক্ল একাদশী তিথিতে উত্তরবাহিনীর নবঘট পূজা উপলক্ষে শিয়াখালায় একটি মেলা হয়।

পূর্ব্বে শিয়াখালায় পুরন্দর গড় নামে একটি গড়ের চিহ্ন দেখা যাইত। বর্ত্তমানে উহা কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানে গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁর বাটী ছিল। পুরন্দর খাঁ ষোড়শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি যুদ্ধ বিদ্যায়ও বিশেষ নিপুণ ছিলেন। কথিত আছে যে তৎকালীন শিয়াখালার অরণ্যনিবাসী জনৈক অর্দ্ধ স্বাধীন নৃপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তিনি শিয়াখালা অধিকার করেন এবং স্বনামে পুরন্দরপুর বা পুরন্দর গড়ের প্রতিষ্ঠা করেন। পুরন্দর খাঁ একজন বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত কতকগুলি কুলবিধি এখনও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে প্রচলিত আছে।

শিয়াখালার নিকটবর্ত্তী **ফুর্‌ফুরা** মুসলমানগণের একটি বিখ্যাত পীরস্থান।

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে বাংলা দেশ

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ খুলিবার পূর্ব্বে বাংলা দেশে একমাত্র নদী পথেই দূরস্থ স্থানে যাইতে হইত। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কলিকাতা ও গৌহাটির মধ্যে বড় বড় নৌকাতেই যাতায়াত করিতে হইত, ইহাতে ৬।৭ সপ্তাহ লাগিত। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলিকাতা ও গৌহাটির মধ্যে স্টীমার চালাইবার ব্যবস্থা করেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া ইণ্ডিয়া জেনারল্ ন্যাভিগেশন কোম্পানি কলিকাতা এবং আসাম উপত্যকার মধ্যে দুইখানি স্টীমার চালাইতে থাকেন; ছয় সপ্তাহ অন্তর স্টীমার ছাড়িত। তখন হইতে সরকারী স্টীমার উঠাইয়া লওয়া হয়। ইহাই পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের স্টীমার পথগুলির সূত্রপাত।

বেশী দিন নয়, একশত বৎসর পূর্ব্বেও এ দেশে রেলের কথা কেহ শুনে নাই। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম রেল চলিয়াছিল। ভারতবর্ষে প্রথম রেল খোলা হয় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৬ই এপ্রিল অর্থাৎ এখন হইতে ৮৬ বৎসর পূর্ব্বে। বোম্বাই হইতে মাত্র ২৪ মাইল দূর "থানা" স্টেশনে গিয়া এই লাইন শেষ হয়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে প্রায় ৫৮ হাজার মাইল পথ রেলে বাঁধা পড়িয়াছে। প্রতি বৎসর প্রায় ৫৮ কোটি যাত্রী ও ২ হাজার কোটি টন (১ টন—২৭৷৷০ মণ) মাল রেলে যাতায়াত করে।

বোম্বাই-থানা লাইন খোলার চার বৎসর পরে (১৮৫৭) "ঈস্টর্ণ্ বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি" কলিকাতা হইতে কুষ্টিয়া পর্য্যন্ত ১১১ মাইল রেল পথ খুলিবেন স্থির করেন। এই কোম্পানির সহিত সরকারের চুক্তি হয় যে তাঁহারা কুষ্টিয়াতে পুল বাঁধিয়া ঢাকা পর্য্যন্ত লাইন লইয়া যাইবেন। তখন পদ্মা কুষ্টিয়ার ধার দিয়া প্রবাহিত ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই লাইনে প্রথম গাড়ী চলে। তখন কুষ্টিয়াই পূর্ব্ববঙ্গ রেলের শেষ সীমা ছিল। ইতিমধ্যে পদ্মা দূরে সরিয়া যায় এবং পুল বাঁধা অসম্ভব হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রেল গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ও সেখান হইতে স্টীমারে করিয়া ঢাকা এবং পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য স্থানে যাইবার ব্যবস্থা হয়।

য়া লাইনের পরেই কলিকাতা-ক্যানিং লাইন খোলা হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আশঙ্কা হইতেছিল যে ভাগীরথীতে পলি পড়ায় কলিকাতার বন্দর বেশীদিন চলিবে না, সেই জন্য কলিকাতা হইতে বন্দর সরাইয়া ক্যানিং শহরে লইয়া যাওয়া স্থিরীকৃত হয়। ফলে "কলিকাতা ও সাউথ্ ঈস্টর্ণ্ রেলওয়ে কোম্পানি" নামে একটি ব্যবসায়ীসঙ্ঘ

কলিকাতা হইতে ক্যানিং পর্য্যন্ত লাইন নির্ম্মাণ করেন। ১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে এই লাইনের কার্য্য শেষ হয়। কিন্তু কার্য্যকালে লাইনের আয় এত অল্প হয় যে শেষে ঐ কোম্পানি চুক্তিমত গভর্ণ্মেণ্ট্‌কে লাইন বিক্রয় করিয়া দেন। পরে অবশ্য কলিকাতা বন্দর পরিবর্ত্তনের সঙ্কল্প বদ্‌লাইয়া যায়। একদিক দিয়া এই লাইনের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে ক্যানিং লাইনই প্রথম সরকারী তত্ত্বাবধানে আসে। এখন সেই জায়গায় চারটি বড় বড় লাইন সরকারের (State) তত্ত্বাবধানে চলিতেছে; যথা—ঈ আই, জি আই পি, এন্ ডব্লিউ এবং ঈ বি রেলওয়ে।

ডায়মণ্ডহারবার লাইন ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে খোলা হয়। ইহারও মূলে সেই বন্দর স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছা ছিল। সরকার মনে করিয়াছিলেন সমুদ্রের কাছে কোনও শহরে বন্দর স্থাপিত হইলে সকলদিকে সুবিধা হইবে। কিন্তু যে সময়ে এই লাইনে গাড়ী চলিল তখন মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এই লাইনটি যে অঞ্চল দিয়া গিয়াছে তাহার চারিদিকে প্রচুর ধান জন্মায়। ধান-চালানীর কাজে এই লাইন যথেষ্ট উপকারে আসিতেছে।

কুষ্টিয়া, ক্যানিং ও ডায়মণ্ডহারবার লাইন ছাড়া সরকারী প্রচেষ্টায় নর্দার্ণ্ বেঙ্গল রেলওয়ে খোলা হয়। ১৮৭৫-৭৭ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে উত্তরবঙ্গে এই লাইনের সৃষ্টি। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে লাইন পাতা শেষ হয় ও গাড়ী চলিতে সুরু করে। নর্দার্ণ্ বেঙ্গল রেলে সাঁড়া হইতে শিলিগুড়ি এবং পার্ব্বতীপুর হইতে একদিকে দিনাজপুর ও অপরদিকে কাউনিয়া পর্য্যন্ত প্রথম গাড়ী চলিয়াছিল। এই রেল মাঝারি মাপে (Metre Gauge) পাতা হয়। অনেকে জানেন না যে চট্টগ্রাম হইতে সুদূর আমেদাবাদ পর্য্যন্ত ১৭৬১ মাইল পথ এই মাপের (Metre Gauge) লাইন ধরিয়া যাওয়া যায়। আজকাল দুইখানি ট্রেন নিয়মিতভাবে এই লাইন দিয়া আমিনগাঁ হইতে লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেছে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঈস্টর্ণ্ বেঙ্গল রেলওয়ে সরকারের হাতে আসে এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সরকার নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা হইয়া ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত একটি মাঝারি মাপের লাইন খুলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখে এই লাইনটি, নর্দার্ণ্ বেঙ্গল রেলওয়ে ও অন্য কয়টি লাইন ঈস্টর্ণ্ বেঙ্গল রেলওয়ের সহিত একত্র হইয়া "ঈস্টর্ণ্ বেঙ্গল স্টেট্ রেলওয়ে" নামে অভিহিত হয়। এন্ ডব্লিউ রেলওয়ে প্রমুখ সরকারী

তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অন্যান্য রেলওয়ে সমূহের নামকরণের সহিত সামঞ্জস্য বিধানকল্পে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে "স্টেট্" কথাটি উঠাইয়া দেওয়া হয়।

তারপর বছরের পর বছর কাটিয়াছে, কুচবিহার, ধুব্ড়ী, আমিনগাঁ, সিরাজগঞ্জ, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি বহুদূর ও বহুদিক বিস্তৃত জেলা ও পরগণাগুলি একই লৌহবর্ম্মে বাঁধা পড়িয়া পরস্পরের নিকটতর হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে সম্ভব সেইখানে নদ-নদীর পুল বাঁধা হইয়াছে অথবা রেলেরই খেয়া-জাহাজের ব্যবস্থা হইয়াছে।

যে পদ্মার ভাঙ্গার খেলায় সকলেই সদা সন্ত্রস্ত থাকে, আজ সেই দুরন্ত পদ্মার বুকেও লৌহের বন্ধনী পড়িয়াছে। সাঁড়ার হার্ডিং পুল (১৯১৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত) জগতে স্থপতি বিদ্যার এক অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে দাঁড়াইয়া আছে।

আজ শিয়ালদহ হইতে গাড়ীতে চড়িয়া লোকে সুদূর দার্জ্জিলিং, পূর্ণিয়া (বিহার), কামরূপ (আসাম) চলিয়া যাইতেছে। ২৪ পরগণা, খুলনা, ফরিদপুর যশোহর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি দার্জ্জিলিং, মালদহ, পূর্ণিয়া (বিহার) কুচবিহার, ময়মনসিংহ, ঢাকা, গোয়ালপাড়া, (আসাম) ও দরং (আসাম) এই একুশটি বিভিন্ন জেলার ভিতর দিয়া ঈ, বি, রেলওয়ে চলিতেছে। কলিকাতা অঞ্চল হইতে বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা এবং আসামের শ্রীহট্ট ও গারো পাহাড় যাইতেও ঈ বি রেল পথ ব্যবহার করিতে হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বেও কলিকাতা হইতে মাত্র সান্তাহার পর্য্যন্ত বড় লাইন (Broad Gauge) ছিল। দার্জ্জিলিং, আমিনগাঁ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে যাইতে এখান হইতে মাঝারি লাইনের (Metre Gauge) গাড়ীতে বদল করিতে হইত। এখন শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত বড় লাইন গিয়াছে। দার্জ্জিলিং যাইতে এখান হইতে পাহাড়ে চড়িবার জন্য দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ছোট গাড়ীতে চড়িতে হয়। দিনাজপুর এবং রংপুর যাইতেও পার্ব্বতীপুরে গাড়ী বদল করিতে হয়।

বর্ত্তমানেও ঈ বি রেলের প্রসার কার্য্যের বিরাম নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে দিনাজপুর হইতে রুহিয়া পর্য্যন্ত একটি লাইন খোলা হইয়াছে। সম্প্রতি বারুইপুর-লক্ষ্মীকান্তপুর শাখা লাইন, পূর্ণিয়া মুরলীগঞ্জ লাইন, আবদুলপুর-নবাবগঞ্জ, কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া ও টাঙ্গলা-রঙ্গপাড়া শাখা লাইন খোলা হইয়াছে।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ঈ বি রেলওয়ে যখন মাত্র ১১১ মাইল পথ খুলিয়াছিলেন তখন কে জানিত ৭৫ বছরের মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠানটি এত দ্রুত বিস্তারলাভ করিবে? আজ ঈ বি রেলওয়ে বাংলা, আসাম ও বিহার প্রদেশে কিঞ্চিদধিক ৩,০৭৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে। ইহার মধ্যে বড় লাইন (Broad Gauge) ১,৭১৭ মাইল, মাঝারি লাইন (Metre Gauge) ১,৩৪৩ মাইল, আর ছোট লাইন (Narrow Gauge) ৪০ মাইল। সর্ব্বসমেত ৪৬১টি স্টেশনের মধ্য দিয়া এই লৌহবর্ত্ম প্রসারিত। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে এই লাইনে **চার কোটীর অধিক আরোহী যাতায়াত করিয়াছে।**

এই লাইনে সাধারণতঃ কৃষিজাত জিনিষই চালান গিয়া থাকে যথা:—পাট, ধান, চাউল, দাল, সরিষা চা, তামাক, ফল, সব্জী ও তরিতরকারী। রেল-কর্ত্তৃপক্ষ অনেক স্থলে এই সব জিনিষ চালানের জন্য অল্পহারে মাশুল ধার্য্য ও অন্যান্য সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। গুড়, রেশম, গুটিপোকা, মাছ, ডিম, শালকাঠ, জ্বালানী-কাঠ, দুধ, দধি ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে এই রেলে চালান গিয়া থাকে।
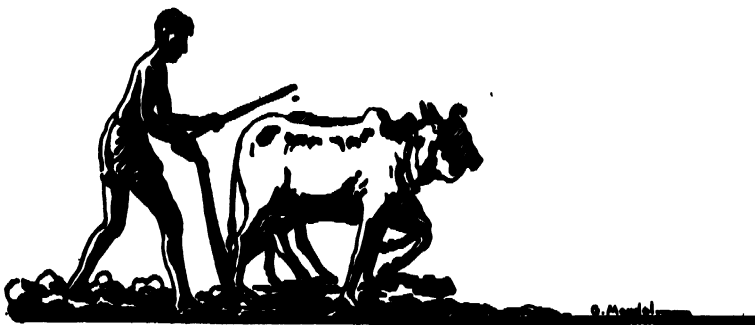
পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে বাংলা দেশ

(ক) কলিকাতা—শিলিগুড়ি।

রাণাঘাট-বনগ্রাম ও রাণাঘাট শান্তিপুর, পোড়াদহ-গোয়ালন্দ-ফরিদপুর -ভাটিয়াপাড়া ঘাট, ঈশ্বরদি-সিরাজগঞ্জঘাট ও আবদুলপুর -চাপাই-নবাবগঞ্জ শাখা

দমদম জংশন—কলিকাতা হইতে ৪ মাইল দূর। এই স্থানের চলিত নাম ঘুঘুডাঙ্গা। এখানে কলিকাতাবাসী বহু ধনী ব্যক্তির উদ্যান বাটিকা আছে। স্টেশন হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে বাগজলা নামক স্থানে একজন পীরের সমাধি আছে। তথায় প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে।

দমদম জংশন হইতে খুলনা শাখা লাইন বাহির হইয়াছে। কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত সরাসরি গাড়ী যাতায়াত করে।

বেলঘরিয়া—কলিকাতা হইতে ৭ মাইল দূর। স্টেশনের এক মাইল পূর্ব্বদিকে **নিমতা** গ্রাম কবি কৃষ্ণরামের জন্ম স্থান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কৃষ্ণরাম দাসের জন্ম হয়। তিনি ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য সূচক "রায় মঙ্গল" কাব্য লিখিয়া যশস্বী হন। "রায় মঙ্গল" ছাড়া কবি কৃষ্ণরাম "ষষ্ঠী মঙ্গল", "অশ্বমেধ পর্ব্ব" ও "কালিকা মঙ্গল" (বিদ্যাসুন্দর) কাব্য প্রণয়ন করেন। বাঙালী কবিগণের মধ্যে কবি কৃষ্ণরামই বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানের আদি কবি। কৃষ্ণরামের পর বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীত রচয়িতা রামপ্রসাদ সেন, মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক কবি "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করেন। কবি কৃষ্ণরামের জন্মভিটা আজিও নিমতা গ্রামে বর্ত্তমান আছে।

আগড়পাড়া—কলিকাতা হইতে ৮½ মাইল দূর। স্টেশনের অতি নিকটে ডাউন প্লাটফরমের পার্শ্বে সুপ্রসিদ্ধ তারাপুকুরের পীরের আস্তানা অবস্থিত। এই আস্তানাটি বহু প্রাচীন। আনুমানিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আজমীর হইতে একজন পীর আসিয়া এই স্থানে বটবৃক্ষমূলে বসিয়া তপস্যা করেন। তাঁহার অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়া স্থানীয় অধিবাসিগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। কথিত আছে, একবার তিনি জনৈক ধনী শিষ্যের বন্ধুবর্গের ব্যবহারের জন্য ইচ্ছামাত্র বহু রৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসপত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পীরের সমাধির উপর একটি একগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। যে বটবৃক্ষতলে পীরের আসন ছিল, উহা শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক একটি ছায়াশীতল কুঞ্জ রচনা করিয়া আজিও দণ্ডায়মান আছে। পীর সাহেবের মৃত্যু তিথি ১লা মাঘ তারিখ হইতে এখানে

সপ্তাহব্যাপী একটি বৃহৎ মেলা হয়। এই মেলায় প্রচুর পরিমাণে চাউল বিক্রয় হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক এই পীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

আগড়পাড়ার নিকটবর্ত্তী কামারহাটি একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এই গ্রামে কলিকাতা বহুবাজারনিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী ৺সাগর দত্ত মহাশয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সুন্দর উদ্যান মধ্যে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড হাসপাতাল ও একটি অবৈতনিক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় আছে।

তারাপুকুরের দরগাহ্

সোদপুর—কলিকাতা হইতে ১০ মাইল দূর। স্টেশনের নিকটেই রুগ্ন ও বৃদ্ধ গবাদি পশুর চিকিৎসা ও পালনের জন্য "পিঁজরাপোল" অবস্থিত। এই প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতা পিঁজরাপোল সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। প্রতিবৎসর গোপাষ্টমী তিথিতে এখানে একটি বিরাট মেলা হয়। সোদপুরে একটি কাপড়ের কল আছে। খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র এখানে অবস্থিত।

সোদপুর স্টেশন হইতে এক মাইল পশ্চিমে গঙ্গাতীরে **পানিহাটি** গ্রাম। প্রায় চার শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত জয়ানন্দের "চৈতন্য মঙ্গল" গ্রন্থে আছে,

"পানিহাটি সম গ্রাম নাহি গঙ্গাতীরে।
বড় বড় সমাজ সব পতাকা মন্দিরে॥"

পানিহাটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিকট একটি পবিত্র স্থান। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট এই গ্রামে অবস্থিত। এই শ্রীপাটে অতি প্রাচীন মাধবী লতাকুঞ্জের মধ্যে রাঘব পণ্ডিতের সমাধি আছে। রাঘব পণ্ডিতের সেবিত মদন-মোহন বিগ্রহ এখানে নিত্য পূজিত হন। রাঘব মন্দিরে শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য আবির্ভাব হয় বলিয়া চৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

রাঘব পণ্ডিতের সমাধি, পানিহাটি

পানিহাটিতে গঙ্গাতীরে প্রায় সাত শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া কথিত একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ আছে। শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ পানিহাটিতে আসিয়া এই বটবৃক্ষ মূলে উপবেশন করিয়াছিলেন। বটবৃক্ষতলস্থ বেদীর একটি প্রস্তরফলকে এই কথা লিখিত আছে। বটবৃক্ষের পার্শ্বে একটি অতি প্রাচীন ঘাটের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই ঘাটে একটি প্রস্তরফলকে লিখিত আছে যে ইহা হিন্দু আমলে নির্ম্মিত এবং ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে পুরী হইতে প্রত্যাগমন কালে শ্রীচৈতন্যদেব এই ঘাটে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া-ছিলেন। এখনও প্রতি বৎসর চৈতন্যদেবের আগমন স্মরণ উপলক্ষে কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথির পরবর্ত্তী রবিবারে এখানে মহোৎসব ও মেলা হয়। সপ্তগ্রামের রাজপুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী পানিহাটির বটবৃক্ষমূলে নিত্যানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং এই স্থানেই তিনি গণসহ নিত্যানন্দকে চিঁড়া-দধি ভোজন করাইয়াছিলেন। এই

ভোজনোৎসব "দণ্ড মহোৎসব" নামে পরিচিত। আজিও জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে দেশ বিদেশ হইতে বৈষ্ণবগণ এই বটবৃক্ষমূলে সম্মিলিত হইয়া এই মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। বটবৃক্ষের নিকটে একটি ক্ষুদ্র গৃহে শ্রীচৈতন্যদেবের চরণচিহ্ন রক্ষিত আছে।

পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে বহুদিন অবস্থান করিয়া নিত্যানন্দ গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রাম সমূহে প্রেম ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

প্রাচীন বটবৃক্ষ, পানিহাটি

পানিহাটি গ্রামের মধ্যে একটি ছায়া শীতল বট বৃক্ষের মূলে বৃন্দাবনের চৌষট্টি মহান্তের সমাজের অনুকরণে নির্ম্মিত একটি স্মৃতি সমাধি মন্দির আছে। উহাতে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রভৃতি মহাপুরুষ ও ভক্তগণের স্মৃতিমঞ্চ ও প্রস্তর ফলক আছে।

পানিহাটির শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরে বহু বৈষ্ণব ভক্তের স্মৃতিচিহ্ন সযত্নে রক্ষিত আছে।

কলিকাতার মহানির্ব্বাণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ অবধূত জ্ঞানানন্দ স্বামী পানিহাটিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মভিটার উপর নির্ম্মিত "কৈবল্য মঠ" পানিহাটির অন্যতম দ্রষ্টব্য।

পানিহাটির প্রাচীন ঘাটের ও রাঘব ভবনের দুইখানি ইষ্টক আমেরিকার ফ্লোরিডা শহরে উইন্টার পার্কে "Walk of Fame" নামক প্রতিষ্ঠানে আমেরিকাবাসিগণ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

খড়দহ—কলিকাতা হইতে ১২ মাইল দূর। ইহাও বৈষ্ণবদিগের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশে নিত্যানন্দ সন্ন্যাস আশ্রম ছাড়িয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং নবদ্বীপের নিকটস্থ শালিগ্রামের পণ্ডিত সূর্য্যদাস সরখেলের বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। কথিত আছে সস্ত্রীক নিত্যানন্দ খড়দহে আসিয়া তত্রত্য ভূস্বামীর নিকট বাসস্থানের জন্য একখণ্ড ভূমি প্রার্থনা করায় তিনি বিদ্রূপচ্ছলে গঙ্গায় একটি খড় ফেলিয়া বলিলেন যে উহাই তাঁহার বাসস্থান। নিত্যানন্দের প্রভাবে
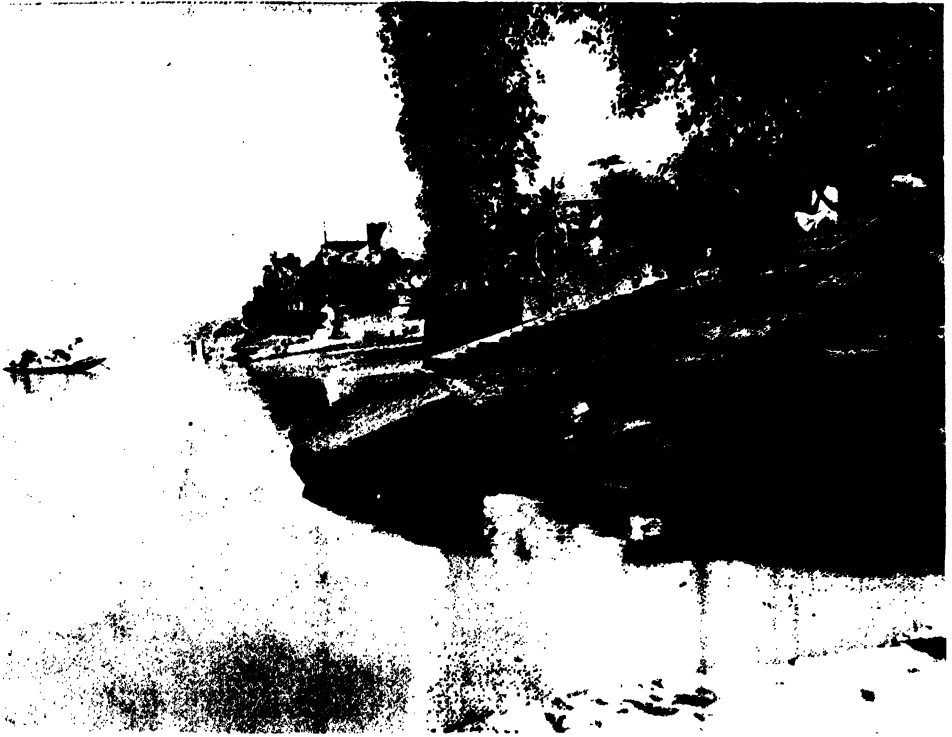
প্রাচীন ঘাট, পানিহাটি

সেই প্রবল দহের মধ্যে একটি চর উত্থিত হইল এবং তিনি সেই স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই জন্য স্থানের নাম হইল খড়দহ। নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী খড়দহে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহ সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবাদ আছে। গঙ্গার পশ্চিমতীরবর্ত্তী বল্লভপুর গ্রামে রুদ্র ব্রহ্মচারী নামক একজন ভক্ত বাস করিতেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহাকে গৌড়ের বাদশাহের প্রাসাদ হইতে একখানি প্রস্তর আনিয়া উহা হইতে বিগ্রহ নির্ম্মাণের আদেশ

দিতেছেন। রুদ্র গৌড়ে উপস্থিত হইয়া স্বপ্ন নির্দ্দিষ্ট পাথর খানি বাদশাহের নিকট প্রার্থনা করেন। বাদশাহ প্রথমে উহা দিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু হঠাৎ পাথর খানি হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে। বাদশাহের জনৈক হিন্দু মন্ত্রী বাদশাহকে বুঝাইয়া দেন যে ইহা বিশেষ অশুভ লক্ষণ। সুতরাং অবশেষে পাথরখানি রুদ্রকে দান করা হয়। পাথরখানি এত ভারী যে নৌকায় তুলিবার সময় উহা জলে পড়িয়া যায়, কিন্তু দৈব প্রভাবে উহা গঙ্গার স্রোতে আনীত হইয়া বল্লভপুরের ঘাটে লাগে। এই পাথর খানি হইতে রুদ্র শ্যামসুন্দর,

শ্যামসুন্দরের রাসমঞ্চ, খড়দহ

রাধাবল্লভ ও নন্দদুলাল নামক তিনটি সুন্দর বিগ্রহ তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। এই বিগ্রহ তিনটির মধ্যে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের উপর বীরভদ্র গোস্বামীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। প্রথমে রুদ্র তাঁহাকে এই বিগ্রহটি দান করিতে সম্মত হন নাই। অতঃপর একদিন রুদ্র স্বীয় ভবনে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতেছিলেন এমন সময়ে ভীষণ মেঘ হইয়া শ্রাদ্ধ পণ্ড করিবার উপক্রম হইল। নিমন্ত্রিত হইয়া বীরভদ্রও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রুদ্রের বিপদ দেখিয়া তিনি স্বীয় অলৌকিক শক্তি প্রভাবে প্রবল বারি বর্ষণ হইতে শ্রাদ্ধমণ্ডপ রক্ষা

করিলেন। ইহাতে প্রীত হইয়া রুদ্র বীরভদ্রকে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ দান করিলেন। খড়দহের শ্যামসুন্দর মন্দির ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাসমঞ্চ এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। রাসযাত্রা, দোল পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে খড়দহে বিশেষ সমারোহ ও মেলা হয়।

খড়দহের গঙ্গাতীরে পুরাতন বাংলা রীতিতে নির্ম্মিত চব্বিশটি শিবমন্দির আছে। খড়দহ নিবাসী ধর্ম্মপ্রাণ জমিদার ৺প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, বহু অর্থ ব্যয়ে বিশ্বাস মহাশয় স্বীয় ভবনে লক্ষ শালগ্রাম শিলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। রামতোষণ বিদ্যারত্ন নামক জনৈক পণ্ডিতের সহায়তায় বিশ্বাস মহাশয় "প্রাণতোষিণী মহাতন্ত্র" নামে একখানি তন্ত্র-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

রুদ্রব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নন্দদুলাল বিগ্রহ খড়দহ হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত **সাঁইবনা** নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মাঘী পূর্ণিমার সময় সাঁইবনায় একটি বৃহৎ মেলা হয় ও সেই সময় খড়দহ হইতে এই স্থান পর্য্যন্ত মোটরবাস যাতায়াত করে। মাঘী পূর্ণিমার দিন গঙ্গার পশ্চিম পারস্থ বল্লভপুরের রাধাবল্লভ, খড়দহের শ্যামসুন্দর ও সাঁইবনার নন্দদুলাল এই তিন বিগ্রহ দর্শন করা মহিলাগণের নিকট বিশেষ পুণ্যের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

টিটাগড় কলিকাতা হইতে ১১ মাইল দূর। বহু পাটকল ও কাগজের কলের জন্য এই স্থান বিখ্যাত।

স্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে গঙ্গাতীরে বিশালাক্ষীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি আধুনিক হইলেও এই দেবী অতি পুরাতন। দেবী ত্রিনেত্রা, পীতবর্ণা ও চতুর্ভুজা। মন্দিরের নিকটেই গঙ্গাগর্ভে "বিশালক্ষীর দহ" নামে একটি অতি গভীর দহ আছে। স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস দেবীর পূজা না দিয়া নৌকা ছাড়িলে দেবী এই দহ মধ্যে নৌকা ডুবাইয়া দেন। বৈশাখমাসে দেবীকে গঙ্গাজলে স্নান করাইবার জন্য এখানে বহু নরনারীর সমাগম হয়।

টিটাগড়ে রাণী রাসমণির কন্যা তারা ঠাকুরাণী কত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঘাট, চাঁদনী, দ্বাদশ শিবমন্দির ও অন্নপূর্ণার মন্দির আছে। এখানে মহাষ্টমী ও অন্নপূর্ণা পূজার সময় বিশেষ সমারোহ হয়।

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে টিটাগড়ে একটি ডক্ এবং প্রায় তিন শত বিঘা জমি লইয়া একটি উদ্যান ছিল। বর্ত্তমানে উহাদের কোন চিহ্ন নাই।

বারাকপুর—কলিকাতা হইতে ১৪ মাইল দূর। ইহা ২৪ পরগণা জেলার একটি মহকুমা। দমদমের সেনা নিবাস উঠিয়া যাওয়ায় ইহা এখন কলিকাতার নিকটবর্ত্তী একমাত্র সেনা নিবাস। এই সেনা নিবাস ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮২৪ ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধের সময় একদল ভারতীয় সিপাহীকে স্থলপথে চট্টগ্রাম ও আরাকানের দিকে

প্রেরণ করা হয়। এই সময়ে গুজব রটে যে ব্রহ্মযুদ্ধে যোগদানের জন্য সিপাহীগণকে জাহাজে করিয়া কালাপানি (বঙ্গোপসাগর) পার করা হইবে। সিপাহীগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের বহু হিন্দু ছিল। এই সংবাদ বারাকপুরে রাষ্ট্র হইবামাত্র তথাকার সিপাহীরা সমুদ্র পার হইলে জাতি যাইবে, এই আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠে এবং ৩০এ অক্টোবর রাত্রে প্রকাশ্য ভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বন্দুক ও কামানের গুলিতে ইহাদের মধ্যে অনেকে প্রাণত্যাগ করে এবং বিদ্রোহের নায়কগণকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এই বিদ্রোহ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ন্যায় ভারতব্যাপী অশান্তির সৃষ্টি করে নাই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহও সর্ব্ব প্রথম বারাকপুরে আত্মপ্রকাশ করে। সেই সময়ে এখানে চারিটি ভারতীয় রেজিমেণ্ট বা সেনাবাহিনী ছিল। একদিন বারুদখানার একজন নিম্ন জাতীয় খালাসী জনৈক উচ্চবর্ণের সিপাহীর লোটা হইতে জল পান করিতে চাহিলে সে আপত্তি করিয়া বলে যে, নীচ জাতির সংস্পর্শে তাহার লোটা অপবিত্র হইয়া যাইবে। ইহাতে খালাসীটি তাহাকে বলে যে কলিকাতার কেল্লায় যে নূতন রকমের টোটা প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে গরু ও শূকরের চর্ব্বি মিশ্রিত আছে। উহা প্রত্যেক সিপাহীকে দাঁত দিয়া কাটিয়া বন্দুকে পুরিতে হইবে, সুতরাং সিপাহীদের জাতির গুমোর আর বেশীদিন থাকিবে না। এই সংবাদ সিপাহী মহলে প্রকাশ পাইলে তাহাদের মধ্যে দারুণ অসন্তোষ ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ইংরেজ সেনাপতি বহু যুক্তি তর্কের দ্বারাও তাহাদের বিশ্বাস টলাইতে পারেন নাই। মঙ্গল পাণ্ডে নামক একজন সিপাহী অন্যান্য সিপাহীগণকে জীবনপণ করিয়া জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য উত্তেজিত করিতে থাকে। সশস্ত্র মঙ্গল পাণ্ডেকে দমন করিতে গিয়া জনৈক সেনানায়ক ও একজন সার্জ্জেণ্ট মেজর উভয়েই তাহার হস্তে নিহত হন। অবশেষে বহু সশস্ত্র সৈনিকের সহায়তায় মঙ্গল পাণ্ডে ধৃত হইলে সামরিক আদালতের বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়। বারাকপুর হইতে বিদ্রোহ ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে দারুণ অশান্তির উদ্ভব হয়। এই বিদ্রোহ দমন করিতে ভারত সরকারকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

বারাকপুরের প্রাচীন নাম চাণক। অনেকে মনে করেন যে কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব্ চার্ণকের নাম হইতে বারাকপুরের নাম চাণক হইয়াছে। কিন্তু এই ধারণা অমূলক। কারণ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত ব্রুকের মানচিত্রে কাঁকিনাড়া ও বরাহনগরের মধ্যে চাণক নামক ক্ষুদ্র গ্রামের উল্লেখ আছে। চাণকে ভাগিরথীতীরে একটি প্রকাণ্ড উদ্যান ও তাহার ভিতরে ভারতবর্ষের বড়লাটদিগের একটি প্রাসাদ আছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই প্রাসাদে ইংরেজ ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান সেনানায়ক বাস করিতেন। কিন্তু উক্ত বৎসরে গভরর্ণর-জেনারল লর্ড্ ওয়েলেস্‌লি প্রধান সেনানায়ক হওয়া অবধি ইহা গভর্ণর-জেনারল্‌গণের বাসস্থান হইয়াছে। কলিকাতার কর্ম্মকঠোর শ্রমের পর নিকটস্থ পল্লীতে বিশ্রামের উপযোগী স্থান খুঁজিবার সময় লর্ড ওয়েলেস্‌লি এই উদ্যানটিই পছন্দ করেন; ইহার সহিত সত্যকার ইংরেজী পার্কের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গভরর্ণর-জেনারলেরা বিশ্রাম করিতে বারাকপুরে যাইতেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের গভর্ণর-জেনারল্ লর্ড ক্যানিংএর পত্নী বারাকপুর প্রাসাদ অত্যন্ত ভালবাসিতেন বলিয়া দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিবার পথে তাঁহার মৃত্যু হইলে বারাকপুর উদ্যানে তাঁহার মৃতদেহ

সমাহিত করা হইয়াছিল। গঙ্গাতীরে তাঁহার উচ্চ সমাধি-মন্দির বহুদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। লেডি ক্যানিংএর নাম হইতে বাঙালীর সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন লেডিকেনীর নাম হইয়াছে। এখনও ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারল্ কলিকাতায় আসিলে বারাকপুর প্রাসাদে কয়েকদিন কাটাইয়া থাকেন। বারাকপুরের অন্তর্গত মণিরামপুর পল্লীতে প্রসিদ্ধ জননায়ক বাগ্মী-প্রবর স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসভূমি এবং এই স্থানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। এখানে একটি ঘোড়দৌড়ের ময়দান আছে।
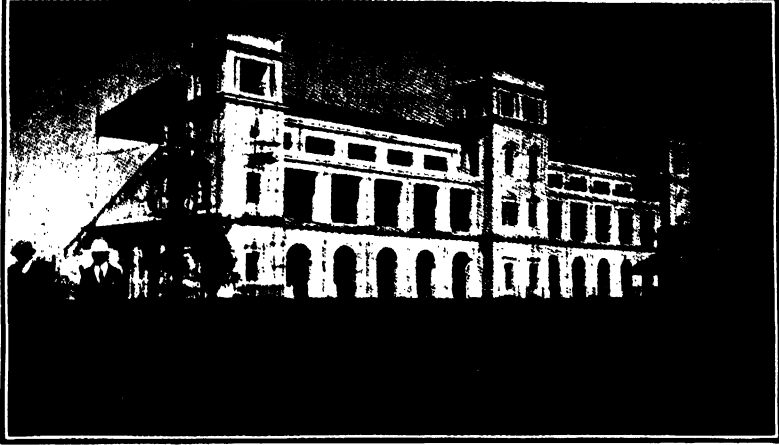
ঘোড়দৌড়ের মাঠ, বারাকপুর

পল্‌তা —কলিকাতা হইতে ১৫½ মাইল। স্টেশনের নিকটে ভাগীরথীকূলে কলিকাতার জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের বিরাট কারখানা এখানে অবস্থিত। ইহা একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য।

ইছাপুর কলিকাতা হইতে ১৭ মাইল দূর। এখানে অর্ডন্যান্স্ ফ্যাক্টরী বা সরকারী অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা অবস্থিত। প্রথমে ওলন্দাজগণ এই কারখানা বাটীর মালিক ছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরেজ সরকারের কারখানা স্থাপিত হয় এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে এখানে সর্ব্বপ্রথম রাইফেল প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি স্টেশনের নিকটে শিখদিগের একটি গুরুদ্বার নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইছাপুর স্টেশন হইতে দেড় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে গঙ্গাতীরবর্ত্তী নবাবগঞ্জ গ্রামে রাসের সময় পক্ষকালস্থায়ী একটি বৃহৎ মেলা হয়।

শ্যামনগর —কলিকাতা হইতে ১৯ মাইল দূর। স্টেশনের অতি নিকটে মূলাযোড়ের প্রসিদ্ধ কালীবাড়ী ও দ্বাদশ শিব মন্দির অবস্থিত। কলিকাতা পাথুরিয়া-ঘাটার গোপীমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক এই কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, গোপী-মোহনের সাত বৎসর বয়স্কা কন্যা ব্রহ্মময়ীর মৃত্যু হইলে তাহার শব গঙ্গার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে মূলাযোড়ের ঘাটে গিয়া লাগে। সেই রাত্রেই গোপীমোহন স্বপ্নে

দেখেন যে কালী যেন তাঁহাকে মূলাযোড়ে মন্দির নির্ম্মাণ ও ব্রহ্মময়ী নামে মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ করিতেছেন। একটি সুন্দর উদ্যান মধ্যে ব্রহ্মময়ীর মন্দির অবস্থিত। এখানে আনন্দশঙ্কর, গোপীশঙ্কর ও হরশঙ্কর নামে তিনটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছে। ব্রহ্মময়ীর মন্দিরের পিছনদিকে একটি স্বতন্ত্র মন্দিরে গোপীনাথ জীউ নামক পাষাণ নির্ম্মিত সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ অবস্থিত। কালীবাড়ীতে প্রতি মাসের অমাবস্যা, রটন্তী চতুর্দ্দশী এবং কালীপূজার সময় বিশেষ সমারোহ হয় এবং সমগ্র পৌষ মাস ধরিয়া এখানে একটি মেলা বসে।

মূলাযোড়ে একটি সংস্কৃত কলেজ, অতিথিশালা ও দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই গুলিও গোপীমোহন ঠাকুরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

সুপ্রসিদ্ধ "অন্নদামঙ্গল" প্রণেতা মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া মূলাযোড়ে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবন এই স্থানেই অতিবাহিত হয়।

মূলাযোড়ের নিকটবর্ত্তী কাউগাছি গ্রামে একটি প্রাচীন গড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, পশ্চিম বঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় বর্গীর উপদ্রবের সময় বর্দ্ধমানের তৎকালীন নাবালক মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের জননী এই স্থানে একটি গড় পরিবেষ্টিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং বিপদের সময় এখানে আসিয়া বাস করিতেন। আবার কাহারও মতে ইহা একটি পুরাতন নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ।

শ্যামনগরের নিকটবর্ত্তী রহুতা গ্রাম পরলোকগত সুসাহিত্যিক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। রঙ্গলাল প্রসিদ্ধ "বিশ্বকোষ" অভিধানের প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক। পরে কলিকাতার প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় বিশ্বকোষের সম্পাদনার ভার লইয়া এই বিরাট কোষ গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। ত্রৈলোক্যনাথের কয়েকখানি উপন্যাস বাঙ্গালী পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল।

কাঁকিনাড়া—কলিকাতা হইতে ২২ মাইল দূর। এখানে অনেক গুলি কল হইয়াছে বলিয়া স্টেশনের নাম কাঁকিনাড়া, কিন্তু **ভাটপাড়াই** এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ স্থান। ভাটপাড়া বা ভট্টপল্লী অতি পুরাতন গ্রাম। এখানে দুই শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন অন্যূন ২০টি মন্দির দৃষ্ট হয়। ভাটপাড়া বাংলা দেশে সংস্কৃত চর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র। ইহা নানা শাস্ত্র-অধ্যাপক বহু পণ্ডিতের জন্মস্থান। ইহাদের মধ্য নিমাই তর্কপঞ্চানন, হলধর তর্কচূড়ামণি, তারাচরণ তর্করত্ন, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, যদুরাম সার্ব্বভৌম, শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভাটপাড়ার পণ্ডিত মণ্ডলীর শাস্ত্রীয় মতামত সমগ্র বঙ্গে সম্মানিত।

ভাটপাড়ার নিকটে জগদ্দলে দুইটি শুষ্কপ্রায় পরিখা দৃষ্ট হয়। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে মোগল বাহিনীর অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্য এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে জগদ্দলে ও নিকটবর্ত্তী আটপুরে এবং খাস ভাটপাড়ায় অনেক গুলি পাটকল হইয়াছে।

ভাটপাড়া হইতে দুই মাইল পূর্ব্বে মাদরাল গ্রামে জয়চণ্ডী দেবীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। এখানে সপ্তম দোল উপলক্ষে মেলা ও বহু জন সমাগম হয়। জয়চণ্ডীর মূর্ত্তি এক খানি প্রস্তর হইতে খোদাই করিয়া নির্ম্মিত।

নৈহাটি জংশন—কলিকাতা হইতে ২৪ মাইল দূর। ভাটপাড়ার ন্যায় নৈহাটিতেও অনেকগুলি কল হইয়াছে এবং জনসংখ্যা বহুপরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ভাটপাড়ার ন্যায় নৈহাটিও অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের জন্মস্থান। নৈহাটি স্টেশনের ঠিক পূর্ব্বদিকবর্ত্তী **কাঁঠালপাড়া** পল্লী সাহিত্য-সম্রাট

বঙ্কিম ভবন, কাঁঠালপাড়া

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান। এই স্থানকে বাংলার সাহিত্যিক-তীর্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক নিবাসের অধিকাংশ জমি রেলওয়ে ইয়ার্ডের অন্তর্গত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার বৈঠকখানা ও পৈতৃক দেবালয়গুলি অভগ্ন আছে। যে কক্ষটিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাদি রচনা করিতেন তাহা এখনও আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কুলদেবতা ৺বিজয় রাধাবল্লভ জীউর রথযাত্রা উপলক্ষে কাঁঠালপাড়ায় বিশেষ সমারোহ হয়। বঙ্কিম ভবনের অন্দরে একটি পুষ্করিণী আছে। অনেকে বলেন যে "চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে বর্ণিত ভীমা পুষ্করিণীর বর্ণনা এই পুকুরটি হইতেই গৃহীত। বঙ্কিমচন্দ্রের পুণ্যস্মৃতি রক্ষা কল্পে প্রতিবৎসর কাঁঠালপাড়ায় সাহিত্যসেবীদিগের একটি সম্মেলন হইয়া থাকে; উহা "বঙ্কিম সাহিত্য সম্মেলন" নামে পরিচিত।

নৈহাটির উত্তরে অবস্থিত **গৌরিফা** গ্রাম প্রসিদ্ধ সমাজসংস্কারক, বাগ্মী, ভগবৎ-প্রেমিক ও সাহিত্যসেবী স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের জন্মস্থান। কেশবচন্দ্র একজন অসাধারণ মনীষা সম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম সমাজে "নব বিধান" মতের প্রবর্ত্তক। বাংলার নব জাগরণের অন্যতম অগ্রদূত হিসাবে তাঁহার নাম চিরদিনই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

নৈহাটি একটি জংশন স্টেশন। ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে পূর্ব্বভাবত রেলপথের একটি ছোট শাখা হুগলীর নিকট "জুবিলী ব্রিজ" নামক ঝুলানো সেতুর উপর দিয়া গঙ্গা পার হইয়া এই স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

হালিশহর—কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দূর। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ প্রণীত চণ্ডীকাব্যে হালিশহরের নামোল্লেখ আছে। এই স্থান কুমারহট্ট পরগণার অন্তর্গত এবং প্রাচীন কালে ইহা কুমারহট্ট নামে পরিচিত ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী হালিশহর বা কুমারহট্টের অধিবাসী ছিলেন। যে স্থানে তাঁহার বাসভবন ছিল, বর্ত্তমানে উহা "চৈতন্য ডোবা" নামে পরিচিত, এখানে একটি অতি পুরাতন পুষ্করিণী ও তাহার চতুর্দ্দিকে গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সম্প্রতি ঈশ্বরপুরীর জন্মভিটায় ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত গৌর নিতাই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে এবং একটি মঠের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া সম্ভবতঃ অর্থাভাবে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। শ্রীচৈতন্যদেব গুরুর জন্মভিটা দর্শন করিবার জন্য কুমারহট্টে আগমন করিয়াছিলেন এবং গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ এই স্থানের ধুলিমুষ্টি উত্তরীয়ের অঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। ঈশ্বর পুরীর অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও ভগবদ্ভক্তি অতি উজ্জ্বল অক্ষরে বৈষ্ণব সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত কুমারহট্টে একটি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া মধ্যে মধ্যে তথায় বাস করিতেন। নবদ্বীপে ইহারই বাটীতে শ্রীচৈতন্য-দেবের কীর্ত্তন মহোৎসব হইত।

কুমারহট্টের বাসুদেব ঘোষ চৈতন্যদেব বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি এবং ইঁহার দুই ভ্রাতা মাধব ও গোবিন্দানন্দ চৈতন্যদেবের ভক্ত অনুচর এবং বিখ্যাত কীর্ত্তনিয়া ছিলেন। শেষ বয়সে ইঁহারা নবদ্বীপবাসী হন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে হালিশহরে বিখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতা শাক্ত সাধক রামপ্রসাদ সেন জন্ম গ্রহণ করেন। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য রামপ্রসাদ কলিকাতার জনৈক ধনী ব্যক্তির সেরেস্তায় মুহুরির কার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার মন সর্ব্বদাই কালী বিষয়ক চিন্তায় এতদূর মগ্ন থাকিত যে অনেক সময়ে অন্যমনস্ক হইয়া তিনি হিসাবের খাতার উপর স্বরচিত শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত লিখিয়া ফেলিতেন। এইরূপ একটি সঙ্গীতের কয়েকটি কলি একদিন তাঁহার মনিবের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তিনি বুঝিতে পারিলেন যে রামপ্রসাদ অতি উচ্চ স্তরের ভাবুক ও স্বভাব-কবি। গুণগ্রাহী মনিব রামপ্রসাদকে মুহুরির কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিয়া তাঁহার মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অর্থ চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রামপ্রসাদ শ্যামা সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং কথিত আছে যে তিনি

তাহাতে সিদ্ধিলাভও করেন। হালিশহরে তাঁহার পঞ্চবটী ও সাধন বেদী আজিও বর্ত্তমান আছে। সম্প্রতি রামপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষা কল্পে এখানে একটি স্মৃতি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। কালী পূজার সময় এখানে বিশেষ ধুমধাম হয় এবং "প্রসাদ মেলা" নামে একটি মেলা বসে। রামপ্রসাদের শ্যামাবিষয়ক গান গুলি খুবই বিখ্যাত এবং যে বিশেষ সুরে উহা গীত হয় তাহা "রামপ্রসাদী সুর" নামে পরিচিত। শ্যামা সঙ্গীত ছাড়া রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের পালা অবলম্বনে একখানি কাব্য রচনা করেন এবং কৃষ্ণনগরের গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে "কবিরঞ্জন" উপাধি প্রাপ্ত হন। রামপ্রসাদের সমসাময়িককালে হালিশহরে অযোধ্যারাম গোস্বামী বা আজু গোঁসাই নামে জনৈক বৈষ্ণব ভক্ত বাস করিতেন। ইনিও উপস্থিতমত সঙ্গীত রচনা করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রামপ্রসাদ কোন গান রচনা করিলে ইনি তাহার উত্তর স্বরূপ অপর একটি গান রচনা করিতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অনেক সময়ে এই দুই সঙ্গীত-নিপুণ কবিকে একত্র করিয়া

রামপ্রসাদের পঞ্চবটী, হালিশহর

উভয়ের সঙ্গীত-যুদ্ধ উপভোগ করিতেন। রামপ্রসাদের সাধনা-শক্তি সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে একবার স্বয়ং ভগবতী কন্যার রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার বেড়া বাঁধিবার দড়ি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। একদিন আজু গোঁসাই গঙ্গাস্নানান্তে কমণ্ডলুতে করিয়া গঙ্গাজল লইয়া ফিরিতেছেন, এমন সময়ে পথে রামপ্রসাদ তাঁহাকে ছুঁইয়া ফেলেন। আজু গোঁসাই ইহাতে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং বলেন যে সুরাপায়ী তান্ত্রিক সাধক রামপ্রসাদের স্পর্শে তাঁহার কমণ্ডলু মধ্যস্থ গঙ্গাজল অপবিত্র

হইয়া গিয়াছে। জল ফেলিয়া দিয়া তিনি পুনরায় স্নানান্তে গঙ্গাজল লইয়া গেলেন, কিন্তু বাটীতে গিয়া আহ্নিক করিবার সময় দেখিলেন যে কমণ্ডলুর জল মদ্যে পরিণত হইয়াছে। তখন রামপ্রসাদের প্রভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি তাঁহার নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। আরও প্রবাদ আছে যে নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা একদিন নৌকার উপর হইতে রামপ্রসাদের মর্ম্মস্পর্শী গান শুনিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে স্বীয় বজরায় আনয়ন করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার গীতি-সুধা পান করেন।

"কাশীখণ্ড" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভাস্কর্য্য শিল্পে সুদক্ষ হালিশহরবাসী নয়ন ভাস্করের উল্লেখ আছে।

রেলের ওয়ার্কশপ, কাঁচড়াপাড়া

হালিশহরের আধুনিক দ্রষ্টব্যের মধ্যে স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মঠ উল্লেখযোগ্য।

স্টেশন হইতে হালিশহর গ্রাম প্রায় দুই মাইল দূর। পরবর্ত্তী স্টেশন কাঁচড়াপাড়ায় নামিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া হালিশহর যাওয়াই সুবিধা।

কাঁচড়াপাড়া—কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূর। এই খানেই চব্বিশ পরগণা জেলার শেষ এবং ইহার পরেই নদীয়া জেলার আরম্ভ। এই স্থানে পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলের ইঞ্জিন মেরামত ও গাড়ী তৈয়ারী করিবার কারখানা অবস্থিত। বড় মাপের লাইনের সমস্ত গাড়ীই এখানে প্রস্তুত হয়। যেখানে ওয়ার্কশপ্ অবস্থিত তাহার পুরাতন নাম বীজপুর। পূর্ব্বে বীজপুরে "ডাকাতে কালী" নামে এক কালী ছিলেন। কথিত আছে ডাকাতেরা এই কালীর নিকট নরবলি দিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত। যে বৃক্ষমূলে এই কালীর মন্দির ছিল উহা এখনও বর্ত্তমান আছে। কাঁচড়াপাড়ার রেলওয়ে উপনিবেশ একটি সুদৃশ্য শহর। উদ্যান, ক্রীড়াক্ষেত্র, রাজপথ, বিদ্যুদালোক, কলের জল, বিদ্যালয়, ভজনাগার, প্রমোদগৃহ কোন কিছুরই এখানে অভাব নাই।

কাঁচড়াপাড়ার প্রাচীন নাম কাঞ্চনপল্লী। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই স্থান "সেন শিবানন্দের পাট" নামে উল্লিখিত আছে। শিবানন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব কাঞ্চনপল্লীতে শিবানন্দের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব যখন নীলাচলে (পুরীতে) অবস্থান করিতেন তখন প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময় গৌড়দেশীয় ভক্তগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। সেন শিবানন্দ এই ভক্তমণ্ডলীর পথ প্রদর্শক হইয়া তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রকার ব্যয়ভার বহন করিতেন। চৈতন্যদাস, রামদাস ও পুরীদাস নামে শিবানন্দের তিন পুত্র ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুরীদাস বা পরমানন্দ সেন সংস্কৃত ভাষায় "চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক",
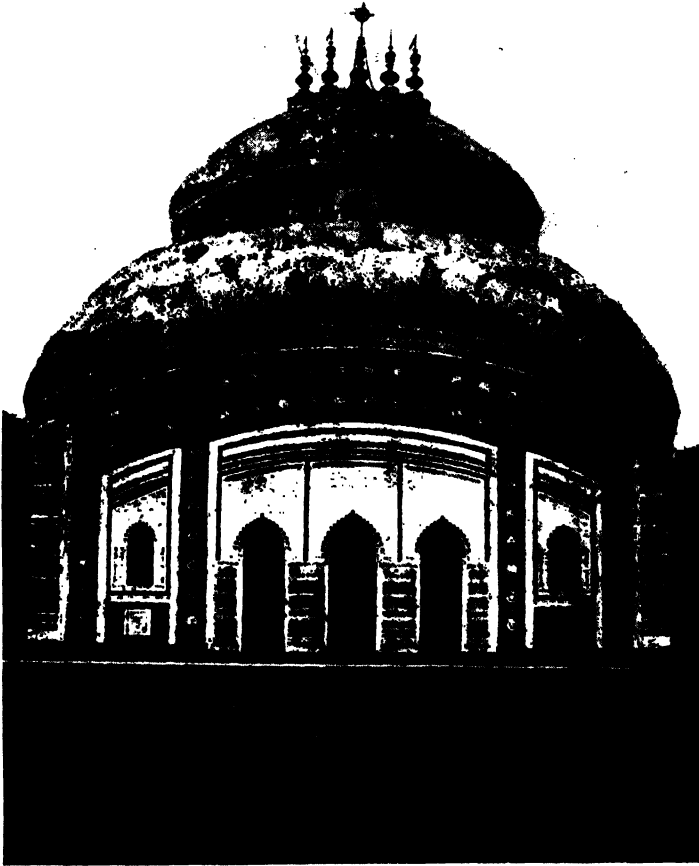
কৃষ্ণরায়ের মন্দির, কাঁচড়াপাড়া

"চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য" ও "গৌরগণোদ্দেশদীপিকা" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া মহাকবিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। স্বয়ং চৈতন্যদেব তাঁহাকে "কবিকর্ণপূর" উপাধি প্রদান করেন। বৈষ্ণবজগতে এই শেষোক্ত নামেই তিনি সমধিক পরিচিত। সেন শিবানন্দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহ আজও কাঁচড়াপাড়ায় নিত্য পূজিত হইতেছেন।

যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত পুত্র রাঘব বা কচুরায় দিল্লী হইতে "যশোরজিৎ" উপাধি ও বাদশাহী সনন্দলাভ করিবার পর কৃষ্ণরায়ের নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন ও নিত্য সেবা নির্ব্বাহের জন্য "কৃষ্ণবাটী" নামে একটি নিষ্কর তালুক জায়গীর দেন। এই মন্দির গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইবার পর কৃষ্ণরায়ের বর্ত্তমান মন্দির ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নিবাসী নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক মহাশয়দ্বয়ের ব্যয়ে নিম্মিত হয়। এই মন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। রথের সময় কাঁচড়াপাড়ায় বিশেষ সমারোহ হয়।
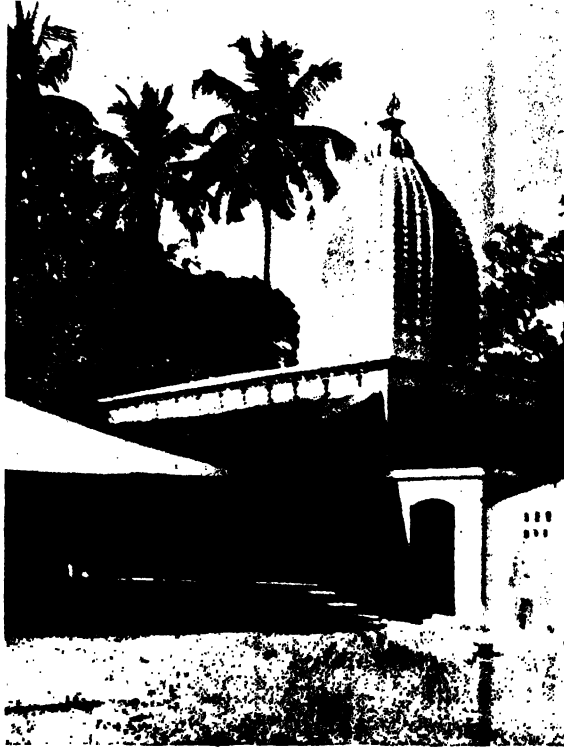
কুলিয়ারপাটের মন্দির

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন সংবাদপত্র "প্রভাকর" সম্পাদক ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষিগণের সাহিত্যগুরু সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কাঁচড়াপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। ইংরেজী প্রভাব বর্জ্জিত খাঁটি বাঙালীর ধরণে যাঁহারা কবিতা লিখিতেন ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাদিগের সর্ব্বশেষ কবি। এই কবির জন্মস্থান হিসাবে কাঁচড়াপাড়া বঙ্গসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই দ্রষ্টব্য স্থান। বিখ্যাত ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিমচাঁদ শিরোমণি ও তুলসীরামায়ণ ও অদ্ভুত রামায়ণের বঙ্গানুবাদক হরিমোহন গুপ্ত কাঁচড়াপাড়ার অধিবাসী ছিলেন।

কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী সুবর্ণপুর গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ "আর্য্য-দর্শন" সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জন্মস্থান। যোগেন্দ্রনাথের "গ্যারিবল্ডির জীবন চরিত" "ম্যাটসিনির জীবন চরিত" ও "জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবন চরিত" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ এক সময়ে

-ঙ্গ সাহিত্যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। বাংলার জাতীয় ভাব উদ্দীপনে যোগেন্দ্র-নাথের দান নিতান্ত সামান্য নহে।

কাঁচড়াপাড়া স্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বে নদীয়া জেলায় "অপরাধভঞ্জন" বা **কুলিয়ারপাট** অবস্থিত। এখানে একটি সুন্দর মন্দিরে গৌর নিতাই বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়। এখানকার দ্বাদশবকুল নামক কুঞ্জ বৈষ্ণবগণের নিকট অতি প্রিয়। প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে এখানে তিন দিন ব্যাপী একটি বিরাট মেলা হয়। কথিত আছে, এই তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেব কুলিয়া গ্রাম নিবাসী বৈষ্ণব-নিন্দক পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ মার্জ্জনা করেন। তদবধি কুলিয়া অপরাধভঞ্জনের পাট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উক্ত তিথিতে এখানে আসিয়া পূজা অর্চ্চনা করিলে সর্ব্ব পাপ ও অপরাধ দূর হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

ঘোষপাড়ার মন্দির

কাঁচড়াপাড়া হইতে ৫ মাইল দূরে নদীয়া জেলায় কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র **ঘোষপাড়া** গ্রাম অবস্থিত। আউলচাঁদ নামক একজন সাধক এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কর্ত্তাভজাদের মধ্যে অনেকে বলেন যে শ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে অন্তর্ধান করিবার পর বহুকাল পরে পুনরায় আউলচাঁদ রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া "গুরু সত্য" এই মহামন্ত্র প্রচার করেন। জনশ্রুতি যে উলা (বীরনগর) নিবাসী মহাদেব নামক জনৈক বারুজীবী ১৬১৬ শকাব্দের (১৬৯৪ খৃষ্টাব্দ) ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবারে তাঁহার পানের বরজের মধ্যে একটি অজ্ঞাত কুলশীল সুদর্শন বালককে দেখিতে পান। মহাদেব তাহাকে গৃহে আনিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন এবং তাহার নাম রাখেন পূর্ণচন্দ্র। মহাদেবের যত্নে পূর্ণচন্দ্র হরিহর নামক জনৈক বৈষ্ণবের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। প্রায় বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়ায় গিয়া বলরাম

দাসের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং তখন হইতে তাঁহার নাম হয় আউলচাঁদ। কর্ত্তাভজাগণকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি শাখা বলা যাইতে পারে। নিজ ধর্ম্মকে ইঁহারা সত্যধর্ম্ম বা সহজধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে কর্ত্তা বা ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা এবং গুরুই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। এই সম্প্রদায়ের গুরুগণ "মহাশয়" ও শিষ্যগণ "বরাতি" নামে অভিহিত হন। এই সম্প্রদায়ের সাধন বিষয়ে কতকগুলি গুহ্য রহস্য আছে, সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অপরে উহা জানিতে পারে না। দিনে পাঁচবার ইঁহাদের মন্ত্রজপ করিতে হয়। শুক্রবারকে পবিত্রজ্ঞানে এই দিন ইঁহারা উপবাসে এবং ধর্ম্মকর্ম্মে অতিবাহিত করেন। মদ্য ও মাংস ইঁহাদের নিকট নিষিদ্ধ বলিয়া কথিত। সাধনক্ষেত্রে ইঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকিলেও ব্যবহারিক জীবনে ইঁহারা জাতিভেদ প্রথা মানিয়া চলেন।

হিমসাগর দীঘি, ঘোষপাড়া

কথিত আছে, যে এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আউলচাঁদের ২১ জন শিষ্য ছিল। উঁহাদের মধ্যে সদ্‌গোপ বংশীয় রামশরণ পাল আউলচাঁদের মৃত্যুর পর গুরুর পদ প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমানে রামশরণের বংশধরগণই ঘোষপাড়ায় থাকিয়া এই সম্প্রদায়ের পরিচালনা করেন। রামশরণের স্ত্রী অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। শিষ্যগণ তাঁহাকে "সতী মা" নামে অভিহিত করিতেন। সতীমায়ের সমাধিস্থান ডালিমতলা ঘোষপাড়ার একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে একবার রামশরণের স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আউলচাঁদ নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে কিছু মৃত্তিকা লইয়া তাঁহার গায়ে মাখাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত ও সুস্থ করিয়াছিলেন। আউলচাঁদ তাঁহার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া আশ্চর্য্যভাবে অন্তর্হিত হন। তিনিই রামশরণের পুত্র রামদুলাল রূপে জন্ম গ্রহণ করেন বলিয়া কথিত। ঘোষপাড়ায় হিমসাগর নামে একটি দীঘি আছে। অনেকের বিশ্বাস যে ইহার জলের রোগ আরোগ্য করিবার

আশ্চর্য্য শক্তি আছে। প্রবাদ যে ইহার জল চোখে দিয়া জনৈক অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছিল। রথযাত্রা ও দোলের সময় এখানে বিশেষ সমারোহ হয়। ইহা ছাড়া রামশরণের পুত্র রামতুলালের মৃত্যু তিথিতেও এখানে মহোৎসব হইয়া থাকে। ঘোষপাড়ার দোলের মেলা খুবই প্রসিদ্ধ। এই মেলা সপ্তাহকাল স্থায়ী হয় এবং এই উপলক্ষে এখানে নানাস্থান হইতে সহস্র সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

জগন্নাথদেবের দোলমঞ্চ, যশোড়া

কাঁচড়াপাড়া স্টেশন হইতে ঘোষপাড়া ও কুলিয়ার পাট যাইবার জন্য ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। মেলার সময় এই দুই স্থানেই কাঁচড়াপাড়া হইতে মোটর বাস যাতায়াত করে।

শিমুরালি—কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইল দূর। স্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী যশোড়া গ্রাম প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট। এখানে জগন্নাথদেবের একটি মন্দির আছে। কথিত আছে যে বৃদ্ধ বয়সে জগদীশ পণ্ডিত

শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। সেখানে জগন্নাথদেবের নবকলেবর ধারণকালে তিনি পুরাতন প্রতিমূর্ত্তিটি পুরী হইতে স্বয়ং পদব্রজে বহন করিয়া যশোড়ায় আনয়ন ও প্রতিষ্ঠা করেন। স্নানযাত্রার সময় যশোড়ায় বহু জনসমাগম হয়। প্রতিবৎসর পৌষ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে যশোড়ায় জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং মাঘী পূর্ণিমা ও গঙ্গাস্নানের যোগ উপলক্ষেও এখানে বহু লোকের সমাবেশ হয়।

চাকদহ—কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল দূর। এই স্থানের প্রাচীন নাম চক্রদ্বীপ বা চক্রদহ। প্রবাদ, গঙ্গা আনয়নের সময় ভগীরথের রথের চক্র এখানে একটি গভীর খাত খনন করিয়া গিয়াছিল, গঙ্গাজলে পূর্ণ হইয়া উহার নাম হয় চক্রদহ বা চাকদহ। এই স্থান বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। রেল খুলিবার পূর্ব্বে যশোহর ও খুলনা
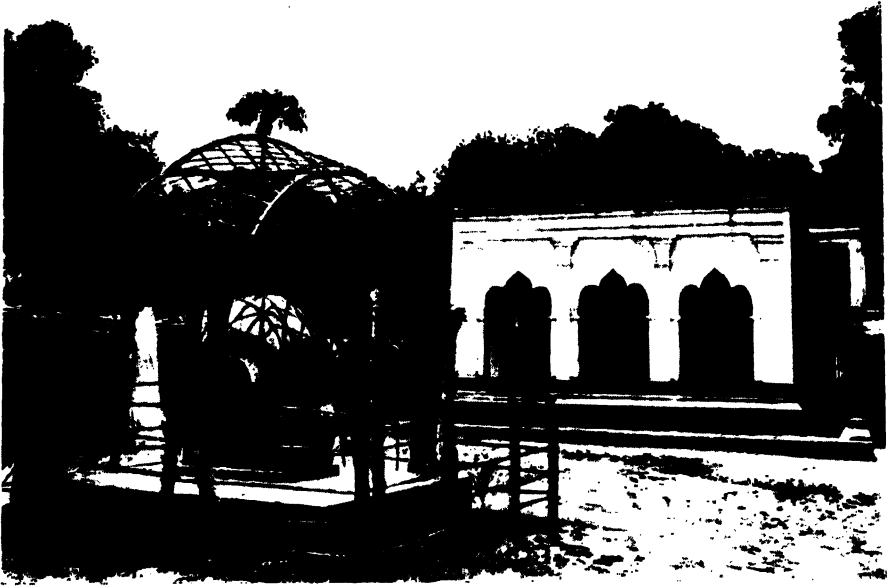
মহেশ পণ্ডিতের ফুলসমাজ বেদী ও মন্দির, চাকদহ

অঞ্চলের বহু লোক চাকদহে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। চাকদহ হইতে বনগ্রাম হইয়া যশোহর পর্য্যন্ত একটি পাকা রাস্তা আছে। এখনও বহুদূর হইতে লোকে এখানে শবদাহ করিতে আসে। বর্ত্তমানে চাকদহ হইতে গঙ্গা প্রায় দেড় মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। চাকদহ গ্রামের নিম্নে গঙ্গার পুরাতন খাত এখনও বর্ত্তমান আছে। প্রাচীন কালে গঙ্গাসাগরের ন্যায় এই স্থানেও লোকে শিশু সন্তান নিক্ষেপ করিত ও অনেকে মুক্তি প্রাপ্তির আশায় চক্রদহের জলে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিত। কথিত আছে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাজ মানসিংহ যখন মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য বাংলায় আগমন করেন তখন তাঁহার সৈন্যদলকে ঝড়বৃষ্টির জন্য কয়েকদিন এই স্থানে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। চাকদহ স্টেশন হইতে মাত্র সাত আট মিনিটের

পথ **কাঁঠালপুলি** নামক পল্লীতে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম মহেশ পণ্ডিতের ফুলসমাজ বেদী ও শ্রীপাট অবস্থিত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে এখানে বৈষ্ণবদিগের একটি মহোৎসব হয়। যশোড়ার জগদীশ পণ্ডিত এই মহেশ পণ্ডিতের ভ্রাতা ছিলেন। চাকদহ যে এককালে একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল
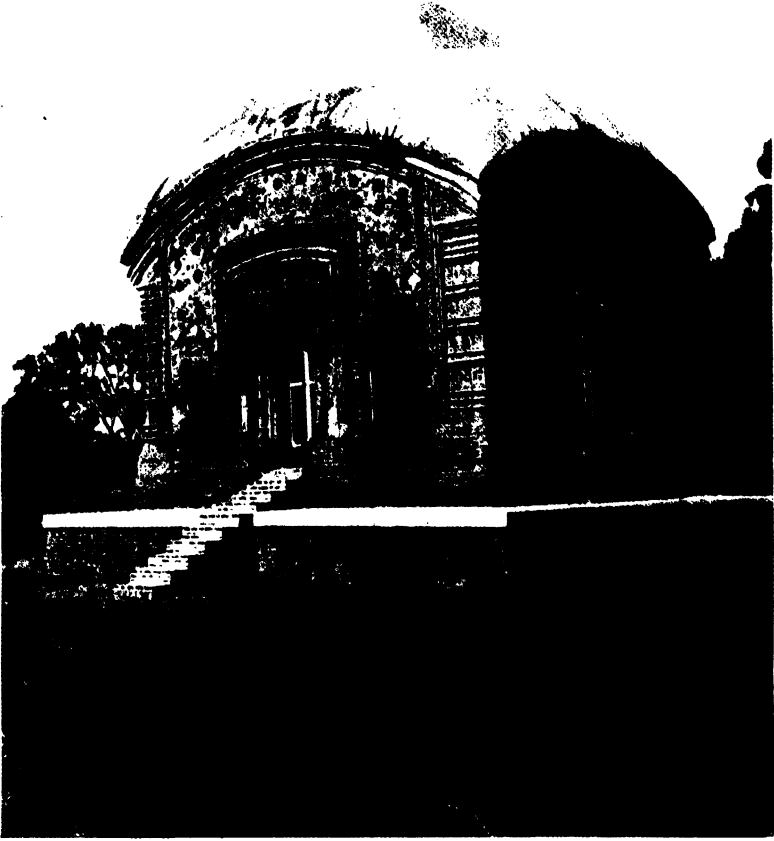
পালপাড়ার মন্দির, চাক্দহ (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

তাহা ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। বহু অট্টালিকা ও দেবায়তনের ধ্বংসাবশেষ গভীর অরণ্য সমাচ্ছন্ন হইয়া এই গ্রামখানিকে এক অপরূপ নীরবতা ও গাম্ভীর্য্য প্রদান করিয়াছে। এখানে এখনও একটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। চাকদহের আনন্দগঞ্জবাজারে মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে মহাধুমধামের সহিত গণেশ-জননী মূর্ত্তির পূজা হয় এবং প্রায় পক্ষকাল স্থায়ী একটি বিরাট মেলা বসে।

চাকদহের নিকটবর্ত্তী **পালপাড়া** গ্রামে হিন্দু আমলে নির্ম্মিত একটি প্রাচীন মন্দির আছে। শিমুরালি ও চাকদহের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত এই মন্দিরটি রেলগাড়ীতে

বসিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটি যে স্থানে অবস্থিত উহা চতুর্দ্দিকের ভূমি হইতে অনেক উচ্চ। এই মন্দিরের ছাদ চৌচালার আকারে নির্ম্মিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল ইটের দ্বারা গঠিত ও অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় এই মন্দিরটি বর্ত্তমানে সরকারী "রক্ষিত-কীর্ত্তির" অন্তর্গত। কবে কাহার দ্বারা এই মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নির্ণীত হয় নাই। ইহা অন্ততঃ ৫০০ শত বৎসরের পুরাতন হইবে। মন্দিরের নিকটে প্রদ্যুম্ন সরোবর নামে একটি অতি পুরাতন দীঘি আছে। জমিদারগণের প্রাচীন দলিলাদিতে প্রদ্যুম্ন হ্রদ ও প্রদ্যুম্ননগরের উল্লেখ আছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন মুক্তবেণীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া প্রদ্যুম্ন নগরের নাম করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন যে অতি প্রাচীনকালে চাকদহ প্রদ্যুম্ননগর নামে একটি বিশাল নগরের অন্তর্গত ছিল। জনশ্রুতি যে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন চক্রতীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়া এই স্থানে স্বীয় নামে একটি নগর স্থাপন করেন। আবার কাহারও কাহারও মতে প্রদ্যুম্ন রায় নামক জনৈক হিন্দু নরপতি এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। শিমুরালি হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে বহু উচ্চ ভিটা ও পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। এই সকল স্থান খনন করিলে বহু পুরাতন কীর্ত্তির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া অনেকের অভিমত। প্রসিদ্ধ "কুলার্ণবতন্ত্র" প্রণেতা তান্ত্রিক পণ্ডিত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার মহাশয় পালপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে লর্ড বিশপ হিবর তাঁহার রোজনামচায় এই পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

রাণাঘাট জংশন—কলিকাতা হইতে ৪৫½ মাইল দূর। ইহা চূর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত ও নদীয়া জেলার অন্যতম মহকুমা। প্রবাদ, বহু পূর্ব্বে এখানে রণা নামক একজন দস্যু সর্দ্দার বাস করিত। রণার ঘাঁটি বা আড্ডা হইতে "রাণাঘাট" নাম হইয়াছে অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। এখানে সিদ্ধেশ্বরী নামে এক কালী আছেন, এই কালী রণা দস্যুর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। রাণাঘাটে পাল চৌধুরী জমিদারগণের বাস। ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ কৃষ্ণপান্তি অতি মহৎ ও সদাশয় লোক ছিলেন। কথিত আছে, ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ ইঁহাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করিতে চাহিলে ইনি তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই এবং কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত "পাল-চৌধুরী" উপাধিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। ইনি ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। রাণাঘাটে একটি মেডিক্যাল মিশন আছে। নদীয়ার ভূতপূর্ব্ব কলেক্টর মনরো সাহেব ইহার প্রতিষ্ঠাতা। রাণাঘাট শহরের উপকণ্ঠে দয়াবাড়ী নামক স্থানে একটি বৃহৎ চিকিৎসালয় ও একটি বিদ্যালয় আছে। রাণাঘাটের পান্তুয়া খুব বিখ্যাত।

রাণাঘাট হইতে ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে চূর্ণী নদীর উভয়তীরে হরধাম ও আনন্দধাম নামে কৃষ্ণনগর রাজবংশীয়গণের দুইটি আবাসস্থল আছে। হরধাম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ইহার অট্টালিকা প্রভৃতি এখন ধ্বংসোন্মুখ। এখানে চিন্ময়ী নামে এক প্রাচীন কালী আছেন।

রাণাঘাট জংশন হইতে পূর্ব্ববঙ্গ রেল পথের এক শাখা কৃষ্ণনগর ও মুর্শিদাবাদ হইয়া লালগোলা ঘাট পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে খেয়া জাহাজে গঙ্গা পার হইয়া গোদাগাড়ীঘাট হইতে মাঝারি মাপের লাইনে মালদহ হইয়া কাটিহার পর্য্যন্ত গিয়াছে। দ্বিতীয় একটি

শাখা ২০ মাইল দূরবর্ত্তী খুলনা শাখা লাইনের উপর অবস্থিত বনগ্রাম জংশন পর্য্যন্ত গিয়াছে; এই শাখা পথে মাঝেরগ্রাম ও গোপালনগর উল্লেখযোগ্য স্টেশন। তৃতীয় একটি শাখা ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী শান্তিপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে; এই পথে তিনটি স্টেশনের মধ্যে ফুলিয়া ও শান্তিপুর প্রধান।

রাণাঘাট জংশন হইতে **মাঝেরগ্রাম** ৯ মাইল দূর। এই স্থানের তিন মাইল উত্তরে "দেগাঁর ঢিবি" নামে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, ইহা দেবপাল বা দেপাল নামক কুম্ভকার জাতীয় রাজার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। দেগাঁর প্রাচীন নাম দেবগ্রাম। ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলে" দেগাঁএর দেপাল রাজার উল্লেখ আছে। জনশ্রুতি যে এই দেবপাল জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে একখানি পরশ পাথর অপহরণ করিয়া বিপুল ধনসম্পত্তি লাভ করেন ও স্বীয় নামানুসারে বাসস্থানের নাম দেবগ্রাম রাখিয়া তথায় স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজ্য করিতে থাকেন। কালক্রমে স্থানীয় মুসলমান শাসন কর্ত্তার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হইলে তিনি উহার মীমাংসা করিবার জন্য দিল্লীতে বাদশাহের নিকট গমন করেন। যাত্রাকালে তিনি জয় ও বিজয় নামক শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের দুইটি পারাবত সঙ্গে লইয়া যান এবং স্বীয় মহিষীকে বলিয়া যান যে যদি দরবারে তিনি সফলকাম হন তবে শ্বেত পারাবত জয়কে ছাড়িয়া দিবেন; সে দ্রুতগতিতে উড়িয়া এই শুভ সংবাদ বহন করিয়া আনিবে। আর যদি কৃষ্ণ পারাবত বিজয় প্রথমে আসে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ফল অশুভ, তখন আত্মসম্মান রক্ষার জন্য মহিষীকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। রাজা দেবপাল সম্রাট দরবারে সফলকাম হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুচর ভুলক্রমে জয়ের পরিবর্ত্তে বিজয়কে মুক্ত করিয়া দেয়। কৃষ্ণ পারাবতের আগমন লক্ষ্য করিয়া মহারাণী বুঝিলেন যে সংবাদ অশুভ; তখন অন্তঃপুর মধ্যস্থ পুষ্করিণীতে ডুবিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। দেবপাল এই নিদারুণ ভুল সংশোধনের জন্য অতি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি পৌঁছিয়া দেখিলেন যে মহারাণী ইতিমধ্যেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। মনের দুঃখে তিনিও সেই পুষ্করিণীতে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। দেবগ্রাম তখন মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধিকারে আসিল। অনেকে বলেন যে মুসলমান শাসন-কর্ত্তার নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া দেবপালের অনুচর ইচ্ছা করিয়া জয়ের পরিবর্ত্তে বিজয়কে ছাড়িয়া দিয়াছিল। দেগাঁর ঢিবিতে কারুকার্য্য খচিত বহু ইষ্টক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান এখন জঙ্গলের দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

রাণাঘাট জংশন হইতে **গোপালনগর** স্টেশন ১৪ মাইল দূর। এই স্থান একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার কাঁচাগোল্লা অতি উৎকৃষ্ট। গোপালনগর হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত **চৌবেড়িয়া** গ্রাম "নীলদর্পণ" প্রণেতা প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের জন্মস্থান। এই গ্রামটি যমুনা নদীর উপর অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ। এখানে মুসলমান আমলে কাশীনাথ রায় নামক জনৈক কায়স্থ বংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার দুর্গের চারিদিকের খাতেই যমুনা নদী প্রবাহিত হইত বলিয়া ইহার নাম ছিল চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গ। এই দুর্গটি দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত ছিল। রাজা কাশীনাথ রায় পাঠান বিজয়ে মোগল বাহিনীকে বিশেষ সাহায্য করিয়া রণনৈপুণ্যের

জন্য সম্রাট আকবরের নিকট হইতে "সমরসিংহ" উপাধি লাভ করেন। পরে তিনি বিশ্বাসঘাতকগণ কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহার মহিষীর অভিযোগক্রমে আকবরের রাজস্ব-সচিব ও অন্যতম সেনাপতি তোডরমল্ল বিদ্রোহীগণকে যথোচিত দণ্ড প্রদান করেন এবং চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে একটি দরবার করিয়া সেই স্থান হইতেই সর্ব্ব প্রথম আকবরের বঙ্গবিজয় ঘোষণা করেন। চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গকে পটভূমি করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার "বঙ্গ বিজেতা" নামক উপন্যাস রচনা করেন। বর্ত্তমানে এই দুর্গের কোনই চিহ্ন নাই, উহা যমুনাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। প্রাচীন চতুর্ব্বেষ্টিত বা চৌবেড়িয়া এখন রাজার বাগান, ফুলবাড়ী ও সেহালা নামক তিনটি বিভিন্ন পল্লীতে বিভক্ত হইয়াছে।

ফুলিয়া শান্তিপুর শাখায় রাণাঘাট হইতে ৯ মাইল এবং কলিকাতা হইতে ৫৪ মাইল দূর। ফুলিয়া "ভাষা-রামায়ণ"-কার মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান। ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের মাঘমাস রবিবার শুক্লা পঞ্চমীর দিন সরস্বতী পূজার শুভবাসরে বাণীর বরপুত্র মহাকবি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বনমালী ও মাতার নাম মালিনী দেবী। ইঁহারা মুখুটি ব্রাহ্মণ; এই বংশের নবাব প্রদত্ত উপাধি ছিল "ওঝা"। কৃত্তিবাসের সময়ে ফুলিয়া অতি সমৃদ্ধ স্থান ছিল; তখন ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,

"গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥"

গুরু গৃহে শিক্ষা সমাপনান্তে কৃত্তিবাস পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাজপণ্ডিত হইবার আশায় তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় গমন করেন এবং স্বরচিত পাঁচটি সংস্কৃত শ্লোক রাজার নিকট প্রেরণ করেন। রাজসভায় তিনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। গৌড়েশ্বরের ইচ্ছানুসারে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আত্মনিয়োগ করেন। এই গৌড়েশ্বর কে ছিলেন, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে; কেহ কেহ বলেন যে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণই কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বর, আবার কাহারও কাহারও মতে রাজা গণেশ ও এই গৌড়েশ্বর অভিন্ন। কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণই বাংলা ভাষার আদি কাব্য বলিয়া অনেকের অভিমত। কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণের যথাযথ অনুবাদ না করিয়া উহার আখ্যানভাগ অবলম্বনে মৌলিক মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তিনি অন্যান্য পুরাণ হইতে বা কথকগণের প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়া আখ্যান ভাগের মধ্যে নব নব বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়াছেন। কৃত্তিবাস বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা, হনুমান কর্ত্তৃক রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, মহীরাবণ বধ ও লবকুশের যুদ্ধ প্রভৃতি সুপরিচিত বিষয়গুলি বাল্মীকির রামায়ণে দৃষ্ট হয় না। অধুনা কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে বাজারে যাহা বিক্রয় হয়, উহাতে কৃত্তিবাসের আদি রচনার সন্ধান অতি অল্পই পাওয়া যায়। প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নামক একজন অধ্যাপক ছিলেন। কৃত্তিবাসের আমলের প্রাচীন ভাষাকে সাধারণের সুবোধ্য করিবার জন্য তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষার প্রায় আমূল সংস্কার করেন। কৃত্তিবাসের নামে

প্রচলিত রামায়ণ প্রকৃতপক্ষে "জয়গোপালী" রামায়ণ। সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে কৃত্তিবাসের মূল রচনা প্রকাশের প্রচেষ্টা চলিতেছে এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের কিয়দংশ প্রকাশিতও হইয়াছে।

কৃত্তিবাসের সময়ের গ্রামরত্ন ফুলিয়া এখন জনবিরল পরিত্যক্ত পল্লীর রূপ ধারণ করিয়াছে। ফুলিয়া হইতে গঙ্গা এখন প্রায় ৪ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। ২৬ বৎসর
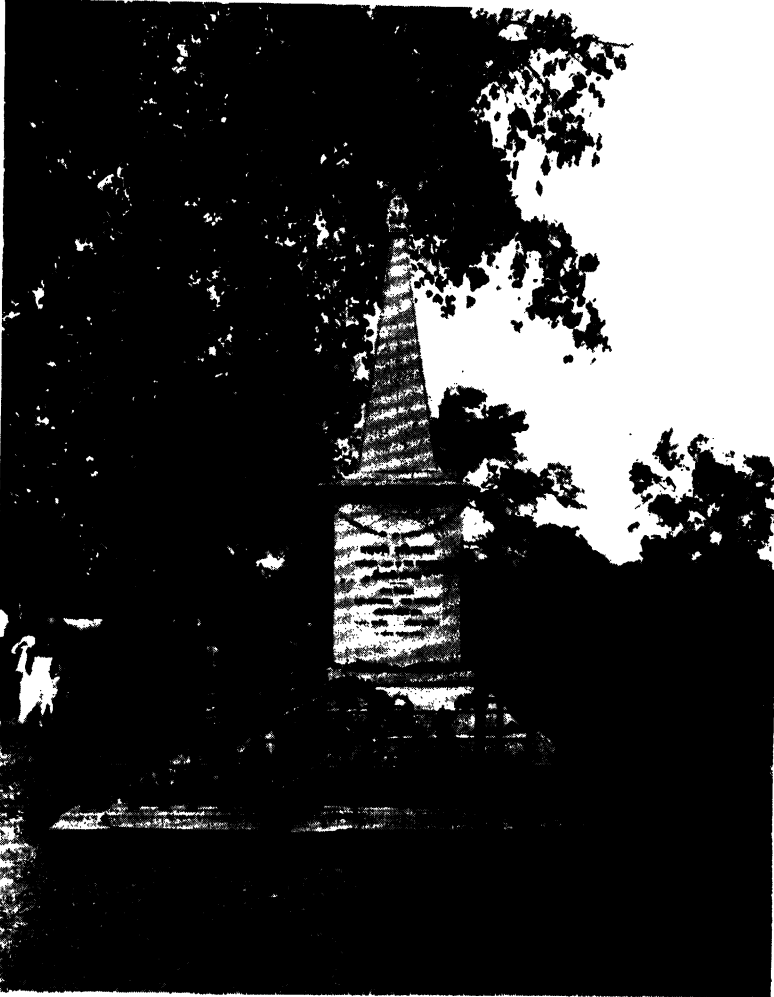
কৃত্তিবাস স্মৃতিস্তম্ভ, ফুলিয়া

পূর্ব্বে মহাকবি কৃত্তিবাসের ধ্বংসপ্রাপ্ত জন্মভিটায় সাহিত্যসেবীদিগের উদ্যোগে একটি স্মৃতি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার পার্শ্বে "কৃত্তিবাস কূপ" নামে একটি কূপ ও সম্মুখস্থ বিস্তৃত অঙ্গনের অপর দিকে "কৃত্তিবাস স্মৃতি বিদ্যালয়" নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কৃত্তিবাসের জন্মভিটায়

সাহিত্যসেবী ও স্বজাতিপ্রেমিক বাঙালীদিগের একটি সম্মেলন হয়। শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই বাংলার আদি কবি ও অন্যতম প্রধান জনশিক্ষক মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থানকে তীর্থের ন্যায় পবিত্রজ্ঞানে শ্রদ্ধার সহিত দর্শন করা কর্তব্য। কৃত্তিবাসের স্মৃতি স্তম্ভের গাত্রে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে,—

"মহাকবি কৃত্তিবাসের
আবির্ভাব ১৪৪০ খৃষ্টাব্দ, মাঘমাস, শ্রীপঞ্চমী, রবিবার
হেথা দ্বিজোত্তম
আদি কবি বাঙ্গালার ভাষা রামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিলা জনম,
সুরভিত সুকবিত্বে ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে
হে পাথিক, সম্ভ্রমে প্রণম।
শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী কর্তৃক ভিত্তি স্থাপিত হইল।
২৭শে চৈত্র, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।"

হরিদাস ঠাকুরের ভজন-গোম্ফা, ফুলিয়া

সমাধি স্তম্ভের দক্ষিণদিকে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে একটি ভগ্ন ইষ্টক স্তূপ আছে। উহা কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চ নামে পরিচিত। আশপাশের জমি হইতে কৃত্তিবাসের জন্মভিটা অনেক উচ্চ। অনুমান হয় যে এই স্থান খনন করিলে অনেক অট্টালিকাদির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

কৃত্তিবাসের জন্মভিটার অতি নিকটে অবস্থিত হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠ ফুলিয়ার অন্যতম দ্রষ্টব্য। বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত আছে যে "যবন" হরিদাস বা ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর বেনাপোল পরিত্যাগ করিবার পর শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত মিলিত হন

এবং নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে গঙ্গাতীরে একটী "গোফা" বা মৃত্তিকা গাত্রে নির্ম্মিত কুটীরের মধ্যে ভজন সাধন করিতে থাকেন। মুসলমান হইয়া তিনি হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠান করায় কাজীর অভিযোগ অনুসারে মুলুকপতি বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে লোকজন দিয়া ধরিয়া লইয়া যান এবং বহু যুক্তিতর্কের দ্বারাও তাঁহাকে স্বমতে আনিতে সমর্থ না হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে একে একে বাইশ বাজারে লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত করিবার আদেশ দেন! সাধারণতঃ দুই তিন বাজারে মার খাইলেই লোকের জীবনান্ত হইত, কিন্তু ভক্ত শিরোমণি হরিদাস বাইশ বাজারে অতি গুরুতরভাবে প্রহৃত হইয়াও কোন রূপ দুঃখপ্রকাশ করিলেন না। যে সমস্ত লোক তাঁহাকে বিনাদোষে নির্য্যাতন করিতেছিল, তাহাদের অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া তিনি করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন,

ফুলিয়ার মঠের বিগ্রহ

"এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোরে দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥"

জগৎ-প্রেমিক যীশু খ্রীষ্টের পর এরূপ অপূর্ব্ব ক্ষমার আদর্শ জগতের ইতিহাসে আর দেখা যায় না। বৈষ্ণব জগতে ঠাকুর হরিদাসের স্থান অতি উচ্চে। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে "পৃথিবীর শিরোমণি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হরিদাসের অপূর্ব্ব প্রভাবের পরিচয় পাইয়া কাজী ও মুলুকপতির মন ফিরিয়া গেল। তাঁহারা তাঁহাকে যথেচ্ছ বিচরণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া সেই গোফার মধ্যে অবস্থান করতঃ প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম

গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ফুলিয়ার বিখ্যাত ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁহার অনুগত হইল। অনেকেই ধর্ম্মালোচনার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিতেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে হরিদাস ঠাকুরের গোফার মধ্যে এক বিষধর সর্প বাস করিত। হরিদাসের ভক্তগণ এই সর্পের বিষের জ্বালায় গোফার নিকটে আসিতে পারিতেন না, কিন্তু হরিদাস নিজে এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না বা তাঁহার কোন কষ্টবোধই হইত না। ভক্তগণের মুখে সর্পের বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি তাঁহাদের সুবিধার জন্য গোফা ত্যাগের উদ্যোগ করিলে সর্পই সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণের পর নীলাচল গমনের পথে শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বপ্রথম ফুলিয়ায় হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে আগমন করেন এবং নবদ্বীপ-বাসিগণ এই স্থানে আসিয়াই তাঁহার দর্শন লাভ করেন।

তরুকুঞ্জ-শোভিত হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠটি অতি শান্তরসাস্পদ স্থান। এখানে একটি মন্দির মধ্যে বলরাম, রেবতী, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার বিগ্রহ আছে। যে গোফায় বসিয়া হরিদাস ঠাকুর নাম জপ করিতেন, একটি বৃক্ষমূলে তাহার চিহ্ন আছে। মন্দিরের সম্মুখে একটি তুলসী বেদী ও কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সমাধি নামে পরিচিত অপর একটি বেদী আছে। এই মন্দিরটি জনসাধারণের নিকট "ফুলিয়ার মঠ" নামে পরিচিত। মঠমধ্যবর্ত্তী বিগ্রহ চতুষ্টয় দেখিতে অতি সুন্দর। এখানে প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমার সময় বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

শান্তিপুর—কলিকাতা হইতে ৫৮ মাইল দূর। ইহা একটি অতি প্রাচীন গ্রাম। এই স্থানটি কত প্রাচীন তাহা বলা কঠিন। প্রায় আট শত বৎসরের উপর হইতে শান্তিপুর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে শান্তিপুরের তিন দিক্ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, এখন কিন্তু গঙ্গা দূরে পশ্চিম দিকে সরিয়া গিয়াছে।

শান্তিপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে শান্ত নামক জনৈক মুনির বাস-স্থান ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম শান্তপুর বা শান্তিপুর হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে শান্তিপুর গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলিয়া অনেকে তাঁহাদের মৃতকল্প পিতামাতাকে সজ্ঞানে গঙ্গাতীরস্থ করিবার জন্য এখানে লইয়া আসিতেন। যাঁহারা দৈবাৎ রোগমুক্ত হইতেন তাঁহারা আর সংসারে ফিরিয়া না গিয়া এই স্থানেই শান্তিতে জীবন যাপন করিতেন। এইরূপ শান্তিপ্রিয় লোকদের লইয়া এই গ্রাম গঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম শান্তিপুর হয়।

শান্তিপুর বৈষ্ণবদিগের একটি শ্রীপাট। ইহার অন্তর্গত বাবলা গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈত আচার্য্যের পাটবাড়ী অবস্থিত। অদ্বৈত আচার্য্য শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় পরগণার নবগ্রাম নামক পল্লীতে ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কুবের আচার্য্য লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য অদ্বৈত শান্তিপুর আগমন করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কমলাক্ষ, অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহার উপাধি। শান্তিপুরের অন্তঃপাতী পূর্ণবাটী গ্রাম নিবাসী শান্ত

বদান্তবাগীশ নামক জনৈক অধ্যাপকের নিকট বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া তিনি বেদ পঞ্চানন" ও "অদ্বৈত আচার্য্য" উপাধি লাভ করেন। বিদ্যাশিক্ষান্তে অদ্বৈত াঙ্গাতীরবর্ত্তী শান্তিপুর গ্রামেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। বৈষ্ণবজগতে তিনি মহাবিষ্ণু
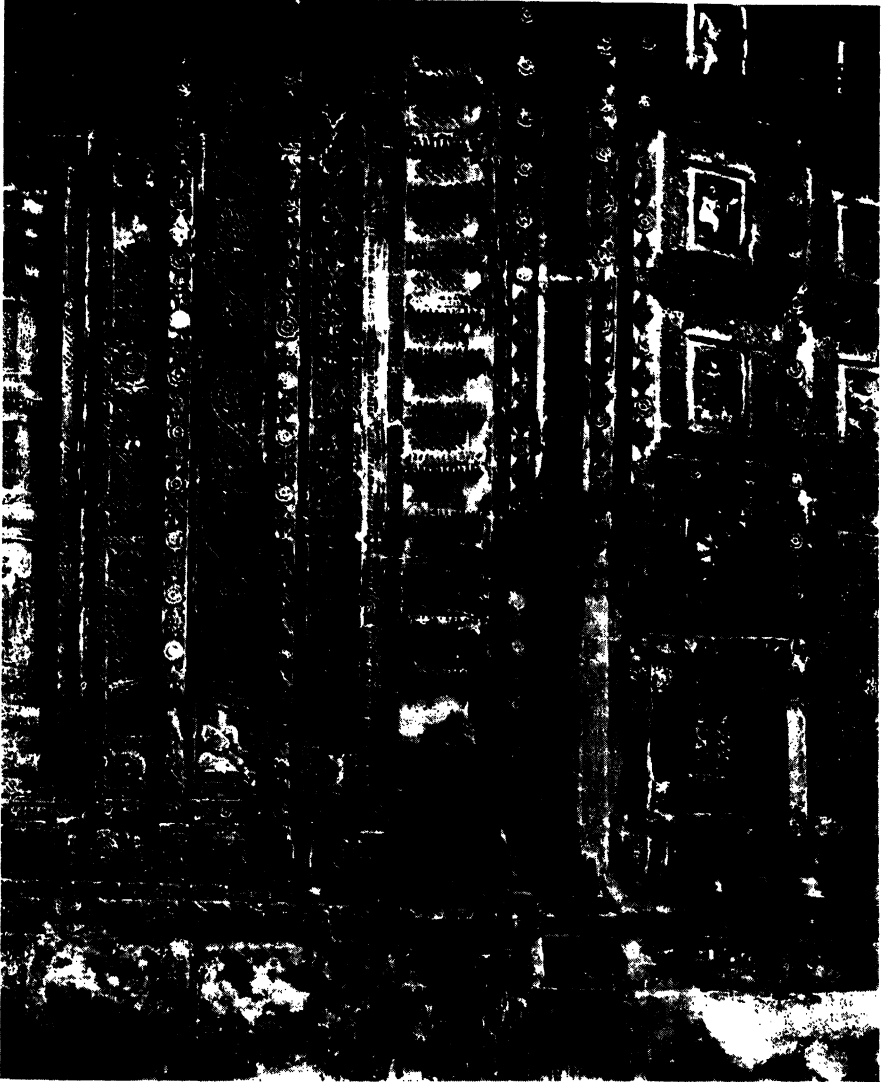
জলেশ্বর মন্দিরের কারুকার্য্য, শান্তিপুর

া শিবের অবতার রূপে পূজিত। তাঁহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়াই গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন, বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে

"অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।
সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার॥"

বৈষ্ণব জগতে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের পরেই অদ্বৈতাচার্য্যের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অদ্বৈতের বয়স যখন ৫২ বৎসর সেই সময়ে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। শ্রীচৈতন্যদেব বহুবার গণসহ শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। অদ্বৈত দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন। ১২৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শান্তিপুরেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার অনেক গুলি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দ আজন্ম সংসার বিরাগী ছিলেন।
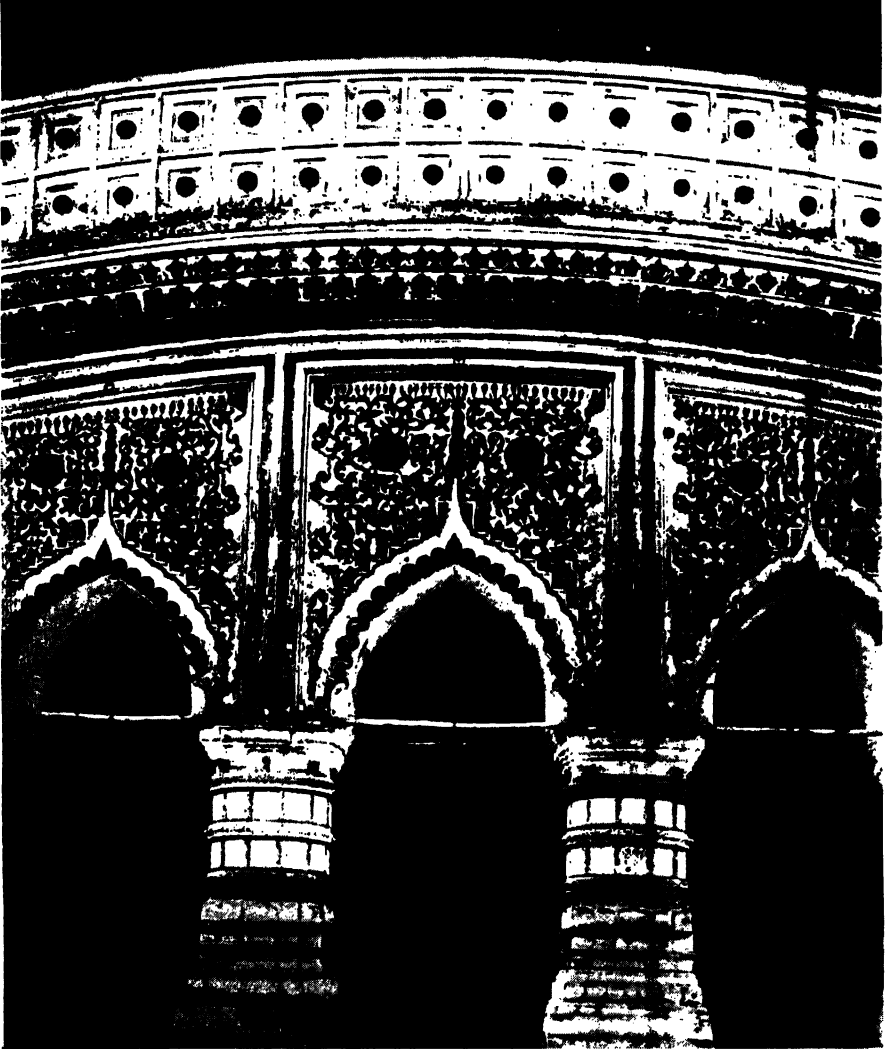
শ্যামচাঁদ মন্দিরের কারুকার্য্য—শান্তিপুর

অদ্বৈতের বংশধরগণ এখনও শান্তিপুরে বাস করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "অদ্বৈত প্রকাশ" প্রণেতা ঈশান নাগর ৫ বৎসর বয়স হইতে অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট শান্তিপুরে মানুষ হন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ৭০ বৎসর বয়সে আচার্য্য

পত্নী সীতাদেবীর আদেশে তিনি বিবাহ করেন। ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি অদ্বৈত প্রকাশ সমাপ্ত করেন এবং বৃদ্ধ বয়সে লাউড়ে যাইয়া ধর্ম্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। লাউড়-রাজ দিব্যসিংহ বৃদ্ধ বয়সে রাজ্যভার ছাড়িয়া শান্তিপুরে আসিয়া ধর্ম্মসাধনায় কাল যাপন করেন। তদবধি তিনি লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস নামে পরিচিত হন। তিনি অদ্বৈত আচার্য্যের "বাল্য লীলা" রচনা করেন এবং বিষ্ণুপুরী ঠাকুর কৃত সংস্কৃত কাব্য রত্নাবলীর বাংলা অনুবাদ করেন।
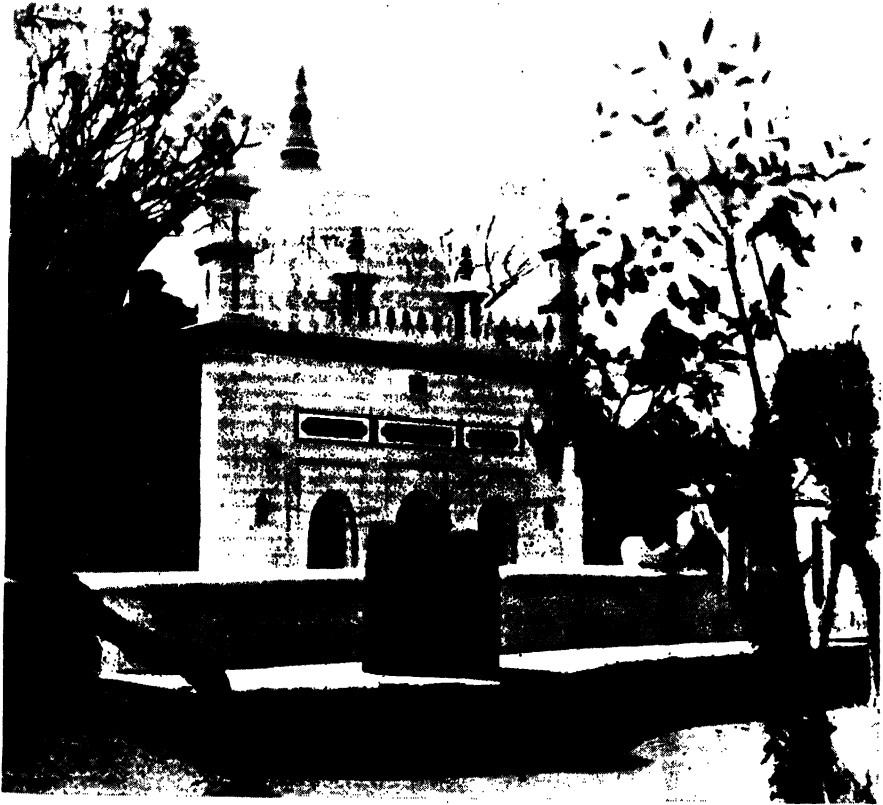
তোপখানা মস্‌জিদ, শান্তিপুর

শান্তিপুরে অনেক গুলি মন্দির ও দেববিগ্রহ আছে। মন্দিরগুলির মধ্যে শ্যামচাঁদ, গোকুলচাঁদ ও জলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরই সমধিক বিখ্যাত। শ্যামচাঁদের প্রকাণ্ড মন্দিরটি ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুর নিবাসী তন্তুবায়কুলোদ্ভব রামগোপাল খাঁ চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে খাঁ চৌধুরী

মহাশয় নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন এবং কথিত আছে নদীয়ার মহারাজকেও শান্তিপুরে আনিয়া এক লক্ষ টাকা নজর দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। গোকুলচাঁদের মন্দিরটি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত। জলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নদীয়ার মহারাজা রামকৃষ্ণের মাতা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির গুলি বাংলার শিল্পপদ্ধতি অনুসারে নির্ম্মিত এবং ইহাদের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। বিশেষতঃ জলেশ্বর মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ পৌরাণিক চিত্রাদির শিল্প চাতুর্য্য অতি চমৎকার। শান্তিপুরের বড় বাজারে সিদ্ধেশ্বরী কালী নামে এক প্রকাণ্ড কালীমূর্ত্তি আছে। এরূপ বড় বিগ্রহ সচরাচর দেখা যায় না। ইহা ছাড়া গোস্বামীদের নাট মন্দির ও পঞ্চরত্ন মন্দিরও দ্রষ্টব্য।

শান্তিপুরে অধিকাংশ পালাপার্ব্বণ বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তবে এখানকার রাসের উৎসবই দেশ বিখ্যাত। শান্তিপুরের ভাঙ্গা রাসের শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য বাংলার নানা স্থান, এমন কি সুদূর ত্রিপুরা ও মণিপুর হইতেও বহু যাত্রীর সমাগম হয়। রাস উৎসবের শেষ দিন গোস্বামিগণের গৃহস্থিত বিগ্রহগণকে চতুর্দ্দোলের উপর স্থাপন করিয়া এক সঙ্গে শোভাযাত্রা সহকারে নগর প্রদক্ষিণ করানো হয়। ইহারই নাম "ভাঙ্গা রাস"। এই মেলায় সুন্দর দেশীয় পুতুল প্রভৃতি লোক-শিল্পের নিদর্শন এখনও বিক্রীত হয়।

মুসলমান যুগেও শান্তিপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। পাঠান আমলে এই স্থানে একজন কাজী ছিলেন। বাদসাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ফৌজদার মহম্মদ ইয়ার খাঁ কর্ত্তৃক শান্তিপুরের তোপখানায় একটি সুদৃশ্য মসজিদ্ নির্ম্মিত হয়। ইহা শান্তিপুরের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু।

প্রাচীন কাল হইতেই শান্তিপুর বস্ত্র শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার প্রস্তুত সূক্ষ্ম বস্ত্র পাশ্চাত্য দেশ সমূহেও রপ্তানি হইত। ইংরেজ রাজত্বের গোড়ার দিকে এখানে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটি বড় কুঠি ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর কোম্পানি দেড় লক্ষ পাউণ্ড বা সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকার সূতির কাপড় প্রতিবর্ষে ক্রয় করিতেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ম্যানচেষ্টারের সস্তা কাপড় আসায় এই শিল্পের পতন আরম্ভ হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এখানকার কুঠির ধ্বংসাবশেষ নীলাম করিয়া বিক্রয় করা হয়। বর্ত্তমানেও শান্তিপুর বস্ত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

নবদ্বীপের ন্যায় শান্তিপুরও পূর্ব্বে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার পণ্ডিতবর্গের মধ্যে শ্রীরাম গোস্বামী, চন্দ্রশেখর বাচস্পতি ও রামনাথ তর্করত্ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক গোপালভাঁড় শান্তিপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার লোককে হাসাইবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার রসিকতা সম্বন্ধে বহু কাহিনী জনসমাজে প্রচলিত আছে। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে শান্তিপুরে আশানন্দ মুখোপাধ্যায় নামে একজন বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেরূপ সরল প্রকৃতি ও সহৃদয় ছিলেন, তাঁহার দেহেও তদ্রূপ অমিতশক্তি ছিল।

পন্নের উদ্ধারের জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। একবার অতিথিরূপে তিনি জনৈক নী গৃহস্থের বাটীতে রাত্রি যাপন করেন। গৃহস্বামীর বাটীতে হঠাৎ একদল ডাকাত

আশানন্দ ঢেঁকির স্মৃতিস্তম্ভ, শান্তিপুর

পড়ে। আশ্রয়দাতা গৃহস্বামীর এইরূপ অতর্কিত বিপদ দেখিয়া মহাবীর আশানন্দ হাতের কাছে অন্য কোনরূপ অস্ত্র না পাইয়া নিকটবর্ত্তী ঢেঁকিশালা হইতে একটি প্রকাণ্ড ঢেঁকি

লইয়া দস্যুদলের সম্মুখীন হন এবং বীর বিক্রমে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। এই অদ্ভুত কার্য্যের জন্য তিনি জনসমাজে আশানন্দ ঢেঁকি নামে পরিচিত হন। তাঁহার বীরত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বহু অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। কয়েক বৎসর হইল বীর আশানন্দের স্মৃতি রক্ষা কল্পে তদীয় বাসভবনে একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বজাতি প্রেমিক বাঙালী মাত্রেরই এই মহাবীরের স্মৃতিস্তম্ভমূলে শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত।

বর্ত্তমান যুগের অন্যতম মহাপুরুষ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুরের সুবিখ্যাত অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৫১ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং তজ্জন্য গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্র নাথ তাঁহাকে ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকের পদে নিযুক্ত করেন। একবার গয়ায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া বিজয়কৃষ্ণ একজন সিদ্ধ যোগী পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁহাকেই গুরুরূপে বরণ করেন। যোগীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ পুনরায় সনাতন হিন্দুধর্ম্মে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর তিনি গৈরিক বাস পরিধান করিলেন, জটাজুট রাখিলেন, মালা ধরিলেন এবং হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অলৌকিক যোগপ্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার জীবনী-লেখকগণ বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বহু শিষ্য প্রশিষ্য এখনও বর্ত্তমান আছেন। শেষ বয়সে বিজয়কৃষ্ণ পুরীধামে বাস করিতেন। সেখানে তিনি "জটিয়া বাবা" নামে পরিচিত হন। পুরীধামের নরেন্দ্র সরোবরের তীরে তাঁহার সমাধি ও মঠ বিরাজিত আছে।

শান্তিপুরবাসী হরিমোহন প্রামাণিক মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় "কোকিল দূতম" নামক কাব্য ও "কমলা করুণা বিলাসম্" নামক নাটক লিখিয়া যশস্বী হন।

পল্লীগ্রাম হইলেও শান্তিপুর একটি শহর বিশেষ। এখানে মিউনিসিপালিটি আছে। এখানকার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রিভার টমসন্ হল, শান্তিপুর সাহিত্য পরিষৎ, খোন্দকারদিগের স্থাপিত দাতব্য চিকিৎসালয়, গোস্বামীদের নাটমন্দির, পঞ্চরত্ন মন্দির ও মিউনিসিপ্যাল অফিস প্রভৃতি প্রধান।

শান্তিপুর হইয়া বড়মাপের লাইনের উপর অবস্থিত কৃষ্ণনগর দিয়া একটি লাইট রেলওয়ে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী নবদ্বীপঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। (কৃষ্ণনগর সিটি দ্রষ্টব্য)।

শান্তিপুরের নিকটস্থ অম্বিকা গ্রামে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গৌরীদাস পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চৈতন্যদেবের বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন; শ্রীচৈতন্যের নিজ হাতে লেখা একখানি গীতা ইঁহার নিকট রক্ষিত ছিল। অম্বিকাগ্রামে ইনি চৈতন্যদেবের একটি নিম কাঠের বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন।

শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী **বাগ আঁচড়া** গ্রামে বাগ্‌দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। কথিত আছে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক সাধক এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাগ আঁচড়ার পার্শ্ববর্ত্তী **ব্রহ্মশাসন** গ্রামে প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত একটি ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির আছে। চাঁদ রায় নামক জনৈক ব্যক্তি এই মন্দিরের

প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানের নাম চাঁদড়া বা চাঁদুড়া হইয়াছে। এই চাঁদ রায় কে ছিলেন তাহা জানা যায় নাই। প্রবাদ, তিনি নাকি দস্যুবৃত্তি করিতেন এবং পরে ব্রহ্মশাপে সবংশে বিনষ্ট হন। ব্রহ্মশাসন গ্রামের এই শিবমন্দিরটি এক সময়ে সমগ্র

চাঁদরায়ের শিব মন্দির, ব্রহ্মশাসন

নদীয়া জেলার গৌরব স্বরূপ ছিল। একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনের চারিদিকে চারিটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। উত্তর দিকের মন্দিরটি এখনও দণ্ডায়মান আছে। ইহার চূড়া

নাই, ইহার সম্মুখস্থ ভিত্তির গাত্রে নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। পূর্ব্বদিকের দ্বারের উপর প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে নিম্নলিখিত লিপিটি খোদিত আছেঃ—

চাঁদরায়ের মন্দিরের কারুকার্য্য, ব্রহ্মশাসন

"শ্রীশিবঃ

শাকে বারমতঙ্গবাণ হরিনাঙ্কে নাঙ্কিতে শঙ্করং
সংস্থাপ্যাশু সুধা সুধাকর কর ক্ষীরোদনীরোপমং
তস্মৈ সৌধমিদমুদা সুজলদানিলীনলোলধ্বজং
তৎপাদেরিত ধীর ধীরবিরতং শ্রীচাঁদরায় দদৌ॥

অর্থাৎ সতত স্থিরবুদ্ধি শ্রীচাঁদ রায় ১৮৫৭ শকে (১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) সুধাসুধাকর ও ক্ষীর সমুদ্রের নীর তুল্য নিবিড় মেঘ সংলগ্ন ধ্বজ যুক্ত এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া শঙ্করের পদে অর্পণ করিলেন।
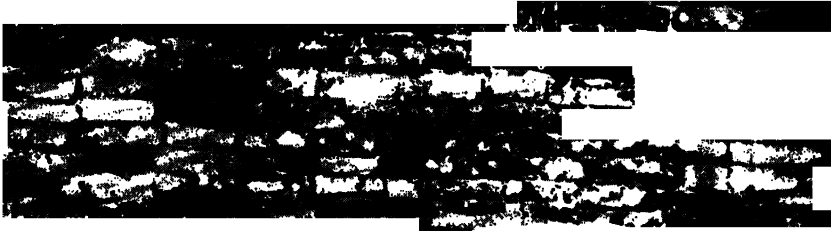
চাঁদরায়ের মন্দিরের শিলালিপি, ব্রহ্মশাসন

এই মন্দির গাত্রের কারুকার্য্যও অতি সুন্দর। দুঃখের বিষয়, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের দ্বারা এই মন্দিরটি যেরূপভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে তাহাতে অচিরকাল মধ্যে ইহার সংস্কার ও সংরক্ষণের কোনরূপ ব্যবস্থা না হইলে প্রাচীন শিল্পকলার এই সুন্দর নিদর্শনটি শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।

শান্তিপুর হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া এই মন্দির দেখিয়া আসিতে পারা যায়।

আড়ংঘাটা—কলিকাতা হইতে ৫৬ মাইল দূরে চূর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ কবিতা "দেবতার গ্রাসে" চূর্ণী নদী অমর হইয়া আছে। গঙ্গাসাগরের যাত্রীদল লইয়া নৌকা যখন ছাড়িয়া দিল তখন............

.........হেমন্তের প্রভাত শিশিরে
ছল ছল করে গ্রাম চূর্ণী নদীতীরে।

এখানে চূর্ণী নদীর তীরে যুগলকিশোর বিগ্রহের একটি মন্দির আছে। কথিত আছে, গঙ্গারাম দাস নামক জনৈক বৈষ্ণব বৃন্দাবন হইতে একটি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আনিয়া প্রথমে নবদ্বীপের নিকট সমুদ্রগড়ে স্থাপন করেন। বর্গির উপদ্রবের সময় গঙ্গারাম

যুগলকিশোরের মন্দির, আড়ংঘাটা

বিগ্রহটিকে লইয়া আড়ংঘাটায় চলিয়া আসেন। এখানে তাঁহার স্বদেশবাসী জনৈক বণিক তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। যুগলকিশোরের মন্দিরটি আনুমানিক ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। প্রথমে শুধু শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহেরই পূজা হইত। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটি রাধামূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে প্রতিষ্ঠা করিয়া উভয় বিগ্রহের "যুগল-কিশোর" নাম প্রদান করেন। যুগলকিশোরের সেবা নির্ব্বাহের জন্য তিনি বহু নিষ্কর ভূমিও দান করেন। কথিত আছে, একবার যুগল কিশোরের ধানের গোলা আগুনে পুড়িয়া গেলে রাণাঘাটের পালচৌধুরী বংশের আদিপুরুষ কৃষ্ণপান্তি অতি সামান্য মূল্যে ঐ গোলা ক্রয় করেন। কৃষ্ণপান্তির সৌভাগ্যবশতঃ গোলার ধান উপরের দিকেই

সামান্যমাত্র পুড়িয়াছিল, কিন্তু নীচেকার ধান বেশ ভালই ছিল। ঐ ধান বিক্রয় করিয়া কৃষ্ণপান্তি বিপুল অর্থলাভ করেন এবং উহা হইতেই তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যের সূত্রপাত হয়। প্রতিবৎসর সমস্ত জ্যৈষ্ঠমাস ধরিয়া আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরের মেলা হয়। মেলার যাত্রিগণের মধ্যে মহিলার সংখ্যাই অধিক। মহিলাদের মধ্যে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে জ্যৈষ্ঠমাসে যুগলকিশোরকে দর্শন করিলে ইহ বা পরজন্মে বৈধব্য ভোগ করিতে হয় না। যুগলকিশোরের মন্দিরের দক্ষিণে অপর একটি প্রাচীন মন্দিরে গোপীনাথজীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রবাদ, আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরের স্থাপনার পূর্ব্ব হইতেই এই বিগ্রহ এখানে বর্ত্তমান।
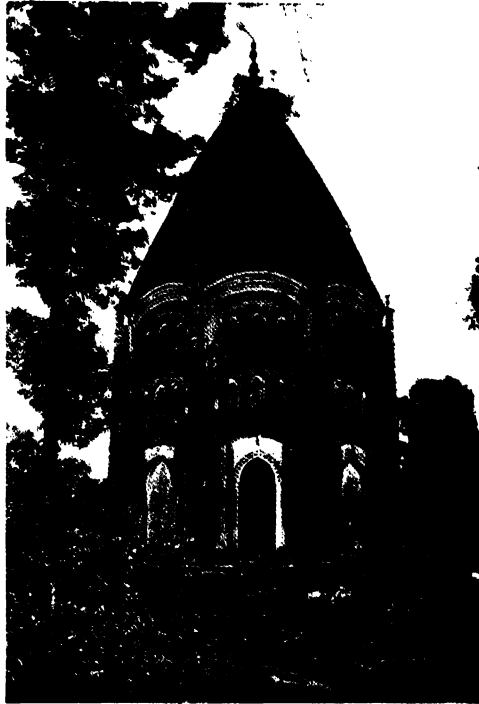
বুড়াশিবের মন্দির, শিবনিবাস (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

মাজদিয়া –কলিকাতা হইতে ৬৫ মাইল দূর। এই ষ্টেশনের পূর্ব্ব নাম ছিল শিবনিবাস। ষ্টেশন হইতে শিবনিবাস দুই মাইল দূর। শিবনিবাস মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, নসরত খাঁ নামক জনৈক দস্যুকে দমন করিবার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানে উপস্থিত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করেন। প্রাতঃকালে তিনি নদীতে মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময়ে একটি রোহিত মৎস্য জল হইতে লাফাইয়া তাঁহার কোলের উপর গিয়া পড়ে। ইহা দেখিয়া রাজজ্যোতিষী বলেন "মহারাজ! রাজভোগ্য রোহিত মৎস্য যখন আপনা হইতেই আপনার অঙ্কে লাফাইয়া পড়িয়াছে তখন এই স্থান রাজবাসের একান্ত উপযুক্ত, আপনি এখানে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করুন।" এই স্থানটির

তিন দিকে ইছামতী নদী প্রবাহিতা বলিয়া স্থানটি বেশ সুরক্ষিত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এখানে একটি নগর ও বহু দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার নাম রাখেন শিবনিবাস। তাঁহার সময়ে এখানে ১০৮টি শিবমন্দির ছিল, কিন্তু এখন তাহার তিনটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিশপ হিবর শিবনিবাসে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার লিখিত বৃত্তান্তে এই স্থানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি এখানে চারিটি অতি সুন্দর মন্দির দেখিয়াছিলেন এবং এখানকার পুরাতন রাজ বাড়ীর প্রবেশ দ্বারকে "গথিক" স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহার গঠন প্রণালী মস্‌কো নগরীর প্রসিদ্ধ ক্রেমলিন প্রাসাদের পবিত্র ফটকের ন্যায়, কিন্তু দেখিতে আরও অনেক সুন্দর। কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে শিবনিবাস কাশীতুল্য বিবেচিত হইত। সেই জন্য একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হইয়াছিল—

শিবনিবাস তুল্য কাশী ধন্য নদী কঙ্কনা।
উপরে বাজে দেব ঘড়ি নীচে বাজে ঠঠনা॥

বর্ত্তমানে এখানে বুড়াশিবের মন্দির ও রামচন্দ্রের মন্দির দ্রষ্টব্য বস্তু। বুড়াশিব নামে পরিচিত শিবলিঙ্গটি প্রায় ৯ ফুট উচ্চ। শিবরাত্রি, চড়ক ও ভৈমী একাদশীর সময় এখানে এখনও বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

মাজদিয়া স্টেশনের নিকটে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে মাথাভাঙ্গা নদী চূর্ণী ও ইছামতী ধারায় বিভক্ত হইয়াছে; চূর্ণী প্রধান লাইনের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। ইছামতী মাজদিয়া স্টেশনের দক্ষিণে প্রধান লাইনের নীচে দিয়া গিয়া নদীয়া, যশোহর, চব্বিশ পরগণা ও খুলনা জেলা দিয়া প্রবাহিতা হইয়াছে। ইহা একটি পুরাতন নদী; গঙ্গার প্রধান ধারা যখন ভাগীরথী পথে বহিত তখন ইহার উৎপত্তি হয় বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার কূলে স্থানে স্থানে পর্ত্তুগীজদিগের কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে ইহা ঢাকার পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্রে গিয়া পড়িত এবং এই সঙ্গমস্থলে বাংলার প্রাচীন রাজধানী রামপাল অবস্থিত ছিল। (পাবনা দ্রষ্টব্য)।

স্টেশনের দেড় মাইল দক্ষিণে **ভাজনঘাট** গ্রামে "রাই উন্মাদিনী" এবং "স্বপ্ন বিলাস" "বিচিত্র বিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যে পিতার সহিত বৃন্দাবনে থাকিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করেন এবং নবদ্বীপে আসিয়া পাঠ সমাপ্ত করেন। কবি শেষ বয়সে ঢাকায় বাস করিতেন। ইঁহার রচিত যাত্রার পালা পূর্ব্ববঙ্গে অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়াছিল। অনেকের মতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরে ইঁহার মত উচ্চদরের পদকর্ত্তা আর দৃষ্ট হয় না। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে চুঁচুড়ায় ইনি পরলোক গমন করেন।

মাজদিয়া স্টেশন হইতে এক মাইল পশ্চিমে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রাম; তাহার পাশেই ক্ষুদ্র গ্রাম নাথপুরে সুপ্রসিদ্ধ কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাসের পৈতৃক বাসস্থান। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রাণাঘাটে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করায় গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া ১৭ বৎসর বয়সে খালাসির কার্য্য লইয়া তিনি বিলাত গমন করেন, তথায় নানা কষ্টের পর একটি সার্কাসদলে যোগ দিয়া শেষে দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রেজিলে উপস্থিত হন। সেখানে

অবস্থানকালে ঐ দেশীয় একটি চিকিৎসক-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং ব্রেজিলের সেনাদলে যোগদান করেন। নিজ কার্য্যকুশলতায় তিনি অচিরে লেফট্‌ন্যাণ্ট পদে উন্নীত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিলে রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে তিনি সাধারণ তন্ত্রের পক্ষে বিশেষ সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন। সেজন্য বিদেশী হইয়াও কর্ণেল পদ প্রাপ্ত হন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ২২এ সেপ্টেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। এখনও তাঁহার বংশীয়গণ ব্রেজিলে বাস করিতেছেন।

মাজদিয়া স্টেশন হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী কোটচাঁদপুর পর্য্যন্ত রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট একটি মোটরবাস সার্ভিস আছে। কোটচাঁদপুর যশোহর জেলার একটি বিখ্যাত বাণিজ্য-স্থান। এক সময়ে ইহা দেশী চিনির কারবারের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

বাণপুর—কলিকাতা হইতে ৬৯ মাইল দূর। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী মাটীয়ারি গ্রামে কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রথম রাজধানী ছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাঘব এই স্থান হইতে বর্ত্তমান কৃষ্ণনগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। প্রাচীন রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ আজিও মাটিয়ারিতে দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, ভবানন্দ কাশীর অন্নপূর্ণামন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানে পীর মল্লিক গস্ নামক একজন মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। অম্বুবাচীর সময় পীরের মৃত্যুতিথি উপলক্ষে এখানে একটি বৃহৎ মেলা হয়।

মাটীয়ারি অতি প্রাচীন গ্রাম। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহল যাত্রার প্রসঙ্গে এই গ্রামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

দর্শনা—কলিকাতা হইতে ৭৫ মাইল। সম্প্রতি এখানে একটি প্রকাণ্ড চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে।

চুয়াডাঙ্গা—কলিকাতা হইতে ৮৪ মাইল দূর। স্টেশন হইতে চুয়াডাঙ্গা শহর প্রায় তিন মাইল দূর। ইহা নদীয়া জেলার একটি মহকুমা এবং ধান ও চাউলের একটি বিখ্যাত গঞ্জ। এই স্থান হইতে তুই মাইল পশ্চিমে উজিরপুর নামক গ্রামে একটি পুরাতন দীঘি ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে নামিয়া নদীয়া জেলার অন্যতম মহকুমা **মেহেরপুর** যাইতে হয়। চুয়াডাঙ্গা হইতে মেহেরপুর পশ্চিমদিকে অবস্থিত এবং মোটরবাস যোগে ১৮ মাইল দূর। স্টেশনের পশ্চিমে অল্প দূর যাইয়া মাথাভাঙ্গা নদী খেয়া নৌকায় পার হইতে হয়। ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত মেহেরপুর একটি প্রাচীন স্থান। কেহ কেহ বলেন যে, এই স্থানে মিহির ও খনার বাস ছিল এবং মিহিরের নাম হইতেই নাকি মিহিরপুর বা মেহেরপুর নাম হইয়াছে। মেহেরপুরের দর্শনীয় স্থানের মধ্যে বলরাম হাড়ীর আখড়া ও গোয়াল চৌধুরীদিগের মন্দিরাদি প্রধান।

বলরাম হাড়ী "বলরামভজা" নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সম্প্রদায় অনেকটা কর্ত্তভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ। এই সম্প্রদায়েও জাতিভেদ নাই। বলরামের শিষ্যগণ তাহাকে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। বলরাম প্রথম জীবনে জনৈক

ধনীর বাটীতে চৌকীদারের কার্য্য করিতেন। একবার মনিব কর্ত্তৃক চোর অপবাদ দেওয়ার ফলে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া যোগ সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। সাধনাবলে তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ভক্তগণের বিশ্বাস। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে বলরামের মৃত্যু হয়। মেহেরপুরের নিকট ভৈরব নদের তীরে তাঁহার সমাধির উপর নির্ম্মিত মঠ বহু দূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চৌধুরী উপাধিধারী গোপজাতীয় জমিদারগণ এক সময়ে মেহেরপুরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত বহু মন্দিরের মধ্যে একটি শিব ও একটি কালী-মন্দির আজিও বর্ত্তমান আছে। কথিত আছে, বর্গির আক্রমণে বাধা দিতে গিয়া এই বংশ সপরিবারে ধ্বংস হয়। মেহেরপুরের মিউনিসিপ্যাল অফিস প্রভৃতি ইমারত গোয়াল চৌধুরীদিগের বাটীর ভগ্নস্তূপের ইষ্টকের দ্বারা নির্ম্মিত।

মেহেরপুরের রসকদম্ব ও ক্ষীরের মিঠাই প্রসিদ্ধ।

আলমডাঙ্গা– কলিকাতা হইতে ৯৪ মাইল দূর। ইহা নদীয়া জেলার একটি বিখ্যাত গঞ্জ। নদীয়া জেলার উত্তরে জলাঙ্গীর উৎপত্তির প্রায় ১০ মাইল পূর্ব্বদিকে পদ্মা হইতে বাহির হইয়া মাথাভাঙ্গা নদী আলমডাঙ্গা স্টেশনের প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে আসিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে: কুমার নামে শাখাটি পূর্ব্বমুখে গিয়া আলমডাঙ্গা স্টেশনের কিছু উত্তরে লাইনের নীচে দিয়া গিয়া নদীয়া, যশোহর ও খুলনা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। অপর শাখাটি মাথাভাঙ্গা নামেই লাইনের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। এককালে গঙ্গার প্রধান ধারা মাথাভাঙ্গা দিয়া বহিত। (পাবনা দ্রষ্টব্য।) আলমডাঙ্গার ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে **গোস্বামী-দুর্গাপুর** নামক গ্রামে রাধারমণের একটি অতি পুরাতন মন্দির আছে। এখানে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি হইতে এক পক্ষ স্থায়ী একটি বৃহৎ মেলা হয়। কথিত আছে, পূর্ব্বে এই স্থানে গভীর জঙ্গল ছিল এবং সেই জঙ্গলের মধ্যে কমলাকান্ত গোস্বামী নামে একজন সুদর্শন তরুণ সন্ন্যাসী বাস করিতেন। একদিন একদল দস্যু স্থানান্তরে দস্যুবৃত্তি করিয়া এই বনের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। দ্রুতগতিতে ছুটিয়া আসার জন্য তাহারা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়ে এবং সম্মুখে সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট পানীয় জল চাহে। সন্ন্যাসী অদ্ভুত ক্ষমতাবলে স্বীয় ক্ষুদ্র কমণ্ডলু হইতে জল দিয়া সমগ্র দস্যুদলের পিপাসা নিবৃত্তি করেন। দস্যুদলের লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে একটি রাধারমণ (কৃষ্ণ) বিগ্রহ ছিল। সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহারা সেই বিগ্রহটি তাঁহাকে দান করে। সন্ন্যাসীও বিগ্রহটিকে যথাবিধি পূজা করিতে থাকেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে জয়দিয়ার রাজা মুকুটরায় স্বীয় তরুণী কন্যা দুর্গাবতীকে সঙ্গে লইয়া শিকারে বহির্গত হন এবং এই অরণ্য মধ্যে সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পান। তরুণ সন্ন্যাসীর সুন্দর মূর্ত্তি ও গাম্ভীর্য্য দর্শনে রাজা বিশেষ মুগ্ধ হন এবং রাজকন্যা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। সন্ন্যাসীও রাজকন্যার রূপ দর্শনে প্রীতি-লাভ করেন। রাজা উভয়ের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের বিবাহের আয়োজন করেন এবং এই অরণ্যমধ্যে একটি সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিয়া উহার নাম দেন গোস্বামী-দুর্গাপুর। গোস্বামী-দুর্গাপুরের বর্ত্তমান মন্দিরে যে শিলালিপি আছে তাহা হইতে জানা

যায় যে জয়দিয়ার রাজা মুকুটরায়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণরায় ১৫৯৬ শকাব্দে (১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে) রাধারমণের জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। জয়দিয়া গোস্বামী-দুর্গাপুর হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এবং বর্ত্তমানে ইহা যশোহর জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম মাত্র।

পোড়াদহ জংশন—কলিকাতা হইতে ১০৩ মাইল দূর। এই স্থানও নদীয়া জেলার একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান হইতে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের একটি শাখা লাইন ৫৪ মাইল দূরবর্ত্তী গোয়ালন্দে একেবারে পদ্মার ধার পর্য্যন্ত গিয়াছে। কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত সরাসরি গাড়ী যাতায়াত করে। এই শাখাপথে অবস্থিত কালুখালি জংশন ও পাঁচুরিয়া জংশন হইতে দুইটি শাখা যথাক্রমে ভাটিয়াপাড়া ঘাট ও ফরিদপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

-কলিকাতা হইতে ১১১ মাইল দূর। ইহা নদীয়া জেলার একটি মহকুমা। শহরটি গড়াই নদীর তীরে অবস্থিত ও একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। গড়াই নদী কুষ্টিয়ার অনতিদূরে পদ্মা হইতে উঠিয়াছে এবং দক্ষিণে যশোহর ও ফরিদপুর জেলার সীমা দিয়া গিয়া খুল্না জেলায় প্রবেশ করিয়া এই জেলা এবং বাখরগঞ্জ জেলার সীমা রক্ষা করিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। দক্ষিণে ইহা মধুমতী, বলেশ্বর এবং হরিণঘাটা নামে পরিচিত। এককালে গঙ্গার প্রধান ধারা গড়াই নদী দিয়া বহিত। কুষ্টিয়ার প্রায় দুই মাইল পূর্ব্বে গড়াই নদীর উপর একটি বড় সেতু আছে। সম্প্রতি ইহা নূতন করিয়া

গড়াই নদীর সেতু, কুষ্টিয়া

নির্ম্মিত হইয়াছে। কুষ্টিয়া শহরে মোহিনী মিল নামক বিখ্যাত কাপড়ের কল অবস্থিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খৃষ্টান মিশনারীগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি গির্জ্জা ও তৎসংলগ্ন সমাধিক্ষেত্র এখানকার অন্যতম দ্রষ্টব্য। কুষ্টিয়ায় ধান, চাউল, দাইল-কলাই, গুড় ও পাটের বিস্তৃত কারবার আছে। কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী লাহিনীপাড়া গ্রাম সুবিখ্যাত "বিষাদসিন্ধু" প্রণেতা মরহুম মীর মশারফ হোসেন সাহেবের জন্মস্থান।

কুমারখালি- কলিকাতা হইতে ১১৯ মাইল দূর। ইহাও গড়াই নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে এখানে একটি রেশম কুঠি ছিল। এই সময়ে নির্ম্মিত একটি কারখানা এখনও এখানে আছে। সেই সময়কার সাক্ষীস্বরূপ এখনও একটি ছোট গোরস্থান বর্ত্তমান আছে। কুমারখালি পূর্ব্বে পাবনা

জেলার অধীন ছিল এবং এখানে একটি মুনসেফী আদালত ছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইহা নদীয়া জেলার অধীন হওয়ার পর এই আদালত উঠিয়া যায়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে।

কুমারখালি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সাধক হরিনাথ মজুমদার বা কাঙাল হরিনাথের জন্মস্থান। কাঙাল হরিনাথের রচিত বাউলের গানগুলি এখনও জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত। কাঙাল হরিনাথের সাহিত্যশিষ্য সম্প্রতি পরলোকগত স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক রায় জলধর সেন বাহাদুরও কুমারখালির অধিবাসী ছিলেন।

কুমারখালি স্টেশন হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে পদ্মা ও গড়াই নদীর সঙ্গমস্থলের অতি নিকটে পদ্মার তীরে **শিলাইদহ** গ্রাম অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে এই গ্রাম বাংলাসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। এই স্থানে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদিগের একটি বড় কাছারি আছে। জমিদারীর কার্য্য দেখিবার জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ বহু সময় এই গ্রামে অবস্থান করিয়াছেন। তাঁহার বহু কবিতা ও অন্যান্য রচনা এই শিলাইদহে বসিয়া লেখা। বাংলা সাহিত্যানুরাগীদিগের নিকট এই গ্রাম একটি ক্ষুদ্র তীর্থস্বরূপ। অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে অদ্বিতীয় কবি ও আদর্শবাদী বলিয়া জানেন, কিন্তু তিনি যেরূপ দক্ষতা ও ঔদার্য্যের সহিত জমিদারীর কাজ চালাইয়াছেন তাহা শুনিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে ব্যবহারিক জীবনে তিনি কবিসুলভ অক্ষমতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাঁহার প্রতিভা যথার্থই বহুমুখী।

শিলাইদহে গোপীনাথদেবের বিগ্রহ বিরাজিত। স্নানযাত্রা উপলক্ষে এই স্থানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। এই স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি সুন্দর।

পাংশা—কলিকাতা হইতে ১৩১ মাইল দূরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র স্টেশন। ইহা ফরিদপুরের অন্তর্গত। স্টেশনের ৩ মাইল দক্ষিণে মালঞ্চি গ্রামে একটি সুবিস্তৃত ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা রাজা সীতারাম রায়ের গড় ছিল বলিয়া কথিত। পাংশার পূর্ব্বদিকে কালিকাপুরেও তাঁহার একটি গড় ছিল এবং ইহার নিকটে নবাব সৈন্যের সহিত তাঁহার একটি খণ্ডযুদ্ধ হইয়াছিল।

কালুখালি জংশন—কলিকাতা হইতে ১৩৬ মাইল দূর। কয়েক বৎসর হইল এখান হইতে ৪১ মাইল দূরবর্ত্তী **ভাটিয়াপাড়া ঘাট** পর্য্যন্ত একটি শাখা লাইন খোলা হইয়াছে। এই শাখাপথের **মধুখালি জংশন** হইতে অপর একটি শাখা ৭ মাইল দূরবর্ত্তী **কামারখালি ঘাট** পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথ দিয়া প্রচুর পরিমাণে পাটের আমদানি হয়।

এই শাখায় কালুখালি জংশন হইতে ৬ মাইল দূর **রামদিয়া** স্টেশন হইতে ২ মাইল পূর্ব্বদিকে খালকুলা গ্রাম প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও লেখক ৺বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জন্মস্থান। শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের বংশীয় এই গ্রামের জ্যোতির্ব্বিদগণ এককালে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামদিয়া স্টেশন হইতে চন্দনা নদী পার হইয়া ১ মাইল দক্ষিণে দক্ষিণবাড়ী গ্রামে এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধ পীর মনুমিঞা ও সনুমিঞার সমাধিস্থানে

হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে ভক্তি প্রদর্শন করেন। দক্ষিণবাড়ীর নিকটস্থ শেখ-আড়া গ্রামে পীর শাহ পালোয়ানের সমাধি আছে। ইঁহার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, ইনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন তাহার কবর পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ করিয়া দিতে। কিন্তু উহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া সাধারণ নিয়মানুসারে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ করিয়া সমাধি দেওয়া হয়। কিন্তু পরদিন প্রাতে দেখা যায় সমাধি ঘুরিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ হইয়াছে।

কালুখালি জংশন হইতে **বহরপুর** স্টেশন ৯ মাইল দূর; স্টেশনের ৩ মাইল পূর্ব্ব-দিকে বাণীবহ নামে একটি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। কথিত আছে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সময়ে সংগ্রামশাহ নামক একজন রাজপুতসেনা-নায়ক পর্তুগীজ প্রভৃতি জলদস্যু দমনের জন্য পদ্মা ও মেঘনার সঙ্গমস্থলে নূতন নাওয়ারা মহলের কর্ত্তা হইয়া আসেন। নাওয়ারা মহলের খরচের জন্য এবং পারিশ্রমিক হিসাবে বহু সম্পত্তি তিনি পাইয়াছিলেন। তিনি এদেশেই বিবাহ করিয়া থাকিয়া যান এবং তাঁহার বংশীয়গণ উত্তরাধিকারক্রমে নাওয়ারা মহলের কর্ত্তৃত্ব করিতেন। ইঁহারাই বাণীবহের নাওয়ারা চৌধুরী নামে পরিচিত হন। ইঁহারা একটি পুরাতন জমিদার বংশ। রাজা সীতারাম রায় নাওয়ারার বহু সম্পত্তি দখল করিয়া লইয়াছিলেন।

কালুখালি জংশন হইতে **আড়কান্দী** স্টেশন ১২ মাইল দূর। এইখানে চন্দনা নদীতীরে বাণীবহের "নাওয়ারা" চৌধুরীদের নৌকা নির্ম্মাণের প্রধান কারখানা ছিল।

কালুখালি জংশন হইতে প্রায় ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী **নলিয়া গ্রাম** স্টেশন। নলিয়াতে মাঘীপূর্ণিমার সময়ে একটি মেলা হয়। এই মেলায় লোক-শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ কিছু কিছু দ্রব্য বিক্রীত হয়।

কালুখালি জংশন হইতে **মধুখালি জংশন** ২০ মাইল দূর; স্টেশন হইতে ২ মাইল পশ্চিমে কোঁড়কদি এককালে পণ্ডিত প্রধান গ্রাম ছিল; এখানকার নৈয়ায়িক রামধন তর্কপঞ্চাননের খ্যাতি পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল। কোঁড়কদির সান্যালদিগের বাড়ীতে একবার একই রাত্রে ১০১ খানি কালীপূজা হইয়াছিল বলিয়া কথিত; ইহা হইতে গ্রামটির পুরাতন সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। মধুখালি জংশন হইতে পশ্চিমে প্রায় ৭ মাইল দূরে চন্দনা ও গড়াই নদীর সঙ্গমস্থলে **কামারখালি ঘাট** পর্য্যন্ত একটি শাখা লাইন গিয়াছে। মধুখালি ও কামারখালিঘাট এই অঞ্চলের বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

কালুখালি জংশন হইতে **বোয়ালমারি বাজার** স্টেশন ৩১ মাইল; বারসিয়া নদীর উপর ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। ইহার আধ মাইল পশ্চিমে ভূষণা থানা। ইহা একটি প্রাচীন ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। ভূষণার অধিপতি মুকুন্দরাম বারভূঁইয়া-দিগের অন্যতম ছিলেন। সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষদিকে অন্যান্য ভূঁইয়াদিগের সহিত ইনিও বিদ্রোহী হন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময়ে নবাব ইসমাইল খাঁ ভূষণাধিপতি মুকুন্দরামের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাঁহার সাহায্যে কোচহাজো বা কামরূপ অধিকার করেন। ইঁহার পুত্র সত্রাজিতের কথা খুলনা বাগেরহাটের পর সত্রাজিৎপুর প্রসঙ্গে বলা

হইয়াছে। বহু কাল হইতে ভূষণার বিবিধ প্রকারের সূক্ষ্ম বস্ত্র, কাগজ, গালা, মোম, তামা, পিতলকাঁসা প্রভৃতির দ্রব্যাদি এবং সোনারূপার কারুশিল্পের খ্যাতি ছিল। প্রাকারবেষ্টিত প্রাচীন ভূষণার জঙ্গলাকীর্ণ ভগ্নাবশেষের মধ্যে নানাস্থান বিভিন্ন বাজার নামে অভিহিত হয়। গোপীনাথজীউর আখড়া ও রণরঙ্গিণী দেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। ভূষণার খাসা নামক বস্ত্র বহুকাল হইতে খ্যাত। রামপ্রসাদের "বিদ্যাসুন্দরে" আছে।

বনাত মখ্‌মল পট্টু ভূষণাই খাসা,
বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তামাসা।

এককালে ভূষণা এঅঞ্চলে সভ্যতা ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। রাজা সীতারাম রায়ের উত্থানের সহিত ভূষণার বাণিজ্য ক্রমে মহম্মদপুরে চলিয়া যায় এবং ভূষণার পতন সুরু হয়। বোয়ালমারি বাজার স্টেশন হইতে পশ্চিমে বারাসিয়া ও গড়াইনদী পার হইয়া ৬ মাইল দূরে সীতারামের প্রাচীন রাজধানী মহম্মদপুর অবস্থিত। ("মহম্মদপুর" দ্রষ্টব্য)।

কালুখালি জংশন হইতে **ব্যাসপুর** স্টেশন প্রায় ৪১ মাইল দূর। স্টেশনের একটু উত্তরে কারণাপুর নামে ক্ষুদ্র একটি গ্রাম আছে; ইহা ক্ষুদ্র হইলেও বাঙ্গালীর নিকট পরিচিত হইবার দাবী রাখে। সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক ও বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রামের প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়বংশ হইতে উদ্ভূত। ব্যাসপুর স্টেশন হইতে প্রায় ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে মুকসুদপুর থানার অন্তর্গত খান্দারপাড়া একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামটি রামচন্দ্রপুর নামেও অভিহিত হয়। রজনীকান্ত স্মৃতিভূষণ, বিষ্ণুরাম কবিরাজ-চন্দ্র প্রভৃতি বহু পণ্ডিত এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিরাজ চন্দ্র মহাশয় কালিদাসের শৃঙ্গারতিলক কাব্যের নূতন এক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। খান্দারপাড়ের সেন কবিরাজবংশে বহু চিকিৎসক জন্মিয়াছেন; ইহাদের মধ্যে অভিরাম কবিরাজ মহাশয়ের "খান্দারপাড় সংগ্রহ" একখানি প্রসিদ্ধ চিকিৎসা গ্রন্থ সংগ্রহ। ইনি রাজা সীতারাম রায়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহারা বহু পুরুষ ধরিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য টোল চালাইয়াছিলেন। এইজন্য গ্রামটি সাধারণ্যে টোলা রামচন্দ্রপুর নামে অভিহিত হইত। সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺দ্বারিকনাথ সেন এই বংশের লোক ছিলেন। ভারতীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে পণ্ডিত দ্বারিকানাথ সেন কবিরত্ন মহাশয়ই প্রথম মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন।

এই শাখা লাইনের শেষ স্টেশন **ভাটিয়াপাড়া ঘাট** কালুখালি জংশন হইতে ৪২ মাইল দূর। ইহা বারাসিয়া ও মধুমতী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি বাণিজ্য প্রধান-স্থান। স্টেশন হইতে মধুমতী পার হইয়া প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে যশোহর জেলার অন্তর্গত লোহাগড়া গ্রামে ২০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর মজুমদার মহাশয় একটি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত জোড়বাংলা স্থাপন করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় সুদূর পল্লীগ্রামে এই মন্দির ইংরেজ অধিকারের বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইলেও ইহার তিনটি খিলানে ইংরেজের জাতীয় রাজচিহ্ন উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। যশোহরের সুসন্তান ৺রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার এই গ্রামে চন্দ্রশেখর মজুমদার মহাশয়ের বংশে জন্মলাভ করেন।

ভাটিয়াপাড়া ঘাট হইতে ৩।৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে মধুমতী পার হইয়া যশোর জেলার অন্তর্গত ইত্না একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামের রায় বংশের পূর্ব্বপুরুষ পরমানন্দ রায় ভূষণাধিপতি মুকুন্দরামের একজন সেনাপতি ছিলেন। ইঁহার পত্নী একটি অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ঘোষবংশের কন্যা বলিয়া মঠটি "ঘোষ-দুহিতার মঠ" নামে পরিচিত। মঠের ইষ্টকলিপি হইতে জানা যায় যে ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে "জগৎগুরু" শ্রীপতি নারায়ণের পরিতোষের জন্য ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজবাড়ী—কলিকাতা হইতে ১৪৬ মাইল দূর। গোয়ালন্দ মহকুমার সদর দপ্তর রাজবাড়ীতে অবস্থিত। স্টেশন হইতে ৪।৫ মাইল দক্ষিণে হমদমপুর একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহার এক অংশ মূলঘর নামে পরিচিত। এখানে প্রসিদ্ধ সরযূপারী-গ্রহবিপ্রবংশীয় আচার্য্যদিগের বাটীতে স্ফটিকনির্ম্মিত অতি মনোরম সূর্য্যমূর্ত্তি ও দামোদর নামক নারায়ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই বিগ্রহের সেবার জন্য পূর্ব্বে রাজা সীতারাম রায় ও নাটোর জমিদারগণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। মূলঘরে পূর্ব্বে সংস্কৃত চর্চ্চা ছিল। কথিত আছে রাজা সীতারামের সময়ে সরযূপারী গ্রহবিপ্রগণ প্রথম এতঅঞ্চলে আগমন করেন। ইঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। হমদমপুরের এক মাইল পশ্চিমে পাঁচথুপিও একটি প্রাচীন গ্রাম। পূর্ব্বে পাঁচথুপির কাছ দিয়া পদ্মা বহিত; এখনও মরাপদ্মার চিহ্ন নিকটে কিছু কিছু দৃষ্ট হয়। পাঁচথুপির উত্তরে রাধাগঞ্জ নামে তখন একটি বড় বন্দর ছিল এবং তথা হইতে মুঘল সৈন্যের যাতায়াতের জন্য রাজাপুর পর্য্যন্ত একটি চওড়া রাস্তা ছিল। উহা পল্টনের রাস্তা নামে অভিহিত হইত। বাণীবহের নাওয়ারা চৌধুরী-গণের আদিবাস পাঁচথুপিতে ছিল; তথা হইতে তাঁহারা বাণীবহে উঠিয়া যান।

পাঁচুরিয়া জংশন কলিকাতা হইতে ১৫১ মাইল দূর। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী **ফরিদপুর** পর্য্যন্ত গিয়াছে।

ফরিদপুর—কলিকাতা হইতে ১৬৬ মাইল দূর। জেলার সদর শহর ফরিদপুর মরাপদ্মা নামে একটি খালের উপর অবস্থিত। ইহার পূর্ব্ব দিকে মাদারতলা খাল ও পশ্চিমে ফরিদপুরের জোলা নামে আরও দুইটি খাল আছে। শহরের দক্ষিণ দিকে ঢোল সমুদ্র নামে একটি প্রকাণ্ড বিল আছে। বর্ষাকালে এই বিলের জল শহরের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছে। ফরিদ খাঁ নামক এক ফকিরের নাম হইতে ফরিদপুরের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া কথিত। ফরিদখাঁর দরগাহ কাছারীর উত্তরে দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে এই শহরের কমলাপুরপাড়ার উত্তর পশ্চিমে পদ্মা বহিত এবং তাহার নিকটে বনমধ্যে একটি ডাকাতের দলের আড্ডা ছিল। ইহার নেতৃত্ব করিত ছবদরা নামে একটি স্ত্রীলোক; এই ডাকাতের দল দমন করিবার জন্য প্রথমে এখানে মহকুমার প্রতিষ্ঠা হয়, এবং পরে ইহা জেলার সদরে পরিণত হইয়াছে।

ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজ নামে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ আছে। পরলোক-গত বিখ্যাত জননায়ক অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় ফরিদপুরের অধিবাসী ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল পুরাতন ফরিদপুর স্টেশনটির নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহার

নামানুসারে অম্বিকাপুর রাখা হইয়াছে এবং রেল লাইনকে বিস্তৃত করিয়া বর্ত্তমান ফরিদপুর স্টেশনের সৃষ্টি হইয়াছে। ফরিদপুরে জগদ্বন্ধু সুন্দর নামে একজন ভক্ত সাধক বাস করিতেন। তাঁহার সমাধি এখানকার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

গোয়ালন্দ—কলিকাতা হইতে ১৫৫ মাইল দূর। এই স্থানটি প্রবলস্রোতা পদ্মার তীরে অবস্থিত। পদ্মার ভাঙ্গনের জন্য শহর ও স্টেশন এক জায়গায় থাকিতে পারে না, প্রায়ই বৎসর বৎসর ইহার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এই জন্য এখানে ছোট ছোট কুটীর ভিন্ন বড় বাড়ী নির্ম্মিত হয় না। রেল স্টেশনের অফিস প্রভৃতি পদ্মার মধ্যে ভাসমান ফ্ল্যাটের উপর অবস্থিত। গোয়ালন্দ হইতে স্টীমার যোগে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের ঢাকা বিভাগের নারায়ণগঞ্জ স্টেশন ও আসাম বাংলা রেলপথের চাঁদপুর এবং বাংলার আরও বহু স্থানে যাওয়া যায়। গোয়ালন্দ হইতে সিরাজগঞ্জ ঘাট ও জগন্নাথগঞ্জ ঘাট হইয়া বাহাদুরাবাদ ঘাট পর্য্যন্ত দৈনিক স্টীমার যাতায়াত করে। গোয়ালন্দের ইলিশ মাছ ও তরমুজ খুব বিখ্যাত। বর্ষাকালে গোয়ালন্দ হইতে বহু পরিমাণে ইলিশ মাছ কলিকাতায় চালান আসে। গোয়ালন্দের নিকটবর্ত্তী পদ্মানদীর বাঁক সমূহে যত ইলিশ মাছ পড়ে, এত আর কোথাও দেখা যায় না। বর্ষাকালে ইলিশ মাছ ধরিবার জন্য এক এক স্থানে বহু জেলের নৌকার সমাবেশ হয় এবং কেবলমাত্র জেলেদের ও মহাজনদের নিকট জিনিষ পত্র বিক্রয় করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী চর গুলিতে অস্থায়ীভাবে এক একটি বড় বাজার বসে। গোয়ালন্দের নিকটস্থ পদ্মাতীরবর্ত্তী স্থান সমূহের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর।

হার্ডিং সেতু সংরক্ষণের বাঁধ

ভেড়ামারা জংশন—কলিকাতা হইতে ১১৫ মাইল দূর। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল এখানে "সর্ব্বানন্দ মঠ" নামে একটি মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মঠের সংলগ্ন একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আছে।

ভেড়ামারা হইতে একটি শাখা লাইন দামুকদিয়া হইয়া ৯ মাইল দূরবর্ত্তী **রায়তা** পর্য্যন্ত গিয়াছে। জগদ্বিখ্যাত হার্ডিং সেতু নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে দামুকদিয়া ঘাট হইতে

…য়া জাহাজ-যোগে যাত্রীদিগকে পদ্মা পার হইয়া সাঁড়া ঘাট স্টেশনে মাঝারি মাপের ট্রেণ ধরিতে হইত।

ভেড়ামারা স্টেশন অতিক্রম করিবার পর রেলের লাইন ক্রমশঃ উঁচু হইতে আরম্ভ করিয়াছে, লাইনের তুইদিকে বিল ও পদ্মা নদীর বিস্তৃত চরভূমির দৃশ্য। ইহার পর

হার্ডিং সেতু
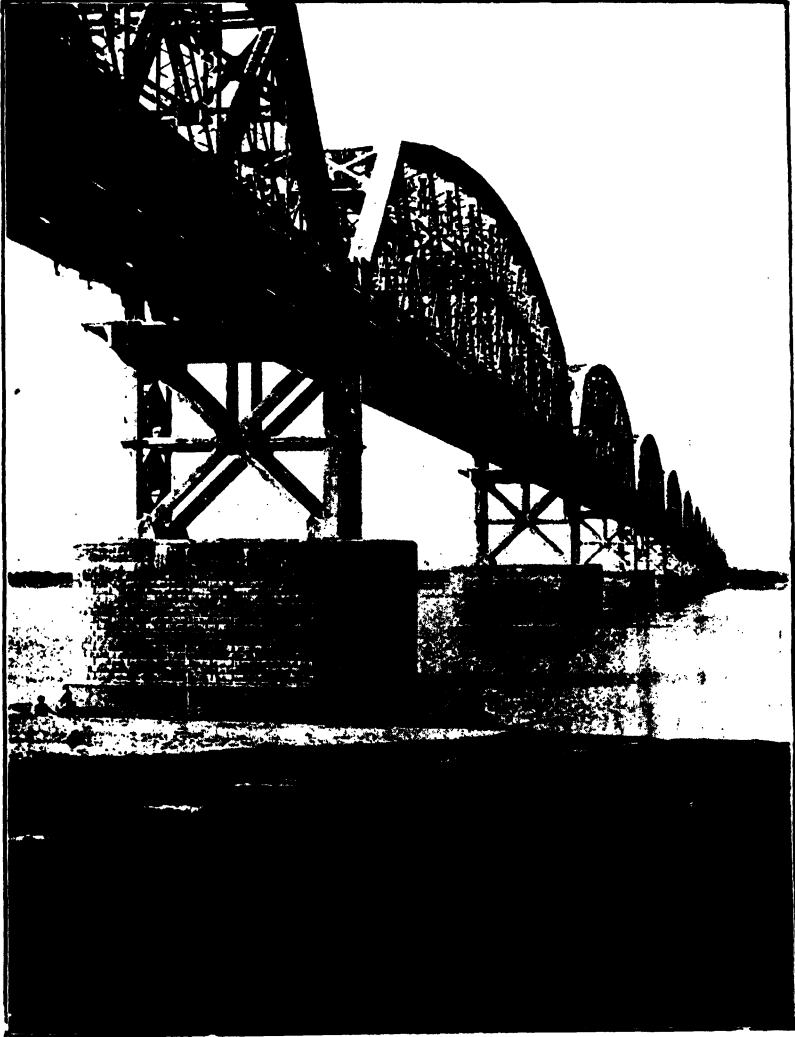
সুপ্রসিদ্ধ **হার্ডিং সেতু**। এই সেতু ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়। তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিংএর নামানুসারে ইহার নাম হয় "হার্ডিং সেতু"। ইহা পৃথিবীর দীর্ঘ রেলওয়ে সেতুগুলির অন্যতম। ইহার দৈর্ঘ্য ৫,৯০০ ফুট। পদ্মানদী প্রায়ই গতি পরিবর্ত্তন করে ও অনেক সময়ে অন্তঃসলিলারূপে প্রবাহিত হয়। এরূপ

চঞ্চল জলস্রোত পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। সুতরাং এই সেতু নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হইয়াছিল। পদ্মার প্রবল স্রোতে স্তম্ভগুলি যাহাতে অবিচলিত থাকিতে পারে তজ্জন্য ইহাদের কোন কোনটিকে নদীতল হইতে প্রায় ১৫০ ফুট নীচু হইতে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে। এই সেতু সংরক্ষণের জন্য পদ্মার উভয় তীর দিয়া প্রকাণ্ড পাথরের বাঁধ দিতে হইয়াছে এবং জলস্রোতের বেগ সংহত করিবার জন্য বহু পাশখাল খনন ও জলমধ্যে "পিরামিড" নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইয়াছে। ভারতের প্রধান প্রধান ইঞ্জিনীয়রগণকে লইয়া গঠিত একটি সমিতির পরামর্শক্রমে এই সেতু সংরক্ষণ করা হয়। এই সেতুটি সমগ্র জগতের মধ্যে স্থপতিবিদ্যার একটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্বরূপ পরিগণিত। সেতুর উপরে লোক চলাচলের পথ আছে। সেতুর উপর হইতে পদ্মানদীর দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। বর্ষাকালে যখন গৈরিক জলস্রোতসম্ভারে পদ্মার কলেবর অতিশয় পরিপুষ্ট হয়, তখনকার দৃশ্য যেরূপ ভীষণ সেইরূপই সুন্দর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তখন "কূল ছাড়ি নদী কলকল্লোলে এল পল্লীর কাছে রে।" এই বিপুল জলরাশির উপর দিয়া হল্‌দে ও কমলালেবু রঙের পাল তোলা নৌকাগুলির সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে ভাসিয়া যাওয়ার দৃশ্য অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয়।

যাঁহারা এই সেতু দেখিতে চান তাঁহাদিগের পক্ষে ভেড়ামারার পরবর্ত্তী স্টেশন পাক্‌শীতে নামাই সুবিধা। পাক্‌শী স্টেশন এই সেতুর ঠিক পার্শ্বেই অবস্থিত। পাক্‌শী হইতেই পাবনা জেলার সীমানা আরম্ভ। পদ্মাতীরবর্ত্তী স্থানগুলি বিশেষ স্বাস্থ্যকর। পাক্‌শীতে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের বিভাগীয় দপ্তর অবস্থিত এবং ইহা একটি প্রসিদ্ধ রেলওয়ে বসতি; এই বসতিতে যাইবার সুবিধার জন্য পরবর্ত্তী স্টেশন ঈশ্বরদি হইতে একটি সাইডিং আছে।

ঈশ্বরদি জংশন—কলিকাতা হইতে ১২৫ মাইল দূর। ইহা পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম ছিল, কিন্তু রেলের কল্যাণে বর্ত্তমানে একটি বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বরদি হইতে ২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে **সাঁড়া** গ্রাম। হার্ডিং সেতু নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ইহা পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের একটি প্রধান ঘাট স্টেশন ছিল। এখন মালগুদামের জন্য ঈশ্বরদি হইতে একটি সাইডিং আছে। বিহার হইতে আগত কয়েকটি পরিবার এখানে একপ্রকার মোটা কম্বল তৈয়ারী করে; পশমের জন্য ইহারা ভেড়া পুষিয়া থাকে। ঈশ্বরদি হইতে জেলার সদর শহর ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী **পাবনা** পর্য্যন্ত রেলওয়ে-সংশ্লিষ্ট মোটরবাস যাতায়াত করে। পাবনা শহর ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত এবং ইহার প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে গঙ্গা বা পদ্মা প্রবাহিতা। পদ্মার ভাঙ্গনের জন্য শহর রক্ষা করা অনেকবার উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। চার শত বৎসর পূর্ব্বেও গঙ্গা এই পথে বহিত না; ইহার প্রধান ধারা তখন ভাগীরথী দিয়াই চলিত, কিন্তু পলি পড়িয়া নদীতল উচ্চ হইয়া উঠিলে পর পর জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা, গড়াই প্রভৃতি দিয়া গঙ্গার প্রধান প্রবাহ বহিতে থাকে; এই রূপে নদী ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে চলিতে চলিতে বর্ত্তমান পদ্মার খাত খুঁজিয়া লয়। এইরূপ অনুমিত হয় যে গঙ্গার ক্রমশঃ পূর্ব্ব দিকে গমনের সহিত উত্তরে কোশী নদীর পশ্চিমাভিমুখে গমনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্বে কোশী মহানন্দার সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বে বহিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইত। পরে ইহারা গঙ্গার সহিত যুক্ত হয় এবং কোশী ক্রমশঃই

পশ্চিম দিকে হটিতে থাকে। ইছামতী পাবনার ঠিক নীচেই পদ্মা হইতে উঠিয়া জেলার দক্ষিণ দিকে বহিয়া বেরার নিকট হুরাসাগর নদীতে পড়িয়াছে। ইছামতী নামে নদী নদীয়া, যশোহর, খুলনা, চব্বিশ পরগণা, ঢাকা প্রভৃতি জেলায় দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ পূর্ব্বে এগুলি একই নদী ছিল।

পাবনা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বকালে এখানে "পবনা" নামে একজন দস্যুর আড্ডা ছিল, তাহার নাম হইতেই পাবনা নাম হইয়াছে। আবার কাহারও কাহারও মতে গঙ্গার পাবনী নামক পূর্ব্বগামিনী ধারা হইতেই "পাবনা" নাম হইয়াছে। পাবনা ছোট শহর। এখানে বহু পরিমাণে গেঞ্জী মোজা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানে এড্ওয়ার্ড কলেজ নামক একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটি টেক্নিক্যাল স্কুল আছে। এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে জোড়-বাংলা উল্লেখযোগ্য। ইহা শহরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে কালাচাঁদপাড়ায় অবস্থিত। এই মন্দিরের উপরিভাগ অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল প্রস্তর দিয়া মন্দিরটি নির্ম্মিত; ইহার প্রাচীরগাত্রে বহু দেবদেবীর চিত্র উৎকীর্ণ আছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পের ফলে এই মন্দিরের পাদপীঠ অনেকটা মৃত্তিকাগর্ভে বসিয়া গিয়াছে। কথিত আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রজমোহন ক্রোড়ী (ক্রোড় সংখ্যক দাম রাজস্ব আদায়কারী) নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। পাবনা শহরের অনতিদূরে হিমাইতপুর গ্রামে "সৎসঙ্গ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এখানে ধর্ম্ম শিক্ষার সহিত হাতে কলমে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও কুটীর শিল্প প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর অনুকূলের জন্মোৎসব উপলক্ষে এখানে বহু লোকের সমাগম হয়। এখানে একটি অতিথিশালা আছে। পাবনা শহরের ১২ মাইল পূর্ব্বদিকে তাঁতীবন্দের চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণ এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ।

ঈশ্বরদি জংশন হইতে একটি শাখা লাইন ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী সিরাজগঞ্জ ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। বর্ত্তমানে আসাম বাংলা রেলপথের আশুগঞ্জ ও ভৈরববাজারের মধ্যে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত হওয়ায় সিরাজগঞ্জ ঘাট, জগন্নাথগঞ্জ ঘাট ও ময়মনসিংহ হইয়া অল্প সময়ে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

এই শাখা পথে চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, উল্লাপাড়া ও সিরাজগঞ্জ (বাজার ও ঘাট) উল্লেখযোগ্য স্টেশন।

চাটমোহর—ঈশ্বরদি হইতে চাটমোহর ১৬ মাইল দূর। ইহা বড়াল নদীর তীরে অবস্থিত এবং পাবনা জেলার একটি বাণিজ্য-কেন্দ্র। বড়াল রাজশাহী জেলার চারঘাটের নিকটে পদ্মা হইতে উঠিয়া শাহজাদপুরের দক্ষিণে হুরাসাগরে পতিত হইয়াছে। চাটমোহরে একটি প্রাচীন মস্‌জিদ আছে। এই মস্‌জিদের উৎকীর্ণলিপি হইতে জানা যায় যে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে তুই মহম্মদ খাঁ কাকৃশালের পুত্র সুলতান মাসুম খাঁ কাবুলি কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। এই মস্‌জিদের প্রস্তর গাত্রে বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। তুর্কি জাতির এক শাখা কাক্‌শাল নামে পরিচিত ছিল। উত্তর বঙ্গে বিশেষতঃ দিনাজপুর জেলায় ইহাদের বহু জায়গীর ছিল। নিষ্কর জায়গীর উঠাইয়া লওয়ায় এবং ইসলাম ধর্ম্মের উপর সম্রাট আকবরের তাদৃশ নিষ্ঠা ছিল না মনে করিয়া

কাক্‌শালগণ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহে মাসুম খাঁ নেতৃত্ব করেন। বাদশাহী সেনাদলকে ইহাতে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। পরে মাসুম খাঁ কাবুলি সোণার গাঁ-এর ঈশা খাঁর সহিত যোগদান করেন; কিন্তু অবশেষে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ভাওয়ালের নিকট বাদশাহী ফৌজের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। কথিত আছে মাসুম খাঁ চাটমোহরে একটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করান। ইহার উত্তর তীরে নাকি তাঁহার বাসভবন ছিল। যে স্থানে তাঁহার পাঠান সৈন্যগণ বাস করিত আজিও উহা পাঠানপাড়া নামে পরিচিত।

চাটমোহর হইতে ৮।৯ মাইল উত্তর পূর্ব্বে হাণ্ডিয়াল বা **হাঁড়িয়াল** একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। এককালে ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। রেশম এবং সুতীর কাপড় ক্রয় করিবার জন্য ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটি কুঠি বহুদিন ধরিয়া এখানে ছিল। এখানকার জগন্নাথ দেবের একটি প্রাচীন মন্দিরের উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে ভবানী দাস নামক এক ব্যক্তি ইহার সংস্কার করিয়াছিলেন। ইহার নিকটেই রাজসাহী এবং পাবনা জেলার সীমান্তে অবস্থিত সুবিশাল **চলন বিল**। বর্ত্তমানে ইহার বিস্তৃতি ১৪০ বর্গমাইল; পূর্ব্বে ইহার বর্গফল ৪২১ মাইল ছিল বলিয়া কথিত; পলি পড়িয়া ইহা দ্রুত ভরিয়া আসিতেছে। আত্রাই নদী এই বিলে আসিয়া পড়ে; এবং ক্ষুদ্র নদী গুমাণী হইয়া বড়াল ও হুরাসাগর নদীপথে ইহার জল ব্রহ্মপুত্র বা যমুনায় পতিত হয়। পুরাতন মন্দির, পুষ্করিণী ও বাড়ী ঘর হইতে ধারণা হয় চলন বিলের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল পূর্ব্বে বেশ সমৃদ্ধ ছিল। হাঁড়িয়ালের ৩।৪ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে সমাজ নামক স্থানে বহু পুরাতন পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। কথিত আছে এই স্থানে মুঘলদিগের একটি কাছারী ছিল এবং নিকটস্থ মরীচপুরান গ্রামে একটি সৈন্যের ঘাঁটী ছিল। সমাজের এক মাইল উত্তরে শীতলাই গ্রামের জমিদারগণ এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ।

হাঁড়িয়ালের ১০ মাইল উত্তরে চাটমোহর হইতে প্রায় ১৯ মাইল দূরে তাড়াশ গ্রাম অবস্থিত। এখানকার রায় উপাধিধারী জমিদারগণও প্রসিদ্ধ। তাড়াশে বহু মন্দির আছে। ইহার মধ্যে একটি শিবমন্দিরের উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ইহা নারায়ণদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ১৭১১ খৃষ্টাব্দে বলরাম দাস কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছিল।

ভাঙ্গুড়া—ঈশ্বরদি হইতে ২২ মাইল দূর। এখান হইতে বহু পরিমাণ মৎস্য ও পাট কলিকাতায় রপ্তানি হয়। স্টেশনের পরেই বড়াল নদী লাইন পার হইয়া দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গুড়া হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তরে অষ্টমনীষা গ্রাম এক কালে সমৃদ্ধ ছিল এবং এখানে বহু মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

উল্লাপাড়া—ঈশ্বরদি হইতে ৩৬ মাইল দূরে ফুলঝুর নদীর তীরে অবস্থিত। করতোয়া নদী বগুড়া জেলার দক্ষিণে হলহলিয়ার সহিত মিলিত হইবার পর ফুলঝুর নামে অভিহিত হয় এবং উল্লাপাড়ায় সিরাজগঞ্জ লাইন পার হইয়া প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণে হুরাসাগর নদে পতিত হয়। উল্লাপাড়া পাটের ব্যবসায়ের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। এখান

...তেও বহু পরিমাণ মৎস্য কলিকাতায় রপ্তানি হয়। ইহা শাহজাদপুরে যাইবার স্টেশন। **শাহজাদপুর** উল্লাপাড়া হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে হুরাসাগরের তীরে অবস্থিত একটি পুরাতন নগর। এখানে মখ্‌দুম শাহ্‌-দৌলা নামক মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। মখ্‌দুমশাহ্‌ আরব দেশের যমনের রাজপুত্র। কথিত আছে, তিনি পিতার অনুমতি লইয়া ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করেন। পাবনা জেলায় শাহজাদপুরের দুই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পোতাজিয়ায় পৌঁছিলে তাঁহার জাহাজ ডাঙ্গায় লাগিয়া যায়। মখ্‌দুম শাহ্‌-দৌলা একটি চরে আবাস স্থাপন করেন। মখ্‌দুম শাহ্‌-দৌলার সহিত তাঁহার ভগিনী, তিনজন ভাগিনেয়, দ্বাদশ জন 'দরবেশ' এবং বহু সাঙ্গোপাঙ্গ আসিয়াছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে আগন্তুকদিগের সহিত তৎকালের হিন্দুরাজার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ক্রমে যুদ্ধ বাধে। প্রথম দুইটি যুদ্ধে মখ্‌দুম শাহের দল জয়ী হন; তৃতীয় যুদ্ধে তাঁহারা হারিয়া যান এবং শাগজাদা নিহত হন। তাঁহার ভগিনী অপমানের ভয়ে জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এখনও লোকে "সতী বিবির খাল" দেখাইয়া সেই ঘটনা স্মরণ করে। এখানে মখ্‌দুম শাহ তাঁহার ভাগিনেয়ত্রয় এবং সহচর দ্বাদশজন দরবেশের সমাধি ব্যতীত পরববর্ত্তী কালের আরও কয়েকজন আউলিয়ার সমাধি আছে। শেষোক্তদের মধ্যে শাহ হবিবুল্লার আস্তানায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই অর্ঘ্য প্রদান করেন এবং শাহ মস্তানের আস্তানা হইতে নাকি অন্ধকার রাত্রে মধ্যে মধ্যে এক ঝলক অত্যুজ্জ্বল আলোক আকাশের দিকে উঠিতে দেখা যায়। এখনে শাহজাদা মখদুম শাহের প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্দর পুরাতন মসজিদ আছে। মখ্‌দুমশাহ্‌দৌলা আরবদেশের রাজপুত্র বা শাহজাদা ছিলেন বলিয়া স্থানটির নাম শাহজাদপুর হইয়াছে। মসজিদটি ইষ্টক নির্ম্মিত এবং ৫২ ফুট লম্বা ও ৩১ ফুট চওড়া, ইহার ভিতরে ২৮টি কালো পাথরের থাম আছে। ইহার মধ্যে একটি থামের রং অপরগুলি হইতে কিছু বিভিন্ন। এতঞ্চলে লোকের বিশ্বাস এই থামটিকে জড়াইয়া ধরিলে সন্তানহীনা নারী সন্তান লাভ করেন। মসজিদ ও কবরগুলির খরচের জন্য ৭১২ বিঘা নিষ্কর জমি আছে। বৈশাখ মাসে এখানে একটি বড় মেলা হয়। হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে বহু লোক ইহাতে যোগদান করেন। এই মেলায় টাট্টু ঘোড়া বিক্রয় হয়। এই মেলায় সুন্দর পুতুল প্রভৃতি লোকশিল্পের নিদর্শনস্বরূপ কিছু কিছু জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়।

পোতাজিয়ায় একটি পুরাতন ও ভগ্নপ্রায় নবরত্ন মন্দির আছে। কথিত আছে, যে ইহার চূড়া অত্যন্ত উচ্চ ছিল এবং বহুদূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত; জনৈক নবাবের আদেশে ইহার উপরের দুইটি তলা নাকি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁহাদের জমিদারী নিজে দেখাশুনা করিতেন, সে সময়ে তিনি মধ্যে মধ্যে শাহজাদপুরে আসিয়া অবস্থান করিতেন। তাঁহার "ছিন্নপত্রের" কয়েকটি পত্র এই স্থান হইতে লেখা।

শাহাজাদপুর হইতে ৬।৭ মাইল দক্ষিণে ইছামতী বড়াল ও হুরাসাগরের সঙ্গমস্থলে মথুরা থানার অন্তর্গত পাবনার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র **বেরা** অবস্থিত। ইহা পাটের একটি

প্রসিদ্ধ গঞ্জ। ইহার কিছু নীচে হুরাসাগর যমুনা বা ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। হুরাসাগরের উৎসও যমুনা হইতে, সিরাজগঞ্জের কিছু নীচে।

চাটমোহর, উল্লাপাড়া ও শাহজাদপুরের নিকটস্থ বিল হইতে শীতকালে ছোট ছোট এক রকম মুক্তা পাওয়া যায়। অল্প দামে কলিকাতা ও বগুড়ায় ইহা বিক্রয় হয়।

সিরাজগঞ্জ বাজার—ঈশ্বরদি হইতে ৫০ মাইল ও কলিকাতা হইতে ১৭৫ মাইল দূর। ইহা পাবনা জেলার মহকুমা এবং বাংলাদেশের একটি প্রধান বন্দর। যমুনা বা ব্রহ্মপুত্রকূলে অবস্থিত ইহা একটি আধুনিক গঞ্জ। সিরাজ আলি নামক একজন জমিদার ইহার পত্তন করেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে সিরাজগঞ্জ। সিরাজগঞ্জ ঘাট স্টেশন হইতে স্টীমারযোগে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের ঢাকা বিভাগের জগন্নাথগঞ্জ স্টেশন হইতে মাঝারি মাপের রেলপথ ধরিয়া ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। সিরাজগঞ্জ গত ৫০ বৎসরের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড নগর হইয়া উঠিয়াছে। এক নারায়ণগঞ্জ ব্যতীত বাংলাদেশে এত বড় আভ্যন্তরীন বন্দর এখন আর নাই। অবশ্য কলিকাতা ও চট্টগ্রামের কথা স্বতন্ত্র, কারণ এই দুইস্থানে সমুদ্রগামী জাহাজ আসিয়া থাকে। এখান হইতে প্রতিবৎসর রেল বা স্টীমারযোগে লক্ষ লক্ষ টাকার পাট চালান যায়। যমুনা বা নূতন ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্ত্তন হওয়ায় সিরাজগঞ্জ শহরটি অতি দ্রুত ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। সম্প্রতি স্থানীয় লোক ও বাংলা সরকারের প্রচেষ্টায় ভাঙ্গনের প্রসার রোধ করা হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের এই খাতটি নূতন। পূর্ব্বে ইহা গারো পাহাড়ের নীচে দিয়া ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভৈরববাজারের নীচে মেঘনায় পড়িত। এই পুরাতন খাতটি মজিয়া আসিতেছে। পলি পড়িয়া নদীর খাত উচ্চ হইতে থাকিলে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিস্তার প্রসিদ্ধ খাতের পর ব্রহ্মপুত্র পুরাতন খাত ছাড়িয়া রংপুর, বগুড়া, ও পাবনা জেলার পূর্ব্বদিক দিয়া যমুনা নদীর খাতে বহিয়া গঙ্গার সহিত যুক্ত হয়। পূর্ব্বে তিস্তা দক্ষিণে গঙ্গা বা পদ্মায় পড়িত, কিন্তু বন্যার পরে পূর্ব্বদিকে হটিয়া যমুনা বা ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়। গঙ্গার ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে গমনের ন্যায় ব্রহ্মপুত্র ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে আসিতেছে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা চট্টগ্রাম বন্দরের নিকট সমুদ্রে মিলিত হইত। ইহার পর ভৈরববাজারের নীচে দিয়া মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া বহিতে থাকে। তাহার পর ঢাকা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পর পর ধলেশ্বরী ও যমুনার খাত বাছিয়া লইয়াছে।

১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জ মহকুমার ইউসুফশাহী পরগণায় জমিদারগণের খাজনা এবং সেস্ প্রভৃতি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রজাগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও বিদ্রোহী হয়। তাহাদের নেতা ঈশান রায় বিদ্রোহীর রাজা নামে অভিহিত হয়। এই আন্দোলন ক্রমে পাবনা জেলার অন্যত্র এবং পার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে। গভর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতায় এবং ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে এই হাঙ্গামা চাপা পড়িয়া যায়। ইহা হইতেই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের প্রজাস্বত্ব আইনের সূত্রপাত হয়।

গোপালপুর—কলিকাতা হইতে ১৩২ মাইল। এখানে একটি প্রকাণ্ড চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে।

আবদুলপুর জংশন—কলিকাতা হইতে ১৩৬ মাইল দূর। এই স্থান হইতে একটি শাখা লাইন রাজশাহী ও গোদাগাড়ী-কাটিহার শাখার আমনুরা জংশন হইয়া মালদহ জেলার চাপাই-নবাবগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখা পথে নন্দনগাছি সরদা রোড, রাজশাহী, খেতুর রোড ও চাপাই-নবাবগঞ্জ উল্লেখযোগ্য স্টেশন। ঈশ্বরদি জংশন হইতে চাপাই-নবাবগঞ্জ পর্য্যন্ত সরাসরি গাড়ী যাতায়াত করে।

নন্দনগাছি—আবদুলপুর জংশন হইতে ১১ মাইল। এখান হইতে ৪ মাইল উত্তরে **পুঁটিয়া** অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের বাস। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ বৎসাচার্য্য খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে পুঁটিয়ার নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে ধর্ম্মসাধনায় লিপ্ত থাকেন; তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান এবং সাধু চরিত্রের কথা চারিদিকে খ্যাত ছিল। আকবরের সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ যখন পাঠান সর্দ্দারগণকে দমন করিবার জন্য এ অঞ্চলে আগমন করেন তখন তিনি বৎসাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া পাঠান জায়গীরদার লস্কর খাঁর জমিদারী তাঁহাকে অর্পণ করিতে চাহেন। বৎসাচার্য্য ইহা প্রত্যাখ্যান করিলে মানসিংহ তাঁহার পুত্র পীতাম্বরকে ইহা অর্পণ করেন। পীতাম্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নীলাম্বর এই জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে রাজা উপাধি লাভ করেন। এই জমিদারী এখন পাঁচ আনা, চার আনা, এক আনী প্রভৃতি কয়েকটি তরফে বিভক্ত।

জমিদারগণের প্রতিষ্ঠিত শিবসাগর নামক সুন্দর একটি পুষ্করিণীর তীরে ভুবনেশ্বর মহাদেবের একটি চমৎকার সুউচ্চ পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। গোবিন্দ সরোবর নামক আর একটি জলাশয়ের ধারে দোলমণ্ডপ এবং ইহার সম্মুখে পাঁচ আনী রাজবাটীতে গোবিন্দদেবের সুন্দর কারুকার্য্যখচিত ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির আছে।

পুঁটিয়ার মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী দান এবং পুণ্যকার্য্যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন; ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারের নিকট হইতে মহারাণী উপাধি লাভ করেন।

পুঁটিয়ার ১২ মাইল উত্তরে **তাহিরপুর গ্রামে** আর একটি অতি প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। নাটোর স্টেশন হইতেও তাহিরপুর যাওয়া যায়। সেখান হইতেও এইস্থান প্রায় ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, তবে পথে একটি খেয়া পার হইতে হয়। কথিত আছে, তাহিরপুর জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কামদেব ভট্ট খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে একজন পাঠান জায়গীরদারকে পরাজিত করিয়া তাঁহার সম্পত্তি অধিকার করেন। কামদেব ভট্টের বংশীয়গণের মধ্যে রাজা কংসনারায়ণই সর্ব্বপ্রধান। ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এ অঞ্চলে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি মগদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন এবং বারভুঁইয়াদের অন্যতম ছিলেন বলিয়া কথিত। তাঁহার পিতামহ উদয়নারায়ণ প্রসিদ্ধ রাজা গণেশের সময়ে রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। কংসনারায়ণ বাংলায় আধুনিকালের দুর্গোৎসবের প্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে বৃদ্ধ বয়সে রাজা কংসনারায়ণ একটি মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিবার মনস্থ করিলে তখনকার দিনে

পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন যে তিনি সামন্তরাজা বিধায় বিশ্বজিৎ ও রাজসূয় যজ্ঞ করিবার অধিকারী নহেন এবং কলিতে অশ্বমেধ বা গোমেধ যজ্ঞও নিষিদ্ধ। সে জন্য তাঁহারা কংসনারায়ণকে রামচন্দ্রের ন্যায় শারদীয় দুর্গোৎসব করিবার পরামর্শ দান করেন। কংসনারায়ণের পুরোহিতবংশীয় সুপণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রী প্রভৃতি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া পূজার পদ্ধতি বা বিধি প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া সাড়ম্বরে কংসনারায়ণ দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন। ইহাতে চারিদিকে কংসনারায়ণের নাম প্রচারিত হয়। ইহাতে নিকটবর্ত্তী ভাতুরিয়া পরগণার ভূম্যধিকারী রাজা জগৎনারায়ণ ঈর্ষান্বিত হইয়া নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুর্গাপূজার প্রবর্ত্তক সুরথ রাজার ন্যায় সুকাল বসন্ত-কালে বহু ধুমধামের সহিত পূজা সম্পন্ন করেন, কিন্তু তথাপি কংসনারায়ণের অকালের শারদীয়া পূজা বাংলার চারিদিকে প্রচলিত হইল এবং সুকালের বাসন্তী পূজার বিশেষ চলন হয় নাই। কথিত আছে, ইহা লক্ষ্য করিয়া জগৎনারায়ণ দুঃখ করিলে তাঁহার পুরোহিত নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে কংসনারায়ণের পূজার উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম্মসাধন এবং তাঁহার ছিল ঈর্ষা ও দাম্ভিকতা প্রকাশ এবং সেই অনুপাতেই দুজনে ফললাভ করিয়াছেন। যাহা হউক শারদীয়া ও বাসন্তীপূজা তদবধি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং ভারতের অপর কোন স্থানেই এই ধরণের পূজার ব্যবস্থা নাই।

কথিত আছে রাজা কংসনারায়ণই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কংসনারায়ণের বংশের পুত্রশাখা লুপ্ত হইলে, কন্যাশাখা হইতে তাহিরপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের আরম্ভ হয়।

সরদা রোড—আবদুলপুর জংশন হইতে ১৫ মাইল দূর। এই স্থান হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে গঙ্গাতীরবর্ত্তী সরদা বা সরদহে যাইতে হয়। তথায় বাংলার পুলিশ বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের জন্য একটি ট্রেণিং কলেজ আছে। যে বাড়ীতে কলেজটি অবস্থিত পূর্ব্বে উহা ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমকুঠি ছিল। পদ্মাতীরবর্ত্তী এই কলেজটির অবস্থান অতি মনোরম। কলেজের পাশেই তখনকার দিনের একটি ছোট গোরস্থান আছে; ফরাসীভাষায় উৎকীর্ণ একটি সমাধিস্তম্ভ হইতে জানিতে পারা যায় যে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে একটি ফরাসী শিশু এখানে সমাহিত হইয়াছিল।

সরদার নিকটেই পদ্মা হইতে বড়াল নদী উঠিয়াছে; এই নদীর অপর পারে চারঘাট গ্রাম এ অঞ্চলের একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। নদী পারাপারের জন্য এখানে একটি খেয়া

চারঘাট হইতে ১১ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে **বাঘা** গ্রাম; প্রধান লাইনের গোপালপুর ষ্টশন হইতেও এখানে আসা যায়; পশ্চিমে ১২।১৩ মাইল পথ। এই গ্রামে একটি সুন্দর প্রাচীন মস্‌জিদ আছে। ইহার শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে গৌড়রাজ নসরৎশাহ ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে এই মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা করেন। মস্‌জিদটি একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণীর ধারে অবস্থিত। ইহা গৌড়ের তৎকালীন মস্‌জিদ প্রভৃতির ধরণে নির্ম্মিত।

মস্‌জিদটি এখন সরকারী রক্ষিত-কীর্ত্তি বিভাগের তত্ত্বাবধানে আছে। মস্‌জিদের প্রাঙ্গনে হজরৎ মৌলানা শাহ্‌-দৌলা নামক একজন প্রসিদ্ধ সাধুর সমাধি আছে।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ভবন, রাজশাহী

রাজশাহী—আবদুলপুর জংশন হইতে ২৫ মাইল ও কলিকাতা হইতে ১৭৯ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা রাজশাহী জেলা ও বিভাগের সদর শহর ও পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। রামপুর ও বোয়ালিয়া নামক দুইটি পল্লী লইয়া এই শহরটি গঠিত। এই দুই নামের পরিবর্ত্তে ইহা এখন রাজশাহী নামেই পরিচিত। ব্লখ্‌ম্যান সাহেবের মতে মাহমুদশাহী ও বারবক শাহী পরগণার নামের ন্যায় হিন্দুরাজা গণেশের পর হইতে রাজশাহী
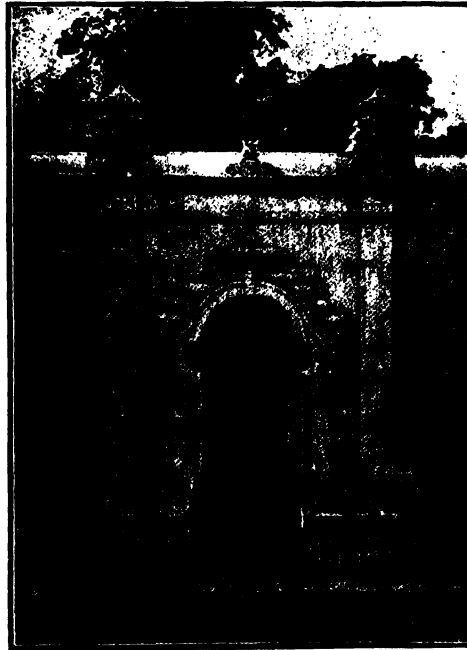
বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্র শালার প্রবেশদ্বার

এই মিশ্র নামের উৎপত্তি হয়। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রামপুরে রেশমের কারবার খুব বাড়িয়া যায় এবং ওলন্দাজ, ইংরেজ ও ফরাসীরা এখানে কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। ওলন্দাজ কোম্পানির সুবৃহৎ কুঠি "বড় কুঠি" নামে পরিচিত ছিল এবং এই স্থানে তাঁহাদের অনেকগুলি কামান ছিল। ইহার একটি কামান এখনও রাজশাহীর পুলিশ

লাইনে দেখিতে পাওয়া যায়। বড় কুঠির হাতার মধ্যে তখনকার দিনের একটি ছোট গোরস্থান আছে। রাজশাহী শহরের দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে রাজশাহী কলেজ, পুঁটিয়ার মহারাণী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজ ও বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত চিত্রশালা উল্লেখযোগ্য। রাজশাহীর কলেজটি সরকারী কলেজ। পদ্মার তীরে অবস্থিত এই কলেজটির দৃশ্য অতি সুন্দর। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়ম্‌ বা চিত্রশালা কেবলমাত্র রাজশাহীর নহে, সমগ্র বাংলার গৌরবের বস্তু। প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গ হইতে সংগৃহীত প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি ও শিল্প সাধনার নিদর্শন এখানে রক্ষিত হইয়াছে। যাঁহারা বাংলার ইতিহাস আলোচনায় অনুরাগী এই চিত্রশালাটি তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য দ্রষ্টব্য। চিত্রশালার ভবনটি হিন্দু স্থাপত্যের আদর্শে নির্ম্মিত। রাজশাহী কলেজের দক্ষিণে একটি পুরাতন মস্‌জিদ এবং মখ্‌দুমশাহ নামক পীরের দরগাহ্‌ আছে। ইহার পশ্চিমে রাজশাহীর বিশাল জেলখানা এবং তাহার পশ্চিমে শহরের সুন্দর ও বিস্তৃত ময়দান অবস্থিত।
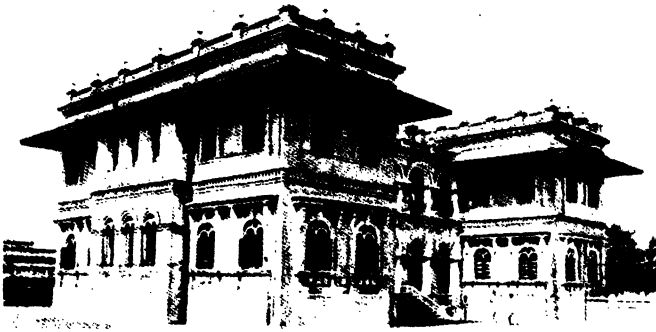
রাজশাহী কলেজ

মুসলমান আমলে রাজশাহী একটি প্রকাণ্ড পরগণা ও জমিদারীরূপে পরিচিত ছিল। বর্ত্তমান রাজশাহী জেলা ছাড়া বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের কতকাংশও ইহার অন্তর্গত ছিল। আজিও শেষোক্ত দুই জেলায় রাজশাহী নামে একটি পরগণা আছে। লালা উপাধিধারী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ বহুকাল হইতে রাজশাহী পরগণার জমিদার ছিলেন। এই বংশের রাজা উদয়নারায়ণ রায়ের সহিত রাজস্ব ব্যাপার লইয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর বিবাদ ও যুদ্ধ হওয়ার ফলে রাজশাহী জমিদারী এই বংশের হস্তচ্যুত হয় এবং উহা নাটোর রাজবংশের অধিকারে আসে। উত্তরকালে নাটোর জমিদারী হইতেও কতকগুলি বিভিন্ন জমিদারীর সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমানে রাজশাহী জেলার মধ্যে নাটোর, দিঘাপতিয়া, পুঁটিয়া ও তাহিরপুরের জমিদার বংশের নাম উল্লেখযোগ্য।

খেতুররোড—আবদুলপুর জংশন হইতে খেতুররোড ৪০ মাইল দূর। এই স্থান হইতে প্রেমতলী ও শ্রীপাট খেতুরে যাইতে হয়। খেতুর রোড স্টেশন হইতে খেতুর ১১ মাইল দূর। রাজশাহী হইতেও ১৩ মাইল পশ্চিমে খেতুরে যাইবার রাস্তা আছে। খেতুর সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাজন নরোত্তম ঠাকুরের জন্মস্থান ও পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত। প্রেমতলী হইতে খেতুর দুই মাইল দূর। ঠাকুর নরোত্তম খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে খেতুরের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত ও মাতার নাম নারায়ণী দেবী। বৈষ্ণবসাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব গৌড় গমন কালে খেতুরির দিকে লক্ষ্য করিয়া "নরোত্তম" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। তখনও নরোত্তমের জন্ম হয় নাই। বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে শ্রীচৈতন্যদেবের আহ্বানেই নরোত্তমের আবির্ভাব হইয়াছিল। অতি বাল্য বয়সে নরোত্তম বিষয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া পদব্রজে বৃন্দাবনে গমন করেন এবং তথায় লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার অদ্ভুত প্রেম ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া গোস্বামিগণ তাঁহাকে "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি প্রদান করেন। গুরুর আদেশে নরোত্তম স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া হরিনাম প্রচার ও কীর্ত্তনে আত্মনিয়োগ করেন। "প্রার্থনা", "প্রেমভক্তি চান্দ্রকা" ও "পাষণ্ড দলন" প্রভৃতি তৎপ্রণীত গ্রন্থ নিচয় বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত নিত্য পঠিত হইয়া থাকে। তাঁহার জীবন কথা নরহরি চক্রবর্ত্তী কৃত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "নরোত্তম বিলাসে" বর্ণিত হইয়াছে। চাঁদ রায় নামক জনৈক দস্যু সর্দ্দার ঠাকুর নরোত্তমের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করে। ১৫০৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে নরোত্তম স্বীয় জন্মস্থান খেতুরিতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে বৈষ্ণব সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেন। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সর্ব্ব প্রথম মহাসম্মেলন। এই সম্মেলনে বাংলার সকল স্থানের বৈষ্ণব মহাজনগণ যোগদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই ঘটনা বহুস্থানে বিবৃত হইয়াছে। নরোত্তমের খুল্লতাতপুত্র রাজা সন্তোষ এই কার্য্যে নরোত্তমের সর্ব্বপ্রধান সহায় হইয়াছিলেন। নরোত্তম প্রবর্ত্তিত কীর্ত্তন গানের পদ্ধতি "গরাণহাটি" বা "গড়েরহাটি" নামে পরিচিত। গড়ের হাট পরগণায় প্রথম প্রবর্ত্তিত বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাংলাদেশের বহু কীর্ত্তনিয়া এই পদ্ধতিতে কীর্ত্তন গান করিয়া থাকেন। আজিও প্রতি বৎসর লক্ষ্মীপূজার সময় শ্রীপাট খেতুরে তিন দিনব্যাপী বিরাট মেলার অধিবেশন ও মহোৎসব হয়। যাত্রীরা প্রেমতলীতে স্নান করিয়া খেতুরের পুরাতন মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ, বিষ্ণুপ্রিয়া এবং নিত্যানন্দের বিগ্রহ দর্শন করেন। এই মেলায় সুন্দর দেশীয় পুতুল প্রভৃতি লোকশিল্পের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

খেতুরের নিকটে **বিজয়নগর** নামে একটি গ্রাম আছে। ইহা প্রেমতলী হইতে ৪ মাইল পূর্ব্বদিকে এবং রাজশাহী হইতে খেতুরের পথে ৯ মাইল দূর। অনেকে অনুমান করেন যে এই স্থানে সেন বংশীয় নৃপতি বল্লাল সেনের পিতা রাজা বিজয় সেনের রাজধানী ছিল এবং পরে তিনি ও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা রাজধানী এখান হইতে লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ে লইয়া যান। ইহার উত্তরদিকস্থ **দেবপাড়া** নামক পল্লী হইতে বিজয় সেনের একখানি প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে কর্ণাট দেশের সামন্ত সেনের পৌত্র ও হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন রাঢ় দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং পালবংশীয়দিগের নিকট হইতে গৌড় জয় করিয়াছিলেন

এবং পরে কামরূপ, কলিঙ্গ ও মিথিলা অধিকার করেন। এই প্রশস্তি প্রসিদ্ধ কবি উমাপতি ধর কর্ত্তৃক রচিত এবং শিল্পী চাণক শূলপাণি কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ। এই প্রস্তর লিপিতে উল্লিখিত বিজয় সেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মহাদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী তৎপ্রতিষ্ঠিত বৃহৎ হ্রদ পদ্মসর নামক দীঘির তীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনেকের অনুমান। এই স্থান হইতে উক্ত মন্দিরের প্রবেশদ্বারের "উড়ুম্বর" বা চৌকাট বলিয়া কথিত দুইখানি দীর্ঘ প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী পালপুর নামক স্থানে সুদীর্ঘ দুর্গ পরিখার চিহ্ন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

খেতুর হইতে চারি মাইল দূরে **মণ্ডুয়েল** বা মাড়ইল নামক গ্রামে ধ্বংস প্রাপ্ত চারিটি মৃত্তিকা স্তূপ আছে; উহাদের মধ্যে একটি ৪০ফুট উচ্চ। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি এই স্থান হইতে বহু প্রাচীন নরমূর্ত্তি ও ষোড়শ স্থানীয় জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের প্রস্তর মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র এই স্থান হইতে প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভ দেবের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন যে এই স্থানের অধিবাসিগণ বহু পূর্ব্বে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। বর্ত্তমানে এখানকার অধিবাসি-গণের মধ্যে সাঁওতালের সংখ্যাই অধিক।

চাপাই নবাবগঞ্জ—আবদুলপুর জংশন হইতে ৫৬ মাইল দূর। এই শাখা লাইন আমনুরা জংশনে গোদাগাড়ীঘাট-মালদহ-কাটিহার মাঝারি মাপের লাইন পার হইয়াছে। চাপাই-নবাবগঞ্জ মহানন্দার তীরে অবস্থিত ও মালদহ জেলার একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল চালান যায়। এখানকার প্রস্তুত কাঁসা ও পিতলের বাসন বেশ বিখ্যাত। মহানন্দার জলোচ্ছ্বাস হইতে বন্দরটিকে রক্ষা করিবার জন্য নদীতীর দিয়া একটি উচ্চ বাঁধ আছে। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি ও একটি মুনসেফী আদালত আছে। ইহার ১০।১২ মাইল দক্ষিণে গোদাগাড়ীর নিকট মহানন্দা গঙ্গায় গিয়া পড়িয়াছে। চাপাই-নবাবগঞ্জের অপর পারে মহানন্দাতীরে বারঘরিয়া গ্রাম। সেখান হইতে ১২ মাইল দূরে মালদহের পথে প্রসিদ্ধ গ্রাম শিবগঞ্জ। শিবগঞ্জের সুন্দর ও সূক্ষ্ম রেশমের কাপড় বিখ্যাত।

নাটোর—কলিকাতা হইতে ১৪৬ মাইল দূর। স্টেশন হইতে নাটোর শহরের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। ইহা নারদ নামক একটি লুপ্তপ্রায় নদীর তীরে অবস্থিত। ইংরেজ আমলের গোড়া হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা রাজশাহী জেলার সদর ছিল। বর্ত্তমানে ইহা একটি মহকুমা মাত্র। নাটোরের রাজবংশ এককালে প্রায় অর্দ্ধবঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। রামজীবন ও রঘুনন্দন নামক দুই ভ্রাতা এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। রঘুনন্দন প্রথম জীবনে পুঁটিয়া রাজসংসারে সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে একদিন নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার মাথার উপর একটি সাপকে ফণা বিস্তার করিতে দেখিয়া পুঁটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ তাঁহাকে বলেন যে তুমি রাজা হইবে, কিন্তু তখন আমাদের জমিদারী কাড়িয়া লইও না। কিছু দিন বাদে দর্পনারায়ণ তাঁহাকে উকীল নিযুক্ত করিয়া ঢাকার নবাব দরবারে পাঠাইয়া দেন। ঢাকা হইতে রঘুনন্দন মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহাকে প্রধান কাননগো বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণের

অধীনে নায়েব কাননগোর পদ প্রদান করেন। স্বীয় প্রতিভাবলে রঘুনন্দন মুর্শিদকুলী খাঁর প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন এবং তাঁহার অনুগ্রহে অনেক জমিদারী লাভ করেন। রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনের নামেই এই সকল জমিদারী গৃহীত হইয়াছিল। রামজীবনের পুত্র কালিকাপ্রসাদ অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার দত্তক পুত্র রামকান্ত নাটোর জমিদারীর অধীশ্বর হন। এই রামকান্তের পত্নীই বঙ্গবিখ্যাতা মহারাণী ভবানী। একটি মাত্র কন্যা লইয়া মহারাণী ভবানী ৩২ বৎসর বয়সে বিধবা হন। অতঃপর তিনি দেবসেবা, দরিদ্রসেবা, জলাশয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। কাশীর দুর্গাবাড়ী মন্দির ইঁহারই কীর্ত্তি। এক কাশীধামেই তিনি ৩৮০টি মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দরিদ্রদের চিকিৎসার জন্য বহু গ্রামে তিনি কবিরাজ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নাটোর হইতে পূর্ব্বদিকে বগুড়া জেলার পীঠস্থান ভবানীপুর পর্য্যন্ত যে উচ্চ রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহা আজও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে এবং রাণী ভবানীর জাঙ্গাল নামে পরিচিত। দানে ও সৎকার্য্যে তিনি ৫০ ক্রোর টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। তাঁহার মহত্ত্বের কথা বাংলার ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত।

নাটোর রাজপ্রাসাদ

অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানীর পুণ্যনাম বাংলার ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসনকালে নানা কারণে নাটোরের বিশাল জমিদারীর অধিকাংশ এই বংশের হস্তচ্যুত হইয়া যায় এবং উহা হইতে বাংলার বিভিন্ন জেলায় কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জমিদারীর সৃষ্টি হয়। নাটোরের জমিদারী বড় তরফ ও ছোট তরফে বিভক্ত হয়। বড় তরফের রাজারা বৈষ্ণব এবং ছোট তরফের রাজারা শাক্ত। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে জমিদাররাই পুলিস ও শান্তি রক্ষার কার্য্য করিতেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ পুলিসের কার্য্যের জন্য সরকার হইতে বাৎসরিক ৩৬,৯২৬৲ টাকা পাইতেন। নাটোর রাজবংশের অধিকাংশ প্রাচীন কীর্ত্তি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। রাজপ্রাসাদের পরিখাগুলি আজিও বর্ত্তমান আছে। ছোট তরফের উপাস্য দেবতা জয়কালীর মন্দিরে নাটোরের প্রাচীন গৌরবের চিহ্ন কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ ইহা ভূমিকম্পে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় নাই। বড় তরফের স্বর্গীয় মহারাজা জগদিন্দ্র নাথ রায় ভূমিকম্পের পর তাঁহার বাসভবন ও ইষ্টদেবতা শ্যামসুন্দরের

মন্দির নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করান। তিনি সুকবি, সঙ্গীতজ্ঞ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি "মানসী ও মর্ম্মবাণী" নামক মাসিক পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন এবং "সন্ধ্যাতারা" ও "নূরজাহান" নামক পুস্তক লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

মহারাণী ভবানীর বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দয়ারাম রায়ের বংশধর **দিঘাপতিয়ার** রাজারা নাটোরের এক মাইল উত্তরে দিঘাপতিয়া গ্রামে বাস করেন। কথিত আছে নাটোররাজ রামজীবনের আদেশে তাঁহার প্রধান ও বিশিষ্ট কর্ম্মচারী দয়ারাম রায় বহু সৈন্য লইয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর পক্ষে সীতারাম রায়কে দমন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। সীতারামের পতনের পর তাঁহার সম্পত্তি নাটোর জমিদারবংশের অধীনে আসে। নাটোর-রাজ প্রীত হইয়া রাজশাহী ও যশোহর অঞ্চলে বহু ভূসম্পত্তি দয়ারাম রায়কে প্রদান করেন। এইরূপে দিঘাপতিয়া জমিদারীর আরম্ভ হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ভূমিকম্পে দিঘাপতিয়ার পুরাতন প্রাসাদ ধ্বংস হইয়া গেলে স্বর্গীয় রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর দিঘাপতিয়ায় একটি বিশাল প্রাসাদ ও সুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করেন। উত্তরবঙ্গে এইরূপ মনোরম উদ্যান অতি অল্পই আছে।

জয়কালীর মন্দির, নাটোর

নাটোরের চারিদিকে সমগ্র মহকুমা নদী ও খালবিলে পরিপূর্ণ এবং বর্ষাকালে লোকে বড় বড় মাটির গামলায় করিয়া বাড়ী বাড়ী যাতায়াত করে।

সান্তাহার জংশন—কলিকাতা হইতে ১৭৪ মাইল দূর। সান্তাহারের পুরাতন নাম সুলতানগঞ্জ। ইহা বগুড়া জেলার একটি নগণ্য পল্লী ছিল, কিন্তু রেলওয়ের কল্যাণে এখন একটি ছোটখাট শহরে পরিণত হইয়াছে। ইহা পাটের কারবারের একটি

বিখ্যাত স্থান। সান্তাহার জংশন হইতে একটি মাঝারি মাপের লাইন (মিটার গেজ) বগুড়া ও গাইবান্ধা হইয়া পার্ব্বতীপুর-আমিনগাঁও লাইনের কাউনিয়া জংশন পর্য্যন্ত গিয়াছে।

সান্তাহারের চারি মাইল পশ্চিমে অবস্থিত **নওগাঁ** রাজসাহী জেলার অন্যতম মহকুমা। সান্তাহার স্টেশন হইতে নওগাঁ পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ী বা মোটরবাসে যাওয়া যায়।

নওগাঁর শহরে গাঁজার বড় বড় গুদাম দেখিতে পাওয়া যায়। নাওগাঁ থানা এবং নিকটবর্ত্তী বাদলগাছী ও মহাদেবপুর থানার কয়েকটি গ্রামে সরকারী তত্ত্বাবধানে গাঁজার চাষ হইয়া থাকে; এই গাঁজার চাষের জন্যই নওগাঁ একটি মহকুমার সদরে পরিণত হইয়াছে।

নওগাঁ হইতে ৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে **দুবলহাটী** গ্রামে একটি প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। কথিত আছে, এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা জগৎরাম রায় বাণিজ্য ব্যপদেশে এই স্থান দিয়া নৌকাযোগে যাইবার সময়ে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া রাজরাজেশ্বরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া এই গ্রামেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপেই তাঁহার জমীদারীর সূত্রপাত হয়। নবাব সরকারে তাঁহার বাৎসরিক খাজনা ধার্য্য হইয়াছিল ১২ কাহন কই মাছ।

নওগাঁ হইতে ১১ মাইল উত্তরপশ্চিমে **বলিহার** গ্রামেও একটি জমিদার বংশ আছেন। গ্রামের নিকটেই ৫০।৬০টি পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, মহারাজ মানসিংহ যখন পাঠানদিগকে দমন করিতে বাংলায় আসেন তখন তাঁহার সৈন্যদল কর্ত্তৃক এগুলি খনিত হইয়াছিল।

সান্তাহার হইতে ১২ মাইল ও নওগাঁ হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে "ভীমের জাঙ্গাল" ও "ভীম সাগর" দীঘি অবস্থিত। ভীমের জাঙ্গাল নামক দুর্গপ্রাকারবৎ রাজপথ উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে দৃষ্ট হয়। ইহা প্রসিদ্ধ জননায়ক মহাবীর দিব্যের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের কীর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বাদশ শতাব্দীতে পালবংশীয় রাজা দ্বিতীয় মহীপাল অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠায় বাংলার প্রজাপুঞ্জ তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সম্মুখযুদ্ধে তাঁহাকে হত্যা করিয়া বিদ্রোহের নায়ক মহাবীর দিব্যকে তাঁহাদের রাজা নির্ব্বাচিত করে। দিব্য অত্যন্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠার সহিত এই গুরুভার পালন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর সিংহাসন লাভ করেন। দিব্য ও ভীমের স্মৃতি বিজড়িত বহু কীর্ত্তি চিহ্ন উত্তরবঙ্গের নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ("জয়পুরহাট" ও "বগুড়া" দ্রষ্টব্য।) মহীপালের পুত্র রামপাল অনন্ত সামন্ত চক্রের সহায়তায় ভীমকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পিতৃভূমির পুনরুদ্ধার করেন। এই আখ্যায়িকা অবলম্বনে রামপালের মহাসন্ধিবিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিতম্" নামক এক দ্ব্যর্থ সূচক সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। ইহার প্রত্যেক শ্লোকেরই দুইভাবে অর্থ করা যাইতে পারে, এক অর্থে রামপালের ভীমকে নিধন করিয়া বরেন্দ্রী ভূমির উদ্ধার ও অপর অর্থে রাম চন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণকে বধ করিয়া সীতার উদ্ধার সাধন—এই দুই প্রকার অর্থই

হইতে পারে। এই কাব্য রচনা করিয়া কবি সন্ধ্যাকর নন্দী "কলিকাল বাল্মীকি" উপাধিতে পরিচিত হন। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে "দিব্য স্মৃতি বার্ষিকী উৎসব" অনুষ্ঠিত হইতেছে।

তিলকপুর—কলিকাতা হইতে ১৭৯ মাইল। স্টেশনের ৫ মাইল পূর্ব্বদিকে কলিঙ্গগ্রাম অবস্থিত। একটি মাটীর উচ্চ স্তূপের উপর ভাঙ্গা মন্দিরে কলিঙ্গেশ্বরী দেবীমূর্ত্তির ভগ্ন পদদ্বয় মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং উহাই পূজা পাইতেছে। মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত জলাশয়টি দিনাজপুরের জমিদার মহারাজ গিরিজানাথ রায় কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াছে। নিকটে একটি পুরাতন শিবমন্দির বর্ত্তমান। কথিত আছে, "তারা-রহস্য" প্রণেতা সাধক ব্রহ্মানন্দ কলিঙ্গেশ্বরীর আরাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এককালে গ্রামটি সমৃদ্ধ ছিল।

গোপীনাথ, বিগ্রহ গোপীনাথপুর

কলিঙ্গগ্রামের দেড় মাইল উত্তরে রায়কালী গ্রামে কয়েক ঘর কায়স্থ জমিদারের বাস। এই গ্রামে কুষানবংশজ মহারাজ বাসুদেবের একটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রার রাজ্যকাল ৬৫ শকাব্দ এবং গ্রীক অক্ষরে পহ্লবী ভাষায় লেখা। মুদ্রার একদিকে চতুর্ম্মুখ মহাদেব ও অপরদিকে দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তি।

নিকটস্থ **ভাণ্ডারগাঁর** ঝড়ু তর্কালঙ্কারের নাম সুপ্রসিদ্ধ। এতদঞ্চলে প্রবাদ আছে, বিচারে "ঝড়বৎ ঝড়ু"।

আক্কেলপুর—কলিকাতা হইতে ১৮৫ মাইল দূর।

এই স্টেশন হইতে পাঁচ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত গোপীনাথপুর গ্রামে প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে গোপীনাথদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। মুর্শিদাবাদ জেলার আমলই গ্রামনিবাসী নন্দরাম সিংহ নামক জনৈক উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ অদ্বৈতাচার্য্যের স্ত্রী সীতাদেবীর নিকট নবদ্বীপে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গোপীভাবে সাধনা করিতে আরম্ভ করেন এবং উহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়া "নন্দিনীপ্রিয়া" নামে পরিচিত হন। তিনিই পরে এই গ্রামে আসিয়া গোপীনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবা করিতে থাকেন। কথিত আছে, তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া তখনকার বাদশাহ মন্দিরের ব্যয়ের জন্য গোপালপুর মহাল দান করেন। গোপীনাথ দেব অষ্টসখীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। কানাই, বলাই, রাধাকৃষ্ণ ও গরুড়মূর্ত্তি মূল বিগ্রহের

গোপীনাথদেবের মন্দির, গোপীনাথপুর

চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান। গোপীনাথের প্রাচীন মন্দির ১৩০২ সালের ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হয়। বর্ত্তমান মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় ৫০ ফুট হইবে। এখানে প্রত্যহ ২৫ সের চাউলের ভোগ দেওয়া হয় এবং অতিথি অভ্যাগতগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়া থাকে। গোপীনাথ সম্বন্ধে বহু অলৌকিক গল্প শুনা যায়।

দোলযাত্রা উপলক্ষে পঞ্চমদোলের দিন হইতে গোপীনাথপুরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে বারদিন স্থায়ী একটি বিরাট মেলা বসে। এই মেলায় বাংলাদেশ তথা ভারতের নানাস্থান হইতে গরু, মহিষ, উট, ঘোড়া, দুম্বা প্রভৃতির আমদানী হয় এবং

মেলাস্থান একটি নগরের আকার ধারণ করে। মেলার সময় আক্কেলপুর স্টেশন হইতে গোপীনাথপুর পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ী ও টমটম যাতায়াত করে।

গোপীনাথপুরের নিকটেই **মাটিহাস** গ্রাম। এই স্থানে বিস্তৃত একটি ধ্বংসাবশেষ আছে।

আক্কেলপুর স্টেশন হইতে প্রায় ১০ মাইল উত্তর পূর্ব্বে **ক্ষেতলাল** গ্রাম অবস্থিত। এখানে একটি থানা আছে। থানার দক্ষিণে রাজবাড়ীর চড়া নামে একটি রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আছে; ইহার পূর্ব্বধারে মহলপুকুর এবং নিকটে সনকা ও মেনকা নামে দুটি জলাশয় আছে। প্রবাদ এই রাজবাড়ী রাজা অনন্তরাম রায়ের। এই গ্রাম হইতে প্রাপ্ত একটি বোধিসত্ত্ব লোকনাথের, একটি মহিষাসনে উপবিষ্ট যমের ও দুইটি জননী ও শিশুর মূর্ত্তি রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

মাটিহাস স্তূপ

জামালগঞ্জ—কলিকাতা হইতে ১৯০ মাইল দূর। ইহা বগুড়া জেলার একটি বৃহৎ পাটের গঞ্জ।

পাহাড়পুর—জামালগঞ্জ হইতে তিন মাইল পশ্চিমে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত প্রাচীন বাংলার অতীত গৌরবের প্রধান নিদর্শন পাহাড়পুর গ্রাম অবস্থিত। স্টেশন হইতে লোকাল বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে; গরুর গাড়ীতে কিংবা পদব্রজে যাইতে হয়। কয়েক বৎসর হইল ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্ব্ব চক্রের অধ্যক্ষ এখানে ৮০ ফুট উচ্চ প্রকাণ্ড একটি ইষ্টকময় স্তূপ খনন করিয়া একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মায়তনের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। পাহাড়পুর নামটি কিন্তু আধুনিক। খনন করিবার পূর্ব্বে এখানকার বিরাট জঙ্গলাকীর্ণ স্তূপটি পাহাড়ের মত দেখাইত বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে পাহাড়পুর। এই স্থানের প্রাচীন নাম ছিল সোমপুর। এখানকার ভগ্নাবশেষের মধ্যে যে একটি মুদ্রা (Seal) পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লেখা রহিয়াছে—"সোমপুর ধর্ম্মশালা বিহার" পাহাড়পুরের পার্শ্ববর্ত্তী একটি গ্রাম এখনও "ওম্‌পুর" নামে পরিচিত। মহাস্থানগড় বা প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও বাণগড় বা প্রাচীন কোটিবর্ষ হইতে যথাক্রমে উত্তর পশ্চিমে ও দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রায় ৩০ মাইল দূরে এই বিরাট বিহার ও সঙ্ঘারাম

অবস্থিত। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, নগরীর কোলাহল হইতে বহুদূরে শান্তি ও নির্জ্জনতার মধ্যে ভিক্ষুগণ যাহাতে ধর্ম্মসাধনায় মগ্ন থাকিতে পারেন সেইজন্য সম্ভবতঃ এই স্থানে এই মহাবিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পাহাড়পুরের প্রধান স্তূপের মন্দির বা মহাবিহারটির গঠনরীতি স্বতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পে ইহা এক নূতন নিদর্শন। ভারতে এইরূপ পদ্ধতি অন্যস্থানে অনুসৃত না হইলেও ব্রহ্মে, কম্বোজে ও যবদ্বীপের বিরাট মন্দিরগুলিতে যে পাহাড়পুরের আদর্শই গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। যবদ্বীপের বরবদুর ও প্রাম্বাণম ও কম্বোজের আঙ্কোরভাট প্রভৃতি জগৎ-প্রসিদ্ধ মন্দির-গুলির গঠন রীতির সহিত পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারের গঠনরীতির সৌসাদৃশ্য হইতে প্রমাণ হয় যে, পূর্ব্ব এসিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারে বাংলার দান অসামান্য। প্রথম পাল রাজত্বের যুগে যবদ্বীপ প্রভৃতির সহিত পূর্ব্বভারতের ঘনিষ্ঠতার কথা নালান্দায় আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।
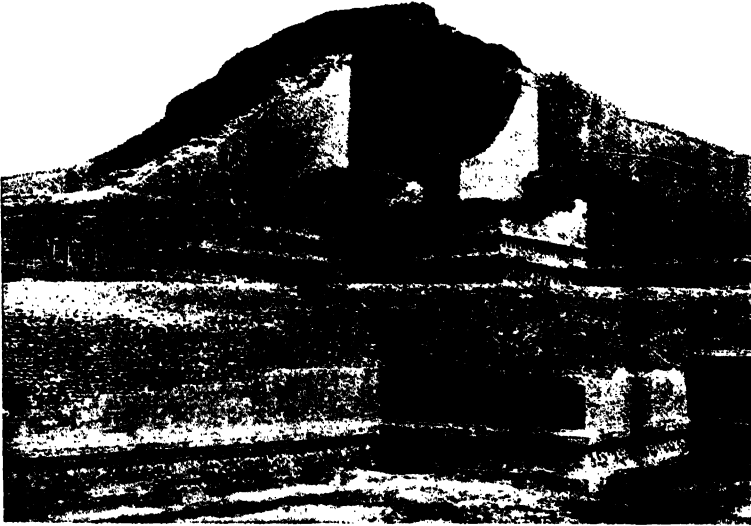
পাহাড়পুর স্তূপের দৃশ্য

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পাহাড়পুরের মহাবিহার প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ঐ স্থানে বা নিকটে চতুর্ম্মুখ জৈনমন্দির ছিল এবং কতকাংশে তাহার আদর্শে বিহারটি পরে নির্ম্মিত হয়; পাহাড়পুরের সহিত জৈনদের যে সম্বন্ধ ছিল তাহার প্রমাণ এই স্তূপ খননকালে ভাল ভাবেই পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক চতুর্ম্মুখ জৈনমন্দিরের সহিত বিহারটির প্রাথমিক আকৃতিগত ও কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও বিহারের তিনটি তল, প্রতি তলে প্রদক্ষিণের পথ প্রভৃতি নানা বিষয়ে ইহার মৌলিকত্ব ও বিশেষত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রধান মন্দির বা বিহারটি ঘিরিয়া পাহাড়পুরের বিরাট সমচতুর্ভুজ সঙ্ঘারামটি অবস্থিত; ইহার প্রতিটি ভুজ বাহিরে ৮২২ ফুট লম্বা। বৌদ্ধভিক্ষুদের এত বড় সঙ্ঘারাম ভারতে আর কোথাও নির্ম্মিত হয় নাই। ইহাতে সারিসারি চারিটি ভুজে ১৮৯ কুঠরী ও প্রবেশমুখে একটি বড় দালান আছে; কুঠরীগুলির সম্মুখে ৮।৯ ফুট লম্বা একটি বারান্দা ঘুরিয়া গিয়াছে। এই কুঠরীগুলির মধ্যে ৯২টিতে উচ্চ পূজার বেদী দৃষ্ট হয়; একটি মহাবিহারের নিকট সঙ্ঘারাম মধ্যে এতগুলি পৃথক পূজার স্থান থাকিবার কি উদ্দেশ্য ছিল তাহা নিরূপিত হয় নাই।

পাহাড়পুর স্তূপের কারুকার্য্য (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

সঙ্ঘারামের পূর্ব্বদিকে এবং ইহার বাহির প্রাচীর হইতে প্রায় ১০০ ফুট দূরে সত্যপীরের ভিটা নামক ক্ষুদ্র স্তূপ খনন করিয়া তারার মন্দির পাওয়া গিয়াছে। ইহার সহিত দূরবর্ত্তী কালে একটি গ্রাম্য কাহিনী যুক্ত হওয়ার ইহার সত্যপীরের ভিটা নাম হইয়াছে। কথিত আছে, এই স্থানের রাজা মহীদলনের কন্যা সন্ধ্যাবতীর পুত্র সত্যপীর একজন বিশিষ্ট ধার্ম্মিক ও সাধু বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন এবং একটি ভীষণ বন্যায় ইনি ভাসিয়া গিয়াছিলেন। সঙ্ঘারামের বাহিরের প্রাচীর হইতে ১৬০ ফুট দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি প্রাচীন স্নানের ঘাট আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রাম্যকাহিনী অনুসারে রাজকন্যা সন্ধ্যাবতী এই ঘাটে প্রত্যহ স্নান করিতেন।

পাহাড়পুরে পালযুগের পূর্ব্বেকার নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া গেলেও ইহার মহাবিহার সঙ্ঘারাম প্রভৃতি পালযুগে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত।

পাহাড়পুরের মহাবিহারের পাদমূলে চারিদিকে প্রস্তর গাত্রে উৎকীর্ণ যে ৬৩টি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা সত্যই অপূর্ব্ব; পূর্ব্বভারতে ইহার তুলনা মিলেনা। পালযুগের বিস্ময়কর ভাস্কর্য্য শিল্পের সূত্রপাত এইগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। পালযুগের প্রসিদ্ধ ভাস্কর ধীমান ও বীটপাল ইহার পরবর্ত্তী কালে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক।

পাহাড়পুরে কয়েকটি খোদিত প্রস্তর স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে; ইহার মধ্যে একটি রাজা মহেন্দ্র পালের রাজ্যকালের।
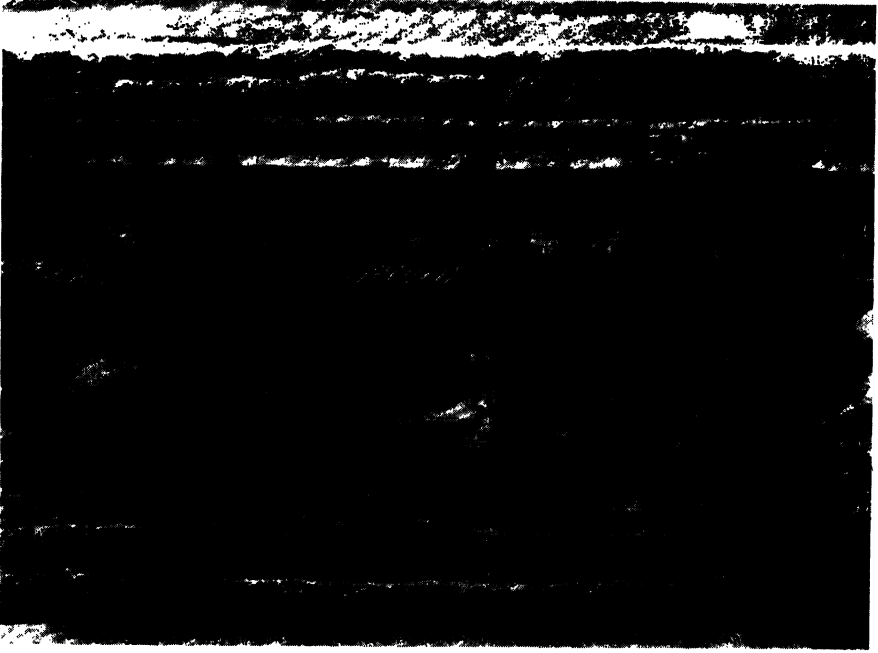
পাহাড়পুর স্তূপের কারুকার্য্য (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

তিব্বতীয় সাহিত্য হইতে জানা যায়, খৃষ্টীয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই সোমপুর মহাবিহার তিব্বতীয়গণের একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থান ছিল। শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর অতীশের তিব্বতীয় জীবনচরিত হইতে জানা যায় যে, তিনি বহু বৎসর সোমপুর বিহারে বাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার গুরু ছিলেন এই বিহারের মহাস্থবির রত্নাকর-শান্তি। নালান্দা ও বোধগয়ায় প্রাপ্ত খোদিত লিপি হইতে তথায় এই সোমপুর বিহারের কয়েকজন ভিক্ষুর দানের কথা জানিতে পারা যায়।

পুরাকালে একটি নদী এই স্থানের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত। আজও অধুনালুপ্ত এই নদীর পার্শ্বস্থিত ঘাট ও তৎসংলগ্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর পশ্চিমতীরে চারিদিকে উচ্চ দেওয়ালবিশিষ্ট গড়ের মধ্যস্থলে মূল অধিষ্ঠানটি অবস্থিত। উত্তরদিকস্থ দেওয়ালের মধ্যস্থলে প্রধান প্রবেশদ্বার আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই

প্রবেশপথের ঠিক সম্মুখভাগে গড়ের মধ্যস্থিত প্রধান অধিষ্ঠানের সুবৃহৎ সিঁড়ি অবস্থিত। উক্ত সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতে হয়। এই তলে একটি "প্রদক্ষিণ-পথ" আছে। পথের চারিধারে নক্সা করা টালিতে (Plaques) মানুষ, নানারকম জীবজন্তুর ছবি এবং "পঞ্চতন্ত্র" ও "হিতোপদেশে" বর্ণিত গল্প চিত্রিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে "বানর-কীলক-

ধেনুকাসুরবধ, পাহাড়পুর স্তূপ [প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে]

কথা" ও "সিংহ-শশক-কথা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার কিঞ্চিৎ উপরিভাগে একটি থামে যে শিলালেখন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে কনৌজের গুর্জ্জর-প্রতিহার বংশের রাজা মহেন্দ্রপাল দেবের সময়ে এই মন্দিরের কিয়দংশের সংস্কার হইয়াছিল। পাহাড়পুরের আবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসনে বর্ণিত আছে যে ১৫৯ গৌপ্তাব্দে অর্থাৎ গুপ্তবংশীয় সম্রাট বুধগুপ্তের সময়ে এই স্থানে একটি জৈন মন্দির ছিল। পাহাড়পুরের মন্দিরের ভিত্তি খুঁড়িবার সময় বহু পাথরের হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে,

…মধ্যে "গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ" শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক "ধেনুকাসুর" ও "চানুর মুষ্টিক বধ" …ভৃতি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মূর্ত্তি সত্যই চিত্তাকর্ষক। তদ্ভিন্ন রামায়ণে বর্ণিত "বালীবধ," বালী সুগ্রীব সংগ্রাম, মহাভারতে বর্ণিত "সুভদ্রা হরণ" ও "মহাদেবের হলাহল পান"

রাধাকৃষ্ণ, পাহাড়পুর স্তূপ

…লরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির চিত্র মন্দিরের প্রাচীর ও পাদমূলে শোভা পাইতেছে। এই …ানে বিহারগাত্রে রাধাকৃষ্ণের যে অনুপম মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছে উহাই প্রাচীনতম …গলমূর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত হয়।

হিন্দুশাস্ত্রের মতে গৃহ ও মন্দির প্রভৃতির প্রবেশ দ্বার উত্তর-মুখী হওয়া শুভ এবং …শস্ত। পাহাড়পুরের মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারও উত্তরমুখী দেখা যায়। এখানে একটি

বিষয়ে বিশেষভাবে প্রত্যেক বাঙালী পর্য্যটকের এবং অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য যে, এখানকার মন্দির-গাত্রে দগ্ধ মৃত্তিকা নির্ম্মিত (terracotta) যে সমুদয় জীবজন্তুর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—মৎস্য, শুশুক, কুম্ভীর, বিবিধ সরীসৃপ, শঙ্খ, ঝিনুক প্রভৃতি তাহাদের প্রায় সমস্তই বাংলা দেশের এবং বাঙালীর চির-পরিচিত। এই সকল হইতে প্রমাণিত হয় যে, পাহাড়পুরের বিহারাদি বাঙালী স্থপতি ও ভাস্করের কীর্ত্তি।
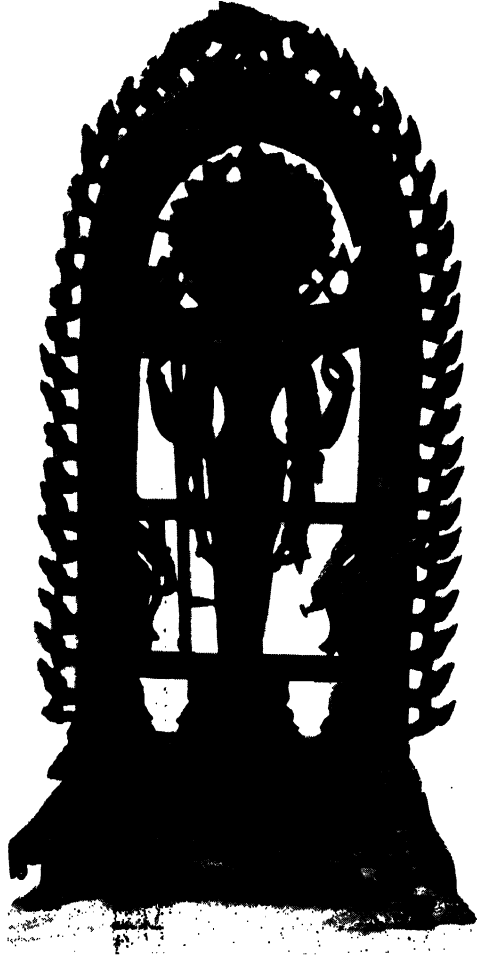
বেলআমলা গ্রামে প্রাপ্ত বাসুদেব মূর্ত্তি, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত। [প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে]

জয়পুর হাট—কলিকাতা হইতে ১৯৫ মাইল দূর। স্টেশন হইতে দেড় মাইল পশ্চিমে **বেলআমলা** গ্রামে রাজীবলোচন মণ্ডল নামে একজন অগাধ ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে তিনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ধনী জগৎশেঠের সমান বিত্তশালী ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার বংশীয়গণের নিকট এককোটি

টাকার একখানি প্রাচীন ডিক্রী এখনও রক্ষিত আছে। রাজীবলোচন প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ শিব মন্দির এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের ইট গুলিতে ১, ২, ৩ বা ১পদ্ম, ১ঘট, ১ তরবারি ইত্যাদি চিহ্নিত আছে; মন্দির নির্ম্মাণের সময়ে এই সকল চিহ্নের সাহায্যে অনভিজ্ঞ মজুর বিশেষ বিশেষ স্থানের ইট সহজেই স্থপতির নিকট পৌঁছাইয়া দিত। বেলআমলায় প্রাপ্ত একটি চণ্ডীমূর্ত্তি, একটি সূর্য্যমূর্ত্তি, একটি সুন্দর বাসুদেবমূর্ত্তি ও একটি বুদ্ধমূর্ত্তি-খোদিত চতুষ্কোণ পাথর রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। চণ্ডীমূর্ত্তির তলায় লেখা আছে "রাজ্ঞীশ্রীগীতা ললিতা।"

দিনাজপুর জেলার করতোয়া হইতে উৎপন্ন যমুনা নামে একটি মাঝারি নদী বগুড়া জেলার বেলআমলার কিছু দক্ষিণে আসিয়া দুই ভাগ হইয়াছে। পশ্চিম শাখাটি যমুনা নামেই দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া রাজশাহী জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্ব শাখাটি "কাটাযমুনা" নামে ৯ মাইল বহিয়া আক্কেলপুরের নিকট তুলসী গঙ্গা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কথিত আছে এই শাখাটি বেলআমলার রাজীবলোচন মণ্ডল মহাশয় কাটাইয়া দিয়াছিলেন।

বেলআমলার নিকটেই খঞ্জনপুর গ্রামে খাসমহালের দপ্তর অবস্থিত।

বেলআমলার অনতিদূরে বগুড়ার সীমান্তে জয়পুর হাট স্টেশন হইতে ছয় মাইল পশ্চিমে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত পত্নীতলা থানার **মুকুন্দপুর** গ্রামে ক্ষৌণী-নায়ক ভীমের স্মৃতি বিজড়িত (সান্তাহার দ্রষ্টব্য) হরগৌরী মণ্ডপ ও "ভীমের পান্টী" নামে পরিচিত প্রাচীন গরুড় স্তম্ভ বা বাদাল স্তম্ভ বিদ্যমান। হরগৌরী মণ্ডপটি অতি পুরাতন ইট পাথর দিয়া তৈয়ারী একটি উঁচু ঢিবি এবং ইহা মঙ্গলবাড়ী হাটের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। এই ঢিবির উপর চারিটি মন্দির আছে। মন্দিরগুলির মধ্যে হরগৌরী, সিংহবাহিনী, জয়দুর্গার প্রস্তর মূর্ত্তি ও শিবের মুখাঙ্কিত শিবলিঙ্গ আছেন। হরগৌরী মন্দিরের নিকট "অমৃত কুণ্ড" ও "কোদাল ধোয়া" নামে দুইটি পুকুর আছে। কালক্রমে মহারাজ ভীমের কীর্ত্তি কলাপ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বীরেশ্বর ব্রহ্মচারী নামক একজন সন্ন্যাসী ভগ্নস্তূপ হইতে দেবমূর্ত্তি গুলির উদ্ধার সাধন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

গরুড়স্তম্ভ বা বাদালস্তম্ভ হরগৌরী মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার কতকাংশ বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে; অবশিষ্ট অংশে সুপ্রসিদ্ধ পালরাজগণের মন্ত্রী বংশের প্রশস্তি আটাশটি সংস্কৃত শ্লোকে উৎকীর্ণ আছে। প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে নারায়ণ পালের রাজত্ব কালে মন্ত্রী ভট্টগুরব.মিশ্র এই স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠা করেন; এই স্থান ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বংশের যজ্ঞভূমি ছিল এবং পালরাজগণ এই স্থানে আসিয়া শান্তিজল লইতেন। গুরব মিশ্রের স্তম্ভ লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে মহারাজ ধর্ম্মপালের পুত্র মহারাজ দেবপাল বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন। ইহা হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে দেবপাল মন্ত্রী কেদার মিশ্রের সাহায্যে ওড়িয়া ও হূনদের দমন ও গুর্জ্জরনাথ ও দ্রবিড়েশ্বরের দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বত গুর্জ্জর রাজ্যের দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমায় ও দ্রবিড় বা রাষ্ট্রকূট রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন

বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোনও উপত্যকায় রাষ্ট্রকূট বংশীয় অমোঘবর্ষ ও গুর্জ্জরনাথ নাগভট-পুত্র রামভদ্রদেব দেবপালের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন। মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে মহারাজ দেবপালের রাজ্য হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নালান্দার ধ্বংসাবশেষ হইতে আবিষ্কৃত মহারাজ দেবপালদেবের রাজ্যের ৩৮ বৎসরে সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে নবদ্বীপের অধিপতি বালপুত্রদেব নালান্দা তীর্থে একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং নালান্দা পালবংশীয় দেবপালদেবের রাজ্যভুক্ত থাকায় তাঁহার নিকট একজন দূত পাঠাইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত বিহারের বুদ্ধমূর্ত্তি পূজা এবং ভিক্ষুগণের সর্ব্বপ্রকার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পাঁচ খানি গ্রাম দান করিতে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ অনুযায়ী দেবপালদেব পাঁচখানি গ্রাম বৌদ্ধ বিহারে দান করিয়াছিলেন। দেবপালদেব আফগানিস্থানের অন্তর্গত নগরহার, (বর্ত্তমান নিংবাহারের) অধিবাসী ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র মহাপণ্ডিত বীরদেবকে নালান্দা মহাবিহারের সঙ্ঘ-স্থবির নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দেবপালদেব ৮২০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল বংশীয় কেহ উত্তরাধিকারী না থাকায় প্রথম গোপালদেবের দ্বিতীয় পুত্র বাক্‌পালের পৌত্র বিগ্রহপাল বা শূরপাল গৌড়-বঙ্গ-মগধের অধীশ্বর হন। বিগ্রহপাল হৈহয় অর্থাৎ চেদী বা কলচুরি রাজবংশের লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভট্টগুরব মিশ্রের পিতা কেদার মিশ্র তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের তৃতীয়বর্ষে সিন্ধুদেশীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু পূর্ণদাস পাটনা জেলার বিহার নগরে দুইটি বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করেন; এই মূর্ত্তির পাদপীঠে বিগ্রহপালের শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নারায়ণপাল গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি ৫০ বৎসরেরও অধিককাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই রাজত্বকালে রাজ্যের অনেকাংশ পালবংশের হস্তচ্যুত হয়। ধর্ম্মপাল ও দেবপালদেবের সময়ে গৌড়-মগধ-বঙ্গে শিল্পোন্নতি চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। গৌড় ও মগধ প্রস্তর শিল্পে সারা ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নানাপ্রকার প্রস্তর ও ধাতু নির্ম্মিত বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্ত্তি এই সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নারায়ণপালের পর পালরাজ বংশের অধঃপতনের সহিত গৌড়ীয় শিল্পের অবনতি ঘটে।

গরুড় স্তম্ভ হইতে ৩ মাইল দূরে চিরী বা শ্রী নদীর ধারে প্রায় ১,০০০ ফুট পরিধি লইয়া বৃত্তাকারের একটি স্তূপ আছে। নিকটেই ২২৫ ফুট লম্বা আর একটি ধ্বংসস্তূপ এবং একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন জলাশয় আছে। অষ্টকোণ-বিশিষ্ট একটি প্রস্তর স্তম্ভও এখানে পাওয়া গিয়াছে। এই স্থানেই "রামচরিত" বর্ণিত পালরাজগণের সময়কার প্রসিদ্ধ জগদ্দল নামক মহাবিহার বা বৌদ্ধ বিশ্ব-বিদ্যালয় অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

গরুড়স্তম্ভের দক্ষিণে **দেওয়ানবাড়ী** ও **ধুরইল** নামক সমীপবর্ত্তী গ্রামেও বহু পুরাতন সরোবর ও অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে।

মুকুন্দপুরের হরগৌরী মন্দিরের কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত **সিদ্ধিপুর** গ্রামে ভীমসাগর নামক একটি দীঘি, ভীমের চামুণ্ডা মণ্ডপ ও জাঙ্গাল আছে। এইগুলির সহিত ক্ষৌণী-নায়ক ভীমের স্মৃতি-বিজড়িত।

জয়পুরহাট স্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে **তেঘরিয়া** গ্রাম। তেঘরিয়ার মাঠের মধ্যে একটি অতি প্রাচীন শিব মন্দির আছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে এই মন্দিরে একটি মেলা হয়।

মহীপুরের ধ্বংসাবশেষ

জয়পুরহাট স্টেশন হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বদিকে **কেন্দুল** গ্রামে জয়দেবের দীঘি, জয়দেবের ভিটা, শূলপাণির দীঘি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ মনে করেন এই গ্রামই গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের জন্মস্থান।

নিমাই সাহার দরগা, কসবা উচাই

পাঁচবিবি—কলিকাতা হইতে ২০১ মাইল দূর। স্টেশন হইতে ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে **মহীপুর, আটাপুর, কস্‌বা-উচাই** প্রভৃতি গ্রাম ব্যাপিয়া বিস্তৃত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলির সহিত পালবংশীয় নৃপতি মহীপালদেবের

সংস্রব আছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। মহীপুরে প্রাপ্ত একটি অতিকায় বোধিসত্ত্ব লোকনাথ মূর্ত্তি ও একটি ধাতু নির্ম্মিত চতুর্ভূজা "শ্রী" মূর্ত্তি রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। এখানে নিমাই সাহা নামে এক ফকিরের দরগাহ

নিমাই সাহার দরগার নিকটস্থ কারুকার্য্যখচিত প্রস্তরস্তম্ভের পাদপীঠ

আছে। এই দরগাহের নিকট তুলসীগঙ্গা নদীর তীরে চৈত্র-সংক্রান্তিতে স্নান-উপলক্ষে একটি মেলা বসিয়া থাকে। ইহা পাথরঘাটার মেলা নামে পরিচিত। ভগ্নস্তূপের অনেক প্রস্তরখণ্ড জমা হইয়াছে বলিয়া এই স্থানের নাম হইয়াছে পাথরঘাটা। কোন কোন

তুলসীগঙ্গা, কসবা উচাই

ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে, যে স্থানে নিমাই সাহার দরগাহ্ অবস্থিত, পূর্ব্বে সেখানে একটি বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ ছিল।

পাঁচবিবি হইতে প্রায় ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে **বলিগ্রাম** নামক গ্রামে বহু ধ্বংসাবশেষ আছে। বলিগ্রাম ক্ষেতলাল থানার অন্তর্গত এবং ক্ষেতলাল হইতে প্রায় ১০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। কিংবদন্তী, এই স্থানে বলিরাজার প্রাসাদ ও রাজধানী ছিল। বলিগ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত **শিলমপুর** গ্রামেও বহু ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই গ্রামে একটি প্রস্তরে খোদিত প্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। বলিগ্রামের এক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে **মাথরাই** গ্রামেও একটি রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আছে; এইস্থান হইতে প্রাপ্ত তিনটি প্রকাণ্ড প্রস্তর স্তম্ভ রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। স্তম্ভগুলির শীর্ষদেশে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে খোদিত আছে "আদেশ বিপঞ্চিক শ্রীপ্রহাসিত শর্ম্মা।" শিলিমপুরের প্রস্তর-প্রশস্তি পাঠে জানা যায় যে পূর্ব্বকালে বলিগ্রাম ও শিলিম-পুরের নাম ছিল বালগ্রাম ও শীয়ম্বপুর; এই বালগ্রাম ছিল পুণ্ড্রজনপদের অন্তর্ভুক্ত

বিষ্ণু বিগ্রহ, কসবা উচাই

ও বরেন্দ্রভূমের অলঙ্কারস্বরূপ। বালগ্রামে ও শীয়ম্বপুরে নানা শাস্ত্রবিদ বহু পণ্ডিত ও গুণীর বাস ছিল। প্রশস্তিটি শীয়ম্বপুর গ্রামের প্রহাস শর্ম্মার কুলপ্রশস্তি। কার্ত্তিকেয়পুত্র প্রহাস বহু শাস্ত্রে পারদর্শী ও বহু সদ্গুণের আকর ছিলেন বলিয়া জনসাধারণের এবং সমসাময়িক নৃপতিপুঞ্জের সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। কামরূপরাজ জয়পালদেব তুলাপুরুষ দান উপলক্ষে প্রহাসকে নয়শত স্বর্ণমুদ্রা ও সহস্র মুদ্রার আয়যুক্ত ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য বহু অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রহাস তাহা গ্রহণ করেন নাই। প্রহাসের নানারূপ ধর্ম্মপালন ও পুণ্য কার্য্যের মধ্যে প্রধান হইল শীয়ম্বপুর গ্রামে অতি উচ্চ একটি শুভ্র মন্দিরে অমরনাথ বিগ্রহ স্থাপন। বিগ্রহের সেবার জন্য তিনি ভূমি দান করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পুত্রগণের উপর সংসার-ভার দিয়া তিনি গঙ্গাকূলে বাস করিয়া ধর্ম্মসাধনে মনোনিবেশ করেন। প্রহাসশর্ম্মার সময় আনুমানিক খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী।

পাঁচবিবির নিকটস্থ জঙ্গলে বাঘ, চিতা, বন্য বরাহ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

হিলি—কলিকাতা হইতে ২০৭ মাইল দূর। ইহা বগুড়া জেলার অন্তর্গত চাউল ও পাটের একটি বিখ্যাত গঞ্জ। এখানে অনেকগুলি চাউলের কল আছে।

হিলি হইতে দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত **বৈগ্রামে** সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্ত্তৃক খননের দ্বারা একটি পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা "শিবের মণ্ডপ" নামে পরিচিত একটি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ। স্তূপটির উচ্চতা প্রায় নয় ফুট, দৈর্ঘ্য ৬০ ফুট ও বিস্তৃতি ৫৬ ফুট। খননের পূর্ব্বে ইহা লতা গুল্মাদির দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। ইহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত একটি লুপ্তপ্রায় পুষ্করিণী হইতে ১২৮ গুপ্তাব্দে (৪৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পর এই স্তূপটির প্রতি শিক্ষিত ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের দৃষ্টি পতিত হয় এবং তাহার ফলেই এখানে খননকার্য্য আরম্ভ

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, বলিগ্রাম

হয়। উক্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে বাইগ্রামে (বৈগ্রামে) শিবনন্দী নামক জনৈক ব্যক্তির দ্বারা একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। খননের দ্বারা মন্দিরের গর্ভগৃহ, দেববিগ্রহের পাদপীঠ ও চতুর্দ্দিকের প্রাচীরাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিতগণের মতে ইহা একটি শিবমন্দির ছিল। ইহার "শিবের মণ্ডপ" নামও এই অনুমানের সমর্থন করে। বাংলার অন্যতম পুরাকীর্ত্তি হিসাবে ইহা একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

হিলি হইতে মোটরবাস যোগে ১৬ মাইল পশ্চিমে দিনাজপুর জেলার অন্যতম মহকুমা **বালুরঘাট** যাওয়া যায়। বালুরঘাটে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের একটি আউট এজেন্সী আছে। আত্রাই নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটির দৃশ্য অতি সুন্দর।

বালুরঘাট হইতে প্রায় ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত **মৌজাদিবর** নামক গ্রামে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ ও হাজার বছরেরও অধিক পুরাতন একটি জলাশয় আছে। ইহা দিবর দীঘি নামে পরিচিত। এই দীঘির মধ্যে প্রায় ৪১ ফুট উচ্চ এবং ১০ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটি অষ্টকোণ গ্রানাইট প্রস্তরের স্তম্ভ আছে। ইহার শীর্ষদেশে লৌহের কাজের কিছু কিছু চিহ্ন আছে। ইহা মহারাজ দিব্যের জয়স্তম্ভ। মহারাজ দিব্য ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে (সান্তাহার দ্রষ্টব্য)।
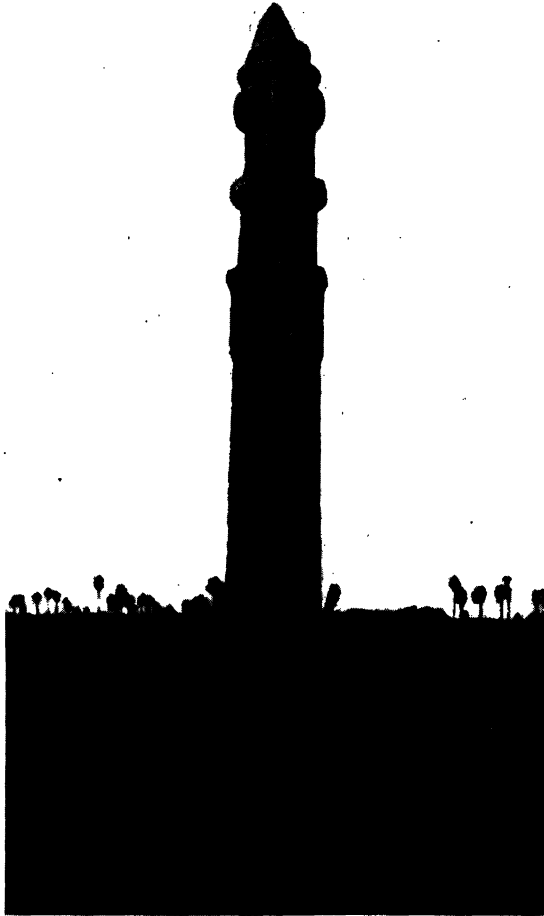
মহারাজ দিব্যের জয়স্তম্ভ। (প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে)

হিলি স্টেশন হইতে ১৮ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত করতোয়া তীরবর্ত্তী **ঘোড়াঘাট** এক সময়ে প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। ঘোড়াঘাট দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ও রংপুর জেলার সীমানার ধারেই বগুড়া জেলার অনতিদূরে অবস্থিত। কিংবদন্তী, এই স্থানে মহাভারতোক্ত বিরাটরাজার অশ্বশালা ছিল বলিয়া ইহার নাম ঘোড়াঘাট হয়। নসরত সাহ

যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত সেই সময়ে রংপুর জেলার অন্তর্গত কাঁটাদুয়ারের রাজা নীলাম্বর ঘোড়াঘাটের অধিপতি ছিলেন বলিয়া কথিত। এই স্থানে তাঁহার একটি অরণ্য-পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। নসরত শাহের সেনাপতি প্রসিদ্ধ মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক গাজী ইসমাইল নীলাম্বরকে পরাস্ত করিয়া এই দুর্গ অধিকার করেন ও এই স্থানের "নসরতাবাদ" নাম দেন। গাজী ইসমাইলের চেষ্টায় এখানে একটি শহর গড়িয়া উঠে। উত্তরকালে মুঘলেরা যখন আসাম ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হন, তখন ঘোড়াঘাট মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের প্রধান সেনানিবাস হইয়া উঠে। কালবশে করতোয়ার প্রবাহ কমিয়া গেলে স্থানটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে এবং এই স্থানের ফৌজদারি রংপুরে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। ঘোড়াঘাটের প্রাচীন কীর্ত্তির অধিকাংশই নদী গর্ভসাৎ হইয়াছে তবে মুঘল আমলের ফৌজদারের প্রাসাদের এবং একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান। ঘোড়াঘাটের দুর্ভেদ্য দুর্গবিজয়ী গাজী ইসমাইলের সমাধি এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই এই সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

চরকাই—কলিকাতা হইতে ২১৫ মাইল দূর। স্টেশন হইতে ৭ মাইল পূর্ব্বদিকে করতোয়ার পরিত্যক্ত খাতের উপর অবস্থিত **নবাবগঞ্জ** গ্রামে সীতাকোট নামে পরিচিত একটি প্রাচীন ইষ্টকস্তূপ আছে। নিকটেই "তর্পণ ঘাট" নামে করতোয়ার একটি ঘাটও আছে। প্রবাদ এই ঘাটে রামায়ণ প্রণেতা মহামুনি বাল্মিকি স্নান ও তর্পণ করিতেন এবং নিকটেই অধুনা-অজ্ঞাত কোন স্থানে তাঁহার আশ্রম ছিল। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে এই স্থানেই বনবাস দিয়া গিয়াছিলেন। সীতা-কোট নামটি অতীত যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে। আজিও বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে উত্তর বঙ্গের নানাস্থানের লোকে তর্পণ ঘাটে স্নান করিয়া থাকেন।

নবাবগঞ্জ থানা হইতে ৫।৬ মাইল দূরে জঙ্গলমধ্যে একটি ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়; উহা বাণরাজার বাড়ী বলিয়া পরিচিত।

ফুলবাড়ী—কলিকাতা হইতে ২২২ মাইল। স্টেশনের নিকটেই **দামোদরপুর** গ্রামে হরিপুকুর ও খোলাকুটী পুকুরের মধ্য দিয়া পথ তৈয়ার করিবার সময় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পাঁচখানি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়। এইগুলি রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি কুমার গুপ্তের, দুইটি বুধ গুপ্তদেবের রাজ্যকালের ও একটি ভানু গুপ্তদেবের রাজ্যকালের। এগুলি তাম্রশাসন নহে, ইহার প্রথমটির তারিখ ১২৪ গৌপ্তাব্দ বা ৪৪৩ খৃষ্টাব্দ এবং শেষটির ২১৪ গৌপ্তাব্দ বা ৫৩৩ খৃষ্টাব্দ। এই তাম্রলিপিগুলি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে দেড় হাজার বছর পূর্ব্বেও বরেন্দ্রভূমির উত্তরভাগ কোটীবর্ষ নামে খ্যাত ছিল এবং গঙ্গার উত্তর তীরের ভূভাগ পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামে পরিচিত ছিল ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পার্ব্বতীপুর জংশন—কলিকাতা হইতে ২৩৪ মাইল দূর। ইহা পূর্ব্ববঙ্গ রেল-পথের একটি প্রধান জংশন। এখান হইতে মাঝারি মাপের রেলপথে পশ্চিমে দিনাজপুর, কাটিহার, পূর্ণিয়া; যোগবণী প্রভৃতি স্থানে ও পূর্ব্বদিকে রংপুর, কুচবিহার, ধুবড়ী, পাণ্ডু

প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। রেলের কল্যাণে পার্ব্বতীপুর একটি নগণ্য পল্লী হইতে একটি বর্দ্ধিষ্ণু শহরে পরিণত হইয়াছে।

পার্ব্বতীপুরের অনতিদূরে প্রাচীন বাংলার একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহা বিরাট রাজার সীমান্তরক্ষী দুর্গ ছিল বলিয়া কথিত। প্রবাদ এই দুর্গে বিরাট রাজার সেনাপতি ও শ্যালক কীচক বাস করিয়াছিলেন। দুর্গটির আকৃতি সমচতুষ্কোণ ও পরিমাণফল প্রায় অর্দ্ধ মাইল। দুর্গের পরিখা ও প্রাকার গভীর জঙ্গলের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। পার্ব্বতীপুরের থানার নিকটবর্ত্তী একটি প্রাচীন বৃক্ষের তলদেশে একটি প্রস্তর নির্ম্মিত লাঙ্গল ও কৃষি কার্য্যের উপযোগী প্রস্তর নির্ম্মিত আরও কয়েকটি দ্রব্য আছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে এইগুলি কীচকের নিধনকর্ত্তা মধ্যম পাণ্ডব ভীমের পরিত্যক্ত দ্রব্য। এই বস্তুগুলির সহিত ক্ষৌণীনায়ক ভীমের ("সান্তাহার" ও "জয়পুরহাট" দ্রষ্টব্য) কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই।

সৈয়দপুর— কলিকাতা হইতে ২৪৩ মাইল দূর। ইহা রংপুর জেলার অন্তর্গত একটি বর্দ্ধিষ্ণু স্থান। এখানে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের মাঝারি মাপের ইঞ্জিন ও গাড়ী মেরামত ও প্রস্তুত করিবার কারখানা অবস্থিত। এই কারখানায় চার পাঁচ হাজার লোক কাজ করে। সৈয়দপুরে ট্রাফিক বিভাগের একটি ডিষ্ট্রিক্ট বা জেলার সদর অবস্থিত। এখানকার রেলওয়ে উপনিবেশটি একটি সুদৃশ্য শহর। আধুনিক সভ্যতার প্রায় সকল রকম সুবিধাই এখানে আছে। সৈয়দপুর পাটের একটি প্রধান গঞ্জ।

দরওয়ানি—কলিকাতা হইতে ২৫০ মাইল দূর। ইহা রংপুর জেলার একটি বিখ্যাত পাটের গঞ্জ। স্টেশনের অনতিদূরে একজন পীরের সমাধি আছে। তথায় প্রতি বৎসর পৌষ-মাঘ মাসে একমাস স্থায়ী একটি বিরাট মেলা হয়। এই মেলায় হাতী, ঘোড়া, উট, মহিষ, গরু ও ভেড়া প্রভৃতি পশু কিনিতে পাওয়া যায়।

নীলফামারি—কলিকাতা হইতে ২৫৫ মাইল দূর। স্টেশন হইতে নীলফামারি শহরের দূরত্ব দুই মাইল। ইহা রংপুর জেলার একটি মহকুমা। এক বিস্তীর্ণ ও সমতল বালুকাময় ক্ষেত্রের উপর শহরটি অবস্থিত। কথিত আছে, পূর্ব্বে এখানে যথেষ্ট নীলের চাষ হইত বলিয়া স্থানের নাম নীলফামারি হয়। এখনও একটি পুরাতন নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ডোমার—কলিকাতা হইতে ২৬৬ মাইল দূর। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু শহর ও বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। করতোয়ার প্রবাহ হ্রাসের পর ঘোড়াঘাটের পতন ঘটিলে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে ডোমারের অভ্যুদয় ঘটে।

ডোমারের নিকটবর্ত্তী পাঙ্গা গ্রামে জনৈক পীরের আস্তানা আছে। সাধারণতঃ ইনি "পাঙ্গা পীর" নামে পরিচিত। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে এই পীরের উরস্ বা মৃত্যুতিথি উপলক্ষে এই স্থানে একমাসব্যাপী মেলা হইয়া থাকে। দরওয়ানির মেলার ন্যায় এই মেলায়ও বিস্তর গৃহপালিত পশুর ক্রয়-বিক্রয় চলে। স্টেশন হইতে সাড়ে চার

মাইল উত্তর-পশ্চিমে দেবীগঞ্জ একটি বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ইহা কোচবিহার মহারাজার চাকলাজাত জমিদারীর সদর তহশীল।

হলদিবাড়ী—কলিকাতা হইতে ৩০০ মাইল। এই স্থানটি পাটের কারবারের জন্য বিখ্যাত। ইহা কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত।

জলপাইগুড়ি—কলিকাতা হইতে ২৯৬ মাইল দূর। ইহা জলপাইগুড়ি জেলার ও রাজশাহী বিভাগের সদর শহর। শহরটি ত্রিস্রোতা বা তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত। শহরের মধ্য দিয়া কার্‌লা নামক একটি ছোট নদী প্রবাহিতা। শহরটির দৃশ্য অতি সুন্দর। কার্‌লা নদীর লৌহসেতু হইতে মেঘ ও কুয়াসামুক্ত পরিষ্কার দিনে তুষারাচ্ছন্ন হিমালয়ের মহান্ দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। জলপাইগুড়ি চায়ের ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। এই জেলার ডুয়ার্স অঞ্চলে বহু চা-বাগান আছে। শহরে ডাকবাংলা, হোটেল, ধৰ্ম্মশালা ও সরাই প্রভৃতি আছে। ইহা একটি উন্নতিশীল স্থান। এখানে একটি মেডিক্যাল স্কুল ও মেয়েদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। এই শহরে পিচ্ দেওয়া রাস্তা, কলের জল, বৈদ্যুতিক আলো, টেলিফোন ও সৰ্ব্বপ্রকার যান-বাহন আছে। কথিত আছে, এই স্থানে পূর্ব্বে প্রচুর জলপাই গাছ ছিল বলিয়া জলপাইগুড়ি নাম হইয়াছে। তিস্তা নদীর অপর পারে শহরের ঠিক বিপরীত দিকে "বার্ণেজ ঘাট" নামে বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ের একটি স্টেশন আছে।

জলপাইগুড়ি জেলার অধিকাংশ স্থান পূর্ব্বে প্রাচীন কামতাপুর ও কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহার পূর্ব্বাঞ্চল বা ডুয়ার্স প্রদেশ ভূটান রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ভূটানী ভাষায় ডুয়ার্স কথাটির অর্থ দুয়ার, দ্বার বা সীমান্ত। ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব্বে ভূটিয়ারা দুয়ার অঞ্চল কোচবিহার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন এই প্রদেশ ভূটিয়াদের হস্তচ্যুত হইয়া ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয় তখন ইহাকে দুই অংশে ভাগ করা হয়। পূর্ব্বাংশ আসামের গোয়ালপাড়া জেলার সহিত সংযুক্ত হয় এবং পশ্চিমাংশ লইয়া "ওয়েষ্টার্ণ ডুয়ার্স" নামে বাংলার একটি নূতন জেলা গঠিত হয় এবং একজন ডেপুটি কমিশনারের উপর উহার শাসনভার অর্পিত হয়। ঐ সময় বৰ্ত্তমান জলপাইগুড়ির "রেগুলেশন" অঞ্চল রংপুর জেলার অধীন ছিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলকে রংপুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া "ওয়েষ্টার্ণ ডুয়ার্সের" সহিত সংযুক্ত করা হয় এবং জলপাইগুড়ি নামে একটি নূতন জেলা গঠিত হয়। ডুয়ার্স অঞ্চল এখনও "নন্ রেগুলেটেড" বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহির্ভূত অঞ্চল।

জলপাইগুড়ি জেলায় দুইটি পুরাকীৰ্ত্তি আছে। একটি তিস্তার অপর পারে জলপাইগুড়ি শহর হইতে ৯ মাইল দূরে অবস্থিত জল্পেশ্বর মন্দির। ইহা একটি বিখ্যাত শৈবপীঠ; শিবরাত্রির মেলার সময় এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। মেলাতে অনেক পাহাড়িয়া জাতীয় লোক আসে এবং নানাপ্রকার জীব-জন্তুর ক্রয়-বিক্রয় হয়। সুন্দর সুন্দর ভূটানী কুকুর এই সময় কিনিতে পাওয়া যায়। জল্লেশ লিঙ্গ ভূগর্ভে প্রোথিত। প্রবাদ যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর (বৰ্ত্তমান গৌহাটী) রাজ্যের রাজা

জল্পেশ্বর গভীর অরণ্যমধ্যে এই অনাদি শিবলিঙ্গকে আবিষ্কার করেন। মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তিনি স্বীয় নামে শিবলিঙ্গের নামকরণ করেন। তৎপ্রণীত আদি মন্দির ধ্বংস হইয়া গেলে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে কোচবিহারাধিপতি রাজা প্রাণনারায়ণ জল্পেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দিরটির শিরোভাগে একটি গোলাকৃতি গুম্বজ থাকায় উহা দূর হইতে মস্‌জিদের মত দেখাইত। বর্ত্তমানে "জল্পেশ টেম্পল কমিটি" নামক সমিতি কর্ত্তৃক ইহা সংস্কৃত ও পুনর্গঠিত হওয়ার ফলে ইহার পূর্ব্বরূপ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন এই মন্দির দেখিয়া ইহাকে নিতান্তই আধুনিক বলিয়া মনে হয়। জল্পেশ মন্দিরের প্রথম তলটি চতুষ্কোণাকৃতি এবং প্রত্যেক কোণে একটি করিয়া ঘর আছে।
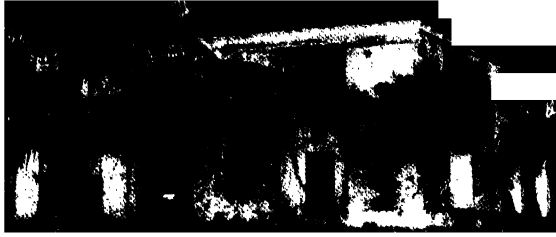
জল্পেশ্বরের পুরাতন মন্দির

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেকে অনুমান করেন যে জল্পেশ লিঙ্গ বলিয়া যাহা অধুনা পূজিত, উহা মূলে একখণ্ড প্রস্তরমাত্র এবং স্থানীয় অরণ্যবাসী অনার্য্যগণই উহার প্রতিষ্ঠাতা। অবশ্য এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। শিবশতনাম স্তোত্রে উল্লিখিত আছে "অহং কোচবধূপুরে জল্পেশ্বর ইতীরিতঃ" অর্থাৎ কোচবিহার রাজ্যে আমি জল্পেশ্বর নামে পরিচিত। জল্পেশ মন্দিরের দক্ষিণে যে সুন্দর জলাশয়টি আছে উহা হইতে প্রাপ্ত একটি বাসুদেব মূর্ত্তি অপর একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি শহর হইতে নয় দশ মাইল পশ্চিমে ভিতরগড় নামক একটি বিস্তৃত ও সুরক্ষিত প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। প্রবাদ, ইহা পৌরাণিক যুগের পৃথুরাজার রাজধানী। ইহাতে পর পর চার প্রস্থ বেষ্টনীর মধ্যে গড় ও চারিদিকে পরিখা এবং দুর্গের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ভগ্ন প্রাসাদের পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড নির্ম্মল সলিলা দীঘি বিদ্যমান আছে। দীঘিটি "মহারাজ দীঘি" নামে পরিচিত এবং ইহাতে দশটি ঘাটের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কীচক নামক এক যাযাবর অস্পৃশ্য জাতির সংস্পর্শে ধর্ম্মলোপের ভয়ে

পৃথুরাজা নাকি এই দীঘির জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। কীচক জাতি এখন বিলুপ্তপ্রায়। জলপাইগুড়ির বনে জঙ্গলে এখনও সামান্য দুই চার ঘর কীচকের বাস আছে। বন্য পশুপক্ষী প্রভৃতি শিকার করিয়া ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

গড়ের উত্তরদিকস্থ তালমা নদী হইতে পরিখার জল লওয়া হইত। প্রাসাদ এবং মহারাজ দীঘি ঘেরিয়া নগরটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৯৩০ গজ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩৪৫ গজ। মধ্যবর্ত্তী নগরীটি পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৩৫৩০ গজ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৬৩৫০ গজ, ইহার দক্ষিণে বাঘপুখোরী নামে একটি পুষ্করিণী আছে, উহার নিকটে নাকি রাজা কতকগুলি বাঘ রাখিতেন। বাহিরের নগরীটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় চার মাইল হইবে। ইহাতে নিম্নতম স্তরের অধিবাসীরা বাস করিত এবং ইহার নাম ছিল হরির ঘর।

সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে কাম্বোজ বা তিব্বতীয়গণের আক্রমণ হইতে উত্তরবঙ্গ রক্ষা করিবার জন্য বাংলার পালবংশীয় রাজারা এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

জলপাইগুড়ি রাজবাড়ীর তোরণ

জলপাইগুড়ি জেলার পুরাতন ইতিহাসের সহিত সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণীর" ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। জলপাইগুড়ির "রেগুলেশন" অঞ্চল অর্থাৎ শিলিগুড়ির নিকটস্থ তিস্তা তীরবর্ত্তী বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল মহাল, চিলহাটির নিকটবর্ত্তী বোদা এবং তিস্তার পূর্ব্বপারে পাটগ্রাম পরগণা পূর্ব্বে কোচবিহাররাজের অধিকৃত ছিল। পরবর্ত্তীকালে এই পরগণাগুলি মুঘলদের অধিকারভুক্ত হইয়া সীমান্তের ফকিরকুণ্ডি (বর্ত্তমান রংপুর) নামক ফৌজদারীর অধীন হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ফকিরকুণ্ডির দেওয়ানি লাভ করিয়া ইতিহাস-কুখ্যাত দেবীসিংহকে উহার ইজারাদার নিযুক্ত করেন। দেবী-সিংহের অমানুষিক অত্যাচারে কৃষকেরা বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোহ দমন করিতে

কোম্পানিকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। একদল ব্রিটিশ সৈন্য কৃষকদের নিকট পরাজিত হয় এবং ক্যাপ্টেন টমাসের অধীন অপর একদল সৈন্যকে তাহারা অবরুদ্ধ করে। রংপুরের বরকন্দাজ বা লাঠিয়াল দ্বারা গঠিত একটি দেশীয় সৈন্যবাহিনীকে অপর তিন দল সৈন্যের সহিত বিদ্রোহ দমন করিবাব জন্য প্রেরণ করা হয়। এই সম্মিলিত সেনাবাহিনী কৃষকদিগকে তাড়িত করিয়া বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের মধ্যে অবরুদ্ধ করে এবং তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। কৃষকদের মধ্যে অনেকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় এবং ইংরেজ আদালতে তাহাদের যথাযোগ্য শাস্তিও হয়। বিদ্রোহী কৃষকদের আশ্রয়স্থান বৈকুণ্ঠপুরের অরণ্য বর্ত্তমানে বহুলাংশে পরিষ্কৃত হইয়া চা-বাগানে পরিণত হইয়াছে। কোচবিহার রাজবংশের সমগোত্র বৈকুণ্ঠপুরের প্রসিদ্ধ "রায়কত" উপাধিধারী ভূম্যধিকারীর শিকারপুর নামক চা-বাগান এইরূপ পরিষ্কৃত অঞ্চলে জঙ্গলের সীমান্তে অবস্থিত। এই চা-বাগানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সুদৃশ্য মন্দিরের সহিত জনশ্রুতি অনুসারে দেবীরাণী বা দেবী চৌধুরাণীর স্মৃতিবিজড়িত। বৈকুণ্ঠপুর বনানীর প্রান্ত দিয়া "দেবী চৌধুরাণী" উপন্যাসে বর্ণিত ত্রিস্রোতা নদী আজিও প্রবাহিতা। অনেকের ধারণা নিকটবর্ত্তী দেবীগঞ্জ, দেবীঘাট ও দেবীডোবা প্রভৃতি পল্লীগুলি কোম্পানির শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কৃষকগণের নেতৃস্থানীয়া উপন্যাস বর্ণিতা দেবী চৌধুরাণীর বাস্তবতার স্মৃতি বহন করিতেছে।

জলপাইগুড়ি হইতে প্রায় ২৪ মাইল পশ্চিমে মহানদীর তীরে **তিতালিয়া** গ্রাম অবস্থিত। এক কালে ইহা পুরাতন রংপুর জেলার একটি মহকুমা-সদর ছিল। এখন ইহা জলপাইগুড়ি সদরের অন্তর্গত। জলপাইগুড়ি হইতে তিতালিয়া পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা আছে। এখনও বাজারের নিকট অনেকগুলি সুন্দর পাকা বাড়ী এবং পরিত্যক্ত ঘোড়-দৌড়ের মাঠ তিতালিয়ার পুরাতন গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ের উপর এখানকার ডাক বাংলাটির অবস্থান অতি মনোরম। তিতালিয়া শিলিগুড়ি হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গ্যাঞ্জেস্-দার্জ্জিলিং রোডের উপর অবস্থিত।

শিলিগুড়ি—কলিকাতা হইতে ৩১৮ মাইল দূর। ইহা পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রধান লাইনের শেষ স্টেশন। শিলিগুড়ি পূর্ব্বে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। রেলের কল্যাণে এখন ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু নগরে পরিণত হইয়াছে। ইহা এখন দার্জ্জিলিং জেলার একটি মহকুমা। ইহার চারিদিকে বহু চা-বাগান হওয়ায় এখানকার শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে।

শিলিগুড়ি শহরটি বিস্তৃত মাঠের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। চারিদিক বেড়িয়াই হিমালয়ের পাদমূলে তরাইয়ের দুর্গম অরণ্য। এই গভীর জঙ্গলে নানাবিধ হিংস্র জন্তুর বাস। শিলিগুড়ি হইতে যে কোন দিকে ভ্রমণে বাহির হইলেই হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। তরাইয়ের গভীর অরণ্যপ্রান্ত হইতে ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ের মত একটির পর একটি পর্ব্বতশ্রেণী নীল আকাশের সহিত মিলাইয়া গিয়াছে।

শিলিগুড়ি নামটি কোচদিগের প্রদত্ত বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার অর্থ পাথুরে জায়গা, নিকটস্থ মহানদীতে হিমালয় হইতে আনীত প্রস্তরখণ্ডের স্তূপ হইতে এই নামের উৎপত্তি।

শিলিগুড়ি সম্বন্ধে প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে Himalayan Journals প্রণেতা বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ স্যার জে ড্যালটন হুকার (Sir Joseph Dalton Hooker) লিখিয়াছিলেন, "আমি শিলিগুড়ির কাছাকাছি ঢেউয়ের মত উঁচুনীচু কঙ্করাকীর্ণ তেরাইয়ের বনভূমির নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি। যে অল্প সময় শিলিগুড়িতে ছিলাম, তাহা আমার কাছে বেশ ভাল লাগিয়াছিল। শিলিগুড়ির চারিদিকের ভূমি ঢেউয়ের মত উঁচুনীচু।"

এই শহরে হিন্দুদের দেবমন্দির ও মুসলমানদের কয়েকটি মস্‌জিদ আছে। হোটেল, ধর্ম্মশালা, ডাকবাংলা থাকায় এখানে যাত্রীদের আহারাদির ও বাসস্থানের কোনও অসুবিধা নাই। ব্যবসায়িগণের মধ্যে মাড়োয়ারীদের সংখ্যাই বেশী।

বর্ত্তমান সময়ে শিলিগুড়ি একটি শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। এখান হইতে তিব্বতের পশম, মৃগনাভি, চা, কমলা, শালকাঠ ও অন্যান্য মূল্যবান কাঠ নানাস্থানে রপ্তানি হয়।

তরাইএর কার্য্যের জন্য কার্সিয়ংএর সদর-আলার অধীন একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এখানে থাকেন। পূর্ব্বে ইঁহার দপ্তর ছিল শিলিগুড়ি হইতে ৮ মাইল দক্ষিণে ফাঁসী-দেওয়া গ্রামের নিকটস্থ হাঁসকুয়ার বা হাঁসখাওয়া গ্রামে। রেলপথ খুলিবার পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার দপ্তর শিলিগুড়িতে উঠিয়া আসে।

শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলপথ নামক ২ ফুট গেজের রেলপথ আরম্ভ হইয়াছে; এখানে গাড়ী বদল করিতে হয়। এই রেলপথের প্রধান লাইন উত্তর-পশ্চিমে কার্সিয়ং হইয়া ৫১ মাইল দূরবর্ত্তী দার্জ্জিলিং গিয়াছে। একটি শাখা লাইন ৭০ মাইল দূরবর্ত্তী পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত কিষণগঞ্জ গিয়াছে। অপর একটি শাখা তিস্তা-উপত্যকা দিয়া কালিম্পং অভিমুখে শিলিগুড়ি হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী গেলিখোলা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই সকল স্থানে শিলিগুড়ি হইতে মোটরযোগেও যাওয়া যায়।

পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং যাইতে হইলে কলিকাতা হইতে পূর্ব্ব-ভারত রেলপথে ট্রেণে সাহেবগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়া তাহার পর নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া গরুর গাড়ী, পাল্কী বা ঘোড়ায় করিয়া গ্যাঞ্জেস্-হিমালয়ান রাস্তা ধরিয়া পূর্ণিয়া, কিষণগঞ্জ, তিতালিয়া ও শিলিগুড়ি হইয়া প্রায় দুই শত মাইল অতিক্রমের পর দার্জ্জিলিং পৌঁছাইতে হইত। ইহাতে প্রায় এক পক্ষকাল সময় লাগিত। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথ কলিকাতা হইতে শিলিগুড়ি পৌঁছাইলে তথা হইতে তাঙ্গা করিয়া দার্জ্জিলিং যাইতে হইত। এইরূপ তাঙ্গার ব্যবস্থা ১০ বৎসর চলিয়াছিল। ইতিমধ্যে এই ব্যবস্থার নানারূপ অসুবিধার জন্য ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের তৎকালীন সর্ব্বাধ্যক্ষ মিঃ ফ্রাঙ্কলিন প্রিস্‌টেজের পরিকল্পনা অনুযায়ী দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথের নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের

মধ্যে তিনধারিয়া পর্য্যন্ত রেলপথ খোলা হয় এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের মধ্যে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত লাইন সমাপ্ত হয়। এই পার্ব্বত্য রেলপথটিতে একটিও সুড়ঙ্গ না থাকায় ভ্রমণকারীর পক্ষে অন্যান্য পার্ব্বত্য রেলপথের ন্যায় সুড়ঙ্গমধ্যে ধোঁয়ার জন্য কষ্ট পাইতে হয় না এবং হিমালয়ের অপূর্ব্ব ও পরিবর্ত্তনশীল শোভা উপভোগ করিবার কোন বাধা হয় না। এই রেলপথের খেলাঘরের ন্যায় ছোট ছোট গাড়ী ও ইঞ্জিন দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য হন কেমন করিয়া ইহারা হিমালয়ের উচ্চ শিখরে উঠিবে। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে সে বিস্ময় আর থাকে না। ক্ষুদ্র ট্রেণ আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ের গা দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা কৌশলে ক্রমে উপরে উঠিতে থাকে। এই পার্ব্বত্য রেলপথের ইঞ্জিনীয়রকে ইহার জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই কারণে দার্জ্জিলিং যাইতে এই রেলপথে ভ্রমণ বিশেষ উপভোগ্য অভিজ্ঞতা।

দার্জ্জিলিংএর পথে—শিলিগুড়ি স্টেশন ছাড়িয়াই পূর্ব্বদিকে তিস্তা উপত্যকা শাখা লাইন ফেলিয়া মহানদী সেতু পার হইয়া ৪ মাইল দূরবর্ত্তী **পঞ্চনই** জংশন পড়িবে। এই জংশন হইতে কিষণগঞ্জ শাখা বহির্গত হইয়াছে। পঞ্চনইএর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম চাঁদমণিতে চৈত্রমাসে দোলপূর্ণিমার সময় রাজবংশীদের বসন্ত উৎসব ও কামদেবের পূজা নৃত্যগীতাদি সহযোগে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। কিষণগঞ্জ শাখাপথের **বাঘডোগরা হাতিঘিষা** ও **নকসল বাড়ী** স্টেশন শিলিগুড়ি হইতে যথাক্রমে ১০, ১৪ ও ১৮ মাইল দূরে তরাইএর জঙ্গলমধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে বাঘের অত্যন্ত উবদ্রব ছিল বলিয়া বাঘডোগরা নাম হইয়াছে, হাতীর অত্যাচারের জন্য হাতিঘিসা ও নকসল অর্থে তিব্বতীয় ভাষায় শিকারের উপযোগী স্থান বলিয়া নাম হইয়াছে নকসল বাড়ী। ইহাদের পরের স্টেশন **বাতাসী** ও **আধিকারী** দার্জ্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমায় অবস্থিত। তাহার পর পূর্ণিয়া জেলার কিষণগঞ্জ মহকুমা আরম্ভ হইয়াছে। শেষোক্ত মহকুমায় এই শাখা লাইনে ইস্‌লামপুর থানা ও ঠাকুরগঞ্জ প্রধান স্টেশন। ইস্‌লামপুরে এ অঞ্চলের বড় হাট। ঠাকুরগঞ্জের একটি ধ্বংসাবশেষ বিরাট রাজার বাড়ী ছিল বলিয়া কথিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ত্রিকোণমিতিক মাপের সময় এখানে ক্ষোদিত লিপিযুক্ত কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। ঠাকুরগঞ্জ, শিলিগুড়ি ও কিষণগঞ্জ হইতে যথাক্রমে ৩৮ ও ৩২ মাইল।

কিষণগঞ্জ শাখা ছাড়িয়া দিয়া দার্জ্জিলিং অভিমুখে পঞ্চনই জংশনের পরের স্টেশন শিলিগুড়ি হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী **সুকনা**। এই পর্য্যন্ত রেলপথ প্রায় সমতল ভূমি দিয়া আসিয়াছে। পঞ্চনই ও সুক্‌নার মধ্যে রেলপথের উভয়দিকে চা-বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। সুক্‌না হইতে তরাইএর জঙ্গল এবং পাহাড়ের চড়াই আরম্ভ হইয়াছে। এখানকার পর হইতে বনানীর শোভা দেখিলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। যতদূর দেখা যায় কেবল তরুশ্রেণীর পর তরুশ্রেণী চলিয়াছে। বনবিহঙ্গের কূজন, পাহাড়িয়া নদীর কুলুকুলু রাগিনী ও ঝিল্লীরব শুনিতে শুনিতে কবির কথা মনে পড়িয়া যায়, "ঝিল্লীমুখরিত বনপরিপূরিত কলয়তি মহানদী মৃদুলপ্রপাতে।" ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়া রেলপথ বিশাল হিমালয়ের সিঙ্গলীলা পর্ব্বতশ্রেণীর একটি বাহু বাহিয়া ক্রমেই উপরে উঠিতেছে।

ষাট মাইল দীর্ঘ এই পর্ব্বতশ্রেণীটি একদিকে নেপাল ও অপরদিকে সিকিম ও দার্জ্জিলিং জেলার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া উঠিতে উঠিতে কাব্রু, জন্নু ও কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তুঙ্গ শিখরে গিয়া শেষ হইয়াছে।

শিলিগুড়ি হইতে ১২ মাইল দূরবর্ত্তী পরবর্ত্তী **রংটং** পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই রেলপথ ১নং লুপের সাহায্যে চক্রাকারে উপরে উঠিয়াছে। যেখানে পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া লাইন লইয়া যাইতে হইলে অনেকটা ঘুর হয়, সেইখানে লুপ বা চক্র তৈয়ার করিয়া সহজে গাড়ীকে উর্দ্ধে উঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। রংটং হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে রেলপথ সমতল ভূমি ছাড়িয়া পর্ব্বতগাত্রে অনেকদূর উপরে উঠিয়াছে।
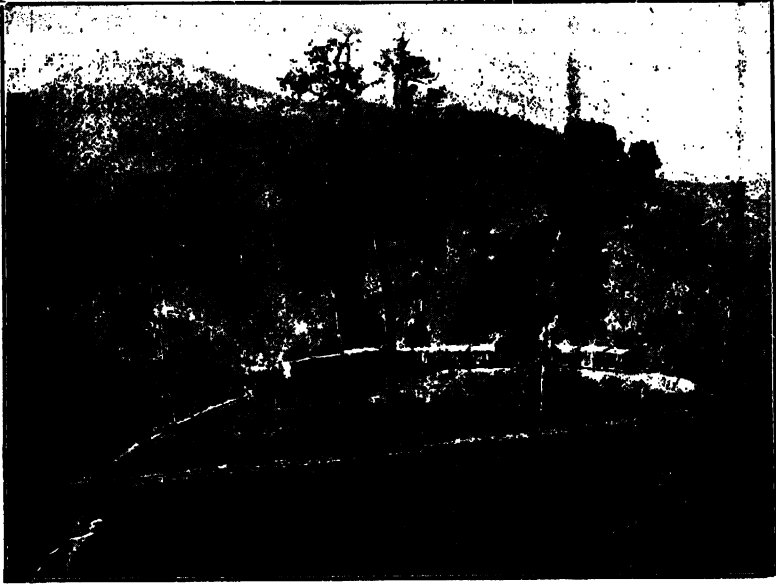
তিনধারিয়া লুপ

রংটং পার হইয়া সু-উচ্চ সেলিম পাহাড় (৩,৫০০ ফুট) সম্মুখে দৃষ্ট হয় এবং কিছু পরেই ২নং লুপ বা চক্র দিয়া রেলপথ উপরে উঠিয়াছে। এই ২নং চক্রের নিকটে চিতাবাঘের উপদ্রব সুবিদিত। কথিত আছে কুড়ি বৎসরে এই স্থানে শতাধিক ব্যক্তি চিতাবাঘের আক্রমণে প্রাণ হারাইয়াছে। বনানী ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিতেছে। বহুপ্রকারের লতাগুল্মবৃক্ষাদিতে উপত্যকা ও গিরিসঙ্কট কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে চা-বাগান ও নিম্নের বিস্তৃত সমতল ভূমির দৃশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অল্প পরেই ৩নং বা চূণাভাটী চক্র পার হইয়া শিলিগুড়ি হইতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী **চুণাভাটী** ছাড়াইয়া কার্সিয়ংএর নিকটস্থ মহলদীরাম পর্ব্বতের কুব্জাকার শিখরদেশ (৭,০০০ ফুট উচ্চ) সিটং পাহাড় দৃষ্টিপথে পড়িবে।

এইবার সহজে পর্ব্বতগাত্রের উপরে উঠিবার অপর অবলম্বন প্রথম রিভার্স টি (reverse) আসিয়া পড়িবে; ইহার সাহায্যে ট্রেণ প্রথমে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া পরে কিছু পিছু হটিয়া আবার সম্মুখে চলিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পথ ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে থাকে। প্রথম রিভার্স টির পরই শিলিগুড়ি হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী **তিনধারিয়া** স্টেশন। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে তিনধারিয়ার উচ্চতা ২,৮২২ ফুট। এখানে দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ের গাড়ী ও ইঞ্জিনের কারখানা অবস্থিত। পূর্ব্বদিকে প্ল্যাটফরমের অপর ধারে ভূটানের রুক্ষ পর্ব্বতশ্রেণী এবং কিছু দক্ষিণদিকে তিস্তা ও মহানদী বাংলার সমতল ভূমিতে প্রবাহিতা দেখা যায়।
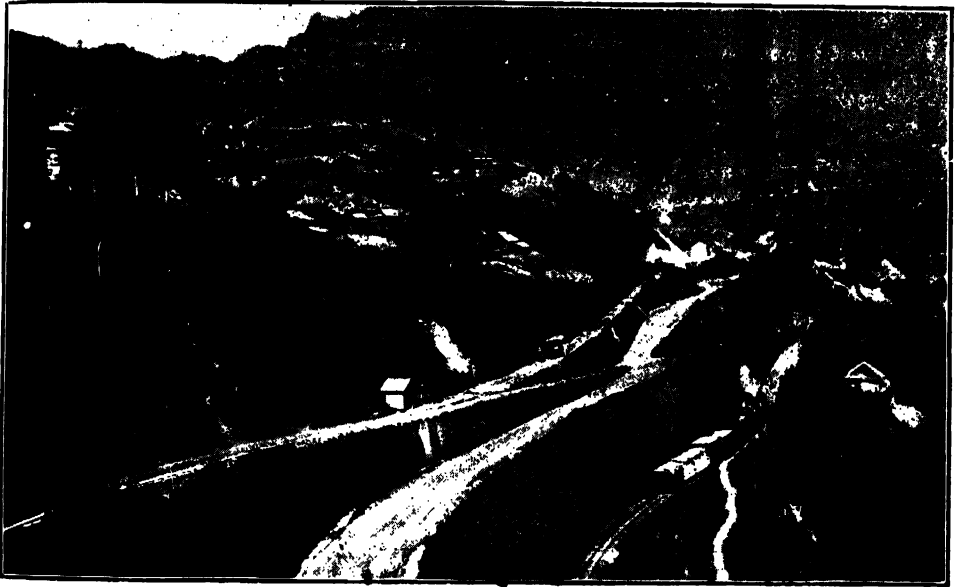
গয়াবাড়ীর নিকটবর্ত্তী দৃশ্য

তিনধারিয়া ছাড়িয়া যথাক্রমে ২ নং রিভার্স, ৪ নং চক্র ও ৩ নং রিভার্স পার হইয়া শিলিগুড়ি হইতে ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী **গয়াবাড়ী** স্টেশন। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩,৪৮০ ফুট উচ্চ।

গয়াবাড়ীর পরই ৪নং বা শেষ রিভার্স টি পড়ে। এখানকার পাথর লক্ষ্য করিবার বিষয়; ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহার নাম দিয়াছেন "সিকিম নাইস"। কাছেই প্রসিদ্ধ **পাগ্‌লাঝোরার** নিকট জল লইবার জন্য গাড়ী থামে। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ অধিক বারিপাতের জন্য ইহা ফাঁপিয়া ফুলিয়া উন্মত্ত বেগে বহিতে থাকে; এই জন্য ইহা পাগলা আখ্যা পাইয়াছে। এখানে ছয় ঘণ্টার মধ্যে চৌদ্দ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বারিপাত হইতে দেখা গিয়াছে। পাগ্‌লা ঝোরা প্রথম প্রথম রেলপথের অনেক ক্ষতি করিয়াছিল; এখন তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আনা হইয়াছে। এই উদ্দাম ও খেয়ালী জলধারাটিকে বন্ধননিপীড়িত দেখিয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথ ব্যথিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার কবিতায় পাগলাঝোরাকে তিনি অমর করিয়া গিয়াছেন। এই কবিতার কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করা হইল ;—

"তোমরা কি কেউ শুন্‌বে নাগো পাগ্‌লাঝোরার দুঃখ গাথা,
পাগল ব'লে কর্ব্বে হেলা ? কর্ব্বে হেলা মর্ম্ম ব্যথা ?
জন্ম আমার হিম উরসে কুলে আমার তুল্য নাই,
সিন্ধুনদের সোদর আমি গঙ্গাদিদির পাগলা ভাই।
তবুও শিকল পরিয়ে দিলে রাখলে আমায় বন্দীবেশে,
ক্ষুদ্র মানুষ স্বল্প আয়ু, আমায় কিনা বাঁধ্‌লে শেষে।
কৌশলে সে ফাঁদ ফেঁদেছে, পারিনে তায় ছিঁড়্‌তে বলে,
শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছি ক্রমে, পড়ছি গ'লে অশ্রুজলে।
আগে আমায় চিন্‌ত যারা বল্‌ছে শোনো যায়না চেনা।
বাজবে কবে প্রলয় বিষাণ—মুখে আমার উঠ্‌ছে ফেনা।
বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন সে থাক্‌বে আরো ?
রুদ্রতালে নাচব কবে ? তোমরা কেহ বল্‌তে পারো ?"
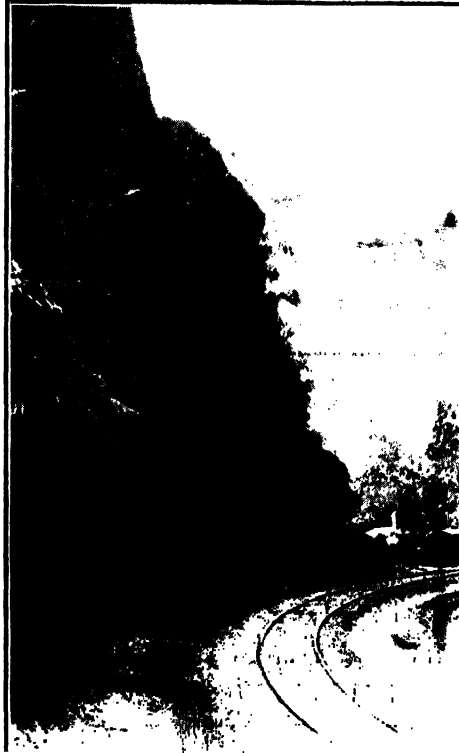
মহানদীর নিকটবর্ত্তী দৃশ্য

পাগ্‌লাঝোরা ছাড়াইয়া শিলিগুড়ি হইতে ২৮ মাইল দূরবর্ত্তী **মহানদী** স্টেশন ; স্টেশনের সম্মুখস্থ জঙ্গলাবৃত মহলদীরাম পর্ব্বত হইতে মহানদী বা মহানন্দার উৎপত্তি

হইয়াছে। এইরূপ অনুমিত হয় যে মহানদী নাম এই নদীর লেপ্চা নাম মহলদী কথার বাংলা অপভ্রংশ। মহলদীর অর্থ বাঁকা নদী ; এই নামের কারণ এই যে পাহাড় হইতে দেখা যায় এই নদী সমতলক্ষেত্রে পৌঁছিয়া হঠাৎ দক্ষিণদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার সহিত তুলনা করিয়া লেপ্চারা তিস্তাকে বলে রংত্যু বা সোজা নদী, কারণ ইহাকে সমতলভূমিতে সোজা যাইতে দেখা যায়। মহলদীরাম পর্ব্বতের নামের অর্থ মহালদী নদীর উৎস-স্থল।

মহানদী ছাড়িয়া একটি কাটিং (পাহাড়কে গভীর করিয়া কাটিয়া দুই পার্শ্বে পাহাড়ের উচ্চ প্রাচীর রাখিয়া রাস্তা) পার হইলে দূরে সমতলক্ষেত্রের দৃশ্য অপরূপ সুন্দর দেখায়। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে পর পর তিস্তা, মহানদী ও বালাসন এই তিনটি নদীকে পরিষ্কার ও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বালাসন বা বালুআসন নাম হইয়াছে ইহার বিস্তৃত ও স্বর্ণাভ বালুকাপূর্ণ নদীগর্ভ হইতে। শীঘ্রই ট্রেণ গিধর পাহাড়ের মধ্যে এক কাটিং পার হইলে অকস্মাৎ সম্পূর্ণ নূতন দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত হইবে। যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, শ্রেণীর পর শ্রেণী পাহাড়ের সারি নীল কুয়াসায় মিশিয়া গিয়াছে ; ইহাদের পাদদেশে তরাইয়ের ঘন জঙ্গলে অসংখ্য পার্ব্বত্য নদী ও নির্ঝরিণী সূর্য্যালোকে রূপার মত ঝিকি মিকি খেলিতেছে। ইহার পরেই কার্সিয়ং স্টেশন।

কার্সিয়ং—ইহা শিলিগুড়ি হইতে ৩২ মাইল, কলিকাতা হইতে ৩৫০ মাইল এবং দার্জ্জিলিং হইতে মাত্র ২০ মাইল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৪৮৬৪ ফুট উচ্চ। দার্জ্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ইহা একটি বড় স্টেশন। কার্সিয়ং দার্জ্জিলিং জেলার একটি মহকুমার সদর এবং দার্জ্জিলিংএর মত বড় শহর না হইলেও এ অঞ্চলে ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ।

হিমালয়ের তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গের মধ্যে এখান হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাব্রু ও জন্নুর কেবল শিখর দেশটুকু ঘুম পাহাড়ের উপর দিয়া জাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু কার্সিয়ংএর প্রকৃত আকর্ষণ হইল দক্ষিণদিকে বাংলার বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির দৃশ্য। লক্ষ্য করিবার বিষয় এখান হইতে পাহাড় যেন অকস্মাৎ নিম্ন ভূমিতে নামিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায় তিস্তা, উহার পর বাম হইতে দক্ষিণে পর পর মহানদী, বালাসন ও নেপাল সীমান্তের মেচী নদী ও বন্য হস্তীর লীলাভূমি মোরুং জঙ্গল ; উহার পর পরিষ্কার দিনে নেপালের মইখোলা ও জোক্মই নদীও দেখিতে পাওয়া যায়। তরাইএর জঙ্গল দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় মাঝে মাঝে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া চাষ আবাদ করা হইয়াছে, এখানে ওখানে চা বাগানের কারখানার টিনের ছাদ নজরে পড়ে। ঘন সবুজ, ফিকে সবুজ প্রভৃতি সবুজ রংএর পার্থক্য দ্বারা এত দূর হইতেও চা, ধান বা পাটের চাষ সহজেই ধরিতে পারা যায়।

কার্সিয়ংএর পশ্চিমদিকে ঠিক নীচেই বালাসন উপত্যকা এবং উহার অপর পারে নাগরী ও মিরিক নামক শৈলবাহু।

দার্জ্জিলিং‌এর মত উচ্চ নহে এবং এখানে অত বেশী শীত হয় না বলিয়া অনেকে দার্জ্জিলিং অপেক্ষা কার্সিয়ং পছন্দ করেন। এখানে দার্জ্জিলিং অপেক্ষা বৃষ্টি বেশী হয়। কার্সিয়ং‌এর চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য চা বাগান হইয়াছে এবং এখান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকের সমতল ভূমিতে নামিয়া যাইবার একটি পাকা রাস্তা আছে। শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং যাইবার পাকা রাস্তা কার্সিয়ং নগরের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং এই রাস্তার উপরেই প্রধান বাজার। কার্সিয়ং‌এ এখন দুই তিনটি স্কুল এবং অনেকগুলি বাড়ী হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান্ রেলের প্রধান আফিস দার্জ্জিলিং হইতে এখানে উঠিয়া আসায় কার্সিয়ং শহর খুব বড় হইয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত কার্সিয়ং সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তাহার পরে নেপালের গুর্খা রাজারা ইহা কাড়িয়া লন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরেজেরা গুর্খাদের হারাইয়া দিয়া উহা সিকিমের রাজাকে ফিরাইয়া দেন। সিকিমের রাজা ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এখানে ৫।৬ মাইল চওড়া পার্ব্বত্যভূমি ইংরাজ সরকারকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। একটি সামান্য গ্রাম হইতে কার্সিয়ং শহর গড়িয়া উঠিয়াছে।

কার্সিয়ং‌এর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে হইলে এখানে নামিতে হয়। এখানকার পথ ঘাটগুলি পরম রমণীয়। পাঙ্খাবাড়ী রোড, কার্ট রোড, ডাউ হিল রোড, প্রভৃতি রাস্তাগুলি অতিশয় মনোরম। এখানকার ঈগলস্ ক্র্যাগ্ (Eagle Crag) নামক পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিলে একদিকে বিস্তৃত সমতল ভূমি, অপর দিকে তুষার কিরীট-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ শ্রেণী সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোড়া ও ডাণ্ডি স্টেশনেই পাওয়া যায়, এজন্য যাত্রীদের চলাফেরারও সুবিধা রহিয়াছে।

কার্সিয়ং স্টেশন ছাড়িবার কিছু পরেই ট্রেণ হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাব্রু ও জন্নুর তুষার মণ্ডিত শ্বেত শিখর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পর শিলিগুড়ি হইতে ৩৭ মাইল দূরবর্ত্তী **টুঙ** স্টেশন পড়ে; সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ইহা ৫,৬৫৬ ফুট উচ্চ। এতক্ষণে গাছ পালা ও জঙ্গলের রূপ সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে।

টুঙ ছাড়িবার কিছু পরেই দক্ষিণে কার্সিয়ং শহর সুন্দর ভাবে দেখা যায়। তাহার পর পশ্চিমে ইংরেজী ধরণের বাড়ী ঘর ও গির্জ্জা-সম্পন্ন হোপ টাউন নামক একটি ক্ষুদ্র ইউরোপীয় বসতি ফেলিয়া ভিক্টোরিয়া ভাটিখানা ছাড়াইয়া শিলিগুড়ি হইতে ৪২ মাইল দূরবর্ত্তী **সোনাদা** পড়িবে। ইহা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৬,৫৫২ ফুট উচ্চ। ভাটিখানা স্টেশন হইতে আধ মাইল নীচে এবং হোপ টাউনে ইউরোপীয়দের বসতি স্থাপন বিশেষ সফল হয় নাই। লেপ্চা ভাষায় সোনাদার অর্থ ভল্লুকের গুহা; এককালে এ অঞ্চলে ভল্লুকের বিশেষ উৎপাত ছিল এবং এখনও এখানে ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়।

সোনাদার পর গভীর রিজার্ভ জঙ্গল পার হইয়া সুউচ্চ সিঞ্চল পাহাড়ের পাদদেশে ঘুম বাজারের মধ্য দিয়া শিলিগুড়ি হইতে ৪৮ মাইল দূরবর্ত্তী **ঘুম** স্টেশন। ইহা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৭,৪০৭ ফুট উচ্চ এবং এই রেলপথে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ

ান। পরবর্ত্তী স্টেশন দাৰ্জ্জিলিং যাইতে রেলপথ কিছু নামিয়া গিয়াছে। ঘুম স্টেশন ছাড়িয়া বাতাসিয়া বা শেষ চক্রটি পার হইবার সময় তুষারাচ্ছন্ন কাঞ্চনজঙ্ঘার বিরাট্ রূপ দর্শককে বিমোহিত করে; প্রথম দর্শনের স্মৃতি চিরকাল জাগরূক থাকে। ইহার পরই **দার্জ্জিলিং** স্টেশন।
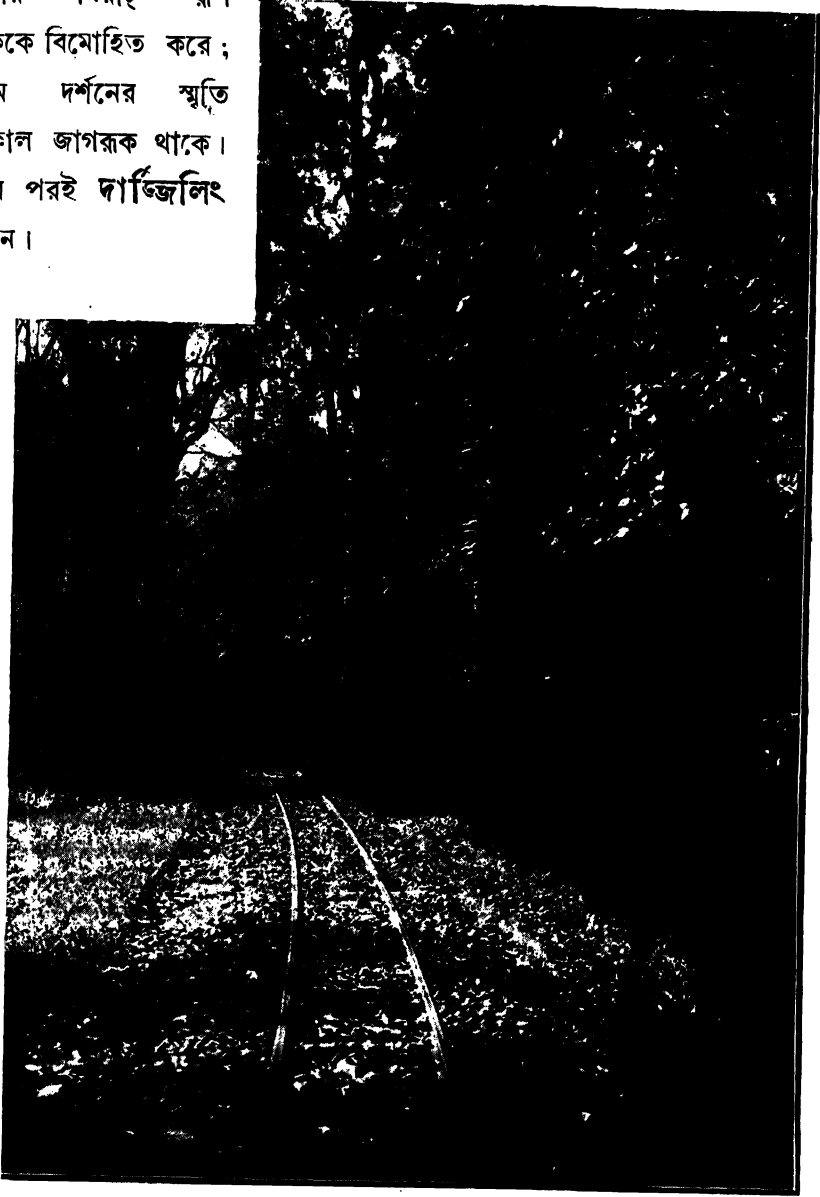
দার্জ্জিলিংএর পথে শালবনের দৃশ্য

দার্জ্জিলিং—ইহা শিলিগুড়ি হইতে ৬১ মাইল ও কলিকাতা হইতে ৩৬৯ মাইল দূরে অবস্থিত। ভারতবর্ষে যতগুলি পার্ব্বত্য নগরী আছে তাহার মধ্যে দার্জ্জিলিং

সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। এজন্য ইহার নাম পার্ব্বত্য নগরীর রাণী (Queen of the Hill Stations), সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৬,৮১২ফুট উচ্চ। এখান হইতে তুষার-মণ্ডিত বিস্তৃত শৈলশ্রেণী যেমন সুন্দর দেখা যায় ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর আর কোনও পার্ব্বত্য নগরী হইতে তেমন দেখা যায় না। সুবিশাল কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অবর্ণনীয়। জলাশয় বা নদী থাকার জন্য শ্রীনগর, নৈনিতাল, শিলং ও উটাকামণ্ড্ অনেকের মনোরঞ্জন করে বটে, কিন্তু চিরহরিৎবর্ণ ঘনপল্লব বিটপীমণ্ডিত পর্ব্বতরাজিবেষ্টিত সুমহান্ কাঞ্চনজঙ্ঘার বহুবিস্তৃত ও চিরশুভ্র শিখরমালা দার্জ্জিলিং হইতে যে ভাবে দেখা যায় সারা দুনিয়ায় তাহার তুলনা নাই।

পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গগুলির মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেও এত উচ্চ পর্ব্বত শিখর এমন মুক্তভাবে ও সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীর কোনও পার্ব্বত্য নগরী হইতে দৃষ্ট হয় না। মুসৌরী, সিমলা, ড্যালহৌসী বা মারী প্রভৃতি স্থানে এমন দুর্ভেদ্য ঘন এবং নয়নাভিরাম অরণ্যানী নাই।

কার্সিয়ংএর মত দার্জ্জিলিংও পূর্ব্বে সিকিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজেরা প্রথম দার্জ্জিলিং-এ আসেন এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে সিকিমরাজ বার্ষিক ৬০০০৲ টাকা খাজনা পাইয়া দার্জ্জিলিং পাহাড় ইংরেজ সরকারকে ছাড়িয়া দেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কার্সিয়ংএর নীচে পাঙ্খাবাড়ী হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত একটি রাস্তা তৈয়ারী হয়। সিকিমরাজ যে খাজনা পাইতেন তাহা দুই জন ইংরেজকে বন্দী করিবার অপরাধে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দার্জ্জিলিং এখন বাংলার লাট সাহেবের গ্রীষ্মনিবাস।

দার্জ্জিলিং শহরটি অর্দ্ধবৃত্তাকারে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এখানকার বাড়ীগুলি অধিকাংশ কাঠের এবং দরজাগুলি কাচের সার্শি দিয়া আঁটা।

দার্জ্জিলিং শহরের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ অংশের নাম কাটাপাহাড়; তাহার নীচেই জলাপাহাড়। ইহার উপর গোরা বারিক অবস্থিত এবং জলাপাহাড়ের উপর ইংরেজ সৈন্যদিগের জন্য স্বাস্থ্যনিবাস অবস্থিত। এই পাহাড়ের উপরিস্থ জঙ্গল আগুনে জ্বলিয়া বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া জলাপাহাড় নাম হইয়াছে।

শহরের মধ্যস্থলে 'অব্জরভেটরী হিল' নামক পাহাড়ও বেশ উচ্চ। পূর্ব্বে এখানে একটি মান মন্দির ছিল বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে অব্জরভেটরী পাহাড়। ইহার শিখরদেশে আরোহণ করিলে গিরি সম্রাট্ কাঞ্চনজঙ্ঘা ও পার্শ্ববর্ত্তী তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বত-শৃঙ্গগুলি অতি মনোরম দেখায়। পূর্ব্বদিকে দার্জ্জিলিং শহরটিও এখান হইতে সুন্দর দেখায়। পরিষ্কার দিনে এখান হইতে কালিম্পং শহরও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ রাত্রিতে দূর হইতে কালিম্পং এর আলোকমালা বিচিত্র ও রমণীয় মনে হয়।

কিংবদন্তী আছে যে অবজরভেটরী পাহাড়ের উপর দুর্জ্জয়লিঙ্গ নামে এক মহাদেবের মন্দির ছিল; এখন দুর্জ্জয়লিঙ্গ পাহাড়ের একটি গহ্বরে বিরাজ করিতেছেন। তথায় প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। দার্জ্জিলিং নামের উৎপত্তি দুর্জ্জয়লিঙ্গ হইতে হইয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা। পূর্ব্বে তিব্বতীয় বৌদ্ধদিগের এখানে একটি মঠ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নেপালীরা এঅঞ্চল জয় করার সময় মঠটি বিনষ্ট করে; এই মঠ সিকিমের প্রসিদ্ধ দার্জ্জিলিং মঠের শাখা ছিল। পুরাতন স্থানেই পাহাড়ের গুহার উপরে মঠটি পুনর্নির্ম্মিত করা হয়; কিন্তু পরে উহাকে অবজরভেটরী পাহাড়ের নীচে ভুটিয়া বস্তীতে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। মঠের পুরাতন স্থানটি এখনও পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়;
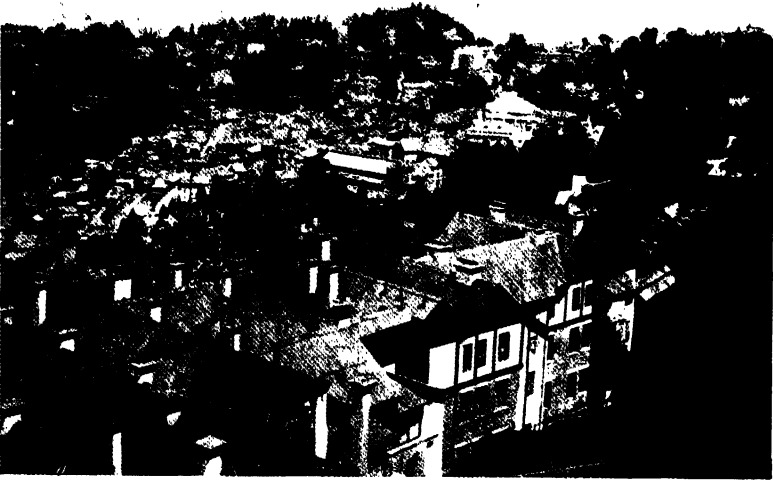
দার্জ্জিলিং শহরের দৃশ্য

তথায় ভুটিয়াদের ক্ষুদ্র একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি বৃহৎ প্রোথিত বংশদণ্ডে নানা মাপের বহু রঙীন নিশান ঝুলানো আছে। লোকের বিশ্বাস নিকটস্থ গুহাটি মাটির নীচ দিয়া বরাবর লাসা পর্য্যন্ত গিয়াছে। পাহাড়ের উপর পূর্ব্বে যে বৌদ্ধ মঠটি ছিল, তাহাকে "দোর্জে" বলা হইত; তিব্বতী ভাষায় দোর্জের অর্থ বজ্র; কেহ কেহ বলেন দোর্জের স্থান হইতে দার্জ্জিলিং নামের উৎপত্তি।

অব্জরভেটরী পাহাড়ের নীচে চারিদিক্ ঘিরিয়া ম্যাল্‌রোড্; ইহাই দার্জ্জিলিংএর প্রধান বেড়াইবার রাস্তা। যাঁহারা দূরে বেড়াইতে চাহেন তাঁহারা অক্‌ল্যাণ্ড রোড্ বা জলাপাহাড় রোড দিয়া ঘুম পর্য্যন্ত যাইতে পারেন।

ম্যালের নীচে অবস্থিত ভূটিয়া বস্তির বৌদ্ধ মঠ বা গোম্ফা দেখিয়া আসা উচিত। ইহা একটি সাধারণ দ্বিতল বাটী; ইহার চারিদিকে লম্বা লম্বা খুঁটী পুতিয়া দড়ি দিয়া বহু নিশান ঝুলানো আছে। প্রবেশ দ্বারের দুই পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ধর্ম্মচক্র আছে। ভিতরে বুদ্ধমূর্ত্তি, নানারূপ পূজার উপকরণ এবং বৌদ্ধ পুঁথির সংগ্রহ আছে। গোম্ফার উপরে রাস্তার ধারে জনৈক মৃত লামার স্মৃতিরক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত একটী চৈত্য আছে।

অব্জরভেটরী পাহাড়ের নীচে ম্যালরোডের এক কোণে বাংলার লাটের প্রাসাদ ও বার্চহিল পার্ক নামক সুন্দর স্বাভাবিক উদ্যান। এইখানে দার্জ্জিলিংএর পুরাতন জঙ্গল কিছু রক্ষিত হইয়াছে। বার্চহিল হইতে সূর্য্যাস্তের দৃশ্য অতীব মনোরম। বার্চহিল পার্কের নীচে দার্জ্জিলিংএর যাদুঘর, এই যাদুঘরে দার্জ্জিলিং জেলার অনেক জীবজন্তু এবং সকল রকম প্রজাপতি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

এখানকার আর একটি দর্শনীয় স্থান লয়েড বোটানিক্যাল গার্ডেন। মানুষের হাতে তৈয়ারী ৪২ বিঘা জমি জুড়িয়া এই উদ্যানটির সহিত বার্চহিলের স্বাভাবিক উদ্যানের পার্থক্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানকার গ্রীন হাউসে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর অর্কিড দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। এখান হইতে আধ মাইল দক্ষিণে ভিক্টোরিয়া জল-প্রপাত। কাগঝোরা নামে একটি ছোট পার্ব্বত্য নদী এখানে হঠাৎ প্রায় ১০০ ফুট নীচে গিয়া পড়িয়াছে।

বোটানিক গার্ডেনের উপরে দার্জ্জিলিংএর বাজারে বহু জাতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়। রবিবারে হাটের দিন ফল সব্জী প্রভৃতি জিনিষের আমদানি হয় এবং বহু দূর হইতে বহু লোক হাটে আসিয়া থাকে।

জলাপাহাড় রোড দিয়া কলিকাতা রোড ধরিয়া মাইল দুই যাইলে ভূটিয়াদের পুরাতন কবরস্থান দেখিতে পাওয়া যায়; এখানে বহু সমাধি চৈত্য আছে। এই রাস্তা হইতে পর্ব্বত ও উপত্যকার দৃশ্য সত্যই উপভোগ্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ ছোট গল্প "দুরাশা"র নবাবজাদীকে পাঠক পাঠিকার স্মরণ থাকিবে; তাঁহাকে দার্জ্জিলিংএর এই ক্যালকাটা রোডেই "দেখিতে" পাওয়া গিয়াছিল।

শিলিগুড়ি হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত কার্টরোড নামে যে পাকা রাস্তা আছে তাহা দার্জ্জিলিং অতিক্রম করিয়া উত্তরে নামিয়া গিয়া প্রায় পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী আলিবং বা লেবং পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহাও বেড়াইবার পক্ষে সুন্দর রাস্তা, সম্মুখে হিমালয়ের চিরতুষার ও উপত্যকা ও স্রোতস্বিনী গুলি ইহাকে মনোরম করিয়াছে। লেবং যাইবার আর একটি রাস্তা ভূটিয়া বস্তীর মধ্য দিয়া গিয়াছে; এ রাস্তায় চড়াই পড়ে, কিন্তু দূর মোটে দুই মাইল। লেবংএ এ অঞ্চলের আর একটি গোরা বারিক আছে এবং এখানকার সমতলমাঠে দার্জ্জিলিংএর ঘোড় দৌড় হয়। আলিবং কথাটির উৎপত্তি লেপ্চা ভাষার "আলি" অর্থে জিহবা ও "আবং" অর্থে মুখ হইতে। আলিবং হইতেই ইংরেজীতে লেবং হইয়াছে। বাস্তবিক লেবংকে দেখিলে মনে হয় ইহা যেন দার্জ্জিলিং পাহাড় হইতে জিহ্বার ন্যায় মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। লেবং হইতে উত্তরে ছয় মাইল আরও নামিয়া সমুদ্র

পৃষ্ঠ হইতে ৪,০০০ ফুট উচ্চ বাদামতম ডাকবাংলা হইতে দুই হাজার ফুট নীচে অবস্থিত গ্রেট রঙ্গীত নামক নদীর দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। নদী পর্য্যন্ত নামিতে আরও তিন মাইল পথ।

দার্জ্জিলিং হইতে যে সকল উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে সম্মুখেই মাত্র ৪৫ মাইল দূরবর্ত্তী কাঞ্চনজঙ্ঘা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮,১৪৬ ফুট উচ্চ। কাঞ্চনজঙ্ঘা কথাটি তিব্বতী কাং-ছেন-দ্জোং-গা হইতে আসিয়াছে; ইহার শাব্দিক অনুবাদ হইল বরফ-বড়-খাজাঞ্জিখানা-পাঁচ। পাহাড়টির পাঁচটি শিখর হইতে এইরূপ নাম হইয়াছে। উচ্চতম শিখরটি সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় সোণার রং ধারণ করে বলিয়া ইহাকে সোণার খাজাঞ্চিখানা বলা হয়; দক্ষিণের শিখরটি সূর্য্যোদয়ের আগে পর্য্যন্ত ধূসরবর্ণ থাকে এবং সূর্য্য উঠিলে রূপার মত ঝক্ ঝক্ করে বলিয়া ইহাকে বলে রূপার খাজাঞ্চিখানা; বাকী শিখরগুলিকে রত্ন, শস্য ও শাস্ত্রের খাজাঞ্চিখানা বলা হয়; তিব্বতীয়দের নিকট এইগুলিই পার্থিব সম্পত্তির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। কাঞ্চনজঙ্ঘার পশ্চিমে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪,৩১৫ ফুট উচ্চ কাব্রু এবং ২৫,৩০০ ফুট উচ্চ জানো বা কুম্ভকর্ণ; কাব্রু দেখিতে দুই খুঁটি-ওয়ালা তাঁবুর মত এবং জন্নু দেখিতে তীক্ষ্ণ শৃঙ্গের ন্যায়। কাঞ্চনজঙ্ঘার পূর্ব্বদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২২,০২০ ফুট উচ্চ পানদিম; ইহার অর্থ রাজমন্ত্রী—পর্ব্বতরাজ কাঞ্চনজঙ্ঘার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। পানদিমের পূর্ব্বে তুষারাবৃত পর্ব্বতশ্রেণী লম্বা চলিয়া গিয়াছে; ইহার মধ্যে প্রধান মোচারমত দেখিতে নরসিং ১৮,১৪৫ ফুট উচ্চ, সিনিওল্চু ২২,৫২০ ফুট উচ্চ এবং টেবিলের পৃষ্ঠের ন্যায় শিখরযুক্ত কিন্‌চিনঝাউ ২২,৭২০ ফুট উচ্চ। তিব্বতী ভাষায় কিন্‌চিনঝাউ অর্থে শ্মশ্রুধারী বৃহৎ বরফের শিখর, পর্ব্বতগাত্র হইতে লম্বমান তুষারপিণ্ডগুলি দেখিতে শ্মশ্রুর মত বলিয়াই ইহার এইরূপ নাম।

অজেয় এভারেস্টের তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করিতে এ পর্য্যন্ত যত অভিযানকারীর দল আসিয়াছেন, তাঁহাদের বেশীর ভাগই দার্জ্জিলিংএ আসিয়া রসদ ও কুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেই আজ পর্য্যন্ত বিফল হইয়াছেন এবং ম্যালোরী, আর্ভিন্ প্রভৃতি এই বীরোচিত কার্য্যে অগ্রসর হইয়া মৃত্যু বরণ করিয়া অপরাজেয় মানবাত্মার অন্তহীন উদ্যমের সাক্ষ্য দিতেছেন। ভারতবাসী হিমালয়কে সত্যই বলিতে পারেন

তুমি ভারতের সাক্ষী তুমি তার গৌরব পতাকা,
যত গর্ব্ব যত বীর্য্য সবই তার তব অঙ্গে লিখা।

দার্জ্জিলিং-এ রামকৃষ্ণ আশ্রম, গৌড়ীয় মঠ, ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আছে। এখানকার সেণ্ট এণ্ড্রুজ গির্জ্জায় ভারতবর্ষের প্রথম ভাইসরীন লেডী ক্যানিংএর সম্মানে একটি স্মৃতি ফলক আছে; তরাইএ স্বাভাবিক দৃশ্যের ছবি আঁকিবার সময় জ্বরে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। বারাকপুরে ইঁহার সমাধির কথা আগে বলা হইয়াছে। এখানকার বিলাতি হোটেলগুলির মধ্যে মাউণ্ট এভারেস্ট হোটেল, বেলভিউ হোটেল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। অন্যান্য পার্ব্বত্য নগরী অপেক্ষা বাঙালী ও ভারতবাসীদের পক্ষে দার্জ্জিলিংএ

থাকিবার অনেক সুবিধা আছে। দেশীয় হোটেল প্রভৃতির মধ্যে সেণ্ট্রাল বোর্ডিং একেবারে স্টেশনের নিকটে অবস্থিত। বাজার হইতে অল্প একটু দূরে রেল স্টেশনের নিকটে কার্টরোডের উপর লাউইস্ জুবিলি স্যানিটেরিয়াম্। ইডেন স্যানিটেরিয়াম্ যেরূপ কেবল ইউরোপীয়দের জন্য, এইটি সেইরূপ কেবল ভারতবাসীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। প্রতি বৎসর বিজয়ার দিন এখানে শহরের সমস্ত বাঙালীরা মিলিত হইয়া ক্রীড়া কৌতুক ও আনন্দের ভিতর দিয়া সময় অতিবাহিত করেন। রেল স্টেশনের কাছেই ধর্ম্মশালা; ধর্ম্মশালায় থাকিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু আহারাদির ব্যবস্থা নিজেদের করিতে হয়। নিরামিষ-ভোজীদের পক্ষে এই ত্রিতল ধর্ম্মশালাটি খুবই সুবিধাজনক। মাড়োয়ারীরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই ত্রিতল ধর্ম্মশালাটি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বাংলাদেশের মধ্যে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ও নিকটবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে বহু লোক আসিয়া থাকেন।

দার্জ্জিলিংএ দুইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। একটি গবর্ণমেণ্ট জেলা স্কুল, অপরটি বাঙালী বালিকাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত মহারাণী স্কুল। ইহার সংলগ্ন বোর্ডিংএ প্রবাসী বালিকাদের থাকিবার সুবন্দোবস্ত আছে। কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ ও বর্দ্ধমানের মহারাণী—এই তিন জন মহারাণীর চেষ্টা ও যত্নে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম "মহারাণী স্কুল।" ইহা ছাড়া ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী বালক বালিকাদিগের জন্য ভালো স্কুল আছে।

দার্জ্জিলি শহরের "ষ্টেপ এসাইড" নামক বাড়ীতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়। তাহার জন্যও বাঙালীর নিকট ইহা স্মরণীয় স্থান।

এই শহরের জন সংখ্যা আনুমানিক ২৮,৬০০। ইহার এক পঞ্চমাংশ বাঙালী। পার্ব্বত্য অধিবাসীরা তিনটি বিভিন্ন জাতির; পাহাড়িয়া বা নেপালী, ভুটিয়া ও লেপচা। ইহাদের মধ্যে পাহাড়িয়াগণ দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর।

দার্জ্জিলিং চা আবাদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দার্জ্জিলিংএর চা সুগন্ধির জন্য বিখ্যাত। সমগ্র জেলায় প্রতি বৎসর গড়ে ২১,০০০,০০০ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়।

দার্জ্জিলিংএর আশে পাশে—দার্জ্জিলিংএর আগের স্টেশন ঘুম হইতে সুন্দর জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা দিয়া দুই মাইল চড়াই উঠিয়া সিঞ্চল পাহাড়ের উপরিস্থিত ডাক-বাংলা। ইহা উচ্চে ৮,১৬৩ ফুট। পূর্ব্বে এখানে গোরা বারিক ছিল। উহা জলা-পাহাড়ে লইয়া যাওয়া হয়। এখন ইহা গলফ খেলার মাঠ হইয়াছে। সিঞ্চল হইতে আরও এক মাইল উঠিয়া টাইগারহিল বা বাঘ পাহাড়ের উপরে যাইতে হয়। সিঞ্চল ও বিশেষতঃ টাইগার হিল হইতে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলী যেরূপ অপূর্ব্ব সুন্দর দেখায় দার্জ্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী আর কোথা হইতে তাহার তুলনা হয় না। দক্ষিণে কার্সিয়ং পাহাড় ও বাংলার সমতল ভূমি ও তরাইএর মধ্য দিয়া তিস্তা, বালাসন, মহানদী ও মেচী যেন মানচিত্রে আঁকা রহিয়াছে। উত্তরে ঠিক সিঞ্চলের নীচে ৭০০০ ফুট নিম্নে

অবস্থিত রঙ্গীত নদীর গভীর উপত্যকা; রঙ্গীত গিয়া তিস্তাতে মিশিয়াছে। তিস্তার ওপারে সিকিম, নেপাল ও ভূটানের পাহাড় শ্রেণীর পর শ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহাদের উপরে অর্দ্ধ দিগ্‌মণ্ডল ব্যাপিয়া জাগিয়া আছে তুষারাবৃত শিখরের পর শিখর। কাঞ্চন-জঙ্ঘা, কাব্রু, জানো, পান্‌দিম্‌, নরসিং প্রভৃতির দৃশ্য এখান হইতে আরও সুন্দর, আরও মহান্‌। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে তুষারাচ্ছন্ন চোঙ্গাশ্রেণীর পশ্চাতে ৪ মাইল দূরে তিব্বতের চুমুলহারি পর্ব্বত (২৩,৯২৯ ফুট) বৃহৎ গোলাকার তুষারস্তূপ রূপে দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম কোণে সিঙ্গলীলার কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতশ্রেণীর উপর দিয়া শত মাইল দূরে জগতের উচ্চতম পর্ব্বতশিখর ২৯,০০২ ফুট উচ্চ এভারেস্টের শীর্ষদেশটুকু অপর দুইটি পর্ব্বতশৃঙ্গের মধ্যস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। পার্শ্ববর্ত্তী দুইটির মধ্যে ২৭,৭৯৯ ফুট উচ্চ আরাম-কেদারার মত দেখিতে মাকালুকে, অনেক নিকটে অবস্থিত বলিয়া এভারেস্ট অপেক্ষা বড় বলিয়া ভ্রম হয়। টাইগার হিল হইতে চিরতুষার-হিমালয়ের গাত্রে সূর্য্যোদয় দেখিতে পাওয়া জীবনের এক দুর্ল্লভ অভিজ্ঞতা। উদীয়মান্‌ সূর্য্যের আলোকচ্ছটায় বরফের গায়ে পর
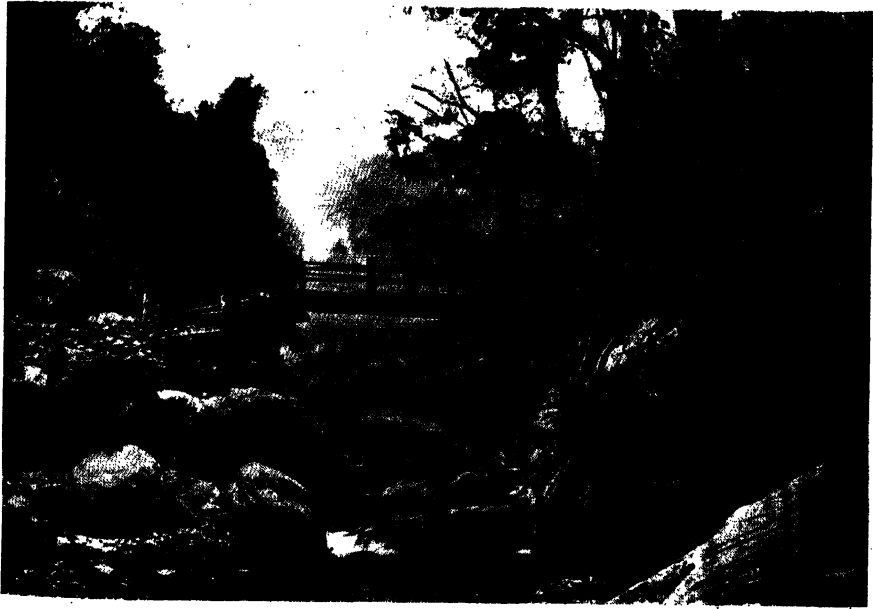
দার্জ্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী একটি সুন্দর দৃশ্য

পর কত রং যে ফলিত হয় তাহা ভাষার দ্বারা বুঝান যায় না। রাত্রি থাকিতে দার্জ্জিলিং হইতে পদব্রজে, অশ্বপৃষ্ঠে বা রিক্‌শা আরোহণে সহজেই সূর্য্যোদয় দেখিয়া আসা যায়। অনেকে সিঞ্চল ডাকবাংলায় আসিয়া রাত্রি যাপন করেন এবং প্রত্যুষে উঠিয়া টাইগার হিলে চলিয়া যান। উত্তর-পশ্চিম সিঞ্চলের গাত্রে দার্জ্জিলিংএর জল সরবরাহের কারখানা। পাহাড়ের গা হইতে জল ধরিয়া থিতাইবার জন্য অনেকগুলি ছোট ছোট পুষ্করিণী আছে।

ঘুম গ্রামটি তিনটি প্রধান রাস্তার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। একটি শিলিগুড়ি হইতে কার্ট রোড, দ্বিতীয়টি পশ্চিমে নেপাল সীমান্তে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী সীমানাবস্তি পর্য্যন্ত এবং তৃতীয়টি পূর্ব্বদিকে তিস্তা উপত্যকা হইয়া কালিম্পং পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে তিব্বত গিয়াছে।

ঘুম হইতে পশ্চিমে সীমানাবস্তির রাস্তা ধরিয়া ৪ মাইল গেলে ১০০ ফুট উচ্চ একটি প্রকাণ্ড বিচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলের ইহা একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। ইহার উপর হইতে পশ্চিমে বালাসন উপত্যকার দৃশ্য অতি চমৎকার। কথিত আছে, বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদিগকে এই পাথরের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া সংহার করা হইত।

এই রাস্তা ধরিয়া আরও তিন মাইল যাইয়া ঘুম হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী **সুকিয়া-পোখরী** গ্রাম। এখানে প্রত্যেক শুক্রবার একটি বড় হাট বসিয়া থাকে। এই হাটে নেপাল হইতে অনেক মাল আমদানী হয়। ইহার পরে পথ ঘন জঙ্গলমধ্য দিয়া উঠিয়া ১ মাইল দূরে জোড়াপোখ্‌রী ডাকবাংলায় পৌঁছায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৪০০ ফুট উচ্চ অরণ্যমধ্যে এই ডাকবাংলাটির অবস্থান ছবির মত। তিন মাইল পরের নেপাল সীমানায় অবস্থিত সীমানাবস্তি গ্রাম ও বাজার। ইহার কিছু অংশ নেপাল রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরে রাস্তা ছোট হইয়া উত্তরদিকে সীমান্ত ধরিয়া গিয়াছে। এই পথে শুধু অশ্বপৃষ্ঠে বা পায়ে হাঁটিয়া চলা যায়।

এই পথ দিয়া ৯ মাইল যাইলে ঘুম হইতে ১৯ মাইল দূরবর্ত্তী তংলু বা তুমলিং ডাকবাংলা। নেপাল সীমান্তের নিকটেই ইহা অবস্থিত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১,০৭৪ ফুট উচ্চ। এখান হইতেও সম্মুখে কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তর পূর্ব্বে দংকিয়া (২৩,১৭৬ ফুট) ও চুমুলহারি পর্ব্বতের তুঙ্গ শিখর ও তুষারপুষ্ট তিস্তা নদী, পশ্চিমে নেপালের উপত্যকাগুলি ও কোশী নদী ও দক্ষিণে উত্তরবঙ্গের সমতল ভূমি প্রভৃতির দৃশ্য অতি সুন্দর।

রাস্তা ধরিয়া আরও ১৪ মাইল যাইলে ঘুম হইতে ৩৩ মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১১,৯২৯ ফুট উচ্চ **সন্দকফু** ইনস্‌পেকশন বাংলা অবস্থিত; ইহা দার্জ্জিলিং জেলার অন্তর্গত উচ্চতম শিখর সিঙ্গলীলা পর্ব্বতশ্রেণীতে অবস্থিত। হিমালয়ের দৃশ্য এত সুন্দর দার্জ্জিলিং জেলার আর কোথা হইতেও দেখিতে পাওয়া যায় না। ভূটান, সিকিম ও নেপালের তুষারাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালা প্রায় দুইশত মাইল ব্যাপিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে কাব্রু, জানো ও পান্‌দিম। সম্মুখের বিরাট কাঞ্চনজঙ্ঘা এবং শত মাইল পশ্চিমদিকে শ্রেণীর পর শ্রেণী পাহাড়ের উপরে বিশাল আরাম কেদারার আকারের মাকালুর পশ্চাতে মহিমান্বিত ও কমনীয় এভারেস্টের তুঙ্গ শিখর। নরসিং, দংকিয়া, চোলা ও চুমুলহারি এই স্থান হইতে আরও ভাল দেখা যায়। তিব্বতী ভাষায় সনদকফুর অর্থ বিষাক্ত গাছের পাহাড়, কারণ এখানে সেঁকো বিষের গাছ বহু পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

এখান হইতে আরও ৯ মাইল উত্তরে যাইলে ঘুম হইতে ৪৬ মাইল দূরবর্ত্তী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১১,৮১১ ফুট উচ্চে অবস্থিত ফালুট ইনস্‌পেক্‌শন্ বাংলা; এখান হইতেও

সনদকৃফুএর মত দৃশ্যাবলী সম্মুখে বিরাজিত, তবে এভারেস্টকে প্রায়ই দেখা যায় না; কারণ মাকালু দিয়া ঢাকা পড়িয়া যায়। কিন্তু মাত্র ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তাহার নিকটস্থ শিখরগুলি আরও বড় দেখায়। ফালুট কথাটি আসিয়াছে লেপ্চা ভাষায় "ফাক-লুট" হইতে, ইহার অর্থ খোলা-ছাড়ানো পাহাড়। এই নামের কারণ, এই পাহাড় শুষ্ক বৃক্ষহীন, কিন্তু ইহার নীচের পাহাড়গুলি ঘন জঙ্গলে পূর্ণ।

দার্জ্জিলিং হইতে একদিনে জোড়পোখ্‌রী, দ্বিতীয় দিনে তংলু বাংলা, তৃতীয় দিনে সনদকফু ও চতুর্থ দিনে ফালুট পৌঁছান যায় এবং আট দিনে দার্জ্জিলিং ফিরিয়া আসা যায়। ফালুট না যাইতে পারিলেও ছয় দিনে সনদকফু একবার দেখিয়া আসা উচিত।

ঘুমের জোড়বাংলা বাজারের মধ্য দিয়া পূর্ব্বদিকে কালিম্পংএর রাস্তাটি গিয়াছে। রঙ্গরুন জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়া ৬ মাইল পরে রাস্তা সরু হইয়া গিয়াছে এবং বাকী রাস্তাটুকু অশ্বপৃষ্ঠে বা পদব্রজে যাইতে হয়। এখান হইতে আরও ৮ মাইল গিয়া ঘুম হইতে ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী লোপচু বাংলায় পৌঁছান যায়; এখান হইতে রঙ্গীত উপত্যকা, ভূটান পাহাড় ও কালিম্পং সুন্দর দেখা যায়। লোপ্চু হইতে অরণ্য মধ্যদিয়া ৫ মাইল নামিলে পশোক বাংলা। ইহা ছাড়িয়া অল্প দূর গেলে ২,৫০০ ফুট নিম্নে অবস্থিত রঙ্গীত ও তিস্তার সঙ্গম অতি সুন্দর দেখায়।

লোপ্চু হইতে কালিম্পংএর রাস্তা ধরিয়া আর মাত্র ৭ মাইল যাইলে তিস্তা নদী দেখা যায়।

ঘুম হইতে তিস্তা তীর পর্য্যন্ত ২১ মাইলে পথটি ৭,০০০ ফুট হইতে ৭০০ ফুটে নামিয়াছে। তিস্তার উপর এই স্থানে একটি সুন্দর ঝুলান সাঁকো আছে; শিলিগুড়ি হইতে কালিম্পং আসিতে হইলেও এই সাঁকো পার হইতে হয়। এই সাঁকো পার হইয়া ভাল গাড়ীর রাস্তায় কালিম্পং ৯॥০ মাইল দূর, কিন্তু অশ্বপৃষ্ঠে, রিক্‌শাতে বা পদব্রজে সোজা পাহাড়ে রাস্তা দিয়া মাত্র ৭ মাইল পড়ে।

এই সাঁকো হইতে মাত্র ৩ মাইল উত্তরে তিস্তার পশ্চিমকুলে গ্রেট রঙ্গীত নদী আসিয়া মিশিয়াছে। ইহা দার্জ্জিলিং জেলার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ রমণীয় স্থান। অরণ্য-বেষ্টিত তুইটি পার্ব্বত্য নদীর এই সঙ্গম স্থলটি সত্যই অতি মনোরম। লক্ষ্য করিবার বিষয় তুইটি নদীর জলের রং সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিস্তার জল স্ফীত ও দুগ্ধশুভ্র ও রঙ্গীতের জল স্বচ্ছ ও ঘোর সবুজ। এই রংঙের পার্থক্য সঙ্গমের পরেও বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। তাহা ছাড়া রঙ্গীতের জল তিস্তার জল অপেক্ষা অনেক উষ্ণ। এই বর্ণ ও তাপের পার্থক্যের কারণ রঙ্গীত প্রধানতঃ নিম্ন হিমালয়ের বারিপাত হইতে পুষ্ট আর তিস্তা উচ্চ হিমালয়ের তুষার ধারা হইতে উদ্ভুত।

দার্জ্জিলিং হইতে লেপ্চু, পশোক ও কালিম্পং যথাক্রমে ২, ৩ ও ৪ দিনে দেখিয়া ফিরিয়া আসা যায়।

দার্জ্জিলিং হইতে এই সকল ও অন্যান্য স্থান দেখিয়া আসিতে হইলে ডেপুটি কমিশনরের দপ্তর হইতে প্রকাশিত নোটস্ অন্ টুরস্ (Notes on Tours) দ্রষ্টব্য। তাহা ছাড়া ডাকবাংলোর ব্যবস্থা এই দপ্তরেই করিতে হইবে।

কালিম্পংএর পথে—শিলিগুড়ি ছাড়িয়া শিলিগুড়ি রোড স্টেশন হইতে তিস্তা উপত্যকা শাখা নির্গত হইয়াছে। শাখাটি প্রথম ১২ মাইল সমতলক্ষেত্র ও অল্প পরেই তরাইএর শালবন দিয়া গিয়াছে, এই বনে ব্যাঘ্র ও বন্য হস্তী আছে। ইহার পর রেলপথ একটি সুন্দর সাঁকো দিয়া সেবক নদী পার হইয়াছে; সাঁকোটি অতিক্রম করিয়াই সেবক তিস্তার সহিত মিশিয়াছে। সেবক নদীর অপর পারে শিলিগুড়ি হইতে ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী এই শাখার প্রথম স্টেশন **সেবক**। ইহার পরেই রেলপথ হঠাৎ তিস্তা উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছে। এই স্থানে তিস্তা পার্ব্বত্যপথে গভীর ও সঙ্কীর্ণ খাদে প্রবাহিত হইয়া সমতল ভূমিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তিস্তা উপত্যকায় প্রবেশ করিলেই দেখা যাইবে যে নিবিড় জঙ্গলাবৃত তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং নিকটেই তিস্তা তর তর করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। শীতকালে নদীর জল যখন সবুজ রং ধারণ করে এবং উপরের ঝুঁকে পড়া লতাপাতার মধ্য হইতে শাদা পাথরগুলি উঁকি দিতে থাকে তখন সত্যই দৃশ্যটি বর্ণ বৈভবে বিচিত্র হইয়া উঠে। বর্ষাকালে জলের রং প্রায় দুধের মত শাদা হইয়া উঠে এবং এত সুন্দর থাকে না; কিন্তু ইহার পরিমাণ ও গতিবেগ অনেক বাড়িয়া যায় এবং কোথাও কোথাও স্রোতের গতি ঘণ্টায় ১৪ মাইল হইয়া উঠে। এইরূপে এই তুঙ্গ ও সঙ্কীর্ণ উপত্যকা দিয়া রেলপথ পর্ব্বত ও জঙ্গল-মধ্য দিয়া গিয়া শিলিগুড়ি হইতে ১৮ মাইল দূরে কালীঝোরা নদীর পুল অতিক্রম করে। নিকটেই কালীঝোরার জলপ্রপাতের দৃশ্য অতি মনোরম; ৫৫০ ফুট উচ্চ পর্ব্বত হইতে কালীঝোরা ঝর ঝর রবে অবতীর্ণ হইয়া রেলপথের পাশেই তিস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। এখানকার দৃশ্য অতি সুন্দর; অনেকে এখানে বনভোজনে ও শিকারে আসেন। কালীঝোরার জল কৃষ্ণাভ বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

কালীঝোরার পর রিয়াং স্টেশন পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তুষারাবৃত পর্ব্বত শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। রিয়াং নদীর পুল পার হইয়া রেলপথ ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা কৌশলে পুলের উপরে রিয়াং স্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছে। **রিয়াং** শিলিগুড়ি হইতে ২৫ মাইল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রিয়াং নদী এক রাত্রির মধ্যে পুরাতন খাদ ত্যাগ করিয়া নূতন খাদে বহিতে থাকে। পুরাতন পুলের স্তম্ভগুলি শুষ্ক পাথর ও নুড়ির মাঝে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বকার খাদের সাক্ষ্য দিতেছে।

রিয়াং স্টেশন হইতে মাত্র ৩।৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রিয়াং নদীর উত্তরে অবস্থিত মংপু গ্রাম। দার্জ্জিলিং পথের সোনাদা স্টেশন হইতেও মংপু যাওয়া যায়; সোনাদা হইতে পূর্ব্বদিকে ১১ মাইল দূর এবং মাঝপথে ৫,৬১৫ ফুট উচ্চে অবস্থিত সরাইল বাংলা পড়ে। মংপু বঙ্গের সিন্‌কোনা আবাদের সদর ও প্রধান কেন্দ্র, এই অঞ্চল সিন্‌কোনা চাষের বিশেষ উপযোগী। এখানকার বিভিন্ন আবাদের নাম, রংজো উপত্যকার রাংবী ও মংপু বিভাগ; রিয়াং উপত্যকার সিটং ও লবদা বিভাগ ও কালিম্পংএর উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত দিওলো পাহাড় হইতে পিওং পর্য্যন্ত রংপো উপত্যকার মুনসং বিভাগ। সিন-কোনার চাষ সরকারের একচেটিয়া কারবার। ভারতবর্ষে ইহা কেবল নীলগিরি ও দার্জ্জিলিংএর পাহাড়েই হইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু হইতে চারা ও বীজ আনাইয়া নীলগিরিতেই প্রথম আবাদ সুরু ও সফল হয়। দক্ষিণ আমেরিকার আন্‌ডিজ পার্ব্বত্য অঞ্চলে বনে জঙ্গলে ইহা আপনি জন্মিয়া থাকে। দার্জ্জিলিংএ সিনকোনা চাষের

আরম্ভ হয় ১৮৬১-৬২ খৃষ্টাব্দে। প্রথমে সিঞ্চল পাহাড়ের শীর্ষ দেশে চারা লাগানো হয়। কিন্তু, অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য অচিরেই সাময়িক ভাবে লেবংএ নামাইয়া আনা হয় এবং শেষে দার্জ্জিলিং হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে রংবীতে স্থায়ীভাবে চাষ আরম্ভ হয়। সিনকোনা চাষ অত্যন্ত যত্নসাপেক্ষ। মংপুতে সিনকোনা গাছের শুক্‌না ছাল রাখিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুদাম আছে; সকল আবাদগুলি হইতে ছাল আনিয়া মংপুর কারখানায় কুইনাইন প্রস্তুত করা হয়। প্রথমে ছালগুলি মিহি করিয়া গুঁড়া করিয়া অতি সূক্ষ্ম রেশমের ছাঁক্‌নী দিয়া ছাঁকিয়া কষ্টিক্ সোডা ও জলের সহিত মিশাইয়া আলোড়ন করা হয়; ইহাতে ছাল হইতে কুইনাইন বাহির হইয়া আসে। ইহার পর ইহাতে তেল ঢালিয়া নাড়িতে থাকিলে কুইনাইন তেলের মধ্যে চলিয়া আসে এবং গুলিয়া যায় এবং নীচে জলের মধ্যে ছালের অবশিষ্ট অংশ পড়িয়া থাকে। উপরের তেল ঢালিয়া লইয়া সারি সারি চৌবাচ্চার মধ্যে রাখিয়া সালফিউরিক এসিড্ মিশ্রিত করা হয়; ইহাতে কুইনাইন সালফেট্ তৈয়ারী হয় এবং তেল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নীচে পড়িয়া যায়; উপর হইতে তেলটুকু পুনর্ব্যবহারের জন্য পৃথক করিয়া লওয়া হয়। এসিড-পূর্ণ নীচের অংশটি অপর একটি পাত্রে লইয়া গিয়া কস্‌টিক সোডা দিয়া অতিরিক্ত এসিডের ভাগ দূর করা হয়; তখন কুইনাইন সালফেট্ দানা বাঁধিয়া উঠে; দানাগুলি ছাঁকিয়া লইয়া গরমজলে পুনরায় গুলিয়া অপর এক প্রক্রিয়া দ্বারা ইহা হইতে রং প্রভৃতি দূর করিয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। কুইনাইন সালফেট মিশ্রিত জল ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা করিতে দিলে পুনরায় দানা বাহির হইয়া আসে। সেনট্রিফিউগাল যন্ত্রের সাহায্যে দানাগুলি হইতে শেষ বিন্দু জল বাহির করিয়া লইয়া একটি উষ্ণ কক্ষে এগুলি শুকাইয়া কাগজের মোড়ক করিয়া বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে পেরুর তদানীন্তন স্পেনীয় রাজ প্রতিনিধির পত্নী কাউনটেস চিন্‌চিন (Chinchon) সিনকোনা ছাল ব্যবহার করিয়া জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করেন। তাঁহার নাম হইতেই সিনকোনা নামের উৎপত্তি, নহিলে প্রথমে ইহা "পেরুভিয়ন বার্ক" বা পেরুদেশীয় ছাল নামে পরিচিত ছিল। কুইনাইন কথার উৎপত্তি পেরুর ইণ্ডিয়ানদিগের ভাষার শব্দ "কিনা" হইতে; কিনা অর্থে গাছের ছাল বুঝায়।

এবার পুনরায় রেলপথে ফিরিয়া রিয়াং স্টেশন হইতে কালিম্পংএর দিকে অগ্রসর হওয়া যাক। রিয়াং স্টেশনের কাছে এবং স্টেশন ছাড়িবার অব্যবহিত পরেই নদীর দৃশ্য অপূর্ব্ব মনোরম হইয়া উঠে। তিস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুতগতিতে বহিয়া চলিয়াছে, নদীর বাঁকে বাঁকে শুভ্র বালুকারাশি ও চক্‌চকে পাথর ও নুড়ির স্তূপ এবং চারিদিকে সুউচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। সবগুলি মিলিয়া নিঁখুত একটি দৃশ্যপট রচনা করিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া রেলপথ চলিয়াছে, কখনও প্রায় ১০০ ফুট নীচে প্রবাহিত তিস্তার একেবারে উপরে আসিয়া পড়িয়াছে, কখনও বা একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে। দৃশ্য গুলি ক্রমেই সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইয়া উঠিতেছে। ইহার পর এই শাখাপথের শেষ স্টেশন শিলিগুড়ি হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী গিয়েলখোলা আসিবে।

গিয়েলখোলা হইতে ২ মাইল উত্তরে তিস্তার উপর ঝুলান সাঁকো। সাঁকোটি দেখিতে সুন্দর এবং নদীর অনেক উপরে নির্ম্মিত; প্রায় ১০০ ফুট নীচে প্রচণ্ডবেগে তিস্তা বহিয়া চলিয়াছে। এখানে তিনটি প্রধান রাস্তা মিলিয়াছে; শিলিগুড়ি থেকে রেলপথের

সমান্তরালে আসিয়াছে তিস্তা-উপত্যকা রাস্তা ; কালিম্পং রাস্তা কালিম্পং হইয়া সিকিম তিব্বত ও ভূটান পর্য্যন্ত গিয়াছে ; তৃতীয়টি পাশোক রাস্তা ঘুম ও দার্জ্জিলিং গিয়াছে। এতগুলি রাস্তা আসায়, সাঁকোর কাছেই নদীর পশ্চিম কূলে একটি ছোটো গঞ্জ গড়িয়া উঠিয়াছে ; স্থানটি স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। ইহারই ৩ মাইল উত্তরে দার্জ্জিলিং জেলার একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান রঙ্গীত ও তিস্তার সঙ্গম ; ইহার কথা আগেই লেখা হইয়াছে।

সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৭০০ ফুট উচ্চ তিস্তা সাঁকো পার হইয়া মোটরের রাস্তা দিয়া কালিম্পং সাড়ে নয় মাইল উপরে। কিন্তু অনেকেই অশ্বপৃষ্ঠে, রিকশ চড়িয়া কিংবা পদব্রজে একটি সোজাসুজি পাহাড়ে রাস্তা দিয়া কালিম্পং গমন করেন ; এই পথে মাত্র ৭ মাইল পড়ে। এই রাস্তা অবশ্য মধ্যে মধ্যে প্রধান মোটর রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছে।

কালিম্পং সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৩,৯৩৩ ফুট উচ্চ। নগরীর রক্ষীস্বরূপ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে ৫,৫৯০ ফুট উচ্চ দেওলো পাহাড়। উত্তরে সেকেন্দার পর্ব্বতমালার পশ্চাতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য তুষারাবৃত শিখরের উপরিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমে গ্রেট রঙ্গীতের শ্যামল উপত্যকা, দক্ষিণ-পশ্চিমে জঙ্গলাকীর্ণ সিঞ্চল পাহাড়, দক্ষিণে বাংলার সমতল ভূমি এবং পূর্ব্বে রিলি নদীর সুন্দর উপত্যকার পশ্চাতে শ্রেণীর পর শ্রেণী নিবিড় অরণ্যে আচ্ছাদিত পর্ব্বতমালা ; এই সকল মিলিয়া কালিম্পংকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের আকর করিয়া তুলিয়াছে।

কালিম্পং শহরে দেখিবার মধ্যে প্রধান হইল বাজারের উপরে সুবৃহৎ গথিক রীতিতে নির্ম্মিত গির্জ্জা। অনতিদূরে তিব্বতীয় রীতিতে নির্ম্মিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তোরণ। ইহার রঞ্জিত ও উজ্জ্বল স্তম্ভ ও কার্ণিসের কারুকার্য্য সিকিম হইতে লামারা আসিয়া খোদাই করিয়াছিলেন। তোরণের মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ব্রোঞ্জমূর্ত্তি। বাজারের নিকটে পর্ব্বতগাত্রে একটি বৌদ্ধ মঠ আছে। উত্তরের দিকে দিওলো পাহাড়ের উপরের অংশে রেভারেণ্ড ডক্টর গ্রেহামের প্রসিদ্ধ সেণ্ট এনড্রুজ কলোনিয়ল হোমজ্ নামক ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী বালক বালিকাদিগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪,৫০০ হইতে ৫,৫০০ ফুট উচ্চে ৪০০ একর জমি লইয়া এই প্রতিষ্ঠানের বিদ্যালয়, কৃষিক্ষেত্র, কারখানা প্রভৃতি অবস্থিত। দিওলো পাহাড়ের নীচের দিকে পিডংএর পথে বাজার হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে ভূটানের প্রধান মন্ত্রী রাজা উগ্যেন্ দোরজি নির্ম্মিত একটি অট্টালিকা আছে। চীন সরকারের শাসন হইতে পলাইয়া আসিয়া দলাই লামা একবার ইহাতে ৪৷৷০ মাস বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহৃত একটি ঘর সম্ভ্রমের সহিত পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা এখানকার একটি দেখিবার জিনিষ।

৪০১ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া তিস্তার পূর্ব্বকূলে অবস্থিত কালিম্পং গভর্ণমেণ্ট স্টেট্ ও তিস্তা জঙ্গল বিভাগের সদর এই কালিম্পং শহর। ইহা একটি বিশিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র। সিকিম ও তিব্বতের বাণিজ্য কালিম্পং দিয়া প্রসার লাভ করিয়াছে। তিব্বত হইতে বহু পরিমাণে পশম অশ্বপৃষ্ঠে আনীত হয়। সিকিমী, তিব্বতী, নেপালী, ভূটানী ও চৈনিক প্রভৃতি নানা জাতীর লোক ব্যবসায়সূত্রে এখানে মিলিত হইয়াছেন। শনি ও বুধবার একবার হাটে ঘুরিয়া আসিলে এইরূপ বহু জাতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

নে হয় এখানকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া যেন মধ্য-এশিয়ার। এখানে প্রতিবৎসর বেম্বর মাসে একটি বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। নেপাল, সিকিম, ভূটান ও তিব্বত হইতে বহু ব্যবসায়ী এই মেলায় যোগদান করে। এ অঞ্চলের ইহা একটি বিশিষ্ট াৎসরিক অনুষ্ঠান। এখানে বৃষ্টি ও শীতের প্রকোপ দার্জ্জিলিং অপেক্ষা অনেক কম।

কালিম্পং হইতে সিকিম ও তিব্বতের পথ বাহির হইয়াছে। দার্জ্জিলিংএর ডেপুটি কমিশনারের অফিস হইতে প্রকাশিত "নোটস্ অন্ টুর‍্জ্"এর কথা আগেই বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রীযুক্ত পার্সী ব্রাউন্ রচিত "টুর‍্জ্ ইন্ সিকিম" দ্রষ্টব্য। ডাকবাংলা, ছাড়পত্র, কুলী প্রভৃতির ব্যবস্থা আগে হইতে করিতে হইবে। দার্জ্জিলিংএর ডেপুটি কমিশনারের অফিস্ হইতে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য জানা যাইবে।

মহারাজার গোম্ফা, গংটক

সিকিমের রাজধানী গংটকে যাইবার দুইটি পথ আছে। প্রধান পথ হইতেছে তিস্তা উপত্যকার রাস্তা ধরিয়া। কালিম্পং ছাড়িয়া প্রথম দিনে রংপো ডাকবাংলায় যাইতে হয়। সিকিম রোড দিয়া তারকোলা হইয়া তিস্তার তীরে কার্টরোড় দিয়া রংপো ১৩ মাইল। তারকোলা যাইতে পথ খুব নামিয়া গিয়াছে; কেহ কেহ কালিম্পং হইতে কার্টরোড ধরিয়া ২০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রংপো আসেন। দ্বিতীয় দিনে ১০ মাইল দূরে শ্যামডং ও তৃতীয় দিনে আরও ১৪ মাইল পথ যাইয়া গংটক। শ্যামডং ও গংটকের মধ্যে রামটেক মঠ পড়ে।

গংটকে যাইবার দ্বিতীয় রাস্তা কালিম্পং হইতে প্রথম দিন ১২ মাইল দূরে পিডং ডাকবাংলা। দ্বিতীয় দিন ঋষি রংচো ও রোরো নদীর পুল পার হইয়া ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী পাকীয়ংএর সুন্দর বাংলায় পৌছিতে হয়। তৃতীয় দিন ১০ মাইল যাইয়া গংটক। গংটকের দুইটী পথই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। গংটক হইতে তুষারাচ্ছন্ন ও জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বতশ্রেণীর দৃশ্য অতি সুন্দর। কাঞ্চনজঙ্ঘা, পান্দিম্, নরসিং ও সিনোলচু ব্যতীত আরও ছোট ছোট অনেক তুষারাচ্ছন্ন গিরিশৃঙ্গ দেখা যায়। গংটকে দেখিবার মধ্যে মহারাজার প্রাসাদ ও মঠ বা গোম্ফা, চেরীগাছের সারি দেওয়া রিজ নামক

প্রধান রাস্তাটি এবং তদুপরে অবস্থিত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মূর্ত্তি। গোম্ফার ভিতরের দেওয়ালে বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত আছে। গংটকের রেসিডেনসীর উদ্যানটি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর উদ্যানগুলির অন্যতম।

গংটক হইতে নাথুলা গিরিসঙ্কট যাতায়াতে মাত্র ৫ দিন লাগে। প্রথম দিন গংটক হইতে বন্য এবং গম্ভীর দৃশ্যের মধ্য দিয়া ৯ মাইল পথ কার্পোনাং। দ্বিতীয় দিন তথা হইতে কতকগুলি জল প্রপাতের পার্শ্ব দিয়া এবং একটি হ্রদের কূল দিয়া ৯ মাইল দূরবর্ত্তী ও ১২,৬০০ ফুট উচ্চ চঙ্গু বাংলা পোঁছিতে হয়। তৃতীয় দিন নাথুলা গিরিসঙ্কটে উঠিয়া পুনরায় চঙ্গুতে ফিরিয়া আসা যায়, যাতায়াতে মাত্র ১২ মাইল। নাথুলা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪,৪০০ ফুট উচ্চ ; এখান হইতে তিব্বতের নিষিদ্ধ ভূমি বিস্তৃত ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। চঙ্গু হইতে চতুর্থদিনে কার্পোনাং এবং পঞ্চমদিনে গংটকে ফিরিয়া আসা যায়।
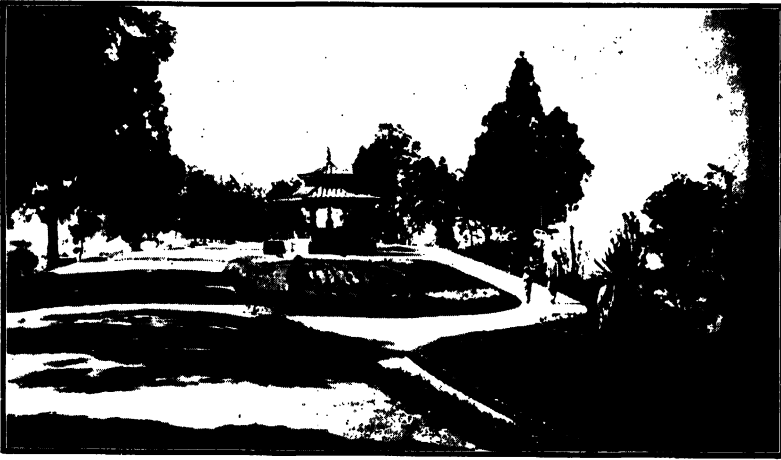
রিজ নামক রাস্তা, গংটক

কালিম্পং হইতে জেলেপলা গিরিসঙ্কটেও সহজেই যাওয়া যায়। প্রথম দিন কালিম্পং হইতে ১২ মাইল দূরে সুন্দর অরণ্যমধ্যের পথ দিয়া রিসিস্সুম (বিস্সুম বা রিকীইস্সুম) বাংলায় যাইতে হয় ; এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিশেষতঃ অরণ্যের ও বিস্তৃত তুষারের দৃশ্য অপূর্ব্ব। দ্বিতীয় দিন ১২ মাইল দূরবর্ত্তী অরি। প্রথম দিন রিসিস্সুম না গিয়া ১২ মাইল দূরে পিডং এবং তথা হইতে দ্বিতীয় দিন অরি আসা যায়। তৃতীয় দিন আরও ১২ মাইল দূরে সিডনচেন। চতুর্থ দিন ৯ মাইল দূরে ১২,৩০০ ফুট উচ্চ গ্নাটং পোঁছিতে হয়। পরদিন কাপুপ হইয়া ৮ মাইল দূরবর্ত্তী জেলেপলা গিরি সঙ্কট দেখিয়া ৩ মাইল পথ ফিরিয়া আসিয়া কাপুপ ডাকবাংলায় আশ্রয় লইতে হয়। জেলেপলা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১৪,৩৯০ ফুট উচ্চ ; এখান হইতে চম্বি উপত্যকা এবং তিব্বতের বিশাল অধিত্যকা চমৎকার দেখিতে পাওয়া যায়। কাপুপ বাংলা অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ একটি হ্রদের প্রান্তে অবস্থিত। কাপুপ হইতে গ্নাটং সেডনচেন পথে না ফিরিয়া চঙ্গু কার্পোনাং ও গংটক হইয়াও ফেরা যায়। শেষের পথে আসিলে নাথুলা গিরিসঙ্কট ও চঙ্গু হ্রদ দেখিয়া আসা যায়।

(খ) কলিকাতা—ডায়মণ্ড হারবার ও বজ-বজ, ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুর শাখা।

বালীগঞ্জ জংশন—কলিকাতা হইতে ৪ মাইল দূর। ইহা বর্ত্তমানে কলিকাতা মহানগরীরই অংশ বিশেষে পরিণত হইয়াছে। স্টেশনের অনতিদূরে পারশীদের সমাধি-মন্দির বা টাওয়ার অফ সাইলেন্স্ একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। পারশীগণ শবদেহের অগ্নি সংস্কার বা কবর দেন না। একটি উচ্চ ভবনের ছাদের উপর উহা রাখিয়া দেন; চিল, শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী উহা ভক্ষণ করিয়া ফেলে।

বালীগঞ্জ হইতে একটি শাখা লাইন কলিকাতা হইতে ১৭ মাইল দূরবর্ত্তী বজ-বজ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে কালীঘাট, মাঝের হাট, নঙ্গী ও বজ-বজ উল্লেখযোগ্য স্টেশন।

সাধারণ দৃশ্য, বাটানগর

মাঝেরহাট—মাঝেরহাটও একটি জংশন স্টেশন। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৮ মাইল। এখান হইতে কালীঘাট-ফলতা লাইট রেলওয়ের আরম্ভ। খিদিরপুরের সুবিখ্যাত ডকগুলি ইহার নিকটে অবস্থিত। ডকে জাহাজ হইতে যত মাল নামে, তাহার অধিকাংশই রেলগাড়ীতে মাঝেরহাট হইয়া আসে। মাঝেরহাটের অতি নিকটে আলিপুরের "এরোড্রোম" বা বিমান ঘাঁটি অবস্থিত।

নঙ্গী—কলিকাতা হইতে ১৪ মাইল দূর। স্টেশনের নিকটে সুবিখ্যাত জুতা নির্ম্মাতা বাটা কোম্পানির একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং উহাকে কেন্দ্র করিয়া

একটি বিরাট শ্রমিক উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। এই উপনিবেশটির নাম দেওয়া হইয়াছে বাটানগর। চর্ম্ম শিল্পের কেন্দ্র হিসাবে বাটানগর একটি দ্রষ্টব্য স্থান।

বজ-বজ—কলিকাতা হইতে ১৭ মাইল দূর। বজ-বজ শহর গঙ্গার তীরে অবস্থিত। ইহা ভারতের মধ্যে একটি প্রধান কেরোসিন তৈল ও পেট্রোলের বন্দর। এক শ্রেণীর বিশেষ জাহাজে করিয়া বিদেশ হইতে কেরোসিন তৈল ও পেট্রোল আনা হয়। তৈল-বাহী জাহাজ বজ-বজে আসিলে উহা হইতে পাম্পযোগে কেরোসিন তৈল তুলিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্যাঙ্কে রাখা হয় ও পরে বিশেষ গাড়ীতে করিয়া স্থানান্তরে চালান দেওয়া হয়।

কেরোসিন তৈলের ডিপো—বজ-বজ

বজ-বজে মুসলমান যুগে একটি দুর্গ ছিল; ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা আক্রমণের প্রাক্কালে ক্লাইভ কর্ত্তৃক উহা অধিকৃত হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং কামান ও সাজ্ সরঞ্জাম কলিকাতা দুর্গে লইয়া যাওয়া হয়। দুর্গের পরিখার চিহ্ন এখনও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়।

বজ-বজের নিকটে কয়েকটি পাটকল ও কাপড়ের কল আছে। বজ-বজ হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভাগীরথী কূলে আচিপুর গ্রামে চীনাদের একটি মন্দির আছে। প্রতি বৎসর মাঘ-ফাল্গুন মাসে উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা প্রাবাসী চীনারা এই স্থানে সমবেত হন। ওয়ারেন হেস্‌টিংসের সময় টং আচু নামে একজন চীনদেশীয় ব্যক্তি এই স্থানে একটি চিনির কল স্থাপন করেন। তাঁহার নাম হইতেই গ্রামটি আচিপুর নাম পাইয়াছে। এই স্থানে টং আচুর অশ্বক্ষুর আকৃতির কবর আছে।

যাদবপুর—কলিকাতা হইতে ৫ মাইল দূর। এখানে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার জন্য একটি বড় হাসপাতাল আছে। এখানকার এঞ্জিনীয়রিং কলেজ বাংলা দেশের মধ্যে একটি বিখ্যাত বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক যুবক এখান হইতে শিক্ষালাভ করিয়া বিবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

গড়িয়া—কলিকাতা হইতে ৮ মাইল দূর। স্টেশনের বিপরীত দিকে একটি প্রকাণ্ড বিল আছে। বর্ষাকালে জলপূর্ণ হইয়া এই বিলটি একটি হ্রদের মত দেখায়। এখানে অনেকে পক্ষী শিকার করিতে আসেন। এই বিল হইতে প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে মৎস্য কলিকাতায় চালান যায়।

গড়িয়া হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী **বোড়াল** একটি প্রসিদ্ধ ও পুরাতন স্থান। এই পল্লী সুবিখ্যাত সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যিক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জন্মস্থান। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্‌টেম্বর রাজনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। সেকালের হিন্দু কলেজের যে

রাজনারায়ণ বসুর বাসভবন, বোড়াল

সকল ছাত্র উত্তরকালে বাংলার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণ তাঁহাদিগের অন্যতম। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত রাজনারায়ণের সহপাঠী ছিলেন এবং ইঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। হিন্দু কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজনারায়ণ ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব রাজনারায়ণকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত চাকুরী তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় তিনি স্কুল মাস্টারের কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি মেদিনীপুর গভর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাস্টার নিযুক্ত হন। তৎকালে শিক্ষিত সমাজে সুরাপান প্রচলিত ছিল। রাজনারায়ণ ইহা নিবারণ করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও ব্যায়াম চর্চ্চায়ও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। রাজনারায়ণ কতকগুলি বাংলা পুস্তক প্রণয়ন করেন। তৎপ্রণীত "সে কাল আর এ কাল" "বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব" ও "বিবিধ প্রবন্ধ" প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর রাজনারায়ণ পরলোক গমন

করেন। জগদ্বিখ্যাত মনীষী শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র। রাজনারায়ণ বসুর জন্মভিটা এখন পরিত্যক্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ। ইহার সংস্কার ও সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা এখনও হয় নাই।

বোড়াল গ্রামে কতকগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন ইষ্টকস্তূপ ও লুপ্তপ্রায় একটি দীঘি আছে। এই স্থান হইতে প্রাপ্ত ইষ্টকগুলির মধ্যে কতকগুলি চতুষ্কোণ, কতকগুলি ত্রিকোণ এবং কতকগুলি গোলাকার। ইষ্টকগুলি কারুকার্য্যখচিত ও সুদৃঢ়। এইগুলির সহিত সুযোগ্য সেন নামক সেনবংশীয় জনৈক নৃপতির সংশ্রব আছে বলিয়া কেহ কেহ

ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী, বোড়াল

অনুমান করেন। এই দীঘির অতি নিকটে "ত্রিপুরা সুন্দরীর পীঠ" নামে একটি দেবস্থান আছে। কথিত আছে সেনবংশীয় রাজা সুযোগ্য সেন প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেবীপীঠের প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর প্রাচীন মন্দির কালপ্রভাবে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। পুরাতন দেবী প্রতিমার অনুকরণে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অষ্টধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত ত্রিপুরা-সুন্দরীর বিগ্রহ বর্ত্তমানে এই গ্রামে পূজিত হইতেছেন। এই ধাতুময়ী মূর্ত্তি বেশ বড় ও অতি সুন্দর। দেবী প্রতিমার পাদপীঠে দশমহাবিদ্যার অন্যতম ষোড়শী বা ত্রিপুরাসুন্দরীর ধ্যান অনুযায়ী পঞ্চদেবতার মূর্ত্তি উৎকীর্ণ, তদুপরি শিব শবরূপে শয়ান। শিবের নাভি-পদ্মস্থিত পদ্মের উপর চতুর্ভুজা ত্রিনয়না সুন্দরী ষোড়শী মূর্ত্তি উপবিষ্টা। পাদপীঠস্থ পঞ্চদেবতার নাম ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ঈশ্বর ও রুদ্র। ইঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ; ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ ও রক্তবর্ণ, বিষ্ণু শ্যামলবর্ণ, মহেশ্বরের মুখ পাঁচটি, বর্ণ তুষারশুভ্র; ঈশ্বর ও

রুদ্র শিবেরই মূর্ত্তিভেদ বিশেষ, তবে ইঁহাদের মুখ একটি করিয়া ; ঈশ্বর শুভ্রবর্ণ, রুদ্রের গায়ের রং কমলা নেবুর রংয়ের ন্যায়। এই সুন্দর বিগ্রহটি একটি দেখিবার মত বস্তু। এখানে প্রতিবৎসর মাঘমাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে মহোৎসব হয়।

গড়িয়া হইতে বোড়াল গ্রামে যাইবার পথে ভাগীরথীর লুপ্ত খাত দেখা যায়। ইহার তীরে এখনও প্রাচীনকালে নির্ম্মিত কতকগুলি শিবমন্দির দৃষ্ট হয়।

সোনারপুর জংশন—কলিকাতা হইতে ১০ মাইল দূর। ইহা চব্বিশ পরগণা জেলার একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। ইহার নিকটবর্ত্তী রাজপুর ও হরিনাভি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই স্থান হইতে একটি শাখা পথ কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূরবর্ত্তী ক্যানিং পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখা পথে ঘুটিয়ারী শরীফ ও ক্যানিং উল্লেখযোগ্য স্টেশন।
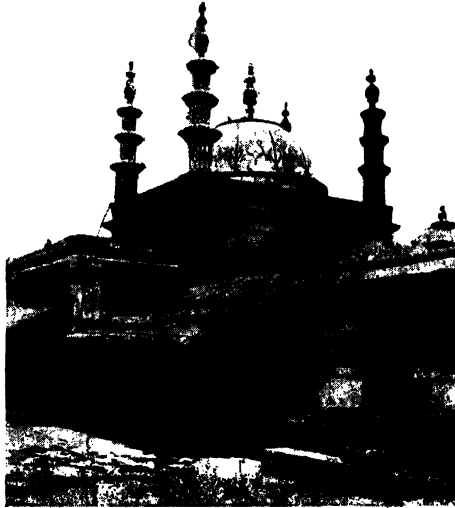
মস্‌জিদ, ঘুটিয়ারি শরীফ

ঘুটিয়ারী শরীফ—কলিকাতা হইতে ২০ মাইল দূর। ইহা মুসলমানগণের একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান। স্টেশনের নিকটেই সুবিখ্যাত পীর গাজী মোবারক আলি সাহেবের দরগাহ্‌ ও মস্‌জিদ অবস্থিত। গাজী সাহেবের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য বিশেষ কিছুই জানা যায় না, তবে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। যে স্থানে ঘুটিয়ারী শরীফ অবস্থিত উহা মদনমল পরগণার অন্তর্গত। পূর্ব্বে এই অঞ্চল সুন্দরবনের অংশ বিশেষ ছিল। কথিত আছে যে গাজী সাহেব অদ্ভুত ক্ষমতাবলে বনের ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে বশীভূত করিয়া এই অঞ্চলে মনুষ্যের বসতি স্থাপন করেন। তিনি ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। একবার স্থানীয় জনৈক নাবালক জমিদার বাদশাহ সরকারে সময়মত খাজনা না দিতে পারায় বাদশাহের আদেশে ধৃত হইয়া রাজধানীতে নীত হন। বালকের জননীর ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া গাজী সাহেব একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে বাদশাহের দরবারে গিয়া উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য,

বাদশাহ তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন ও বালককে মুক্ত করিয়া দেন। অতঃপর বাদশাহ গাজী সাহেবের নামে মদনমল্ল পরগণার জমিদারী সনদ প্রদান করেন। সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামে গাজী মোবারক আলি বা সংক্ষেপতঃ মোবারক গাজী ও তাঁহার ভ্রাতা কালু হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে পূজিত হন। গাজী সাহেবের দেহত্যাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনীটি প্রচলিত আছে –

একবার ভীষণ অনাবৃষ্টি হইয়া অজন্মা উপস্থিত হইলে শিষ্যগণের অনুরোধে গাজী সাহেব খোদার দরবারে আরজি পেশ করিবার জন্য একটি গৃহের মধ্যে গিয়া উহার অর্গল বন্ধ করিয়া দেন এবং প্রত্যেককে সাবধান করিয়া বলেন যে যতক্ষণ তিনি ধ্যানস্থ

পল্লী সংগঠন প্রতিষ্ঠান গোসাবা,

থাকিবেন, ততক্ষণ যেন কেহ গৃহমধ্যে প্রবেশ না করে। ক্রমে ক্রমে তিন দিন চলিয়া গেল, গাজী সাহেবের বাহিরে আসার কিন্তু কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। তখন জন-কয়েক লোক নানারূপ আশঙ্কা করিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবং দেখিতে পায় যে গাজী সাহেবের দেহ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে। তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন মনে করিয়া তাঁহারা সেই গৃহমধ্যেই কবর খুঁড়িয়া তাঁহাকে সমাহিত করে। সেই দিনই কিন্তু প্রবল বারিপাত হয় ও রাত্রে গাজী সাহেব জনৈক অনুরক্ত শিষ্যকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন যে তাঁহার ধ্যানস্থ দেহকে ভুলবশতঃ মৃতদেহ মনে করিয়া লোক-গুলি তাঁহার কবর দিয়াছে। অম্বুবাচীর সময় এই ঘটনাটি ঘটে। ঘুটিয়ারী শরীফের সুন্দর ও বৃহৎ মসজিদটি গাজী সাহেবের সমাধির উপর নির্ম্মিত। প্রতি বৎসর আষা-

ভাদ্রমাসে গাজী সাহেবের স্মরণার্থে ঘুটিয়ারী শরীফে দুইটি বৃহৎ মেলা হয়। এই মেলায় বহু মুসলমান ও হিন্দুভক্ত উপস্থিত হইয়া গাজী সাহেবের দরগাহে শিরণি দিয়া থাকেন। এখানে প্রতি শুক্রবার বহু লোকের সমাগম হয়।

ক্যানিং---কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূর। ক্যানিং, ক্যানিং টাউন বা পোর্ট ক্যানিং মাতলা নামক একটি বিস্তৃত নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার উত্তরে বিদ্যাধরী প্রবাহিত। এই স্থানের দেশীয় নাম মাতলা। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লর্ড ক্যানিংএর সময়ে ভাগীরথী নদীতে অতিমাত্রায় বালি পড়ায় যখন কলিকাতা বন্দর সম্বন্ধে নানারূপ আশঙ্কা হইতেছিল, সেই সময়েই পোর্ট ক্যানিংএর সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য ভাগীরথীর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং কলিকাতা হইতে বন্দরও আর স্থানান্তরিত করিতে
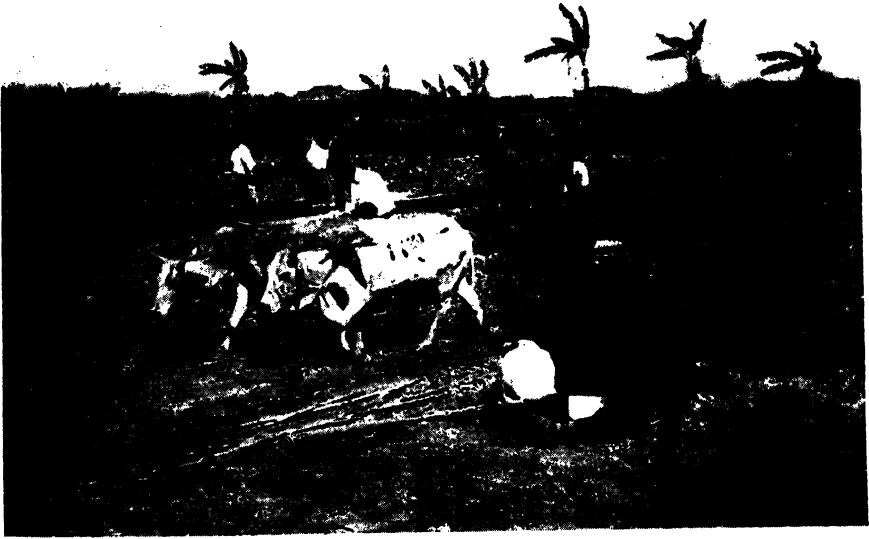
আদর্শ কৃষিক্ষেত্র, গোসাবা

হয় নাই, সুতরাং ক্যানিংএর আর তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। ক্যানিং বন্দরের জন্য মাতলার উপর পাঁচটি এবং বিদ্যাধরীতে দুইটি জেটি, ডক ও ট্রামওয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল; ইহার এখন কিছুই নাই। ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৬টি জাহাজ আসিয়াছিল, কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে একটি জাহাজও ভিড়ে নাই। বর্ত্তমানে এই স্থান পোর্ট ক্যানিং জমিদারী কোম্পানির অধিকারভুক্ত। ইহা একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। সুন্দরবন অঞ্চলের বহু খাদ্যদ্রব্য এই স্থান দিয়াই যাতায়াত করে। প্রকৃতপক্ষে ক্যানিংএর অপর পার হইতেই সুন্দরবন এলাকার আরম্ভ। ক্যানিংএর অবস্থান অতি সুন্দর, নদীর জলোচ্ছ্বাস হইতে শহর রক্ষা করিবার জন্য নদীতীর দিয়াই একটি দীর্ঘ বাঁধ আছে। এই বাঁধের উপর হইতে নদীর দৃশ্য সত্যই মনোরম। কলিকাতা হইতে ছাত্রছাত্রীরা এবং অন্যান্য বহু

লোক এই বাঁধে ভ্রমণের জন্য আসিয়া থাকেন। ক্যানিং হইতে প্রচুর পরিমাণে ধান, চাউল, গরাণকাঠ, ও গোলপাতা প্রভৃতি আমদানি হয়।

ক্যানিং বা মাতলা শহরের উত্তরদিকে মাতলা বিদ্যাধরী নদীর মোহানায় প্রতাপাদিত্যের একটি দুর্গ ছিল। ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন প্রতাপের প্রসিদ্ধ সেনানায়ক হায়দার মানক্লী, সেই জন্য দুর্গের নাম হয় হায়দারগড়। এখনও বুরুজখানা নামে উচ্চ ঢিবি, নিকটস্থ প্রতাপনগর গ্রাম, রাজার খাল, হায়দার আবাদ প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছে। সুন্দরবনের ৫৭ নং লাটে হায়দার আবাদ অবস্থিত।

ক্যানিং টাউন হইতে নৌকা বা মোটরলঞ্চযোগে সুন্দরবনের অন্তর্গত স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের জমিদারী গোসাবায় যাওয়া যায়। প্রত্যহ বেলা ১টার সময় ক্যানিং হইতে গোসাবার মোটরলঞ্চ ছাড়ে। সুন্দরবন অঞ্চলে চাষ আবাদ প্রবর্ত্তনের জন্য স্যার ড্যানিয়েল সরকারের নিকট হইতে বহু জমি গ্রহণ করিয়া গোসাবায় একটি আদর্শ কৃষি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। এখানে ভদ্র ও বেকার যুবকগণকে অতি সুলভে বাসস্থান ও কৃষি কার্য্যের উপযোগী জমি বিলির ব্যবস্থা আছে। স্যার ড্যানিয়েলের প্রচেষ্টায় শ্বাপদ সঙ্কুল সুন্দরবনের মধ্যে গোসাবা একটি আদর্শ পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। এখানে সাধারণ শিক্ষার সহিত হাতে কলমে কৃষি শিক্ষা দেওয়ার প্রতিষ্ঠান আছে। এখানে সুন্দর পথঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে, যৌথ ভাণ্ডার আছে, সুপেয় জলের ব্যবস্থা আছে, উৎপন্ন দ্রব্যের খরিদ বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত রহিয়াছে। এক কথায় গোসাবাকে একটি আদর্শ ও আধুনিক পল্লী বলা যাইতে পারে। ইহার এলাকার মধ্যে বিনিময়ের জন্য "গোসাবা নোট" নামক এক প্রকার নোটও প্রচলিত আছে। অতিথি অভ্যাগতগণের থাকিবার জন্য গোসাবায় একটি "গেস্ট হাউস" বা অতিথিশালা আছে।

চাংড়িপোতা—কলিকাতা হইতে ১৩ মাইল দূর। এই গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ পুরাতন সংবাদপত্র "সোমপ্রকাশ" সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জন্মস্থান। তদীয় সমসাময়িকযুগে দ্বারকানাথ একজন প্রসিদ্ধ মনীষীরূপে পরিচিত ছিলেন। তৎসম্পাদিত "সোমপ্রকাশ" বাংলার শিক্ষিত সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিল। সুরুচিসম্মত প্রণালীতে সংবাদপত্র সম্পাদনে দ্বারকানাথকে অগ্রণী বলা যাইতে পারে। তৎপ্রণীত "নীতিসার" "রোমের ইতিহাস" "গ্রীসদেশের ইতিবৃত্ত" প্রভৃতি পুস্তক তৎকালে বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়। স্বনামখ্যাত শিবনাথ শাস্ত্রী দ্বারকানাথের ভাগিনেয় ছিলেন। শিবনাথ চাংড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সম্প্রতি দ্বারকানাথের বসতবাটীতে শিবনাথ শাস্ত্রীর একটি স্মৃতি ফলক স্থাপিত হইয়াছে।

র—কলিকাতা হইতে ১৪ মাইল দূর। এই স্থানে নাখোদা সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণের একটি দরগাহ আছে। ইহা ফকির আবদুল্লা আত্তাসের দরগাহ নামে পরিচিত। দরগাহের মস্‌জিদটি দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার সমীপস্থ একটি কূপের

জ…নের রোগ আরোগ্য করিবার অদ্ভুত শক্তি আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এই পবিত্র কূ…া হইতে জল লইবার জন্য এখানে প্রতি শুক্রবার বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

মল্লিকপুরের নিকটবর্ত্তী **মাইনগর** গ্রাম ইতিহাস বিশ্রুত পুরন্দর খাঁ বা গোপীনাথ বসুর জন্ম স্থান। পুরন্দর খাঁ গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী বা উজির ছিলেন এবং তৎপুত্র কেশব খাঁ ছত্রনাজিরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে কেশব খাঁর নামোল্লেখ আছে। তিনি ছত্রনাজির বা Grand Master of the Royal Umbrella ছিলেন বলিয়া অনেক স্থলে কেশব "ছত্রি" নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। রাজসরকারে পিতা পুত্রের অসীম প্রতিপত্তি ছিল। পুরন্দর খাঁ শিয়াখালার রাজাকে পরাজিত করিয়া তথায় স্বনামে পুরন্দর গড়ের প্রতিষ্ঠা করেন। শিয়াখালা স্টেশন দ্রষ্টব্য।
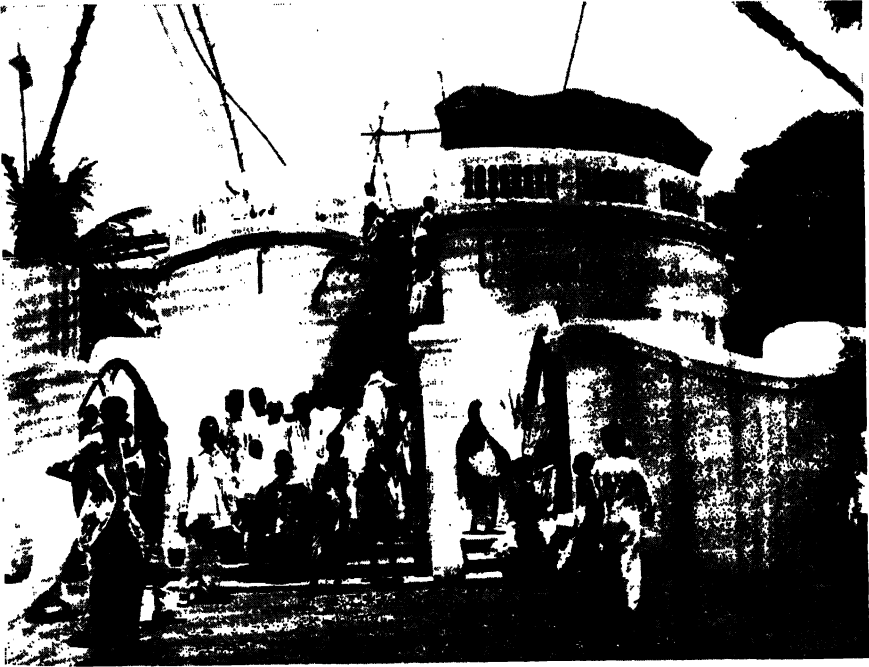
মল্লিকপুরের দরগাহ্

বারুইপুর জংসন—কলিকাতা হইতে ১৬ মাইল দূর। এখানে একটি মুনসেফী আদালত আছে। ইহার পাশ দিয়া পূর্ব্বে গঙ্গার একটি শাখা প্রবাহিত হইত। স্থানটি পানের চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। পান ব্যবসায়ী বারুইজাতি হইতে ইহার নাম হইয়াছে বারুইপুর। রাস-যাত্রা এবং রথযাত্রা উপলক্ষে এখানে মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলায় লোক-শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ সুন্দর দেশীয় পুতুল প্রভৃতি বিক্রীত হয়। বারুইপুর হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে লুপ্তস্রোতা গঙ্গার উপর আটিসারা গ্রামের "মহাপ্রভু-বাটি" একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। চৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত আছে যে শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুর

হইতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী পথ দিয়া পুরীযাত্রা কালে আটিসারা গ্রামে অনন্ত নামক জনৈক সাধু ব্রাহ্মণের বাটিতে কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে রাত্রি যাপন করেন, যথা —

"সর্ব্ব রাত্রি কৃষ্ণ-কথা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত গৃহে রঙ্গে॥
শুভ দৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি, "হরি, হরি॥"

আটিসারার মহাপ্রভু-বাটিতে গৌর নিতাই বিগ্রহের নিত্য পূজা হয় এবং বৈশাখ মাসে এখানে পক্ষকাল স্থায়ী একটি মেলা হয়।

বারুইপুর জংসন হইতে একটি শাখাপথ ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী লক্ষীকান্তপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই শাখাপথে ধপধপি, দক্ষিণ বারাশত, বহড়ু, জয়নগর-মজিলপুর ও মথুরাপুর রোড উল্লেখযোগ্য স্টেশন। এই সকল স্থানের পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথীর প্রাচীন খাত এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

ধপধপি—কলিকাতা হইতে ২০ মাইল দূর। এই গ্রামে ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায় বা দক্ষিণেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। কবি কৃষ্ণরাম দাসের "রায়মঙ্গল" নামক কাব্যে দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত আছে ("বেলঘরিয়া" স্টেশন দ্রষ্টব্য)।

দক্ষিণরায়, ধপধপি

পূর্ব্বে এই অঞ্চল সুন্দরবনের অংশ ছিল এবং এখানে ব্যাঘ্রের ভয়ানক দৌরাত্ম্য ছিল। যাহারা সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু, মোম বা কাষ্ঠ আহরণ করিতে যাইত, তাহারা ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়কে ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিত। লোকের বিশ্বাস ইহাতে তাহাদের আর কোন বিপদ ঘটিত না এবং তাহারা প্রচুর পরিমাণে মোম ও মধু পাইত। সময়ে সময়ে দক্ষিণরায়ের স্বপ্নাদেশে তাঁহার নিকট নরবলি দিয়া তাঁহার প্রসন্নতা অর্জ্জন করিতে হইত। "বনবিবির জহুরানামা" নামক পুঁথিতে বর্ণিত

আছে যে একবার কলিঙ্গা নগরবাসী ধনা মনা নামক বণিক ভ্রাতৃদ্বয় জনৈক অনাথা বিধবার "দুখে" নামক বালক পুত্রকে ভুলাইয়া সুন্দরবনে নিয়া গিয়া দক্ষিণরায়ের আদেশে নরবলি দিবার উপক্রম করিলে, দুখের কাতর ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া সুন্দরবনের অধীশ্বরী বনবিবি স্বীয় বীর অনুচর জঙ্গলী শার দ্বারা দক্ষিণরায়ের ব্যাঘ্রের কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করেন। জঙ্গলী শার নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দক্ষিণরায় কুমারখালির জঙ্গলে আসিয়া বড়খাঁ গাজীর শরণাপন্ন হন। দক্ষিণরায়ের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বড়খাঁ গাজী দক্ষিণরায়কে সঙ্গে করিয়া কেঁদোখালির চরে বনবিবির দরবারে হাজির হইলেন। বনবিবি তখন অনাথিনীর পুত্র দুখেকে কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন।

"হেনকালে উপনীত গাজী দক্ষিণরায়।
ছালাম করিল রায় বনবিবির পায়॥
তাতল খাঁ খোশাল খাঁ আর অলিগণ।
কর জুড়ি করিয়া আইল সর্ব্বজন॥
হরি রায় বিষম রায় আর কাল রায়।
আসিয়া ছালাম করে বনবিবির পায়॥

কহেন বড়খাঁ গাজী শুন নেক মাই।
তোমার হুজুরে মাগো এই ভিক্ষা চাই॥
দক্ষিণরায়ের পর কোপ কর দূর।
এখাতের আইলাম তোমার হুজুর॥
এতেক শুনিয়া মায়ের দয়া উপজিল।
সদয় হইয়া মাতা বলিতে লাগিল॥

আঠার ভাটির মধ্যে আমি সবার মা।
মা বলে যে ডাকে তার দুঃখ থাকে না॥
সঙ্কটে পড়িয়া যে বা মা বলে ডাকিবে।
কদাচিৎ হিংসা তায় কভু না করিবে॥

রায় বলে শুন মাতা আরজ আমার।
সত্য সত্য তিন সত্য সত্য অঙ্গীকার॥
বনেতে আসিয়া যে বা মা বলে ডাকিবে।
আমা হৈতে হিংসা তার কদাচ না হবে॥"

(মুন্সী বয়নদ্দিন রচিত পুঁথি)

এইরূপে বড়খাঁ গাজীর মধ্যস্থতায় বনবিবির সহিত দক্ষিণরায়ের আপোষ-রফা হইল। বনবিবির আদেশে ধনা-মনা দুখেকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সে যাত্রা নিস্তার পায়।

প্রভাকর রায়ের পুত্র ও ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুটরায়ের সেনাপতি মানুষ দক্ষিণ-রায় কি করিয়া সুন্দরবনের একাংশের আধিপত্য লাভ করেন ও পরে দেবত্ব প্রাপ্ত হন, সে কথার উল্লেখ পরে করা হইয়াছে ("ঝিকারগাছা ঘাট" দ্রষ্টব্য)।

ধপধপির দক্ষিণরায়ের মূর্ত্তিটি যোদ্ধবেশধারী ও অতি বীরত্ব-ব্যঞ্জক। ইহা। পরিধানে কাষায় বস্ত্র, গলে উত্তরীয়, মস্তকে উষ্ণীষ, কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল, প্রকো্ঠে সুবর্ণবলয়, পৃষ্ঠদেশে বানপূর্ণ তূণীর ও ধনু, হস্তে নালিকা ও উন্মুক্ত কৃপাণ এবং কোমরবন্ধে শাণিত ছুরিকা। এইরূপ বীরবেশধারী বিগ্রহ বাংলার আর কোথাও নাই। দেখিলে মনে হয় সুন্দরবনের দেবতার এই অপরূপ রূপ-সজ্জা স্থানোপযোগীই বটে। এই দেবতার স্বতন্ত্র কোন ধ্যান নাই। গণেশের ধ্যানে ইহার পূজা হইয়া থাকে।

বাতরোগ-গ্রস্ত বহু রোগী ও তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন এই দেবতার কৃপা লাভের জন্য এখানে আগমন করেন। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে এখানে ছোটখাট মেলা হয় এবং মাঘ মাসের ১লা তারিখে সমস্ত দিবস ধরিয়া মহাসমারোহে দেবতার পূজা ও এতদুপলক্ষে বাতের ঔষধ লইবার জন্য বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

ধপধপির অদূরে প্রাচীন ভাগীরথীর গর্ভে "কালীদহ" ও "শিঙ্গাদহ" নামে দুইটি দহ দেখা যায়। প্রবাদ, সিংহল যাত্রাকালে শ্রীমন্ত সদাগর এই কালীদহেই নাকি কমলে কামিনী দর্শন করিয়াছিলেন। "দ্বারীর জাঙ্গাল" নামে একটি প্রাচীন রাজপথের ভগ্নাবশেষও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পথ দিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব পুরী যাত্রা করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ বারাশত কলিকাতা হইতে ২৬ মাইল দূর। এখানে একটি কালী মন্দির এবং "আদ্যমহেশ" নামে একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। কথিত আছে, পিতার অন্বেষণে সিংহল যাত্রাকালে শ্রীমন্ত সদাগর এই শিবের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ত সদাগর একশত বার এই শিবকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম "বারাশত" হয়—এইরূপ একটি প্রবাদও প্রচলিত আছে এবং এই জেলার অন্যতম মহকুমা সদর বারাসাতের সহিত পার্থক্য করিবার জন্য ইহার "দক্ষিণ" বিশেষণ মিলিয়াছে। এখানকার শিবের মন্দিরটি খুব প্রাচীন। কয়েকটি সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া মন্দির গর্ভে শিবকে দর্শন করিতে হয়। মন্দিরের নিকটে একটি পুষ্করিণী আছে। বর্ষাকালে পুষ্করিণীটির জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মন্দির অভ্যন্তরস্থ শিবলিঙ্গের কুণ্ডটি জলপ্লাবিত হইয়া যায়। ভূনিম্ন দিয়া গর্ভ মন্দিরের সহিত এই পুষ্করিণীটির যোগাযোগ আছে বলিয়াই এইরূপ সংঘটিত হয়। "আদ্য মহেশ" এই অঞ্চলের একটি বিখ্যাত দেবস্থান। শিবরাত্রির সময় এখানে বহু জনসমাগম হয়।

অচলানন্দ তীর্থস্বামী নামক একজন সাধুর সমাধি এই গ্রামে আছে।

বহড়ু—কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূর। ইহাও একটি প্রাচীন গ্রাম। এই স্থানের প্রাচীন নাম "বড়ুক্ষেত্র"। এখানকার জমিদার বসুদিগের প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর জীউর মন্দিরের কারুকার্য্য অতি সুন্দর। এই বংশীয় দেওয়ান নন্দকুমার বসু মহাশয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে বৃন্দাবনে গোবিন্দজী, মদনমোহনজী ও গোপীনাথজীর জন্য নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই বংশীয় রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু কতকগুলি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। সঙ্গীত শাস্ত্রেও বৈকুণ্ঠনাথের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল।

বহড়ুর নিকটবর্ত্তী ময়দা গ্রামে এক পুরাতন কালী আছেন। ইনি ময়দার মহাকালী নামে পরিচিত। ইঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও এতদঞ্চলে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

জয়নগর-মজিলপুর—কলিকাতা হইতে ৩১ মাইল দূর। জয়নগর ও মজিলপুর পাশাপাশি অবস্থিত দুইটি ভিন্ন গ্রাম হইলেও সাধারণের নিকট ইহা "জয়নগর-মজিলপুর" এই যুগ্মনামে পরিচিত। এই গ্রাম দুইটির ন্যায় বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রপল্লী এতদঞ্চলে আর নাই। এই উভয় গ্রামেই প্রাচীন ও আধুনিক কালের বহু দেবায়তন ও দীঘিকা অবস্থিত। এখানে একটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ব্রাহ্ম-সমাজের বিশিষ্ট নেতা আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় জয়নগর-মজিলপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার রচিত "নিমাই সন্ন্যাসের" সুন্দর কবিতাটি বোধ হয় অনেকেরই মুখস্থ আছে। শিবনাথের "মেজ বউ" "নয়নতারা" প্রভৃতি উপন্যাসগুলিও পাঠক সমাজে সুপরিচিত। সুকবি গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী মজিলপুরে জন্মগ্রহণ করেন।

জয়নগরে অতি উৎকৃষ্ট খইয়ের মোয়া ও সুগন্ধি পয়রা গুড় পাওয়া যায়।

পঞ্চম দোলযাত্রা উপলক্ষে এখানে ১০ দিন ব্যাপী একটি মেলা বসিয়া থাকে।

বদরিকানাথ শিব, বড়াশী মাধবপুর

মথুরাপুর রোড—কলিকাতা হইতে ৩৪ মাইল দূর। স্টেশন হইতে প্রায় মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে বড়াশী মাধবপুর গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ চক্রতীর্থ অবস্থিত। নিকটেই ছত্রভোগে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্দির। বড়াশী গ্রামে বদরিকানাথ নামক এক

প্রাচীন শিবলিঙ্গ ও মাধবপুরে "সঙ্কেত মাধব" নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। বদরিকানাথ শিবের মন্দিরটি দেখিতে অনেকটা তারকেশ্বরের মন্দিরের ন্যায়। একটি উচ্চ ভূখণ্ডের উপর মন্দিরটি অবস্থিত। নিকটে একটি পুষ্করিণী আছে, উহার জল পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। এই পুষ্করিণীটির নাম শিবকুণ্ড। পুত্রাভিলাষিনী রমণীগণ সুপুত্র লাভের আশায় এখানে অবগাহন করিয়া থাকেন। বদরিকানাথের প্রাচীন নাম অম্বুলিঙ্গ। বড়াশী মাধবপুর প্রভৃতি গ্রাম পূর্ব্বে ছত্রভোগেরই অন্তর্গত ছিল এবং তৎকালে ইহার পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। এখনও এই অঞ্চলে গঙ্গার লুপ্তপ্রায় খাত দেখিতে পাওয়া যায় এবং বর্ষাকালে ঐ খাতের বিভিন্ন অংশ জল পূর্ণ হয়। অম্বুলিঙ্গ শিবের মন্দির পূর্ব্বে গঙ্গার তটে অবস্থিত ছিল এবং এই স্থান অম্বুলিঙ্গঘাট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। চৈতন্য ভাগবতে ছত্রভোগ ও অম্বুলিঙ্গ ঘাটের সবিশেষ বর্ণনা আছে। শান্তিপুর হইতে পুরী গমনকালে শ্রীচৈতন্যদেব যে গঙ্গাতীরের পথ ধরিয়া গমন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ছত্রভোগে আসিয়া তিনি অম্বুলিঙ্গ শিবকে দর্শন ও অম্বুলিঙ্গ ঘাটে স্নান করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতেই নৌকা-যোগে তিনি ওড়িষ্যায় গমন করেন। তৎকালে ছত্রভোগে রামচন্দ্র খাঁ নামক জনৈক জমিদার বাস করিতেন। তিনিই শ্রীচৈতন্যদেবের ওড়িষ্যা গমনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। "অম্বুলিঙ্গ" নাম সম্বন্ধে চৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে যে পূর্ব্বে যখন ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন করেন, তখন মহাদেব দীর্ঘকাল গঙ্গার বিরহে অধীর হইয়া তাঁহার অনুসরণ করেন এবং ছত্রভোগের নিকট আসিয়া জলরূপে তাঁহার সহিত মিলিত হন, যথা—

"গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভোগে।
বিহ্বল হইলা অতি গঙ্গা অনুরাগে ॥
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িলা।
জলরূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা।
* * * *
জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
"অম্বুলিঙ্গ ঘাট" করি ঘোষে সর্ব্বজনে।"

জনশ্রুতি, গঙ্গার স্রোত রুদ্ধ হইবার পর জলময় শিব পাষাণময় শিবলিঙ্গরূপে স্থলভাগে আবির্ভূত হন।

বদরিকানাথ শিবের মন্দিরের অতি নিকটে প্রাচীন ভাগীরথী গর্ভে নন্দা পুষ্করিণী বা চক্রতীর্থ অবস্থিত। কথিত আছে, শিবের সহিত গঙ্গার মিলন কালে জলস্রোতের গর্জ্জন স্তব্ধ হইলে অগ্রগামী ভগীরথ সংশয়াকুলচিত্তে পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি করিতে থাকেন ; তখন গঙ্গাদেবী স্বকরস্থিত জ্যোতির্ম্ময় চক্র উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে দেখান। শিবগঙ্গার মিলন স্থলে এই চক্র প্রদর্শিত হইয়াছিল বলিয়া ঐ স্থান চক্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। চৈত্রমাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশী এই তিন তিথিকে নন্দা বলে। এই জন্য চক্রতীর্থের অপর এক নাম নন্দা। বর্ত্তমানে নন্দা বা চক্রতীর্থ একটি সাধারণ পুষ্করিণী মাত্র। ইহার পশ্চিম দিকে একটি বাঁধা ঘাট আছে এবং তীরে দুই একটি দেবমন্দির আছে।

ারতের অন্যান্য স্থানেও "চক্রতীর্থ" এই নামের তীর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরী, কাশী, ভোস ও বৃন্দাবনেও এক একটি চক্রতীর্থ আছে। এতদঞ্চলের অধিবাসিগণের বিশ্বাস য পুরাণ বর্ণিত চক্রতীর্থ ছত্রভোগেই অবস্থিত। তাঁহারা বলেন যে গঙ্গা, সঙ্কেত মাধব, অম্বুলিঙ্গ শিব ও ত্রিপুরাসুন্দরী শক্তি,—এই চতুর্ব্যূহ-মহাশক্তির অধিষ্ঠানের জন্য প্রাচীন ছত্রভোগই প্রকৃত চক্রতীর্থ। পুরাণে বর্ণিত আছে যে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কর্ম্মফলে অতি দুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়া মহাপাতকের ভাগী হন। পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়াও তাঁহার পাপক্ষয় হইল না। তখন শিবের নির্দ্দেশমত চক্রতীর্থে স্নান করিয়া তিনি মহাপাতক হইতে মুক্তিলাভ করেন। কথিত আছে, শুক্রাচার্য্য যে দিন এই স্থানে স্নান করেন, সে দিন নন্দা তিথির সহিত শুক্রবারের সংযোগ ঘটিয়াছিল। এই বিশেষ যোগের নাম ভৃগুনন্দা। এখনও যদি চৈত্র মাসের শুক্ল প্রতিপদ তিথি শুক্রবারে হয় তাহা হইলে এখানে যাত্রীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়। নন্দা স্নান উপলক্ষে বড়াশী-মাধবপুরে অন্যূন ১৫।২০ হাজার যাত্রীর সমাবেশ হয় এবং সপ্তাহকাল স্থায়ী একটি বিরাট মেলা বসে। মথুরাপুর রোড স্টেশন হইতে মেলার স্থান পর্য্যন্ত মোটর বাস চলে।

নন্দার পুকুর হইতে প্রায় আধ মাইল পশ্চিমে মাধবপুর গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণের পর্ণকুটিরে "সঙ্কেত মাধব" বিগ্রহ আছেন। এই চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিটি অতি সুন্দর ও ব্রহ্মশিলা বা কষ্টিপাথরের দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার কোন মন্দির নাই।

ছত্রভোগের ত্রিপুরাসুন্দরী মূর্ত্তিও অতি সুন্দর। এখানে স্নান যাত্রার সময়ে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কেহ কেহ বলেন যে ত্রিপুরাসুন্দরী একটি শক্তিপীঠ, বড়াশী গ্রামের বদরিকা নাথ মহাদেব ইঁহার ভৈরব।

নন্দা পুষ্করিণী হইতে সামান্য দূরে গঙ্গার খাতের অপর পারে খাঁড়ি নামক গ্রামে "নারায়ণী" নামে এক বিখ্যাত দেবীমূর্ত্তি আছেন। এই দেবী সিংহবাহিনী, ত্রিনেত্রা, দ্বিভুজা ও পীতবর্ণা। নন্দা স্নানের যাত্রিগণ এই দেবীকেও দর্শন করিয়া থাকেন। নারায়ণী দেবীর মন্দিরের অদূরে দক্ষিণরায়ের একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। ধপধপির দক্ষিণরায়ের ন্যায় এই মূর্ত্তিটিরও যোদ্ধবেশ, এবং ইহার হাতেও বন্দুক আছে।

এই সকল স্থান প্রচীনকালে হাতিয়াগড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রাচীনকালে ছত্রভোগের নিকটে গঙ্গার বহু শাখা ছিল এবং এই স্থানের অনতিদূরে সাগর সঙ্গম ও কপিলাশ্রম অবস্থিত ছিল। চৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে,

"সেই ছত্রভোগ গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্ব লোকে করি সুখী॥"

সুন্দরবন অঞ্চলের নদী নালাতে এখনকার দিনেও যে অবস্থা, চারি শত বৎসর পূর্ব্বেও যে ঠিক সেরূপ ছিল, চৈতন্যভাগবত হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। ছত্রভোগ হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের নৌকা ছাড়িবার পর, তাঁহার আদেশে তাঁহার প্রিয় সহচর মুকুন্দ কীর্ত্তন গান আরম্ভ করিলেন,

"অবুধ নাবিক বলে, হইল সংশয়।
বুঝিলাম আজি আর প্রাণ নাহি রয়॥

কূলেতে উঠিলে বাঘে লৈয়া সে পলায়।
জলেতে পড়িলে সে কুম্ভীরে ধরি খায়॥
নিরন্তর এ পানিতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে॥
এতেকে যাবৎ না উড়িয়া দেশ পাই।
তাবৎ নীরব হও সকল গোসাই॥"

মথুরাপুর রোড স্টেশন হইতে প্রায় ছয় মাইল পশ্চিম দিকে মন্দিরবাজার নামক গ্রামে শ্রীকেশবেশ্বরের মন্দির নামে একটি প্রায় আড়াই শত বৎসরের পুরাতন শিবমন্দির আছে। স্টেশন হইতে এই গ্রাম পর্য্যন্ত কাঁচা রাস্তা আছে। এই রাস্তার পার্শ্ব দিয়া একটি খাল বরাবর মন্দিরবাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তা ধরিয়া প্রায় পাঁচ মাইল পথ গেলে জগদীশপুর গ্রাম। এই গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিকটে হাউড়ির হাট নামক স্থানে দুইটি পুরাতন ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে হাউড়ি নামক জনৈক মহিলার দ্বারা এই হাট ও মন্দির দুইটি স্থাপিত হয়। লাল রঙের লম্বা অথচ হাল্কা ইটের দ্বারা এই মন্দির দুইটি নির্ম্মিত। এই মন্দিরদ্বয়ের মধ্যে পদ্মখচিত কৃষ্ণ প্রস্তরের আসনের উপর প্রায় আড়াই হাত উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে।

জগদীশপুর ছাড়িয়া অর্দ্ধ মাইলের কিছু অধিক দূর অগ্রসর হইলে শ্রীকেশবেশ্বরের মন্দিরে পৌঁছানো যায়। এই মন্দিরটি বেশ বড় ও উচ্চ। মন্দির হইতেই গ্রামের নাম মন্দিরবাজার হইয়াছে। বাজারের মধ্যেই এই মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের চূড়ার দুইটি থাক্। উপরের থাকে তিনটি ত্রিশূলযুক্ত কলস বসানো আছে। বহুদিন ধরিয়া এই মন্দিরের সংস্কার না হওয়ায় ইহার চূড়ার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি আগাছা জন্মিয়াছে। মন্দিরটির তিন দিকে প্রশস্ত বারান্দা ও রোয়াক আছে। প্রধান গম্বুজটি বারান্দা গুলিকে আবৃত করিয়া নির্ম্মিত। মন্দিরের মেঝে শ্বেতপ্রস্তরে মণ্ডিত, বারান্দায়ও অনেকগুলি নাম লেখা শ্বেতপাথর বসানো আছে। মন্দিরস্থিত শিবলিঙ্গের নিত্যসেবার বন্দোবস্ত আছে। মন্দিরের বাহিরের দেওয়ালে কতকগুলি কারুকার্য্য খচিত ইষ্টক আছে এবং দুই পার্শ্বে দুইখানি টালিতে পলতোলা অক্ষরে নিম্নলিখিত লিপিটী উৎকীর্ণ আছে—

"আকাশাব্ধি রসঃ ক্ষৌণীমিতে শাকে শিবালয়ং।
ভূপঃ শ্রীকেশবোকার্ষীদ্বাসুদেবেন শিল্পিনা॥"

অর্থাৎ ১৬৭০ শকাব্দে শ্রীকেশব নামক রাজা বাসুদেব নামক শিল্পির দ্বারা এই শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। বর্ত্তমানে ১৮৬১ শকাব্দ চলিতেছে। সুতরাং এই মন্দির দুই শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সুন্দরবন অঞ্চলে কেশব নামে কোন রাজা ছিলেন কিনা তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে ইঁহার নাম ছিল কেশব রায়-চৌধুরী এবং ইনি নাকি একজন ভূঁইয়া রাজা ছিলেন। কথিত আছে, স্বপ্নাদেশ পাইয়া তিনি অরণ্য মধ্যে এই শিবলিঙ্গকে আবিষ্কার করেন এবং স্বীয় নামে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করেন। চৈত্র-সংক্রান্তির সময় কেশবেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গনে মহাসমারোহ হয়।

লক্ষ্মীকান্তপুর—কলিকাতা হইতে ৩৯ মাইল দূর। ইহা সুন্দরবনের আবাদী অঞ্চলের অন্তর্গত। এই স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে ধান ও বিচালী প্রভৃতি চালান যায়। এই স্থান হইতে ৩৩ মাইল দূরবর্ত্তী কাকদ্বীপ পর্য্যন্ত একটি কাঁচা রাস্তা আছে। শীত ও গ্রীষ্ম কালে এই পথ দিয়া মোটর বাস যাতায়াত করে। এই পথে লক্ষ্মীকান্তপুর হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী ভাগীরথী তীরে কুলপী গ্রাম অবস্থিত। নদীর ধারে একটি উচ্চ মন্দির আকৃতির কবর আছে, ইহা মণি বিবির কবর নামে অভিহিত এবং নাবিকদিগের নিকট কুলপী প্যাগোডা নামে পরিচিত। পূর্ব্বে কুলপীর নিকট জাহাজের একটি নঙ্গর ফেলিবার স্থল ছিল। কবরটি একটি ইংরেজ মহিলার কবর বলিয়া কথিত।

লক্ষ্মীকান্তপুর হইতে অনতিদূরে সুন্দরবনের ১১৬ নং লাটে "জটার দেউল" নামে পরিচিত একটি পুরাতন ও ভগ্নপ্রায় দেবমন্দির দৃষ্ট হয়। ইহা ৫০।৬০ হাত উচ্চ হইবে। ইহার আকৃতি ভুবনেশ্বর মন্দিরের অনুরূপ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহা একটি শিবমন্দির, আবার কাহারও কাহারও মতে ইহা কোন বৌদ্ধ চৈত্য। ইহার নির্ম্মাণকাল জানা যায় নাই। জটার দেউলের নিকটে ১২৭ ও ১২৮ নং লাটে বিরিঞ্চির মন্দির, ভরত রাজার মন্দির ও ভরত গড় নামে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে সুন্দরবন অঞ্চলে ভরত নামে কোন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়; (দৌলতপুর দ্রষ্টব্য)।

জটার দেউলের পশ্চিম দিকে ২৬ নং লাটে রায়দীঘি ও কাঞ্চনদীঘি নামে দুইটি পুরাতন ও উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ প্রকাণ্ড দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়।

জটার দেউলের নিকটে প্রাচীন হাতিয়াগড় অবস্থিত ছিল; বৌদ্ধযুগে এখানে একটি প্রসিদ্ধ বিহার ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে বর্ণিত আছে যে ধনপতি সদাগর "হাতো-ঘরে" অম্বুলিঙ্গ শিব ও নীলমাধবের পূজা করিয়াছিলেন। গোড়াই গাজীর প্রসঙ্গে হাতিয়াগড়ের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। (বারাসাত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ের "হাড়োয়াখাল" স্টেশন দ্রষ্টব্য)।

মগরাহাট—কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল দূর। অনেকগুলি খাল এখানে আসিয়া মিলিত হওয়ায় ইহা একটি বড় ব্যবসায়ের কেন্দ্র হইয়াছে। চাউলের কারবারের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ।

বাসুলডাঙ্গা—কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দূর। স্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণদিকে বোলসিদ্ধি নামক গ্রামে এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছেন। গ্রামের এক প্রান্তে একটি উচ্চ ভূখণ্ডের উপর শিবের মন্দির অবস্থিত। কবে কাহার দ্বারা এই শিবের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। স্থানীয় লোকে ইঁহাকে অনাদিলিঙ্গ বলিয়া মনে করেন। শিবের মন্দিরের চতুর্দ্দিকে কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষের চিহ্ন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গলের দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল। একজন সন্ন্যাসী তথায় বাস করিয়া শিবের অর্চ্চনা করিতেন। সন্ন্যাসী বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন; তিনি যাহাকে যাহা বলিতেন

তাহাই ফলিত। এই জন্য এই গ্রামের নাম বাক্‌সিদ্ধি বা বোলসিদ্ধি হয় গাজন ও শিবরাত্রির সময় এই শিবমন্দিরে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

ডায়মণ্ড হারবার—কলিকাতা হইতে ৩৭ মাইল দূর। এই স্থানের দেশীয় নাম হাজীপুর। বাণিজ্য জাহাজ সকলের অবস্থানের জন্য এই স্থানটি বিশেষ উপযোগী বলিয়া ইংরাজেরা ইহার ডায়মণ্ড হারবার নামকরণ করেন। একশত বর্ষেরও পূর্ব্বে এই স্থানে বহু জাহাজ আসিয়া থামিত এবং মাল উঠা নামা করিত। ইহা চব্বিশ পরগণা জেলার অন্যতম মহকুমা। এখানে গঙ্গার বিস্তৃতি প্রায় তিন মাইল ও দৃশ্য অতি মনোরম। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু জল থৈ থৈ করিতেছে দেখা যায়; সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের দৃশ্য আরও সুন্দর। এখানে গঙ্গার কিনারা দিয়া একটি বড় বাঁধ আছে, এই বাঁধের উপর দিয়া ভ্রমণ করা বড়ই আনন্দ দায়ক। দক্ষিণ দিক হইতে আগত সমুদ্রের নির্ম্মল বাতাস ক্লান্ত দেহমনকে তৃপ্ত করে। ডায়মণ্ড হারবারের গঙ্গাতীরে একটি সুন্দর
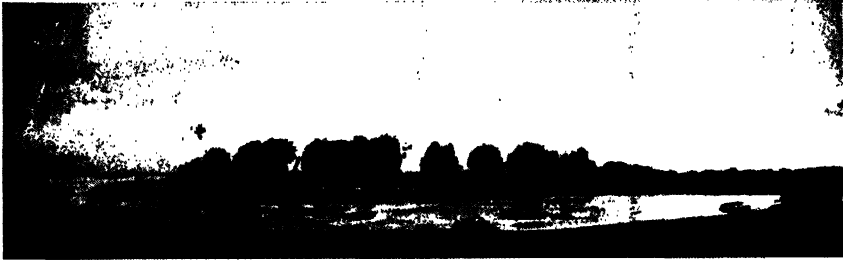
লকগেট ও ঝাউবীথি, ডায়মণ্ডহারবার

ঝাউ বীথি আছে। স্থানটি যেমন নির্জ্জন, তেমনই মনোরম। কলিকাতা শহরের বহু নাগরিক ও ছাত্র এই স্থানে বনভোজন বা চড়িভাতি করিবার জন্য আসিয়া থাকেন। এখানকার লক্‌গেট বা নদী হইতে খালে জল লইবার দরজা অপর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। স্থানটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর। নদীর তীরে এখানে একটি পরিত্যক্ত দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম চিংড়ীখালি গড়। বহিঃ শত্রুর আক্রমণ হইতে কলিকাতা নগরী রক্ষা করিবার জন্য এই দুর্গটি নিম্মিত হইয়াছিল, পরে ইহা পরিত্যক্ত হয়।

এই স্থানে ইংরেজদের একটি পুরাতন গোরস্থান আছে। কথিত আছে চৈতন্যদেব পুরী গমন কালে হাজীপুরে আসিয়াছিলেন।

গঙ্গাসাগর—ডায়মণ্ড হারবার হইতে স্টীমার যোগে সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ গঙ্গাসাগর বা সাগরদ্বীপে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যাইতে হয়। ডায়মণ্ড হারবার হইতে গঙ্গাসাগর দ্বীপের দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময়ে এখানে প্রসিদ্ধ মকর স্নানের মেলা হয় এবং উহাতে ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের লোক যোগদান করে। মেলায় সুন্দর রঙীন কাঠের নানারূপ পুতুল ও কাঠের জন্তু জানোয়ার বিক্রীত হয়; বিশেষতঃ সুন্দরবনের বাঘের মূর্ত্তিগুলি খুবই স্বাভাবিক। এগুলি পুরাতন লোক-শিল্পের চমৎকার নিদর্শন। এই মেলায় যত অধিক সংখ্যক সাধুর সমাগম হয়, বাংলার আর কোন তীর্থে

বা মেলায় সেরূপ হয় না। সাধুদের মধ্যে নাগা সাধুদের সংখ্যাই কিছু অধিক। এই মহাতীর্থে স্নান করিলে লোকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে এবং এখানে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধ তর্পণে অনন্ত ফল লাভ হয় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে গঙ্গাসাগরের কথা আছে।

গঙ্গাসাগর হিন্দুর একটি অতি প্রিয় ও অতি পবিত্র তীর্থ। পবিত্রতায় অন্য কোনও তীর্থ ইহার সমকক্ষ কিনা সন্দেহ। এই সবিশেষ পবিত্রতার প্রধান কারণ ইহা পুণ্যতোয়া গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া। হিন্দুর নিকট গঙ্গা সর্ব্বত্রই পবিত্র এবং পবিত্র নদীর উৎস ও মুখ বা মোহানা অন্য অংশ হইতে পবিত্রতর গণ্য হয় বলিয়া গঙ্গার উৎস গঙ্গোত্রী এবং মোহানা গঙ্গাসাগর গঙ্গার অপরাংশ হইতে অধিকতর পবিত্র। গঙ্গার ন্যায় সাগরও হিন্দুর নিকট সর্ব্বত্রই পবিত্র, সেইজন্য তাহাদের সঙ্গমস্থল গঙ্গাসাগরের পবিত্রতা বহুমাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার উপর সুপ্রসিদ্ধ কপিলমুনি কঠোর তপশ্চর্য্যার পর তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া এই স্থানকে পূত করিয়াছেন। সর্ব্বশেষে সগরের প্রপৌত্র ভগীরথ স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিয়া এই স্থানেই কপিলমুনির শাপে ভস্মীভূত সগরের ষাট হাজার পুত্রকে গঙ্গাবারির মাহাত্ম্যে মুক্তিদান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। শাস্ত্রে গঙ্গাসাগর তীর্থের মাহাত্ম্য সবিস্তারে বর্ণিত আছে। পুরাণে লিখিত আছে, রামচন্দ্রের ত্রয়োদশ স্থানীয় পিতৃপুরুষ অযোধ্যা-রাজ সগর নিরনব্বই বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার পর শতবার পূর্ণ করিবার জন্য পুনর্ব্বার যজ্ঞের আয়োজন করেন। ইহাতে স্বর্গরাজ ইন্দ্র, যিনি নিজে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, উদ্বিগ্ন ও ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠেন, কারণ তাহা হইলে তাঁহার কৃতিত্ব আর থাকিবে না। ইন্দ্র তখন যজ্ঞের জন্য ছাড়িয়া-দেওয়া সগরের অশ্বটি চুরি করিয়া কপিলমুনি যে স্থানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ধ্যানে মগ্ন ছিলেন তাহার নীচে মাটির মধ্যে একটি ঘরে লুকাইয়া রাখিলেন। সগরের ষাট হাজার পুত্র নানা দিকে অন্বেষণ করিবার পর অশ্বটিকে পাইয়া মনে করিলেন কপিলমুনিই বুঝি ইহাকে চুরি করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা তাঁহাকে আঘাত করিলে তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হয়। মুনি চোখ খুলিয়া তাঁহাদের দেখিয়া শাপ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ভস্মীভূত হইয়া নরকে নিক্ষিপ্ত হইলেন। মুনি বিধান দিয়াছিলেন যে ভস্মস্তূপে যদি গঙ্গার ধারা লইয়া আসা যায় তাহা হইলেই শুধু মুক্তি সম্ভব। সগরের প্রপৌত্র ভগীরথ বহু তপস্যার পর গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যে আনিতে সক্ষম হন। কথিত আছে ভগীরথ এইরূপে পথ দেখাইয়া সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী চব্বিশ পরগণা জেলার হাতিয়াগড় পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়া আর পথ খুঁজিয়া পাইলেন না। সগরপুত্রগণের ভস্মে নিশ্চিতরূপে পৌঁছিবার জন্য গঙ্গা তখন শতভাগে বিভক্ত হইয়া সমুদ্রে মিলিত হইলেন। এইরূপে গঙ্গার বিভিন্ন মোহানাগুলি ও ব-দ্বীপ সৃষ্ট হইল। একটি ধারা দিয়া সগর পুত্রগণের ভস্মরাশি ধুইয়া লইয়া গঙ্গাদেবী তাঁহাদের আত্মার সদগতি করিলেন। গঙ্গাসাগরে গঙ্গাদেবী কপিল, সমুদ্র ও ভগীরথের মূর্ত্তি আছে। যাত্রীরা স্নানান্তে এই মূর্ত্তিগুলি দর্শন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি সাগরদ্বীপে কপিলমুনির একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

"Ancient System of Irrigation in Bengal" নামক পুস্তকে মিশরের সেচ বিভাগের বিশেষজ্ঞ স্যার উইলিয়ম উইল্‌কক্‌স্ মহাশয় লিখিয়াছেন যে মধ্য ও

পশ্চিম বাংলার নদীগুলি দেখিলে সুদৃঢ় ধারণা হয় যে পুরাকালে এগুলি গঙ্গা হইতে কাটা কৃত্রিম খাল ছিল; কালক্রমে ইহাদের এক একটি ভাগীরথীর ন্যায় বৃহৎ নদীতে পরিণত হইয়াছে। ভগীরথের উপাখ্যান বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন সম্ভবতঃ ইনিই ছিলেন সেই সুদক্ষ এঞ্জিনিয়র, যাঁহার খনিত কৃত্রিম খালগুলির সাহায্যে বাংলা সুজলা সুফলা হইয়াছিল। হয়ত গঙ্গাসাগরের মেলা সেই ঘটনারই স্মারক হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বে গঙ্গাসাগর তীর্থে যাওয়া বড় কষ্টকর ব্যাপার ছিল। দীর্ঘ দিন ধরিয়া শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য পথে বা বড় বড় নদী দিয়া নৌকায় করিয়া যাতায়াত করিতে হইত। ইহাতে বিপদের আশঙ্কা যে কত ছিল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি দৈব দুর্ব্বিপাক, হিংস্র জন্তুর আক্রমণ, জলদস্যুর অত্যাচার ও বিসূচিকা প্রভৃতি মহামারীর জন্য তীর্থযাত্রীদের অনেকেই আর ধন প্রাণ লইয়া গৃহে ফিরিতে পারিত না। লোকে সাগর তীর্থে যাইবার পূর্ব্বে আত্মীয় স্বজনগণের নিকট হইতে একরূপ চিরবিদায় লইয়া বাহির হইত। এই কারণেই অতীতে পবিত্র গঙ্গাসাগর হরিদ্বার, কাশী বা প্রয়াগের মত জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে ও রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস" নামক কবিতায় সেকালের গঙ্গাসাগর তীর্থ যাত্রার অতি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত আছে। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। অন্যান্য তীর্থের ন্যায় গঙ্গাসাগর তীর্থও এখন অতি সুগম ও ঘরের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। ডায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত রেল গাড়ীতে আসিয়া তথা হইতে স্টীমারে গেলে আজকাল অতি অল্প সময়ের মধ্যে ও অল্প ব্যয়ে ভারতের এই অন্যতম প্রধান তীর্থটি দেখিয়া আসিতে পারা যায়। মকর স্নানের মেলা উপলক্ষে রেল গাড়ী ডায়মণ্ড হারবারে একেবারে গঙ্গার ঘাট পর্য্যন্ত চালানো হয়, গাড়ী হইতে নামিয়াই যাত্রিগণ সম্মুখে স্টীমারে গিয়া উঠিতে পারেন। যাত্রিগণের সুবিধার জন্য বাংলা তথা ভারতের প্রধান প্রধান স্থান হইতে এই সময়ে ডায়মণ্ড হারবার হইয়া রেল ও স্টীমার যোগে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত সুলভ মূল্যে একটানা যাতায়াতী টিকিট বিক্রীত হয়। মেলা উপলক্ষে সাগরদ্বীপেও আজকাল অতি সুবন্দোবস্ত হয়। নির্ম্মল পানীয় জল, বহুবিধ খাদ্য ও অন্যান্য বস্তুর দোকান, চালাঘর, পুলিস প্রহরী ও স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা, শৌচাগার, রাত্রিকালে উজ্জ্বল আলোকের ব্যবস্থা ও চিকিৎসা কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপিত হইয়া মেলার কয়দিন নির্জ্জন সাগরদ্বীপ একটি ছোটখাট শহরে পরিণত হয়। গঙ্গাসাগর যাতায়াতের পথের দৃশ্যও অতি সুন্দর। দিগন্ত বিস্তৃত সলিল রাশির পরপারে শ্যামায়মান বৃক্ষশ্রেণীর সবুজরেখা তীরভূমির অস্পষ্ট আভাষ জানায়। দেখিলেই "কপালকুণ্ডলার" নবকুমারের ন্যায় মনে পড়িবে রঘুবংশের সেই অমর শ্লোক—

> "দূরাদয়শ্চক্রেঃ নিভস্য তন্বীঃ
> তমাল তালী বনরাজি নীলা।
> আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
> র্ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥"

পূর্ব্বকালে সন্তানহীনা বহু নারী পুত্রলাভেচ্ছায় মানসিক করিয়া প্রথম সন্তানটি গঙ্গাসাগরে অর্ঘ্য দিয়া আসিতেন; তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, ইহার ফলে আরও

সন্তান সন্ততি লাভ করিবেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলী আইন করিয়া এই নির্ম্মম ও নিদারুণ প্রথাটি বন্ধ করিয়া দেন।

বর্ত্তমানে সাগরদ্বীপে কয়েক ঘর গৃহস্থ সাধুর বসবাস হইয়াছে। যাহারা সুন্দরবন অঞ্চলে মহাল করিতে অর্থাৎ কাষ্ঠ, মোম ও মধু সংগ্রহ করিতে যায়, সাধারণতঃ তাহাদের দানের উপর নির্ভর করিয়া ইঁহাদের দিন চলে। এই দ্বীপের উত্তর দিকে পোর্ট কমিশনারগণের লাইট হাউস ও আবহাওয়া অফিস অবস্থিত। লাল রঙের দ্বিতল অফিসগৃহ ও বাতি ঘরটি বহু দূর হইতে দৃষ্টি পথে পতিত হয়। সাগরদ্বীপের পরিমাণ প্রায় ১৭০ বর্গ মাইল। ইহা উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। বর্ত্তমানে ইহা জনহীন অরণ্যের অংশ মাত্র হইলেও একসময়ে এখানে বহুলোক বাস করিত। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে এক ভীষণ জলপ্লাবনের ফলে এই দ্বীপ জনহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হয়। ইংরেজ আমলে ১৮১১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই দ্বীপে পুনরায় বসতি স্থাপনের চেষ্টা চলে, কিন্তু ১৮৩৩ ও ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের সাইক্লোনে বহু লোক মারা যায়। দ্বীপের উত্তরভাগে এখন চাষ আবাদ চলিতেছে। যে স্থানে গঙ্গাসাগরের মেলা হয় তাহার সামান্য উত্তরে জঙ্গলের মধ্যে একটি ভগ্নপ্রায় ইষ্টকালয় আজিও বর্ত্তমান আছে। এই স্থানে হইতে কয়েক মাইল উত্তরে বামুনখালি নামক স্থানে একটি প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয় এবং নিকটবর্ত্তী চন্দনপীড়ি নামক জঙ্গলেও একটি ধ্বংসোন্মুখ মন্দির ও বুড়বুড়ীর তট নামক আবাদে "বিশালাক্ষীর মন্দির" নামে একটি পুরাতন মন্দির আছে।

সাগরদ্বীপে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের একটি দুর্গ ছিল ও একটি নৌ-বহর এখানকার ঘাঁটি রক্ষা করিত। এই ঘাঁটি নিরাপদ করিবার জন্য প্রতাপাদিত্য এই জমি অধিকার করেন। সাগরদ্বীপ হইতে রাজধানী ধূমঘাট পর্য্যন্ত জলপথ জাহাজ দিয়া পাহারা ও রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল; এই কার্য্যে এবং সাগরদ্বীপে জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামতী কার্য্যে প্রতাপাদিত্যের অনেক ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারী নিয়োজিত ছিল। সেই জন্য ধূমঘাট যাইবার জলপথের নাম হইয়াছিল "ফিরিঙ্গী ফাঁড়ী"। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন সাগরদ্বীপেই প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল; রামরাম বসু ও হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার প্রভৃতি প্রতাপাদিত্যের জীবনী লেখকগণ তাঁহাকে সাগরদ্বীপের শেষ রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জেসুইট পাদ্রীগণ প্রতাপাদিত্যকে যে চ্যাণ্ডিকানের রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কাহারও কাহারও মতে সেই চ্যাণ্ডিকান বা "চাঁদখাঁ" চক সুন্দরবনের সাগরদ্বীপ অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। (ঈশ্বরীপুর দ্রষ্টব্য)।

গঙ্গাসাগর হইতে ১০।১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার দক্ষিণ প্রান্তে বাহির সমুদ্রের উপর নারায়ণতলা দ্বীপ অবস্থিত। নাবিকদিগের নিকট ইহা মেক্‌লেন্‌বার্গ দ্বীপ নামে পরিচিত। উত্তর-দক্ষিণে ইহা নয় মাইল লম্বা এবং প্রস্থে মোটামুটি তিন মাইল। ইহার সাগর সৈকতের উত্তরে বালিয়াড়ি এবং তাহার উত্তরেই বৃক্ষশ্রেণী; স্থানটি সত্যই মনোরম। দ্বীপের মধ্যে প্রকাণ্ড একটি মিষ্ট জলের ঝিল আছে। স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজর যখন বাংলার ছোট লাট ছিলেন সে সময়ে তিনি কলিকাতাবাসীদিগের বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য এই দ্বীপটিকে একটি স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাস্তা ঘাট, ডাক-বাংলা, ডাক্তারখানা, গল্‌ফের মাঠ প্রভৃতি তৈয়ার

হইয়াছিল ; কিন্তু ব্যয় বাহুল্যের জন্য গবর্ণমেণ্টকে এই পরিকল্পনা বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হয়। সেই সময়ে দ্বীপটির ফ্রেজারগঞ্জ নূতন নামকরণ হয়। রাস্তা ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণকালে অনেকগুলি পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এবং চারটি ইটখোলা দৃষ্ট হয়।

সুন্দরবন—বাংলাদেশে সুন্দরবনের মত অরণ্য আর একটিও নাই। হিমালয়ের পাদদেশে তরাইয়ের প্রসিদ্ধ জঙ্গলও এত বড় ও এত বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। ২৪ পরগণা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ এই তিনটি জেলার দক্ষিণাংশ জুড়িয়া বঙ্গোপসাগরের উপকূলে সুন্দরবন দৈর্ঘ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১৮০ মাইল ও প্রস্থে স্থানভেদে ৬০ হইতে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সুন্দরবনের পশ্চিমে ভাগীরথী এবং পূর্ব্বে মেঘনা। এই দুই প্রান্তের উচ্চ ভূমি হইতে জমি ক্রমশঃ ঢালু হইয়া মধ্যভাগে খুলনা জেলা এবং ২৪ পরগণার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে নিম্ন জলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

ইছামতী বা যমুনা যশোহর জেলা হইতে খুলনা জেলায় প্রবেশ করিয়া কতকদূর ২৪ পরগণা ও খুলনা জেলার সীমা নির্দ্দিষ্ট করে ; তাহার পর যমুনার শাখা কালিন্দী এই সীমা রক্ষা করিয়া রায়মঙ্গলের সহিত মিলিত হয়। রায়মঙ্গল দক্ষিণে সমুদ্রে মিলিবার পূর্ব্ব হইতে বিশালরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্রের শাখা বা বাহু রূপেই দৃষ্ট হয়। রায়মঙ্গলের পূর্ব্বদিকে পর পর মালঞ্চ, বড়পাঙ্গা, মর্জাতা, বাংডা ও হরিণঘাটাও এইরূপ সমুদ্র-বাহু রূপে যেন ডাঙ্গার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। ভাগীরথী এবং রায়মঙ্গল, কালিন্দী—যমুনার মধ্যস্থ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনে চাষ আবাদের জন্য উচ্চ বাঁধ দিয়া লোনা জল বাহিরে রাখিতে হয়। এখানে আবাদের মধ্যে ছোট ছোট অনেক গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে। রায়মঙ্গল—কালিন্দী—যমুনা এবং হরিণঘাটা বলেশ্বর—মধুমতীর মধ্যস্থ খুলনা জেলার অন্তর্গত সুন্দরবনের নিম্নভূমিতে মানুষের বসতি অল্প এবং চাষ আবাদের জন্য নীচু নীচু বাঁধ দেওয়া হয় ; এ অঞ্চলের চাষীরা খুব কমই আবাদের মধ্যে বাস করে। হরিণঘাটা—বলেশ্বর—মধুমতী এবং মেঘনার মধ্যস্থ বাখরগঞ্জ জেলার সুন্দরবনের উচ্চ ভূমিতে চাষের জন্য কোনও বাঁধ দিতে হয় না এবং আবাদে নানাস্থানে লোকের বসতি আছে। গঙ্গা এবং তাহার শাখা প্রশাখাগুলি বহু বৎসর হইতে নিম্নবঙ্গ তথা সুন্দর বনের পশ্চিম অংশ ত্যাগ করিয়া এখন পূর্ব্বাংশেই তাহাদের মিষ্ট জলধারা বিতরণ করিতেছে ; এই জন্য বলেশ্বর বা হরিণঘাটা এবং পূর্ব্বদিকে বাখরগঞ্জ—সুন্দরবনের অন্যান্য নদীগুলির জল বঙ্গোপসাগরের বেশ নিকট পর্য্যন্ত প্রায় সারা বৎসর মিষ্ট থাকে। মধ্যভাগে খুলনা-সুন্দরবনের নদীগুলির জল ক্রমেই লোনা হইয়া ২৪ পরগণা সুন্দর-বনের জল অত্যন্ত লবণাক্ত হইয়াছে।

সুন্দরবনের অসংখ্য খাল, নালা ও নদীর জলপথ কলিকাতা ও পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে যাতায়াতের প্রধান উপায়। সব নদী নালাতেই জোয়ার ভাঁটা খেলিয়া থাকে এবং জোয়ার ও ভাঁটার সাহায্য লইয়া নৌকাগুলিকে চলিতে হয়। বর্ষাকালে প্রধান প্রধান নদী নালাগুলিতে দুইটি বিপরীত মুখী স্রোত বহিতে দেখা যায়। উত্তর হইতে দক্ষিণে বর্ষার জলের স্রোত এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে সমুদ্রের স্রোত বিপরীতদিকে বহিতে থাকে। দক্ষ সন্তরণকারীরাও এই স্রোত বিপর্য্যয়ে বিপন্ন হইয়া থাকেন। নদীর নীচের জল

একদিকে এবং উপরের জল অপরদিকে বহিতে থাকায় কেহ ডুবিয়া গেলে আর উপরে উঠিতে পারে না। সুন্দরবনের নিম্নভূমি জোয়ারের জলে প্লাবিত হইয়া যায়। এই অঞ্চল উত্তরের নদী সমূহের জলধারায় আনীত পলি মাটির সাহায্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিকযুগে গঠিত হইয়াছে এবং এই গঠন ক্রিয়া আজও চলিতেছে।

সুন্দরবনের অরণ্য মধ্যে সুন্দরী গাছের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক থাকায় ইহার নাম সুন্দরবন হইয়াছে। এক এক স্থানে এই অরণ্য এরূপ দুর্ভেদ্য যে দিনের বেলায়ও তাহার মধ্যে দৃষ্টি চলে না। সুন্দরী গাছের আকার দীর্ঘ, ইহার কাঠ লালবর্ণ ও খুব শক্ত; এই গাছের পাতা খুব ছোট, উহার উপরিভাগ মসৃণ ও নিম্নভাগ ধূসর বর্ণ। সুন্দরী গাছ ছাড়া এই বনে পশুর, বাইন, ধোন্দল, কেওড়া, গরাণ, গেঁয়ো, গর্জ্জন, হেন্তাল, বলা, বনঝাউ ও গাবগাছ প্রভৃতি নানারূপ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া প্রচুর পরিমাণে গোলপাতা ও হোগলা জন্মে। কাহারও কাহারও মতে সুন্দর বনের নাম সুন্দরী গাছ হইতে হয় নাই। কারণ অরণ্যের পূর্ব্বাঞ্চলে সুন্দরী গাছ বড় দৃষ্ট হয় না; তাঁহাদের মতে সমুদ্র তীরবর্ত্তী বলিয়া সমুদ্র-বন বা সমুন্দর-বন হইতে সুন্দরবন নাম হইয়াছে।

সুন্দরবনের অরণ্যে নানাপ্রকার হিংস্র প্রাণী বাস করে। উহাদের মধ্যে "রয়াল বেঙ্গল টাইগার" বা সুন্দর বনের "কেঁদো" বা বাঘের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের ন্যায় হিংস্র জন্তু পৃথিবীর আর কোথাও নাই। ইহারা এত শক্তিশালী যে বড় বড় গরু বা মহিষকে পিঠের উপর ফেলিয়া অবলীলাক্রমে বড় বড় খাল, নালা লাফ দিয়া পার হইয়া ছুটিতে পারে। ইহাদের উচ্চতা ৩ হইতে ৪ ফুট ও লাঙ্গুলসমেত দৈর্ঘ্য ১০ হইতে ১২ ফুট। ইহাদের গাত্র হরিদ্রাবর্ণ, উহার উপর লম্বা লম্বা কালো ডোরা থাকে। সুন্দরবনের বাঘ শিকারের ন্যায় দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক কার্য্য অতি অল্পই আছে। সুন্দরবনে প্রতি বৎসর বহুলোকে বাঘের হাতে প্রাণ হারায়। নৌকার মাঝি বা দাঁড়ীকে বাঘে মারিয়া ফেলিলে সেই স্থানেই তাহার হাল বা দাঁড় উপরদিক করিয়া পুতিয়া একখণ্ড শাদা কাপড়ের নিশান তাহাতে বাঁধিয়া দেওয়া হয়; নিশানের এক কোণে এক মুঠা চাউল বাঁধিয়া রাখা হয়। সুন্দরবনের সর্ব্বত্র নদী-নালার ধারে এই আড়ম্বরহীন স্মারক চিহ্নগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। বাঘের পরই সুন্দরবনের নরখাদক কুমীরের নাম করা যাইতে পারে। ডাঙ্গায় যেরূপ বাঘের উৎপাত, জলে কুমীরের অত্যাচারও ঠিক সেইরূপ। ইহারা নদী নালা সর্ব্বত্র অবস্থান করে এবং সুযোগ পাইলেই মানুষ ও গরু ধরিয়া লইয়া যায়। সুন্দরবনে অসংখ্য বানর ও বন্য বরাহ বাস করে। বন্য বরাহগুলি চার পাঁচ ফুট লম্বা ও প্রায় দুই তিন ফুট উচ্চ হয়। ইহাদের গায়ের রং কালো ও ফিকে লালে মিশানো এবং ঘাড় ও পেটের লোমগুলির গোড়ার দিক কালো ও আগার দিক সাদা। সুন্দরবনে বন্য মহিষ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা অত্যন্ত হিংস্র। চলিত কথায় ইহাদিগকে "বয়ার" বলে। হরিণ শিকারের জন্য অনেকেই সুন্দরবনে যাইয়া থাকেন। এখানে নানাজাতীয় হরিণের বাস, তন্মধ্যে ডোরা বা চিতা হরিণ ও কুকুরে হরিণের সংখ্যাই অধিক। কুকুরে হরিণগুলি দেখিতে বড় ছাগলের মত; ইহাদের গায়ের রং লাল। সুন্দরবনে বড় বড় অজগর ও বহু জাতীয় সাপ আছে। এক একটি অজগর

এত বড় যে তাহারা মানুষ বা হরিণকে অক্লেশে গিলিয়া ফেলিতে পারে। সুন্দরবনে বিষধর সর্পের সংখ্যা খুব বেশী। কেউটা, গোখুরা, পাতরাজ, দুধরাজ, মণিরাজ, ধনীরাজ, ভীমরাজ, শঙ্খচূড়, মণিচূড়, নাগরচাঁদ, কানড়, শাঁখামুঠি প্রভৃতি অসংখ্য শ্রেণীর সর্প সুন্দরবনের অধিবাসী। পূর্ব্বে সুন্দরবনের স্থানে স্থানে গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যাইত। বর্ত্তমানে উহারা একরূপ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। সুন্দরবনে মধু মক্ষিকার সংখ্যাও অপর্য্যাপ্ত। প্রতি বৎসর এই অঞ্চল হইতে বহু সহস্র টাকার মধু ও মোম সংগৃহীত হয়। সুন্দরবনবাসী পক্ষীর মধ্যে কুল্যা আকৃতিতে সর্ব্বাপেক্ষা বড়। ইহারা সাদা ও কালো এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। চিল, বক ও কঙ্ক বা কাঁকও সুন্দরবনে প্রচুর দৃষ্ট হয়। সুন্দরবনবাসী কাঁকের সহিত নিত্যদৃষ্ট কাকের কোন সম্বন্ধ বা সাদৃশ্য নাই।

বাঘ ও কুমীরের হাত হইতে রক্ষা পাইবার বিশ্বাসে কাঠুরিয়া বা মাঝিরা সুন্দরবনে যাইবার সময়ে গাজী মোবারক আলি বা মোব্‌রা গাজীর (ঘুটিয়ারী শরীফ দ্রষ্টব্য) চেলা বা বংশীয় বলিয়া পরিচিত ফকিরদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। ইহারা মন্ত্রবলে বাঘ, কুমীর প্রভৃতির আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে এই বিশ্বাসের জোরে তাঁহারা দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল জঙ্গলমধ্যে যাইয়া কাজ করিবার সাহস ও বল পান। কাঠুরিয়ারা জঙ্গলে কাঠ কাটিবার সময়ে ফকিরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ফকির একটুখানি জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে একটি বৃত্ত আঁকেন এবং ইহার মধ্যে লতা-পাতা দিয়া পাশাপাশি ছোট ছোট সাতটি ঘর তৈয়ারী করেন। ডানদিক দিয়া আরম্ভ করিয়া প্রথম তিনটি ঘর যথাক্রমে জগবন্ধু, মহাদেব ও মনসাকে উৎসর্গ করা হয়। ইহার পর জঙ্গলের উপদেবী রূপাপরীর জন্য একটি বেদী তৈয়ারী হয়। ইহার পরে চতুর্থ ঘরটিকে দুভাগ করিয়া যথাক্রমে কালী এবং তাঁহার কন্যা কালীমায়াকে উৎসর্গ করা হয়। ইহার পর জঙ্গলের অপর উপদেবী ওড়পরীর জন্য একটি বেদী থাকে। পঞ্চম ঘরটিকে দুভাগ করিয়া কামেশ্বরী ও বুড়ী ঠাকুরাণীকে উৎসর্গ করা হয়। তৎপরে রক্ষাচণ্ডী নামে সিন্দুরলিপ্ত একটি গাছের গুঁড়ি থাকে। তাহার পর ষষ্ঠ ঘরটি দুভাগ করিয়া গাজী সাহেব এবং তাঁহার ভ্রাতা কালুকে এবং পার্শ্ববর্ত্তী সপ্তম ঘরটিকে দুভাগ করিয়া গাজী সাহেবের পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুত্র চাওয়াল পীর ও রাম গাজীকে উৎসর্গ করা হয়। ইহার পর বাস্তুদেবতার পূজার জন্য কলাপাতা রাখা হয়। ঘটে সিন্দুর দিয়া দেবতাদের ছবি আঁকিয়া সম্মুখে রাখা হয় এবং ঘরগুলির উপরে নিশান ঝুলাইয়া চাউল, কলা, নারিকেল, চিনি, মিঠাই ও চিরাগের নৈবেদ্য দিয়া পূজা করা হয়। স্নানান্তে কাঠুরিয়ার দেওয়া একটি ধুতি পরিয়া বাহুতে, হস্তে ও কপালে সিন্দুর মাখিয়া ফকির পূজা করেন। সর্ব্বশেষে বাঘ তাড়াইবার মন্ত্র বলেন। যদি জানা যায় নিকটে কোন বাঘ আছে, বা যদি বাঘের গর্জ্জন শোনা যায় তাহা হইলে বিশেষপ্রকার মন্ত্র পড়িতে হয়। জঙ্গলে প্রবেশ করিতে হইলে লোকে প্রথমে গাজী সাহেবের নাম লইয়া থাকে।

সুন্দরবন পুরাকালে সমতট বা বগড়ী (বা ব্যাঘ্রতটী) রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। য়ুয়ান চোয়াং নামক প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক সমুদ্রকূলবর্ত্তী সমতট রাজ্যে বহু দিগম্বর জৈন, ৩০ টি বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘারাম এবং এক শত হিন্দু মন্দির দেখিয়াছিলেন। এই

বিহারগুলির চিহ্ন আজ আর বিশেষ নাই। কেহ কেহ মনে করেন এগুলি সুন্দরবনের নরম মাটিতে ভূগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। সাগরদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কয়েকটি স্থানে এবং খুল্‌না জেলার স্থানে স্থানে বৌদ্ধযুগের কিছু কিছু চিহ্ন বর্ত্তমান বলিয়া অনুমিত হয়। (লক্ষ্মীকান্তপুর, গঙ্গাসাগর ও ভরত ভায়না দ্রষ্টব্য)। য়ুয়ান চোয়াংএর সমতট দেশে বাসকালে তথাকার রাজপুত্র প্রসিদ্ধ নালন্দা মহাবিহারের মহাস্থবির হইয়াছিলেন। ইনিই সুবিখ্যাত পণ্ডিত শীলভদ্র। মুসলমান আমলে সুন্দরবন ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চল ভাটিপ্রদেশ নামে খ্যাত ছিল।

অনেকের মতে সুন্দরবনে পূর্ব্বে নানাস্থানে মানুষের বসতি ছিল এবং অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর নগরী ছিল; মগ ও পর্ত্তুগীজগণের অত্যাচারে এই সকল লোকালয় উঠিয়া যায় এবং সুন্দরবন ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া পড়ে; ইহা ছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলের ভূমির সর্ব্বদা অবনমন হেতুও লোকালয়গুলি চিরস্থায়ী হয় নাই এবং এই কারণেই পূর্ব্ব বসতির চিহ্নগুলির অধিকাংশই আর দৃষ্টি গোচর হয় না।

সুন্দরবনের মাটী খুঁড়িলে মাঝে মাঝে ভূগর্ভে পুরাতন পুষ্করিণী, মন্দির এবং অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়; তাহা ছাড়া কখনও কখনও বৃক্ষশ্রেণী খাড়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে ভূমির অবনমনের স্পষ্ট প্রমাণ মিলে।

এই জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন, পূর্ব্বকালে হঠাৎ অবনমনের ফলে সুন্দরবন জনহীন হইয়া যায়। অপর মতে সুন্দরবনে কখনও বিস্তৃত ভাবে মানুষের বসতি হয় নাই, মধ্যে মধ্যে দু একজন সাহসী ব্যক্তি এখানে ওখানে আবাদ করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল হইয়াছেন মাত্র।

সুন্দরবনের জমির অবনমনের ও পুনরুত্থানের কারণ অনেকের মতে এইরূপ।— বঙ্গোপসাগরের পর রায়মঙ্গল ও মালঞ্চ মোহনার দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা এবং খুলনা জেলার কতকাংশের ঠিক নীচেই সমুদ্রের গভীরতা ৫০।৬০ ফুট হইতে হঠাৎ সমুদ্রতীর হইতে ১৫ মাইল দূরে একেবারে ১৭০০।১৮০০ ফুটে পৌঁছিয়াছে। সমুদ্রের এই গভীর অংশকে Swatch of no ground বা অতলতল বলে। ফার্গুসন সাহেবের মতে বঙ্গোপসাগরে পতিত নদীগুলি হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে স্রোত বহিয়া সংঘাতের ফলে ঘূর্ণীর উৎপত্তি হয়, সেজন্য মাটি সেখানে থিতাইয়া জমিতে পারেনা এবং ইহা হইতেই অতলতলের উৎপত্তি। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বঙ্গোপসাগরে মিলিবার সময় নদীগুলি অনেকটা হয় পূর্ব্বদিকে, নয় পশ্চিমদিকে বহিয়া অতলতলের মুখে ধাবিত হয়; এইজন্য সুন্দরবনের দক্ষিণে নদীর মোহানার চরগুলির অগ্রভাগ অতলতলের দিকে মুখ করিয়া আছে। পূর্ব্বদিকের চর পশ্চিমমুখী এবং পশ্চিমদিকের চর পূর্ব্বমুখী। কাহারও কাহারও মতে আবার ভূমিকম্প বা অকস্মাৎ অবনমনের ফলে এই অতলতলের উৎপত্তি। যাহা হউক, সুন্দরবনের ভূমধ্য হইতে অল্প অল্প করিয়া কাদামাটী চুঁইয়া অনবরত দক্ষিণমুখী জলধারার সহিত অতলতলের দিকে চলিতেছে। ভূমধ্যস্থ মৃত্তিকা এইরূপে বাহির হইয়া যাওয়ায় উপরস্থ অরণ্যময় মৃত্তিকাস্তরের ভারে স্থানে স্থানে জমি বসিয়া যায় এবং জলমগ্ন হইয়া যায়। পলিমাটি জমিয়া আবার এই সকল স্থান ভরিয়া উচ্চ হইয়া উঠে।

সুন্দরবনে এইরূপ উঠা নামা নিয়তই চলিতেছে। এই অতলতল না থাকিলে বিরা নদীগুলি হইতে রাশি রাশি পলি পড়িয়া বাংলার দক্ষিণে বিশাল বিশাল বদ্বীপ সৃষ্ট হইয়া মধ্য ও পশ্চিম বাংলাকে অতি সত্বর ধ্বংসের পথে লইয়া যাইত।

সুন্দরবনের প্রায় সর্ব্বত্র আষাঢ় শ্রাবণ মাসে দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে কামানের শব্দের মত একপ্রকার শব্দ মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা "গৈবী আওয়াজ" নামে পরিচিত। ইংরেজরা ইহাকে "বরিশাল গান" বলেন। চব্বিশ পরগণা, খুলনা ও যশোহর জেলায় ইহা বাখরগঞ্জের দক্ষিণভাগ হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। এই শব্দের উৎপত্তির কারণ সঠিক নির্ণীত হয় নাই। কাহারও কাহারও মতে বর্ষাকালে জল বৃদ্ধির এবং অতলতলের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ আছে; কিন্তু তাহা হইলে বাখরগঞ্জ অঞ্চলে ইহা দক্ষিণ না হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে এবং চব্বিশ পরগণা ও খুলনায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব না হইয়া দক্ষিণ হইতে শ্রুত হইত। অপর মতে ইহা সমুদ্রতলের বা আরাকান উপকূলের আগ্নেয় গিরি হইতে উদ্ভূত। আবার কেহ বলেন ইহা বায়ু মণ্ডলের বিদ্যুৎ প্রবাহ হইতে উত্থিত। গ্রাম্য প্রবাদ, ইহা লঙ্কাদ্বীপে রাবণের প্রাসাদের সুবিশাল তোরণদ্বার খুলিবার ও বন্ধ করিবার আওয়াজ।

(গ) কলিকাতা-খুলনা-বাগেরহাট

দমদম গোরাবাজার—কলিকাতা হইতে ৭ মাইল দূর। পূর্ব্বে এখানে একটি সেনা-নিবাস ছিল। সেনা নিবাসের পরিত্যক্ত গৃহগুলি এখন বন্দীনিবাসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই স্থানে লর্ড ক্লাইভের পল্লী-ভবন ছিল; এখনও উহা বিদ্যমান আছে। ইহা বাংলাদেশের প্রাচীনতম অট্টালিকাগুলির অন্যতম; প্রথমে কে হইা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই; অনুমিত হয়, ইহা পূর্ব্বে ওলন্দাজ বা পর্ত্তুগীজ কুঠি ছিল। ইহা একটি উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত; দমদমা শব্দের অর্থ উচ্চ ভূমি বা টীলা এবং ইহা হইতেই স্থানটির নাম হইয়াছে দমদম। এই বাটীতে বসিয়াই ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী
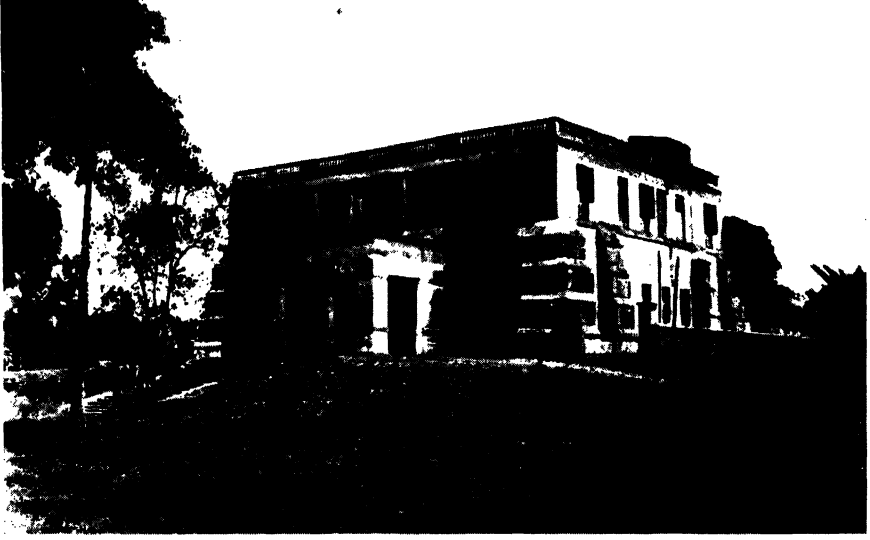
ক্লাইভ ভবন, দমদম

তারিখে নবাব মীরজাফরের সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এখানকার ভূতপূর্ব্ব আর্টিলারি মেসের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড কামান পড়িয়া আছে। প্রবাদ যে এই কামানের নাকি অলৌকিক শক্তি আছে এবং ইহারই সাহায্যে ইংরেজেরা পলাশীর যুদ্ধ জয় করেন। এখনও অনেকে এই কামানকে তৈল ও সিন্দূর দ্বারা লিপ্ত করে।

দমদম গোরাবাজারে একটি এরোড্রোম বা বিমানপোতের অবতরণ ক্ষেত্র আছে।

এই স্থানের নাম হইতেই "দমদম বুলেট" নামক এক বিশেষ প্রকার "গুলির" নাম হইয়াছে। সর্ব্ব প্রথম এই স্থানেই ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল।

বারাসাত জংসন—কলিকাতা হইতে ১৪ মাইল দূর। ইহা চব্বিশ পরগণা জেলার একটি মহকুমা। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে জেলার সদর ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে এই স্থানে বহু ইংরেজ বণিকের বাগান-বাটী ও পল্টনের উচ্চ ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের শিক্ষার জন্য একটি কলেজ ছিল। শেষোক্ত কারণে ইহাকে "বাংলার স্যানড্‌হার্স্ট্" বলা হইত।

বারাসাত হইতে চার মাইল উত্তর পশ্চিমে বারাসাত-বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে অবস্থিত নীলগঞ্জ গ্রামে বাংলার সর্ব্বপ্রথম নীলকুঠি স্থাপিত হয়। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে জন্ প্রিন্সেপ এই কুঠির প্রতিষ্ঠা করেন। এই কুঠির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

স্টেশন হইতে চার মাইল উত্তর-পূর্ব্বে মধুমুরলী নামে একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে; প্রায় সওয়া তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মধু ও মুরলী নামে দুই বণিক্ ভ্রাতা ইহা খনন করাইয়াছিলেন। ইহার উত্তর-পশ্চিম পাড়ে একটি পুরাতন নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ আছে। পুষ্করিণীর পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে একটি উচ্চ স্তম্ভ আছে; ইহা কি জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল জানা যায় নাই। পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি অষ্টকোণ উদ্যান-অট্টালিকার
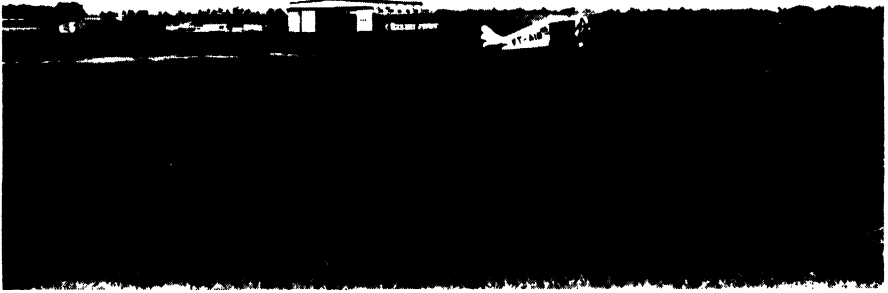
এরোড্রোম, দমদম

ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে ল্যাম্বার্ট নামক একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইনি দিনাজপুরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহাকে দাহ করা হয় এবং তাঁহার দেহভস্ম তাঁহার প্রিয় অট্টালিকার নীচে প্রোথিত করা হয়।

বারাসাত মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত কাজীপাড়ায় পীর একদিল সাহেব নামক একজন পীরের আস্তানা আছে। এখানে পৌষমাসে একটি মেলা হয়। ইঁহার সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে, যথা ইচ্ছামত ইনি নাকি গরু মহিষ প্রভৃতিকে বাঘ ভালুকে পরিণত করিতে পারিতেন।

বারাসাত ও নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের চিকণ শিল্প কিছুকাল পূর্ব্বেও প্রসিদ্ধ ছিল; ইউরোপীয়েরা ইহা আগ্রহের সহিত ক্রয় করিতেন এবং ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়াতে ইহা রপ্তানি হইত।

বারাসাত হইতে বারাসাত-বসিরহাট লাইট্ রেলওয়েযোগে বসিরহাট ও হাসনাবাদ প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়।

মসলন্দপুর—কলিকাতা হইতে ৩৪ মাইল দূর। এই স্থান হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী চব্বিশ পরগণা জেলার অন্যতম বাণিজ্য-প্রধান স্থান **বাদুড়িয়ায়** যাওয়া যায়। মসলন্দপুর হইতে বাদুড়িয়া পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা আছে ও মোটরবাস যাতায়াত করে। কলিকাতা হইতে বারাসাত-বসিরহাট লাইট্ রেলওয়ে যোগে আড়বালিয়া বা গোপমহল স্টেশন হইতেও বাদুড়িয়া যাওয়া যায়; উভয় স্টেশন হইতেই বাদুড়িয়া প্রায় ৪ মাইল দূর। মসলন্দপুর স্টেশন হইতে বাদুড়িয়ার পথে প্রায় ছয় মাইল দূরে হায়দরপুর গ্রাম তিতুমীরের জন্মস্থান। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তিতুমীরের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তিতু অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। প্রথম যৌবনে তিনি কিছুকাল কলিকাতায় পালোয়ানি করেন; পরে নদীয়া জেলার কয়েকজন জমিদারের বৃত্তিভোগী লাঠিয়াল ছিলেন। এই সময়ে একটি দাঙ্গায় লিপ্ত হইয়া তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অতঃপর ৩৯ বৎসর বয়সে তিনি হজ্ করিবার জন্য মক্কায় গমন করেন ও সেখানে ওয়াহাবি ধর্ম্মের প্রচারক সৈয়দ আহম্মদের শিষ্য হন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাগমন করিবার পর তিনি ওয়াহাবি মত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন এবং অচিরকাল মধ্যে বহু মুসলমান তাঁহার অনুগামী হন। এই সময়ে মিস্কিন শাহা নামক জনৈক ফকির তাঁহার সহিত যোগদান করেন। যাঁহারা তিতুমীরের প্রচারিত নবধর্ম্ম মত মানিত না, সেই সকল মুসলমান এবং হিন্দুর উপর তাঁহার অনুচরেরা অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় ও গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত তিতুর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তিতুর বহু লোকবল থাকায় এবং তাহাদের অত্যাচার অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার সাহেব কতকগুলি সৈন্য লইয়া জমিদার-দ্বয়ের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হন; কিন্তু তিতুর সহিত যুদ্ধে তাঁহাদের সমবেত শক্তির পরাজয় ঘটে। জয়স্ফীত তিতু নিজেকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং হায়দরপুরের অনতিদূরবর্ত্তী নারিকেলবেড়িয়া নামক গ্রামে এক বাঁশের কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ঢাল, তরোয়াল, লাঠি, বর্শা, বন্দুক প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে থাকেন। তিতুর অত্যাচার দমনের জন্য মোল্লাহাটি নীলকুঠির ডেভিস্ সাহেব লোকজন লইয়া তিতুমীরের দলকে আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনিও পরাজিত হন। গোবরা-গোবিন্দপুরের ভূস্বামী দেবনাথ রায় তিতুমীরের অত্যাচারে উৎপীড়িত বহু ব্যক্তিকে আশ্রয় দেন এবং স্বয়ং তিতুর সেনাদলের সহিত বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে গুরুতর আঘাতের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সব কারণে তিতুমীরের সাহস অত্যন্ত বাড়িয়া যায় এবং একে একে বহু গ্রামের উপর তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল অত্যাচার ও অরাজকতার কথা লর্ড বেন্টিঙ্কের কর্ণগোচর হইলে তাঁহার হুকুমে দুইটি কামান, একশত গোরা ও তিনশত সিপাহী একজন কর্ণেলের পরিচালনায় তিতুমীরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। কর্ণেল সাহেবের লোকজনের উপর তিতুমীরের দলবল অলক্ষিতে ইষ্টক প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। তথাপি অকারণ লোকক্ষয় নিবারণের জন্য কর্ণেল সাহেব স্বয়ং বাঁশের কেল্লার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া গ্রেপ্তারি পরওয়ানা দেখাইয়া তিতুকে আত্মসমর্পণ করিতে বলেন। দুইবার অনুরোধ সত্ত্বেও যখন কোন ফল হইল না, তখন কর্ণেল সাহেবের হুকুমে

কামানের ফাঁকা আওয়াজ করা হইল। ফাঁকা আওয়াজে কাহারও কোন অনিষ্ট না হওয়ায় তিতুর লোকজনের সাহস বাড়িয়া গেল। তিতুর সহকারী মিস্কিন ফকির সগর্বে হাসিয়া বলিলেন, "গোলা খা ডালা" অর্থাৎ কামানের গোলা আমি খাইয়া ফেলিয়াছি। তিতুর অজ্ঞ অনুচরগণ তাঁহার অলৌকিক শক্তি আছে মনে করিয়া আরও উৎসাহিত হইয়া সরকারী ফৌজের উপর ইট পাথর প্রভৃতি ছুড়িতে লাগিল, তখন কর্ণেল সাহেব গোলা-ভরা কামান দাগিবার হুকুম দিলেন। মূহুর্ত্তের মধ্যে গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা ভূমিসাৎ হইল এবং তিতুর বহু অনুচর হত ও আহত হইল। স্বয়ং তিতুমীরও এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। তাঁহার সেনাপতি মাসুমের সহিত ৩৫০ জন লোক বন্দী হইল। ইহাদের মধ্যে প্রায় ১৪০ জন লোকের কারাদণ্ড হয় এবং তিতুর সেনাপতি মাসুমকে বাঁশের কেল্লার সম্মুখে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিস্কিন ফকির কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। পরে বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার আর খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

গোবরডাঙ্গা—কলিকাতা হইতে ৩৬ মাইল দূর। এই গ্রামটি অধুনা শীর্ণকায়া যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা প্রাচীন কুশদ্বীপ বা কুশদহের অন্তর্গত। এখানে মুখোপাধ্যায় উপাধিধারী এক ঘর প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। ইহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি আছে। আনন্দময়ী বাটী নামক দেবালয় এখানকার একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ তারিখে গোবরডাঙ্গার জমিদার বাটীতে গোষ্ঠবিহার নামে একটি মেলা হয় এবং উহা দেখিবার জন্য নানাস্থান হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। একটি খোয়াড়ের মধ্যে একটি গাভী ও একটি শূকর শাবককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গাভী ও শূকর শাবকটি পরস্পরের ভয়ে ছুটাছুটি করিতে থাকে। গাভী কর্ত্তৃক শূকর শাবককে দংশন না করা পর্য্যন্ত এই ক্রীড়া চলিতে থাকে।

গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী ইছাপুর গ্রামে হড় চৌধুরীদের একটি প্রাচীন ও বৃহৎ নবরত্ন মন্দির ও জোড়-বাংলা আছে। গোবরডাঙ্গার নিকটস্থ রেলওয়ে সেতুর দক্ষিণে যমুনার উপর প্রতাপপুর নামক স্থান প্রতাপাদিত্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। কথিত আছে, ইছাপুরের হড় চৌধুরী বংশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের উপর কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতাপাদিত্য সসৈন্যে আসিয়া যমুনার ধারে ছাউনী করেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় নাকি দৈববলে প্রতাপাদিত্যের ছাউনীতে প্রবেশ করিয়া নিজ হাতে রাজার পূজার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। প্রতাপ প্রীত হইয়া যখন প্রশ্ন করেন কে এই সকল বন্দোবস্ত করিয়াছে, তখন পণ্ডিত মহাশয় আত্ম পরিচয় দেন। তখন তাঁহদের মিটমাট হইয়া যায়। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় তখন রাজাকে আহারাদি করিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলেন যে পররাজ্যে তিনি অন্ন গ্রহণ করেন না। পণ্ডিত মহাশয় তখনই দলিল করিয়া প্রতাপাদিত্যকে ছাউনীর স্থানটি প্রদান করিয়া আতিথ্যে আপ্যায়িত করেন। তখন হইতে স্থানটি প্রতাপপুর নামে খ্যাত হয়। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের পৌত্র রঘুনাথের সময় ইছাপুরের নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রাম্য কাহিনী এ অঞ্চলটিকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত করিয়াছে, এই স্থানেই নাকি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ধেনু চরাইতেন।

গোবরডাঙ্গা রেল স্টেশন হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী গৈপুর গ্রামে ওলাবিবির দরগা নামে এক দেবস্থান আছে। ইহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সম্মানিত। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে এখানে পূজা ও তিন দিনব্যাপী মেলা হয়। গৈপুর গোপিনীদের বাড়ী ছিল বলিয়া কথিত; নদীর অপরপারে গোপিনীপোতা এবং পার্শ্বস্থ একটি গ্রামের নাম কানাই নাটশাল হইতে গ্রাম্য কাহিনীর সম্পূর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গোবরডাঙ্গার দক্ষিণদিকস্থ চারঘাট নামক স্থানে যমুনাগর্ভে "হরে শুঁড়ীর দহ" ও নদী তীরে পীর ঠাকুরবরের আস্তানা আছে। পীর ঠাকুরবর প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান হন। (লাউজানি দ্রষ্টব্য।) তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং হিন্দু সন্ন্যাসীর মত গোপনে সাধন ভজন করিতেন; সেই জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল পীর ঠাকুরবর। তাঁহার সমাধিস্থানে প্রত্যহ সকালে মুসলমান সেবায়েৎ ফুল ও বেলপাতার অর্ঘ্য প্রদান করেন। কথিত আছে হরেকৃষ্ণ সাহা বা "হরে শুঁড়ী" নামক এক ব্যক্তি তাঁহার কৃপালাভ করিয়া ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন; কিন্তু পরে গর্ব্বিত হইয়া পীর সাহেবকে অশ্রদ্ধা করেন। তাঁহার অভিশাপে হরে কৃষ্ণ সাহা নৌকা সমেত যমুনা গর্ভে নিমজ্জিত হওয়ায় তদবধি উক্ত স্থান "হরে শুঁড়ীর দহ" নামে পরিচিত হয়।

গোবরডাঙ্গার চার মাইল পূর্ব্বে দেয়াড়া নামক স্থানে যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার সময় এক বিরাট মেলা বসে এবং গঙ্গা ও যমুনার প্রতিমূর্ত্তির পূজা হয়। এই মেলায় প্রায় ১০।১৫ হাজার যাত্রী যোগদান করে। লোকের বিশ্বাস যে মাঘী পূর্ণিমার দিন এই স্থানে গঙ্গা ও যমুনার মিলন হয় এবং এই স্থানে ঐদিন স্নান করিলে গঙ্গা ও যমুনা এই দুই পুণ্যতোয়া নদীতে স্নানের ফল লাভ করা যায়।

গোবরডাঙ্গা হইতে প্রায় ছয় মাইল পশ্চিমে যমুনা নদীর তীরে জলেশ্বর নামক স্থানে চৈত্র সংক্রান্তিতে এক বিরাট মেলা হয় এবং উহাতেও প্রায় ১০।১২ হাজার যাত্রী যোগদান করে। এই মেলা বুড়া শিবের মেলা নামে পরিচিত। এখানে একটি বৃহৎ দীঘি আছে। প্রবাদ যে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে এই দীঘি হইতে একটি প্রকাণ্ড চড়ক গাছ ও একখণ্ড প্রস্তর আপনা হইতেই ভাসিয়া উঠে এবং পূজা ও মেলা শেষ হইবার পর আবার দীঘির জলে নিমজ্জিত হইয়া যায়।

গোবরডাঙ্গার দুই স্টেশন পূর্ব্ববর্ত্তী হাবড়া নামক স্টেশন হইতেও গরুর গাড়ীতে করিয়া জলেশ্বরে যাওয়া যায়।

বনগ্রাম জংশন—কলিকাতা হইতে ৪৮ মাইল দূর। ইহা যশোহর জেলার একটি মহকুমা। বনগ্রাম শহরটি ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে ইছামতী নদীর উপর একটি ভাসমান সেতু আছে।

ইছামতী নদীর উপরকার রেলওয়ে সেতুর অতি নিকটে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। প্রবাদ পূর্ব্বে এই অশ্বত্থতলায় "ডাকাতে কালী" নামে এক কালী প্রতিষ্ঠিত

ছিলেন। ডাকাতেরা নাকি ডাকাতি করিতে যাইবার পূর্ব্বে এই কালীর পূজা করিয়া বাহির হইত এবং সুযোগ পাইলে এখানে নরবলি দিত।

বনগ্রাম জংশন হইতে একটি শাখা লাইন রাণাঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে।

বেনাপোল—কলিকাতা হইতে ৫৩ মাইল দূর। স্টেশন হইতে মাত্র অর্দ্ধ মাইল দূরে "যশোর রোড" নামক প্রশস্ত রাজবর্ত্মের পার্শ্বে বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ "যবন হরিদাস" বা হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠ ও তুলসী মঞ্চ অবস্থিত। এখানে একটি মন্দির মধ্যে নিতাই, গৌর ও হরিদাস ঠাকুরের দারুময়ী মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের সম্মুখেই তুলসীমঞ্চ অবস্থিত। দোলযাত্রার সময় এখানে মহোৎসব হয় ও তদুপলক্ষে প্রায় চার পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে।

হরিদাস ঠাকুরের তুলসীমঞ্চ, বেনাপোল

জয়ানন্দের "চৈতন্য মঙ্গল" গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে বুঢ়ন পরগণার অন্তর্গত স্বর্ণ নদীর তীরবর্ত্তী ভাটকলাগাছি নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে হরিদাস ঠাকুরের জন্ম হয়। অনেকের অনুমান যে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত কলাগাছি বা "কেঁড়াগাছি" নামক গ্রামই হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান ভাটকলাগাছি গ্রাম। কোন এক বিপ্লবের ফলে অতি শিশুকালেই হরিদাস পিতামাতাকে হারাইয়া স্থানীয় কাজীর গৃহে লালিত পালিত হন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় এবং তিনি পালক পিতার গৃহত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। লোকে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়াই জানিত। চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠে অনুমিত হয় যে হরিদাস মুসলমান বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহত্যাগ করিবার পর তিনি বেনাপোলের এক জঙ্গল মধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় এক তুলসী মঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন ও "রাত্রি দিন তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন" করিতে থাকেন। তাঁহার এইরূপ অপূর্ব্ব সাধনার পরিচয় পাইয়া স্থানীয় লোকজন তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়েন। ইহাতে স্থানীয় ব্রাহ্মণ জমিদার রামচন্দ্র খানের মনে বিশেষ ঈর্ষার সঞ্চার হয়। হরিদাসকে সাধনপথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য তিনি নানারূপ অপচেষ্টা করেন।

কিছুকাল পরে ঠাকুর হরিদাস বেনাপোল ত্যাগ করেন। নবাবের কোপে পড়িয়া অত্যাচারী রামচন্দ্র খানের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। হরিদাসের পাট বাড়ীর অনতিদূরে রামচন্দ্র খানের গড়বেষ্টিত রাজভবনের ধ্বংসাবশেষ অরণ্য সমাবৃত অবস্থায় আজিও বর্ত্তমান আছে। স্থানীয় লোকের নিকট ইহা "রাজবাড়ী" নামে পরিচিত। চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে রামচন্দ্র খান কেবল মাত্র হরিদাস ঠাকুরকে নহে, নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার বাটীতে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকেও বিশেষ অসম্মান করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র খানের বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী দুই একটি প্রাচীন পুষ্করিণী এখনও অতীতের স্মৃতি বহন করিতেছে।

ঝিকরগাছা ঘাট—কলিকাতা হইতে ৬৭ মাইল দূর। ইহা কপোতাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে এইখানে একটি নীলকুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। মেকেঞ্জি নামক জনৈক কুঠিয়াল এখানে একটি হাট বসান, উহা মেকেঞ্জিগঞ্জের হাট নামে পরিচিত। ঝিকরগাছার হাটে প্রচুর পরিমাণে তরীতরকারী, ডাল-কলাই ও গুড়ের আমদানি হয়। ঝিকরগাছার অপর পারে গবাদি পশুর ক্রয় বিক্রয়ের জন্য আর একটি হাট আছে। প্রতি বৎসর মহাসমারোহে ঝিকরগাছার বাজারে দোলযাত্রা উৎসব হয় এবং তদুপলক্ষে এক পক্ষ স্থায়ী একটি মেলা বসে।

বোধখানা—ঝিকরগাছা হইতে ৪ মাইল পশ্চিমে বোধখানা গ্রাম বৈষ্ণবদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম কানাই ঠাকুরের শ্রীপাট এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত প্রাণবল্লভজীউর মন্দির ও বিগ্রহ বিদ্যমান। এখানে প্রতিবৎসর পঞ্চম দোল উপলক্ষে মেলায় মহাসমারোহ ও বহু যাত্রীর সমাগম হয়। প্রবাদ, পঞ্চম দোলের দিন উষাকালে এখানকার একটি কদম্ব বৃক্ষে অকালে কদম্বফুল ফুটিয়া থাকে এবং উহা কর্ণে পরিধান করিয়া প্রাণবল্লভজীউ দোলমঞ্চে আরোহণ করেন।

অমৃতবাজার—ঝিকরগাছা হইতে চার মাইল উত্তরে অবস্থিত অমৃতবাজার গ্রামে সুবিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ৺শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। শিশিরকুমার ও তদীয় সুযোগ্য ভ্রাতা মতিলাল প্রভৃতি মিলিয়া এই গ্রামের বহু উন্নতি সাধন করেন। এই গ্রামের প্রকৃত নাম পলুয়া মাগুরা। ঘোষ ভ্রাতৃগণ গ্রামে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাদের জননী অমৃতময়ীর নামানুসারে উহার নাম রাখেন অমৃতবাজার। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এই গ্রামে শিশির কুমারের সম্পাদনায় অমৃতবাজার পত্রিকা সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে। পরে দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ হইলে শিশির কুমার ইংরেজী ভাষায় অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। মফঃস্বল হইতে সংবাদপত্র প্রকাশে নানারূপ অসুবিধা হওয়ায় অবশেষে অমৃতবাজার পত্রিকার কার্য্যালয় কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। তাঁহার সমসাময়িক কালে শিশির কুমার একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। সংবাদপত্র সেবা, রাজনীতি চর্চ্চা, সাহিত্য সেবা, ধর্ম্মচর্চ্চা, বাগ্মিতা—সকল ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত "অমিয় নিমাই চরিত" গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। শিশির কুমার ইংরেজী ভাষায় "লর্ড গৌরাঙ্গ" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

লাউজানি—ঝিকরগাছার পূর্ব্বোত্তর কোণে অবস্থিত লাউজানি একটি প্রাচীন স্থান। অনেকে অনুমান করেন যে এই স্থানের পূর্ব্বনাম ব্রাহ্মণ নগর এবং এখানে রাজা মুকুট রায়ের রাজধানী ছিল। এই স্থানটি কপোতাক্ষ নদের পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত এবং পূর্ব্বে ইহার দক্ষিণ দিক দিয়া হরিহর নদ প্রবাহিত হইত। মাধবাচার্য্য ও কৃষ্ণরাম দাসের "রায় মঙ্গল" কাব্য এবং "কালুগাজী ও চম্পাবতী" নামক পুঁথি হইতে জানা যায় যে মুসলমান গাথা-সাহিত্যের অন্যতম নায়ক বিরাট নগরের অধিপতি সিকন্দর শাহের পুত্র গাজী সুন্দর বনের ব্যাঘ্রের সাহায্যে ব্রাহ্মণ নগর অধিকার করিয়া মুকুট রায়ের সুন্দরী কন্যা চম্পাবতীকে বিবাহ করেন। মুকুট রায়ের সেনাপতি মহাবীর দক্ষিণরায় গাজীর গতিরোধ করিবার জন্য প্রবল যুদ্ধ করেন, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া সুন্দর বন অভিমুখে পলায়ন করেন এবং পরে গাজীর সহিত সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সুন্দর বনের একাংশের আধিপত্য লাভ করেন। দক্ষিণরায় পরে বনদেবতার পদে উন্নীত হন এবং নানা স্থানে তাঁহার পূজার প্রবর্ত্তন হয় ("ধপধপি" স্টেশন দ্রষ্টব্য)। বিরাটনগর কোথায় তাহা নির্ণীত হয় নাই। গাথা সাহিত্যে গাজী সিকন্দর শাহের পুত্ররূপে বর্ণিত হইলেও কেহ কেহ অনুমান করেন যে তিনি সপ্তগ্রাম বিজয়ী জাফর খাঁর পুত্র (পূর্ব্ব ভারত রেলপথের "আদি সপ্তগ্রাম" স্টেশন দ্রষ্টব্য) এবং ইঁহার প্রকৃত নাম বরখান্ গাজী। গাথা সাহিত্যের নানা স্থানে ইনি বড় খাঁ গাজী নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুট রায়ের সাত পুত্র ছিল, এই সাত ভাইএর একমাত্র বোন ছিলেন চম্পাবতী। কেহ কেহ অনুমান করেন যে রূপ-কথায় উল্লিখিত "সাত ভাই চম্পা" ও এই চম্পাবতী অভিন্ন। মুকুট রায় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সবংশে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং গাজীর সহিত চম্পাবতীর বিবাহ দেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কামদেব পলাইয়া গিয়া গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী চারঘাটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কামদেব পরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং পীর ঠাকুরবর নামে প্রসিদ্ধ হন। ইনি প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। (গোবরডাঙ্গা দ্রষ্টব্য)।

গাথা-সাহিত্যে গাজীকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। দেবদূত বা ফেরেস্তাগণ সর্ব্বদাই তাঁহার সহায়, গঙ্গা, মহাদেব ও চণ্ডী প্রভৃতি হিন্দু-দেবদেবীগণ তাঁহার অনুকূল এবং এমন কি সুন্দরবনের বাঘ ও কুমীর পর্য্যন্ত তাঁহার আজ্ঞাবহ। আজিও হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে বহু ব্যক্তি বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের জন্য গাজীর নামে "সিরণি" মানত করেন এবং এখনও বাংলার কোন কোন অঞ্চলে "গাজীর গীত" বা গাজীর মাহাত্ম্য সূচক পালা সাজসজ্জা সহকারে অভিনীত হয়।

সাগরদাঁড়ি—ঝিকরগাছাঘাট হইতে খুলনা জেলার অন্তর্গত কপিলমুনি নামক প্রসিদ্ধ স্থান পর্য্যন্ত একটী দেশীয় কোম্পানির স্টীমার যাতায়াত করে। এই স্টীমার পথে ঝিকরগাছাঘাট হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে অবস্থিত কপোতাক্ষী তীরবর্ত্তী **সাগরদাঁড়ি** গ্রাম মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মভূমি। শিক্ষিত বাঙালীর নিকট মাইকেল মধুসূদনের পরিচয় অনাবশ্যক। বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক হিসাবে ও "মেঘনাদবধ" কাব্যের কবিরূপে তাঁহার নাম চিরদিনই বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। স্বীয় জন্মপল্লীর প্রান্তবাহিনী কপোতাক্ষী নদীকে তিনি

একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতায় অমর করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার অনুরাগী জনৈক সাহিত্যিকের উদ্যোগে এই কবিতাটি মর্ম্মরপ্রস্তরে উৎকীর্ণ হইয়া তাঁহার পৈতৃক ভবনের নিকটবর্ত্তী কপোতাক্ষীতীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্বীয় সমাধি স্তম্ভের জন্য রচিত কবিতায়ও মাইকেল মধুসূদন আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষী তীরে জন্মভূমি"। এই নদীটি কপোতাক্ষ নদ রূপেও অভিহিত হয়। কপোতাক্ষীতীরবর্ত্তী সাগরদাঁড়ি শিক্ষিত বাঙালীর নিকট সাহিত্য-তীর্থ রূপে পরিগণিত হওয়া উচিত। মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রসিদ্ধ মহিলা কবি মানকুমারী সাগরদাঁড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।

কপিলমুনি- ঝিকরগাছা ঘাট হইতে কপিলমুনি স্টীমার পথে ৪০ মাইল। ইহাও কপোতাক্ষী তীরে অবস্থিত এবং একটি বাণিজ্য প্রধান স্থান। এখানে কপিলেশ্বরী নামে এক অতি প্রাচীন কালী আছেন। এই কালী কপিলমুনি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সাংখ্যকার মহর্ষি কপিল হইতে এই কপিল মুনি পৃথক ব্যক্তি। প্রবাদ অনুসারে ইনি পুণ্ড্রাজ পৌণ্ড্রক বাসুদেবের ভ্রাতা ছিলেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক ও তাঁহার একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের হস্তেই তিনি নিহত হন। পৌণ্ড্রকের ভ্রাতা কপিল আবাল্য বিষয় বিরক্ত ছিলেন। স্বীয় ভ্রাতা পৌণ্ড্রকের ধর্ম্মবিগর্হিত আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তিনি পুণ্ড্র রাজ্য (বর্ত্তমান উত্তরবঙ্গ) ত্যাগ করিয়া সুদূর দক্ষিণ দেশে আগমন করেন এবং স্বীয় নামে তথায় এক কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নাম হইতেই এই স্থানের নাম কপিলমুনি হয়। কপিলেশ্বরীর পুরাতন মন্দির ভাঙ্গিয়া যাইলে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ম্যাকেনজী নামক ইংরেজ জমিদার একটি নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের সাইক্লোনে এই মন্দিরটিও পড়িয়া যায় এবং কালীমূর্ত্তি এখন অন্য একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা।

প্রতি বৎসর বারুণী উপলক্ষে ১৩ দিন ব্যাপী একটি মেলা কপিলের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে; স্থানীয় লোকের বিশ্বাস কপিলের তপস্যাগুণে বারুণীর দিন এই স্থানে কপোতাক্ষী নদীতে গঙ্গা প্রবাহিতা হন। কপিলমুনির বাজার হইতে এক মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে আগ্রা নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে তিনটি অতি পুরাতন ঢিবি বা স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন যে এইগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ। একটি ঢিবিকে খুঁড়িয়া পুরাতন ইষ্টক নির্ম্মিত বাটী পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ আরও ঢিবি দক্ষিণে চাঁদখালি ও উত্তরে টালা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়।

কপিলমুনি গ্রামে জাফর আলি নামে একজন মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। প্রবাদ, ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয় পত্নী খুল্লনা কিছুকাল কপিলমুনিতে বাস করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী খুল্লনার খাল ও খুল্লনার পুল এখনও তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে বলিয়া কথিত।

যশোহর—কলিকাতা হইতে ৭৫ মাইল দূর। জেলার সদর শহর যশোহর বা যশোর ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত। যশোহরের নীচে ভৈরবনদ একরূপ মজিয়া যাওয়ার ফলে শহরটির পূর্ব্ব সমৃদ্ধির আর কিছুই নাই। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ষোড়শ

শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা বাংলার একটি প্রধান নদী ও বাণিজ্য পথ ছিল। তখন গঙ্গা—সরস্বতী, ভাগীরথী ও ভৈরব এই তিনটি প্রধান ধারায় বিভক্ত ছিল। প্রথমে সরস্বতী ও ভৈরবই ছিল প্রধান বাণিজ্য পথ। ক্রমে গঙ্গার পূর্ব্বাভিমুখে সরিয়া যাইবার ফলে সরস্বতী মজিয়া আসে ও ভাগীরথী জলঙ্গী মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি পর পর গঙ্গার প্রধান ধারা বহন করে; এই পরিবর্ত্তনের ফলে ভৈরব দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। বর্ত্তমান শহরের অতি সন্নিকটে মুড়লী কসবা নামক স্থানে পুরাতন যশোহর অবস্থিত ছিল। মুড়লীতে গরীব শাহ ও বেহরাম শাহ নামক দুইজন মুসলমান সাধুর সমাধি আছে। ইঁহারা বাগেরহাটের সুপ্রসিদ্ধ পীর খান জাহান অলির চেলা ছিলেন। আধুনিক সময়ে মুড়লীতে একটি সুন্দর ইমামবাড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহর হইতে বর্ত্তমান যশোহর সম্পূর্ণ পৃথক। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর মুঘলেরা তাঁহার রাজ্যে যশোহর নামে একটি ফৌজদারি স্থাপন করেন এবং উহার সদর মুড়লী কসবায় স্থানান্তরিত করেন। যশোহর ফৌজদারির সদর শহর বলিয়া কালক্রমে মুড়লী কসবার নামই যশোহর হইয়া যায়। বর্ত্তমান যশোহর হইতে ২১ মাইল দক্ষিণে **মির্জ্জানগরে** মুঘল ফৌজদারদের একটি বাসভবন ছিল। তথায় ফৌজদারদের একটি ভগ্ন প্রাসাদ ও একটি মস্‌জিদ আছে। প্রাসাদ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উহার নিকটবর্ত্তী মাঠে একটি পুরাতন কামান আছে।

যশোহর শহরের সংলগ্ন **চাঁচড়া** গ্রামে একটি পুরাতন জমিদার বংশের বাস। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবেশ্বর রায় প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মুঘল সেনাপতি রাজা মানসিংহকে সাহায্য করিয়া চারিটি পরগণার জমিদারি পাইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধর মনোহর রায় আওরঙ্গজেবের আমলে জমিদারি বিস্তর বাড়াইয়াছিলেন। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে চাঁচড়ার জমিদারগণ যশোহরের রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজবাটীর পরিখা ও প্রাচীন প্রাকারের চিহ্ন এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান আছে। চাঁচড়া গ্রামে দশ মহাবিদ্যার একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরের কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যার সুন্দর দারুময়ী মূর্ত্তিগুলি এ অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

যশোহরে চিরুণী, বোতাম প্রভৃতি নির্ম্মাণের কতকগুলি ছোট ছোট কারখানা আছে।

বারবাজার—যশোহর হইতে দশ মাইল উত্তরে যশোহর-ঝিনাইদহ রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত বারবাজার একটি প্রাচীন স্থান। এখানে প্রায় তিন চার মাইল ব্যাপী স্থানে বহু ভগ্নাবশেষ ও পুরাতন দীঘিকাদি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে লিখিত গ্রীক্ ইতিহাস (Periplus of the Erythrean Sea) পেরিপ্লাসে বর্ণিত গঙ্গারিডি রাজ্যের রাজধানী এই স্থানেই অবস্থিত ছিল। (বারাসাত-বসিরহাট রেলওয়ের দেগঙ্গা স্টেশন দ্রষ্টব্য)। খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে মহাকবি ভার্জিল তাঁহার "জর্জিকাস" নামক কাব্যে লিখিয়া গিয়াছেন যে তিনি জন্মভূমি মণ্টুয়া নগরীতে ফিরিয়া একটি মর্ম্মর মন্দির স্থাপন করিয়া তাহার শীর্ষদেশে স্বর্ণ ও গজদন্তে গঙ্গারিডিদিগের বীরত্বের কথা খোদিত করিবেন। ইহা হইতে গঙ্গারিডিগণের শৌর্য্য বীর্য্যের কথা প্রতীয়মান হয়। এখানকার ভগ্ন স্তূপগুলি প্রায় ১০।১২ ফুট হইতে ১৫।১৬ ফুট উচ্চ।

ইহাদের মধ্যে বহু পুরাতন ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এখানকার কতকগুলি প্রস্তরের কারুকার্য্য দেখিয়া মনে হয় যে সেগুলি বৌদ্ধ যুগের। হিন্দু ভাস্কর্য্য সমন্বিত কতকগুলি ভগ্ন প্রস্তর স্তম্ভ ও মসজিদের ধ্বংসাবশেষও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, এই প্রাচীন শহরে বারটি বাজার ছিল বলিয়া ইহার বারবাজার নাম হয়। মতান্তরে এখানে বারজন ফকিরের আস্তানা থাকায় ইহার নাম হয় বারবাজার। এখানে রাজ-পথের দুই পার্শ্বে রাজমাতা দীঘি, সওদাগর দীঘি, পীরপুকুর, মীরের পুকুর, চেরাগদানি দীঘি, মনোহর পুকুর, কানাই দীঘি, বিশ্বাসের দীঘি, শ্রীরামরাজার দীঘি প্রভৃতি বহু দীঘি ও পুষ্করিণী আছে। জনশ্রুতি যে এই নগরে ১২৬টি দীঘি ছিল। শ্রীরামরাজার দীঘির নিকট শ্রীরামরাজার বাড়ীর গড়খাই প্রভৃতি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই অংশের নাম ছাপাইনগর। এই শ্রীরামরাজার ঐতিহাসিক বিবরণ জানা যায় নাই। "কালুগাজী চাম্পাবতী" নামক পুঁথিতে বর্ণিত আছে যে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন মহাবীর গাজী ("ঝিকরগাছা ঘাট" দ্রষ্টব্য) ছাপাইনগরের শ্রীরামরাজার বাটীতে উপস্থিত হইয়া স্বীয় অদ্ভুত ক্ষমতার প্রভাবে তাঁহাকে পরাজিত ও মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। অনেকে অনুমান করেন পুঁথিতে বর্ণিত ছাপাইনগর ও শ্রীরামরাজার সহিত এই ছাপাইনগর ও শ্রীরামরাজার ঐতিহাসিক সম্বন্ধ আছে। সপ্তগ্রাম বিজয়ী জাফরখানের পুত্র বরখান গাজী কর্ত্তৃক ছাপাইনগর বিজয়ের কাহিনীই হয়ত রূপান্তরিত হইয়া গাথা-সাহিত্যে স্থান লাভ করিয়াছে। বারবাজারের ধ্বংসাবশেষ ও পুকুরগুলির বিভিন্ন আকৃতি হইতে অনুমিত হয় যে এখানে পর্য্যায়ক্রমে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ান চোয়াং, ইতসিং প্রভৃতি বর্ণিত সমতট রাজ্যের রাজধানী এই স্থানে ছিল। য়ুয়ান্ চোয়াংএর বিবরণ অনুসারে ইহা তাম্র-লিপ্তি হইতে ৯০০ লী পূর্ব্বে। কানিংহাম সাহেবের মতে সমতটের রাজধানী ছিল বর্ত্তমান যশোহরের নিকটস্থ মুড়লী কস্‌বায়।

ঝিনাইদহ—যশোহর হইতে ঝিনাইদহ পর্য্যন্ত নিয়মিত মোটরবাস যাতায়াত করে। যশোহর হইতে ঝিনাইদহ ২৮ মাইল দূর। প্রধান লাইনের চুঁয়াডাঙ্গা স্টেশন হইতে ইহা ১৩ মাইল দূর। শহরটি নবগঙ্গা নদীর উপর অবস্থিত। ইহা যশোহর জেলার অন্যতম মহকুমা। পূর্ব্বে এই মহকুমায় বহু নীলের চাষ হইত। ইহার নানাস্থানে পুরাতন নীলকুঠি দেখিতে পাওয়া যায়। ঝিনাইদহের চারিপার্শ্বে পূর্ব্বে ডাকাতের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে একটি বড় পুষ্করিণীর ধারে বহু লোকে ডাকাতের হাতে অত্যাচারিত হইয়াছে বলিয়া কথিত। এখনও পুষ্করিণীটি চক্ষুকোরা নামে অভিহিত।

ঝিনাইদহের পূর্ব্বদিকে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত বিজয়পুরে মুকুটরায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজার রাজধানী ছিল। কথিত আছে যে তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহার বহু সৈন্য সামন্তের মধ্যে ১৬ হল্‌কা হাতী, ২০ হল্‌কা ঘোড়া ও ২২০০ কোড়াদার ছিল। তিনি বহু জলাশয় খনন করান, উহাদের মধ্যে ঝিনাইদহের নিকটবর্ত্তী ঢোল-সমুদ্র নামক বৃহৎ দীঘির পরিমাণ প্রায় ৫২ বিঘার উপর। বিজয়পুরের নিকটবর্ত্তী "বেড়বাড়ী" নামক স্থানে তাঁহার বহু গাভী থাকিত। এই জন্য লোকে তাঁহাকে "বৃন্দা-বনের নন্দ" আখ্যা দিয়াছিল।

কথিত আছে যে গয়েশ কাজী নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার রাজ্য মধ্যে গো-হত্যা করায় তিনি তাঁহার প্রাণদণ্ড দেন। এই সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহাকে দমন করিবার জন্য সেনাপতি গয়েশ-উদ্-দীনের পরিচালনায় বহু সৈন্য প্রেরণ করেন। রঘুপতি ঘোষ, চণ্ডী ও কেশব সর্দ্দার নামক তিনজন সেনানায়ক মুকুটরায়ের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া দুই দিন পর্য্যন্ত নবাব সৈন্যকে হটাইয়া রাখেন। নবাব সৈন্য ভ্রমে তাঁহারা স্বপক্ষীয় কয়েকজন পাঠানকে নরবলি প্রদান করেন। ইহাতে মুকুটরায়ের পক্ষীয় পাঠানেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। প্রধানতঃ এই কারণে ও কপোত-বিভ্রাটের ফলে (বারাসাত-বসিরহাট লাইট রেলওয়ের দেগঙ্গা ষ্টেশন দ্রষ্টব্য) মুকুটরায় পরাজিত ও ও বন্দী হন বলিয়া কথিত। মুকুটরায়ের কন্যা স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অন্তঃপুরের নিকটবর্ত্তী একটি পুকুরে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। এই পুষ্করিণীটি পরে "কন্যাদহ" নামে পরিচিত হয়।

নলডাঙ্গা—ঝিনাইদহ হইতে ৯ মাইল দক্ষিণে এবং যশোহর হইতে ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত নলডাঙ্গা একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে একটি পুরাতন জমিদার বংশের বাস। ইঁহারা নলডাঙ্গার রাজা নামে পরিচিত। নলডাঙ্গা রাজবংশের প্রতিষ্ঠিত মঠ-বাড়ীতে আটটি পুরাতন মন্দির এবং নিকটবর্ত্তী গঞ্জনগর নামক স্থানে একটি বৃহৎ অট্টালিকা আছে। এই স্থানে একটি পঞ্চমুণ্ডি আসন ও কালীতলাদহ নামক একটি পুরাতন পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ এই পঞ্চমুণ্ডি আসনে বসিয়া যে কেহ সাধনার চেষ্টা করিতেন, তাঁহাকেই অপদেবতারা নিকটবর্ত্তী কালীতলাদহে ডুবাইয়া মারিত। অবশেষে ভৈরব ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক শক্তিশালী সাধক এই আসনে বসিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। রাত্রিকালে এখনও কালীতলাদহ হইতে নাকি শঙ্খ, ঘণ্টা ইত্যাদির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

নড়াইল—যশোহর হইতে মোটরবাসে অথবা দৌলতপুর কিম্বা খুল্না হইয়া স্টীমারযোগে যশোহর জেলার অন্যতম মহকুমা নড়াইলে যাওয়া যায়। যশোহর হইতে নড়াইল ২০ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব কোণে চিত্রা নদীর তীরে অবস্থিত। নড়াইলে রায় উপাধিধারী প্রাচীন জমিদার বংশের বাস। এই বংশের রামরতন রায় বা রতন বাবুর প্রতাপের কথা বাংলার প্রায় সর্ব্বত্র সুপরিচিত। জমিদার বাবুদের বাসভবন, সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর ও গোবিন্দজীর মন্দির এবং নড়াইল ভিক্টোরিয়া কলেজ নামক দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তু। নড়াইলের সরু চিঁড়া ও খেজুর গুড়ের সুগন্ধযুক্ত পাটালি বিখ্যাত। নড়াইল শহরের অন্তঃপাতী মহিষখোলা গ্রাম সুবিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক ৺রাধারমণ চরণ দাস বাবাজীর জন্মস্থান। গৃহস্থাশ্রমে তাঁহার নাম ছিল রাইচরণ ঘোষ। "নিতাই-গৌর রাধে-শ্যাম" এই মন্ত্র প্রচার করিয়া তিনি বৈষ্ণব সমাজে এক নূতন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। "চরিত সুধা" নামক গ্রন্থে তাঁহার জীবনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। নবদ্বীপের রাধারমণ বাগে তাঁহার সমাজ বা সমাধি বিদ্যমান।

সিঙ্গিয়া—কলিকাতা হইতে ৮৪ মাইল দূর। সিঙ্গিয়া ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল পূর্ব্বে ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত শেখহাটী বা শাঁখহাটী একটি পুরাতন স্থান। কেহ কেহ অনুমান করেন যে সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া

পর এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী দেওভোগ বা দেবভোগ প্রভৃতি গ্রাম প্রাচীন শাঁখহাটী বা শঙ্খহাটির অন্তর্ভুক্ত ছিল। দেবভোগের এক অংশকে বিজয়তলা বলে। স্থানীয় প্রবাদ এই স্থানে বল্লাল সেনের পিতা রাজা বিজয় সেনের বাটী ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বল্লাল সেনের রাজ্য পাঁচটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল যথা, বঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গ, বরেন্দ্র, মিথিলা, রাঢ় ও বগড়ী এবং ইহাদের মধ্যে বগড়ীর প্রাদেশিক রাজধানী ছিল শেখহাটী অঞ্চলে। শাঁখহাটিতে লক্ষ্মণসেনের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত ভুবনেশ্বরী দেবীর একটি বিগ্রহ বিদ্যমান। এই প্রস্তর নির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তি অতি সুন্দর। একখানি অখণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তর কুঁদিয়া মূর্ত্তিটি নির্ম্মিত। ভুবনেশ্বরী দেবীর পৌরাণিক ধ্যান অনুযায়ী পারিজাত কাননে কল্পবৃক্ষতলে মণিময় বেদীর উপর দেবী পদ্মাসনে উপবিষ্টা। দেবীর ছয়খানি হস্তে শঙ্খ, কমণ্ডলু, অঙ্কুশ, পদ্ম, পুষ্পবাণ ও বরমুদ্রা বিরাজিত, গলে রত্নহার ও মস্তকে রত্নমুকুট। শাঁখহাটির এই প্রাচীন দেবী মূর্ত্তিটি বাংলার ভাস্কর্য্য শিল্পের অতি অপূর্ব্ব নিদর্শন। মূর্ত্তিটি ৫ ফুট ও প্রস্থে ২′—৫″ ইঞ্চি।

প্রতাপাদিত্যের অন্যতম সেনাপতি কালিদাস রায় পুষ্করিণী খননকালে মূর্ত্তিটি পাইয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে এখানকার জমিদারী নানা হাত ঘুরিয়া নড়াইলের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

সিঙ্গিয়ার নিকটবর্ত্তী জগন্নাথপুর গ্রামে বহুকাল হইতে অনেকগুলি পাঠান পরিবারের বাস আছে। সুবিখ্যাত "মহিলা" কাব্যের কবি ৺সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার জগন্নাথপুরের অধিবাসী ছিলেন।

চেঙ্গুটিয়া—কলিকাতা হইতে ৮৮ মাইল দূর। চেঙ্গুটিয়া স্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত প্রেমভাগ, তপনভাগ ও দেয়াপাড়া প্রভৃতি স্থানের সহিত অতীতের স্মৃতি বিজড়িত আছে। প্রেমভাগের চলিত নাম পম্‌ভাগ; তপনভাগ ও দেয়াপাড়া ইহার বিপরীত দিকে ভৈরব নদের অপর পারে অবস্থিত। প্রেমভাগে স্বনামধন্য বৈষ্ণব গোস্বামী রূপ ও সনাতনের একটি বাসভবন ছিল। ইঁহাদের জন্মস্থান ছিল বাক্‌লায় (বর্ত্তমান বরিশাল জেলার অন্তর্গত) ও কর্ম্মস্থান ছিল রাজধানী গৌড়ে। রাজ সরকারে ইঁহারা অতি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গৌড় হইতে জন্মস্থান বাক্‌লায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য ইঁহারা প্রায় মধ্যপথবর্ত্তী প্রেমভাগে একটি বাটী নির্ম্মাণ করেন। রূপ ও সনাতন উচ্চ রাজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যখন সন্ন্যাসী হন, তৎপূর্ব্বে তাঁহারা গৌড় হইতে তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থাদি প্রেমভাগের বাটীতে প্রেরণ করেন এবং এই স্থান হইতে উহার যথাযোগ্য বিলি-বন্দোবস্ত করিয়া সংসার ত্যাগ করেন। প্রেমভাগ সরকার ফতেহাবাদের অন্তর্গত ছিল। এই জন্য ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থে এই স্থান ফতেহাবাদ নামেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রেমভাগে রূপ-সনাতন কর্ত্তৃক খনিত কয়েকটি পুরাতন পুকুর, তাঁহাদের বাটীর ও দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি আজিও দৃষ্ট হয়। রূপ গোস্বামী "কারিকা" নামে একটি পুস্তক বাংলা গদ্যে লিখিয়াছিলেন। ইহা হইতে দেখা যায় প্রায় সাড়ে চার শত বৎসর পূর্ব্বেও বাংলা গদ্য বেশ সুখবোধ্য ও প্রসাদগুণ সমন্বিত ছিল। ধর্ম্মসাধনায় নিমগ্ন হইয়া রূপ ও সনাতন বৃন্দাবনে বাস করিতে থাকেন। বৃন্দাবনের সুন্দর ও সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দজীর

মন্দিরটি ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে রূপ গোস্বামীর প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়। লাল পাথরের মদন-মোহন মন্দিরটি সনাতন গোস্বামী নির্ম্মাণ করান। এই মন্দিরের উপরের দিকে একটি সংস্কৃত শ্লোক প্রথমে বাংলা লিপিতে এবং পরে দেবনাগরীতে খোদিত আছে। অনেকে অনুমান করেন যে তপনভাগ ও দেয়াপাড়ার পূর্ব্বনাম যথাক্রমে তপোবনভাগ ও দেবপল্লী ছিল। এই দুই স্থানের সহিতও রূপ-সনাতনের সম্বন্ধ ছিল। কেহ কেহ আবার এই সকল স্থানের সহিত লক্ষ্মণসেনের সংশ্রব ছিল বলিয়া অনুমান করেন।

নওয়াপাড়া—কলিকাতা হইতে ৯১ মাইল দূর। স্থানটি ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত। এখানে একজন বিখ্যাত পীর ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

স্টেশন হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে বুনো নামক গ্রামে এক প্রসিদ্ধ শীতলা আছেন। তথায় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

তালতলাহাট—কলিকাতা হইতে ৯৩ মাইল দূর। এই স্থান হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে ভৈরব নদের তীরে ভাটপাড়া নামক গ্রামে জগন্নাথদেবের মন্দির আছে। প্রায় সাড়ে চার শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। কথিত আছে,
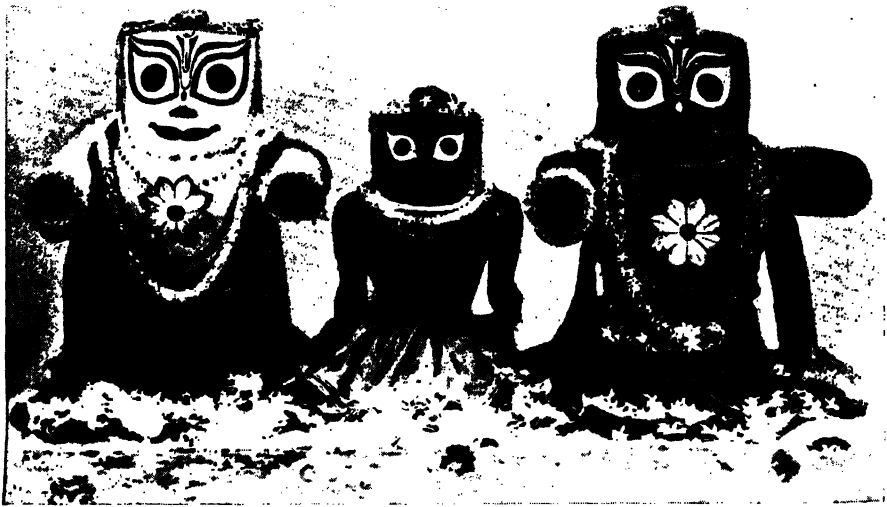
জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম বিগ্রহ, গুপ্তপুরী ভাটপাড়া

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যদেব যখন নীলাচল বা পুরীতে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে ভাটপাড়া নিবাসী দয়ারাম গোস্বামী নামক জনৈক ভক্ত বৈষ্ণব পুরীতে জগন্নাথদেব ও শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিবার আশায় গৃহ হইতে বহির্গত হন। বহুদিন ধরিয়া পদব্রজে বহু পথ অতিক্রম করিবার পর ওড়িষ্যায় পৌঁছিয়া দয়ারাম সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। তাঁহার ভক্তি ও নিষ্ঠায় আকৃষ্ট হইয়া জগন্নাথদেব এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া তাঁহাকে দর্শন দেন এবং গৃহে ফিরিয়া যাইতে

বলেন। তিনি বলেন যে দয়ারামের আর কষ্ট করিয়া পুরী পর্য্যন্ত যাওয়ার আবশ্যক নাই; তাঁহার ভক্তিতে প্রীত স্বয়ং জগন্নাথদেব দারুরূপে তাঁহার গৃহে গমন করিবেন ও তথায় চিরদিন অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবা গ্রহণ করিবেন। তখন প্রীত হইয়া দয়ারাম স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সকলকে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রথমে অনেকেই তাঁহার কথা বিশ্বাস করে নাই; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে যখন ভৈরব নদের উজান স্রোত বাহিত হইয়া একটি নিম গাছ ভাটপাড়ার ঘাটে লাগিল তখন জনগণের মধ্যে তুমুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। দয়ারাম এই নিম গাছ হইতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন। এই অলৌকিক কাহিনী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে জগন্নাথদেবের সেবার জন্য অর্থ দান করিতে লাগিলেন। দয়ারামের গৃহে পূর্ব্ব হইতেই রাধা ও কৃষ্ণের পূজা হইত। জগন্নাথদেবের আবির্ভাবের পর নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বিগ্রহগুলিকে তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা হইল। চাঁচড়ার রাজপরিবার দেবসেবা নির্ব্বাহের জন্য তিন হাজার বিঘা জমি দান করেন। সেই প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভাটপাড়ায় মহাসমারোহে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে অপর একজন ভক্ত কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের বিভিন্ন কক্ষে অবস্থিত এই বিগ্রহগুলির জন্য ভৈরব তীরবর্ত্তী এই পল্লীটি এতদঞ্চলে তীর্থ-গৌরব লাভ করিয়াছে। পুরী হইতে আগমন করিয়া জগন্নাথদেব এখানে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া এই গ্রাম সাধারণের নিকট "গুপ্তপুরী ভাটপাড়া" আখ্যা লাভ করিয়াছে। ভাটপাড়ার রথের মেলা যশোহর খুলনায় বিশেষ বিখ্যাত। মেলার সময় তালতলা হাট স্টেশন হইতে ভাটপাড়া পর্য্যন্ত মোটর লঞ্চ ও নৌকা যাতায়াত করে। স্নানযাত্রা, ঝুলনযাত্রা ও দোল পূর্ণিমার সময়েও এখানে বহু লোকের সমাগম হয়।

দৌলতপুর—কলিকাতা হইতে ১০৫ মাইল দূর। স্থানটি ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত ও খুলনা জেলার একটি প্রসিদ্ধ গঞ্জ। এখান হইতে প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে পাট, বাঁশ, শিমুল কাঠ, নারিকেল, সুপারি, গুড় ও মাছ চালান যায়। গঞ্জটি ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া শহরে পরিণত হইতেছে। খুলনা হইতে যত স্টীমার উত্তরদিকে যায় তাহাদের অধিকাংশই দৌলতপুর হইয়া চলে। এই স্থানে নামিয়া স্টীমারযোগে নড়াইল ও মাগুরা যশোহর জেলার এই দুই মহকুমায় যাওয়া যায়।

দৌলতপুর একটি বিখ্যাত শিক্ষা-কেন্দ্র। পাঠশালা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম শ্রেণীর কলেজ পর্য্যন্ত শিক্ষার প্রায় সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠান এখানে বিদ্যমান। দৌলতপুর "হিন্দু একাডেমির" নাম বাংলার সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ভৈরব নদের তীরে উন্মুক্ত প্রান্তরে বহু স্থান জুড়িয়া কলেজ ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাসগুলি অবস্থিত। বাংলার আর কোন কলেজের এত অধিক ছাত্রাবাস নাই। কয়েক বৎসর হইল এখানে একটি কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৃষি-কলেজ ও তৎসংলগ্ন গো-শালা প্রভৃতি এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তু। দৌলতপুর স্টেশনের অতি নিকটে "মহেশ্বর পাশা স্কুল অব্ আর্ট" নামে একটি আর্ট স্কুল ও মহেশ্বরপাশা নামক স্থানে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় অবস্থিত। ইহা ছাড়া এখানে মক্তব, চতুষ্পাঠী, গুরুট্রেণিং স্কুল, আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় প্রভৃতিও আছে। দৌলতপুর কলেজের সম্মুখে "দৌলতপুর কলেজ" নামে একটি রেল স্টেশনও হইয়াছে।

দৌলতপুরের সংলগ্ন **মহেশ্বর পাশা** গ্রামে প্রায় ২০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন একটি সুন্দর জোড়-বাংলা মন্দির আছে। গোপীনাথ গোস্বামী নামক একজন সাধক গোবিন্দ রায় বিগ্রহের জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

দৌলতপুরের প্রায় বিপরীত দিকে ভৈরব নদের উত্তর তীরে অবস্থিত **সেনহাটি** একটি প্রাচীন বৈদ্য প্রধান গ্রাম। কেহ কেহ বলেন যে এই গ্রামের সহিত সেনবংশের বিখ্যাত রাজা লক্ষ্মণ সেনের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ছিল। এই গ্রামের বিজয় চণ্ডীতলা নামক স্থানের সহিত সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেনের স্মৃতি বিজড়িত বলিয়া অনেকের অভিমত। সেনহাটি গ্রামে কয়েকটি পুরাতন মন্দির ও দীঘি আছে। সেনহাটিতে "জ্বরনারায়ণ" নামে এক জ্বরের ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। "সদ্ভাবশতক" প্রণেতা স্বভাব-কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সেনহাটীর অধিবাসী ছিলেন।

ভরতভায়না—দৌলতপুর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণে বুড়ীভদ্র নদীর তীরে অবস্থিত ভরতভায়না একটি অতি প্রাচীন স্থান। এখানে প্রায় ৭০ ফুট উচ্চ গোলাকৃতি একটি প্রকাণ্ড ইষ্টক স্তূপ আছে। ইহার পরিধি ৯০০ ফুটেরও অধিক হইবে। স্থানীয় লোকেরা

ভরত ভায়নার স্তূপ [প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে]

ইহাকে "ভরত রাজার দেউল" বলিয়া থাকেন। নিকটবর্ত্তী গৌরীঘোনা গ্রামে একটি ইষ্টক স্তূপ ভরত রাজার বাটী বলিয়া পরিচিত। এই ভরত রাজা কে ছিলেন তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে ইহা কোন প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। অনেকের ধারণা এই স্তূপটি খনন করা হইলে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান মিলিতে পারে। প্রাচীনকালে যশোহর-খুলনা সমতট রাজ্যের অন্তর্গত

ছিল। সমতটে বৌদ্ধ প্রভাবের বিবরণ প্রাচীন পর্য্যটকগণের ভ্রমণ-কাহিনীতে লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং এই সকল অঞ্চলে তৎকালে বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারাম থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়াই ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন।

খুলনা—কলিকাতা হইতে ১০৯ মাইল দূর। ইহা ভৈরব নদ ও রূপসা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এবং মধ্য-বঙ্গের একটি প্রধান গঞ্জ ও বন্দর। নদীর তীর দিয়া খুলনা শহরের দৃশ্য অতি সুন্দর। খুলনা শহরে আধুনিক নাগরিক জীবনের প্রায় সকল প্রকার সুখ সুবিধাই বর্ত্তমান আছে। এই শহরের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এখানে ছেলেদের জন্য তিনটি এবং মেয়েদের জন্য একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। খুলনা শহরে প্রতি সপ্তাহের শনি ও বুধবারে প্রকাণ্ড হাট বসে। উহা "সাহেবের হাট" নামে পরিচিত। বহু বৎসর পূর্ব্বে নীলকর শ্যালেট সাহেব এই হাটের সৃষ্টি করেন।

বর্ত্তমান খুলনা শহর হইতে প্রায় দেড় মাইল উত্তর-পূর্ব্বদিকে ভৈরব নদের দক্ষিণ তীরে রেণীগঞ্জ নামক স্থানে পুরাতন খুলনা অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল নয়াবাদ। স্থানীয় নীলকর রেণী সাহেবের অত্যাচার নিবারণের জন্য ইংরেজ সরকার এখানে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে একটি মহকুমা সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়েন। বাংলাদেশের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম মহকুমা। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে খুলনা স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয়। এখানে রেণী সাহেবের একটি কুঠি এখনও বর্ত্তমান আছে, উহার প্রাঙ্গনে রেণীর এক পুত্রের সমাধি আছে। স্থানীয় লোকেদের সমবেত চেষ্টার ফলে অবশেষে অত্যাচারী রেণী সাহেবের পতন ঘটে।

"খুলনা" নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি যে প্রসিদ্ধ চণ্ডীকাব্যের নায়ক ধনপতি সদাগরের পত্নী খুল্লনার নাম হইতেই এই স্থানের নাম খুলনা হইয়াছে। বর্ত্তমান রেণী-গঞ্জের সামান্য উত্তরে তালিবপুর গ্রামে ধনপতি সদাগরের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত "খুল্লনেশ্বরী" কালী আজিও পূজিত হইতেছেন। জ্যেষ্ঠা পত্নী লহনার নামানুসারেও ধনপতি ভৈরবের উত্তর তীরে "লহনেশ্বরী" নামে এক কালী প্রতিষ্ঠা করেন। যে স্থানে কালীর মন্দির অবস্থিত তথায় বহু উলুবন থাকার জন্য এই কালী সাধারণের নিকট "উলুবনের কালী" নামে পরিচিত। খুলনা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য প্রকার প্রবাদও প্রচলিত আছে। এখন যেখানে খুলনা শহর পূর্ব্বে তথায় গভীর জঙ্গল ছিল। প্রকৃত-পক্ষে এই স্থান হইতেই সুন্দরবনের আরম্ভ ছিল। যে সকল লোক সুন্দরবনে কাষ্ঠ, গোলপাতা, হোগলা অথবা মধু সংগ্রহ করিতে যাইত, তাহারা প্রাচীন খুলনা বা নয়া-বাদের থানার নিকট নৌকা রাখিয়া রাত্রি যাপন করিত। অনুকূল স্রোত বা বায়ুর জন্য কোন মাঝি রাত্রিকালে নৌকা খুলিবার উপক্রম করিলে বন মধ্য হইতে নাকি বনদেবতা বলিয়া উঠিতেন, "খুলো না, খুলো না"। কেহ কেহ বলেন যে এই কারণেই এই স্থানের নাম "খুলোনা" বা খুলনা হয়।

খুলনা শহরের বিপরীত দিকে ভৈরব নদের উত্তর পারে অবস্থিত **সেনের বাজার** একটি প্রাচীন স্থান। প্রবাদ, সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেন এই বাজারটির প্রতিষ্ঠাতা। শাঁখহাটি ও সেনহাটির সহিত লক্ষ্মণ সেনের সংশ্রবের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

সেনের বাজারের অদূরে কাজীর জাঙ্গাল, কাজীর দীঘি ও কাজীর দেউড়ি প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন কীর্ত্তি আছে।

আলা-উদ্-দীন হুসেন শাহ যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তখন এই স্থানে সুবি খাঁ ও সুচি খাঁ নামক দুইজন কাজী ছিলেন। তাঁহাদের পিতার নাম ছিল পঞ্চরঙ্গ খাঁ। পঞ্চরঙ্গ প্রথমে হিন্দু ছিলেন; তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল চতুরঙ্গ ভদ্র। প্রাচীন নয়াবাদ বা বর্ত্তমান রেণীগঞ্জের উত্তরে ভৈরব নদের তীরে **ভদ্রগাতি** নামক গ্রামে তাঁহার গড়বেষ্টিত ভবন ছিল। দুই একটি "জাঙ্গাল" ভিন্ন ভদ্রগাতির অন্যান্য প্রাচীন চিহ্ন ভৈরব নদের কুক্ষিগত হইয়াছে। চতুরঙ্গ ভদ্র হুসেন শাহের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। হুসেন শাহের প্রধান অমাত্য গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি ভদ্রগাতি হইতে অর্দ্ধ মাইল উত্তরে অবস্থিত শ্রীফলতলা নামক গ্রামে কন্যা-জামাতার জন্য এক সুরক্ষিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করাইয়া দেন। প্রবাদ যে গৌড় নগরে জনৈক জ্যোতিষী তাঁহার হাত দেখিয়া বলেন যে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি তাঁহার বংশধরগণের ভোগে আসিবে না, উহা তাঁহার দৌহিত্র পাইবে। ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তিনি একমাত্র দৌহিত্রকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য স্বীয় পুত্রের নামে একখানি পত্র লিখিয়া জনৈক বাহকের দ্বারা প্রেরণ করেন। ঘটনাক্রমে ঐ পত্র তাঁহার পুত্রের হস্তে না পৌঁছিয়া দৌহিত্রের হাতে গিয়াই পড়ে। সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চতুরঙ্গের দৌহিত্র মাতুল বংশের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং স্বীয় লোকজনসহ মাতামহের ভবন আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে সবংশে নিধন করেন। যে পুষ্করিণী মধ্যে তাঁহাদের মৃতদেহ সকল নিক্ষেপ করা হয় তাহা লোকে আজিও দেখাইয়া থাকে। চতুরঙ্গ এই সংবাদ পাইয়া পাগলের মত হইয়া যান। কথিত আছে যে বৃদ্ধ বয়সে তিনি গৌড়ে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং তখন তাঁহার নাম হয় পঞ্চরঙ্গ খাঁ। তিনি পুনরায় বিবাহ করেন এবং তাঁহার মুসলমান পত্নীর গর্ভজাত পুত্রদ্বয়ের জন্য 'বেলফুলিয়া পরগণার কাজীর পদ যোগাড় করিয়া দেন। এই কাজীবংশের ধারা আজিও অব্যাহত আছে। চতুরঙ্গ কর্ত্তৃক খনিত শ্রীফলতলা গ্রামের প্রাচীন দীঘি এখনও বর্ত্তমান আছে।

খুলনা শহর হইতে যথাক্রমে তিন মাইল ও পাঁচ মাইল দূরে হুসেনপুর ও আলাইপুর নামে দুইটি গ্রাম আছে। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে এই দুইটি গ্রাম গৌড়েশ্বর আলা-উদ্-দীন হুসেন শাহের স্মৃতি বহন করিতেছে। তাঁহাদের মতে হুসেন শাহের বাল্যজীবন এই আলাইপুরের নিকটবর্ত্তী চাঁদপুর গ্রামের কাজীবাড়ীতে অতিবাহিত হয় এবং এখানেই তাঁহার শ্বশুর বাড়ী ছিল। চাঁদপুর গ্রামটি অধুনা একটি নগণ্য পল্লী হইলেও এক সময়ে ইহা যে একটি সমৃদ্ধ স্থান ছিল তাহা ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াও অনুমান করিতে পারা যায়। আলাইপুর গ্রামটি ভৈরব ও আঠারবাঁকি নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা একটি বড় বন্দর ছিল। ভৈরব নদ মজিয়া যাওয়ায় ইহা এখন একটি সামান্য বাজারে পরিণত হইয়াছে।

খুলনা হইতে দৈনিক অনেকগুলি স্টীমার সার্ভিস আছে। এখান হইতে স্টীমার যোগে পশ্চিমদিকে এই জেলার অন্যতম মহকুমা সাতক্ষীরা, উত্তরদিকে যশোর জেলার নড়াইল

৫ মাগুরা মহকুমা, যশোহর জেলার অন্তর্গত রাজা সীতারাম রায়ের প্রাচীন রাজধানী মহম্মদপুর এবং তাহার অনতিদূরে এই রেলপথের কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া শাখার গোয়ালমারি বাজার নামক গঞ্জ, উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর মহকুমা এবং পূর্ব্বদিকে বাখরগঞ্জ বা বরিশাল জেলার সদর শহর বরিশাল যাওয়া যায়।

রূপসা ঈস্ট—খুলনা শহরের নিকটে রূপসা নদীর পূর্ব্বে তীরে অবস্থিত। এই স্থান হইতে খুলনা-বাগেরহাট লাইট রেলওয়ের আরম্ভ। খুলনাঘাট ও রূপসা ঈস্টের মধ্যে ফেরী ষ্টীমার যাতায়াত করে। স্টেশনের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ নীলকর রেণী সাহেবের কুঠি অবস্থিত।

বাহিরদিয়া—কলিকাতা হইতে ১১৫ মাইল দূর। স্টেশনের নিকটে মানসার বাজার নামে একটি পুরাতন গঞ্জ আছে। এই বাজারে "বুড়ীমা" নামে এক বিখ্যাত মৃন্ময়ী কালী আছেন। ইহার মুখ পশ্চিমাভিমুখী। কথিত আছে, পূর্ব্বে কালী প্রতিমার মুখ দক্ষিণাভিমুখে ছিল। একদিন নিকটবর্ত্তী ভৈরব নদ দিয়া একদল দাঁড়ি "সারি" গান গাহিয়া যাইতেছিল; উহা শুনিবার জন্য কালী প্রতিমা নাকি পশ্চিমদিকে মুখ ফিরান এবং সেই দিন হইতে তদবস্থায় রহিয়াছেন। এই কালী বিশেষ জাগ্রত বলিয়া এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধি আছে। এখানে শনি ও মঙ্গলবারে যাত্রীর সমাগম হয়।

যাত্রাপুর—কলিকাতা হইতে ১২৩ মাইল দূর। স্টেশনের নিকটে শীর্ণকায় ভৈরবনদের অপর পারে লাউপালা গ্রামে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত বালকদাস বাবাজীর সমাধি মন্দির ও তৎপ্রতিষ্ঠিত গোপালজীউর মন্দির অবস্থিত। প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বালকদাস জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, স্বপ্নে আদেশ পাইয়া তিনি ভৈরব নদের মধ্য হইতে গোপালজীউর বিগ্রহ লাভ করেন এবং ভিক্ষালব্ধ অর্থে একটি সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গোপালজীউর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নানা রূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সিদ্ধ মহাত্মা বালকদাস গোপাল বিগ্রহকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিতেন এবং গোপালের সহিত তাঁহার নাকি প্রত্যক্ষ কথাবার্ত্তা চলিত। জনশ্রুতি যে একবার গোপাল বালকের বেশে বরিশাল জেলার ঝালকাঠি বন্দরে গিয়া জনৈক ময়রার সন্দেশ খাইয়া মূল্যের পরিবর্ত্তে স্বীয় হস্তের সুবর্ণ বলয় তাঁহাকে দিয়া আসেন। পরদিন বিগ্রহের হস্ত শূন্য দেখিয়া বালকদাস এ সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে গোপাল নাকি তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত বলেন। বালকদাস ঝালকাঠিতে গিয়া ময়রার নিকট হইতে গোপালের বলয় ছাড়াইয়া আনেন এবং ময়রা সেই দিন হইতে গোপালজীউর একজন অনুরক্ত ভক্ত হইয়া উঠেন। গোপালের সম্বন্ধে এইরূপ অনেক অদ্ভুত জনশ্রুতি আছে। প্রতি বৎসর মহাসমারোহে গোপালের রথযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হয় এবং তদুপলক্ষে যাত্রাপুরে প্রায় পক্ষকালস্থায়ী একটি বৃহৎ মেলা হয়। এই মেলায় আনুমানিক ১৫ হাজার যাত্রীর সমাগম হয় এবং ইহাতে সুন্দর দেশীয় পুতুল প্রভৃতি লোক শিল্পের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। রথযাত্রা হইতেই গ্রামের নাম যাত্রাপুর হইয়াছে অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। যাত্রাপুর সুপারি ও নারিকেলের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ।

যাত্রাপুর হইতে দুই মাইল দূরে প্রাচীন ভৈরব নদের তীরে কোদলা গ্রামে "অযোধ্যার মঠ" নামে একটি পুরাতন মঠ আছে। এই মঠটি বর্ত্তমানে সরকারের "রক্ষিত কীর্ত্তি" বিভাগের অধীন। ভূমি হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট। কবে কাহার দ্বারা এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা নির্ণীত হয় নাই। ইহার দ্বারের উপর উৎকীর্ণ একটি লিপির ক্ষয় প্রাপ্ত অংশ হইতে অনুমিত হয় যে কাহারও চিতাভস্মের উপর
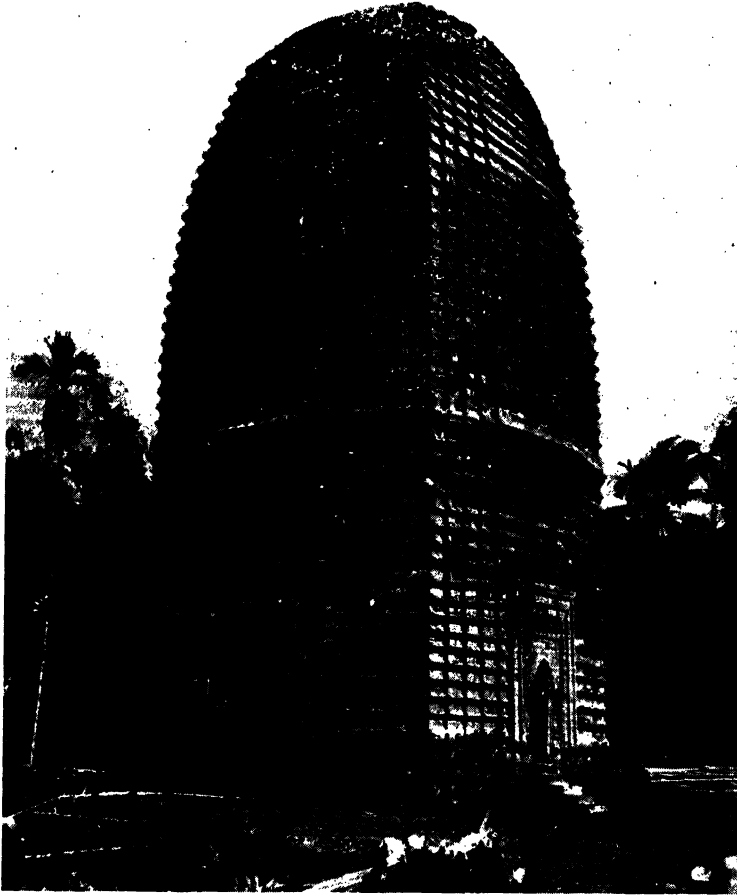
অযোধ্যার মঠ—প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে

এই মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ, প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক তাঁহার সভাপণ্ডিত অবিলম্ব সরস্বতীর স্মৃতি-স্তম্ভ রূপে মঠটি নির্ম্মিত হয়। সমগ্র খুলনা জেলার মধ্যে ইহা একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। যাত্রাপুর হইতে কোদলা গ্রাম পর্য্যন্ত জেলাবোর্ডের ভাল কাঁচা রাস্তা আছে।

ষাটগুম্বজরোড—কলিকাতা হইতে ১২৬ মাইল দূর। স্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে ইতিহাস বিশ্রুত খান জাহান্ আলির দরগা ও ষাটগুম্বজ মসজিদ অবস্থিত। যাঁহারা ঘোড়ার গাড়ী বা মোটরযোগে ষাটগুম্বজে যাইতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের বাগেরহাট হইতে যাওয়াই সুবিধা। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উলুগ-খাঁ-জাহান নামক একজন মুসলমানধর্ম্ম প্রচারক সুন্দরবনের বনাঞ্চল পরিষ্কার করিয়া তথায় হাবেলী নামে একটি শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। যশোহর খুলনার বহু স্থানে তাঁহার নির্ম্মিত মসজিদ ও দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার একদল বেলদার সৈন্য ছিল: তাহাদের কাজ ছিল পথের দুই পার্শ্বে বড় বড় পুষ্করিণী খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট দূর করা। জনসাধারণের নিকট ইনি "খাঞ্জালি" নামে সুপরিচিত। ঠাকুর দীঘি নামক একটি প্রকাণ্ড জলাশয়ের তীরে উচ্চ ভূমির উপর খান জাহান আলির সুন্দর সমাধি সৌধটি অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট ও উচ্চতা ২৫ ফুট, ইহার ছাদে একটি মাত্র গুম্বজ আছে। এই সৌধের ভিতর প্রস্তর নির্ম্মিত বেদীর উপর খান্ জাহানের কবর দেখিতে পাওয়া যায়। কবরের প্রস্তর গাত্রে আরবী ভাষায় আশীর্ব্বাদ খোদিত আছে। ইহার দক্ষিণদিকে একটি ত্রিকোণের মধ্যে লিখিত আছে যে সুমহান খান্ জাহানের কবরটি নন্দন কাননের অংশ। ইহার তারিখ ৮৬৩ হিজরার ২৬শে জিলহিজ্জা বা ২৩শে অক্টোবর ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দ। সমাধি-সৌধের পার্শ্বে একটি ছোট মসজিদ আছে এবং নিকটেই পীর খান জাহানের প্রধান চেলা মহম্মদ তাহির বা পীর আলির সমাধি অবস্থিত। প্রবাদ, মহম্মদ তাহির পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর তিনি ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য বিশেষ উদ্যমশীল হন এবং ঐকান্তিক ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য "পীর আলি" আখ্যা লাভ করেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই "পীর আলি" বা পীরালি নামে একটি শ্রেণী দৃষ্ট হয়। মহম্মদ তাহির মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে যে পুত্রসন্তান লাভ করিয়াছিলেন তিনিই হিন্দু পীরালি সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কথিত।

বাংলার বৃহৎ দীঘি গুলির মধ্যে ঠাকুর দীঘি অন্যতম। জনশ্রুতি যে এই দীঘি খনন কালে ইহার মধ্য হইতে একটি দেববিগ্রহ আবিষ্কৃত হয় বলিয়া ইহার নাম "ঠাকুর দীঘি" হয়। ইহার বাঁধাঘাটের ভগ্নাংশ আজিও বিদ্যমান আছে। এই দীঘির মধ্যে কতকগুলি বড় বড় কুমীর বাস করে। সাধারণতঃ ইহারা মানুষকে হিংসা করে না এবং দরগার ফকিরগণের আহবানে কিনারার নিকট আসিয়া তাহাদের হাত হইতে খাদ্যাদি গ্রহণ করে। এই গুলি খান্ জাহান্ আলির সময়কার কালাপাহাড় ও ধলাপাহাড় নামক দুটি কুমীরের সন্তান সন্ততি বলিয়া কথিত; খান্ জাহান্ আলি এই নামে ডাকিলে তাঁহার নিকট আসিয়া তাহারা হাজির হইত, তাহাদের বংশধরগণ আজও এই নামে সাড়া দিয়া থাকে। প্রতি বৎসর চৈত্র পূর্ণিমার দিন খান্ জাহান্ আলির মৃত্যু তিথি উপলক্ষে ঠাকুর দীঘির পাড়ে ও ষাটগুম্বজ মসজিদে খুব বড় মেলা হয়।

খান জাহানের দরগা হইতে প্রায় এক মাইল দূরে সুবিখ্যাত ষাটগুম্বজ মসজিদ অবস্থিত। ইহার নাম ষাটগুম্বজ হইলেও ইহার ছাদে প্রতি শ্রেণীতে সাতটি করিয়া এগারটি শ্রেণীতে মোট ৭৭টি গুম্বজ আছে। মধ্যকার শ্রেণীর গুম্বজগুলি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট, অপর গুলির আকৃতি গোলাকার। এই বিশাল মস্জিদের চতুর্দ্দিকের প্রাচীর প্রায় ৯ ফুট

চওড়া; গুম্বজ গুলি ধরিবার জন্য অভ্যন্তরে ৬০টি প্রস্তর স্তম্ভ আছে। ইহার চরি কোণে চারিটি মিনার আছে। মস্‌জিদটি ছোট ইট দিয়া তৈরী। ইহার দৈর্ঘ্য ১৬০ ফুট, প্রস্থ ১০৫ ফুট ও উচ্চতা ২২ ফুট। ইহার সম্মুখদিকে মধ্যস্থলে একটি বড় খিলান ও তাহার দুই পার্শ্বে পাঁচটি করিয়া ছোট খিলান আছে। কারুকার্য্য হিসাবে ইহা সমাধি সৌধ হইতে নিকৃষ্ট।

এই মসজিদের নিকটে "ঘোড়া দীঘি" নামে অপর একটি বৃহৎ জলাশয় আছে। ইহার মধ্যেও বহু কুমীর বাস করে। নিকটে বিষপুকুর নামক পুষ্করিণীর জল কেহ ব্যবহার করে না; কথিত আছে খান্ জাহান্ আলির মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী সোনাবিবি বিষ ভক্ষণ করিয়া এই পুকুরে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার অপরা স্ত্রী বাঘীবিবি ঘোড়া দীঘির পশ্চিম তীরে সমাহিতা আছেন।
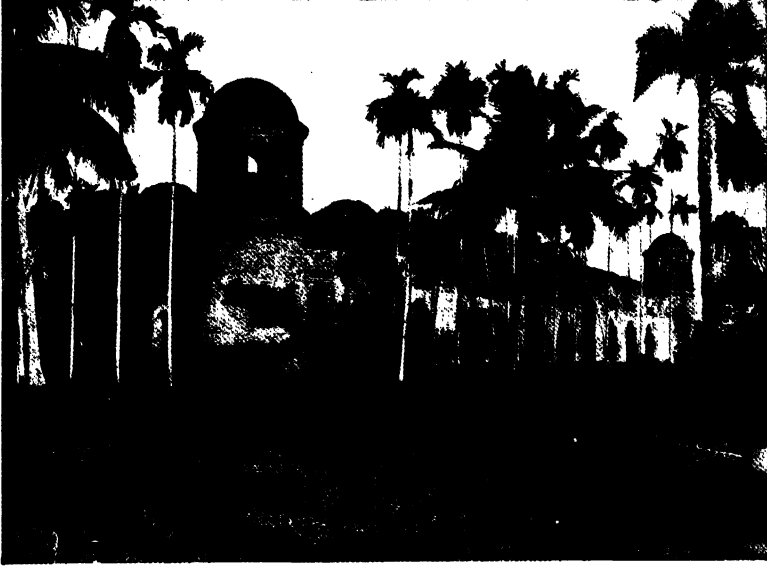
ষাটগুম্বজ মসজিদ্, বাগেরহাট

বাগেরহাট হইতে ষাটগুম্বজ পর্য্যন্ত প্রায় তিন মাইল স্থান জুড়িয়া খান জাহানের আমলের বহু ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

খান জাহানের কীর্ত্তিগুলি বর্ত্তমানে সরকারের রক্ষিত কীর্ত্তি বিভাগের অধীন।

বাগেরহাট—কলিকাতা হইতে ১২৯ মাইল দূর। ইহা খুলনা জেলার একটি মহকুমা। বাগেরহাট শহরটি ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত। এখানে ভৈরব নদ বেশ বহমান আছে। ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল, শুপারি, নারিকেল ও মাছ রপ্তানি হয়। বাগেরহাটে "প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ" নামে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। "বাগেরহাট কলেজ" নামে একটি ছোট রেল স্টেশনও আছে। বাগেরহাট উইভিং মিলের ছিটের কাপড়ের বাজারে বেশ চাহিদা আছে। এখানে একটী ছোট পুরাতন মস্‌জিদ আছে। উহা নসরৎ শাহের আমলে

নির্ম্মিত। বঙ্গেশ্বর নসরৎ শাহের নামাঙ্কিত কয়েকটি মুদ্রা বাগেরহাট হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বাগেরহাটের আশে পাশে খান জাহান আলির আমলের কতকগুলি পুরাকীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বাগেরহাট হইতে ষাটগুম্বজ মস্‌জিদ পর্য্যন্ত খান জাহান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি রাস্তা এখনও ব্যবহারযোগ্য আছে।

বাগেরহাট হইতে চার মাইল দূরবর্ত্তী শিববাড়ী গ্রামে এক প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন শিব আছেন। আসলে এই মূর্ত্তিটি একটি ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তি। ইহার কারুকার্য্য অতি সুন্দর। একখণ্ড শূর্পাকৃতি প্রস্তর কুঁদিয়া এই মূর্ত্তিটি নির্ম্মিত। পাদপীঠ বাদ দিয়া ইহা ৩২ ফুট

শিববাড়ীর শিব (বুদ্ধমূর্ত্তি)—প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে

উচ্চ এবং প্রস্থে ১ ফুট ৮২ ইঞ্চি। ইহার পাদপীঠে অনেকগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি বুদ্ধ খোদিত আছে এবং মধ্যস্থ বড় মূর্ত্তিটির চতুর্দ্দিকে বুদ্ধদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি প্রস্তরে উৎকীর্ণ আছে। বড় মূর্ত্তিটি একটি চৈত্যের মধ্যে অবস্থিত। এই চৈত্যের উপর বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ মন্দিরের অনুকরণে একটি মন্দির খোদিত আছে; তাহার মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র ধ্যানীবুদ্ধ মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। প্রধান মূর্ত্তিটির মুখমণ্ডলে শান্ত সমাহিত ভাব অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবাদ, খান জাহান আলির দরগার পার্শ্ববর্ত্তী ঠাকুর দীঘি হইতে এই মূর্ত্তিটি আবিস্কৃত হইয়াছিল। খান জাহান উহা মহেশচন্দ্র ব্রহ্মচারী নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন। তিনি ইহাকে শিবমূর্ত্তি নামে পরিচিত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।

বাগেরহাট হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ধোতখালি ও কুমারখালি নামক শাখা নদী পরিবেষ্টিত চকশ্রী গ্রাম। স্থানটির অবস্থান বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রতাপাদিত্য এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানকার কাটিকাটা হাট প্রসিদ্ধ; সুন্দরবন আবাদের বহু লোক এখানে হাট করিতে আসেন।

বাগেরহাট হইতে ৫।৬ মাইল দূরে চিরুলিয়া পরগণায় ভৈরব তীরে প্রাচীন গ্রাম পাণিঘাট অবস্থিত। এখানকার অষ্টাদশ ভুজা দেবী মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ। ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি কঠিন কষ্টি পাথরে প্রস্তুত। কথিত আছে, বরিশাল রায়েরকাটির জমিদার গন্ধর্ব্বনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র রাজচন্দ্র চিরুলিয়া পরগণা প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন; একবার সান্নিপাত জ্বরে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বৈদ্যেরা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই; একদিন সহসা একজন সন্ন্যাসী আসিয়া মৃতপ্রায় রাজচন্দ্রকে জঙ্গল মধ্যে নদীকূলে লইয়া যাইয়া দীক্ষা দান করেন। পাঁচ বৎসর পরে পুনরায় সন্ন্যাসী রাজচন্দ্রকে একই স্থানে দেখা দেন এবং অন্যান্য মূর্ত্তিসহ অষ্টাদশভুজা আদ্যাশক্তির মূর্ত্তি প্রদান করেন। রাজচন্দ্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেবীর পূজার ব্যবস্থা করেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের পর এই মন্দির নির্ম্মিত হয়।

এই দেবী বিশেষ জাগ্রত বলিয়া পরিচিত। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে নানা স্থান হইতে এখানে লোকে পূজা দিতে আসে।

বাগেরহাট হইতে বাখরগঞ্জ জেলার **হুলারহাট** পর্য্যন্ত প্রতিদিন (রবিবার ভিন্ন) স্টীমার যাতায়াত করে। খুলনা-বরিশাল স্টীমার পথেও হুলারহাট পড়ে। বাগেরহাট-হুলারহাট স্টীমার পথে **মরেলগঞ্জ** একটি বড় স্টেশন; এই স্থান বাগেরহাট হইতে আড়াই ঘণ্টার পথ। ইহা বাগেরহাট মহকুমার অন্তর্গত সুন্দরবনের মধ্যে পাঙ্গুচি ও বলেশ্বর বা হরিণঘাটা (উপরে যাহা মধুমতী ও গড়াই নামে অভিহিত) নদীর সঙ্গমের আড়াই মাইল উপরে পাঙ্গুচী নদীর কূলে স্থিত। কাছাড় সুন্দরবন স্টীমার পথেও এই স্টেশন পড়ে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মরেল উপাধিধারী দুইজন ইংরেজ এই স্থানে বসতি স্থাপন করেন, এই জন্য স্থানটির নাম হয় মরেলগঞ্জ। গভীর নদী এবং স্বাভাবিক অন্য সুবিধার জন্য স্থানটিকে সামুদ্রিক জাহাজের উপযোগী একটি বন্দরে পরিণত করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকার ইহাকে বন্দর বলিয়া ঘোষণাও করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা আশানুরূপ গড়িয়া উঠে নাই; তবে এখনও সুন্দরবনে একটি ব্যবসায়ের কেন্দ্র হইয়া আছে।

খুলনা হইতে স্টীমার পথে প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ

চাঁদখালি—খুলনা-সাতক্ষীরা স্টীমার পথে চাঁদখালি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। খুলনা হইতে স্টীমারে করিয়া চাঁদখালি যাইতে প্রায় দশ ঘণ্টা সময় লাগে। ইহা কপোতাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত একটি পুরাতন গঞ্জ। পূর্ব্বে ইহা সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। এখন চাষ আবাদ হওয়ার ফলে সুন্দরবন দূরে সরিয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে যশোহরের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট হেঙ্কেল সাহেব সুন্দরবনে চাষ আবাদ প্রবর্ত্তনের জন্য চাঁদখালিতে একটি বাজার ও একটি সরকারী কাছারি স্থাপন

করেন। বর্ত্তমানে কাছারি বাড়িটী নদীতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; হেঙ্কেল সাহেবের খনিত পুষ্করিণী আজিও বর্ত্তমান আছে। কপোতাক্ষীর অপরতীরবর্ত্তী বড়দলের হাট খুব বড় হইয়া যাওয়ায় চাঁদখালির গঞ্জ এখন অনেকটা ছোট হইয়া গিয়াছে। এখানে একটি সরকারী ডাক্তারখানা আছে। পূর্ব্বে যাহারা সুন্দরবনে চাষ আবাদ বা "মহাল" (কাষ্ঠ মধু ও মোম প্রভৃতি সংগ্রহ) করিতে যাইত চাঁদখালি তাহাদের একমাত্র আশ্রয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে চাঁদখালিকে সুন্দরবনের প্রবেশ দ্বার বলা যাইতে পারে।

চাঁদখালির ৬ মাইল দক্ষিণে কপোতাক্ষী নদীর তীরে অবস্থিত মসজিদ কুড়গ্রাম একটি পুরাতন স্থান। বহু বৎসর পূর্ব্বে এখানে আবাদের জন্য জঙ্গল পরিস্কার করিবার সময় একটি প্রাচীন মসজিদ আবিষ্কৃত হয় এবং সেইজন্য গ্রামের নাম হয় মসজিদকুড়। এই মসজিদটির গঠন প্রণালী বাগেরহাটের বিখ্যাত ষাটগুম্বজ মসজিদের অনুরূপ। প্রত্যেক শ্রেণীতে তিনটি করিয়া এই মন্দিরে মোট নয়টি গুম্বজ আছে। ইহার প্রাচীর প্রায় ছয় ফুট চওড়া। চারিটি প্রস্তর স্তম্ভের উপর ইহার ছাদ অবস্থিত এবং চারি কোণে চারিটি মিনার বিরাজিত। ইহার পশ্চিম দিকের প্রাচীর গাত্রে তিনটি মিহ্‌রাব আছে।

মসজিদকুড়ের দক্ষিণ দিকেই **আমাদি** গ্রাম। ইহার পর সুন্দরবন আরম্ভ হইয়াছে। এখানকার পরীমালা দেবীর প্রসিদ্ধি আছে। ইনি চতুর্ভুজা চামুণ্ডা মূর্ত্তি। কথিত আছে টাকীর জমিদার ৺গোবিন্দদেব রায়-চৌধুরী মহাশয় স্বপ্ন পাইয়া নিকটস্থ কয়ড়া নদীর কূলে নারায়ণপুর গ্রামে খনন করিয়া মূর্ত্তিটি প্রাপ্ত হন এবং আমাদিতে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সাতক্ষীরা—খুলনা হইতে পশ্চিম দিকে স্টীমার পথে ৭৭ মাইল দূর। ইলাচর নামক স্থানে নামিয়া সাতক্ষীরায় যাইতে হয়। কলিকাতা হইতে ইটিণ্ডা ঘাট ও পাটকেলঘাটা হইয়া মোটর বাস যোগেও সাতক্ষীরায় যাওয়া যায়। ইহা খুলনা জেলার একটি মহকুমা। শহরটি বেত্রবতী বা বেতনা নদীর একটি অপ্রশস্ত খালের তীরে অবস্থিত। এখানে একটি পুরাতন জমিদার বংশের বাস। এই বংশীয় ৺প্রাণনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিব, গোবিন্দদেব, মহাকাল ভৈরব, আনন্দময়ী ও অন্নপূর্ণার মন্দির এই শহরের দ্রষ্টব্য বস্তু। অন্নপূর্ণার মন্দিরটি কারুকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

সাতক্ষী শহর হইতে দুই মাইল দূরে বেতনা নদীর তীরে অবস্থিত **লাবসা** বা লাপসা নামক গ্রামে "মাঈচম্পার দরগা" নামে একটি পবিত্র স্থান আছে। এই দরগার মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট। ইহার অভ্যন্তরে মাঈচম্পাবিবির কবর বিদ্যমান। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। মাঈচম্পার সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। অধিকাংশের মতে মাঈচম্পা বোগদাদের খলিফার কুমারী কন্যা। ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি এদেশে আগমন করেন। ভারতের নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচারের পর তিনি সুন্দরবন অঞ্চলে আগমন করেন এবং লাবসা গ্রামের নিকটবর্ত্তী নদী দিয়া যাইবার সময় তাঁহার নৌকা নিমজ্জিত হওয়ায় তিনি জীবনের অবশিষ্ট কাল এই স্থানেই অতিবাহিত করেন। তাঁহার অপূর্ব্ব ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য লোকে তাঁহাকে চম্পামাঈ বা মাঈচম্পা নামে অভিহিত করিত। কেহ কেহ বলেন যে "মাঈ" ও "চম্পা" এই দুইটি হিন্দুদের ব্যবহৃত শব্দ। বোগদাদের

খলিফা-কন্যার হিন্দু নাম "চম্পা" থাকা সম্ভবপর নহে। তাঁহারা বলেন যে চম্পাবতী বা চম্পা জনৈক হিন্দুরাজার কন্যা ছিলেন। তাঁহার পিতাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া জনৈক মুসলমান ফকির তাঁহাকে বিবাহ করেন। অল্পকাল পরে ফকিরের মৃত্যুর পর চম্পা সকল সময় ঈশ্বর আরাধনায় কালাতিপাত করিতেন বলিয়া তিনি "মাঈ চম্পা" আখ্যা লাভ করেন। অনুমিত হয়, মাঈ চম্পা ও লাউজানি বা ব্রাহ্মণ নগরের মুকুট-রায়ের কন্যা চম্পাবতী একই ব্যক্তি।

সাতক্ষীরা হইতে ৭ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে কপোতাক্ষী তীরে কুমিরা গ্রাম এক কালে বিদ্যাচর্চ্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল এবং নবদ্বীপের পরেই ইহার স্থান ছিল বলিয়া কথিত।

সাতক্ষীরা হইতে ১২ মাইল উত্তরে কলারোয়া থানার নিকটস্থ **নওপাড়া-মণিঘর** গ্রাম; ইহা গড়দানি নামেও অভিহিত। একটি মাটির গড়ের ভগ্নাবশেষ ও কতকগুলি পুরাতন পুষ্করিণী এখানে দৃষ্ট হয়; এগুলি তিয়র রাজার কীর্ত্তি বলিয়া কথিত। কিংবদন্তী, কোনও এক সময়ে জনৈক তিয়র জাতীয় ব্যক্তি যখন বিলে নৌকা করিয়া মাছ ধরিতে ছিলেন, তখন একজন সন্ন্যাসী তাঁহাকে বিলটি পার করিয়া দিতে বলেন। তিয়র সম্মত হইয়া সন্ন্যাসীকে লইয়া যখন বিলটি পার হইতেছিলেন, তখন দেখিলেন সন্ন্যাসীর ঝোলার স্পর্শে পাইয়া তাঁহার নৌকার একটি লৌহ পাটা সোণায় পরিণত হইল। তিয়র বুঝিলেন ঝোলার মধ্যে পরশ পাথর আছে এবং লোভে পড়িয়া পাথরটি কাড়িয়া লইয়া সন্ন্যাসীকে গভীর জলে ফেলিয়া দিলেন; জলে ডুবিবার সময়ে সন্ন্যাসী অভিসম্পাত করিলেন যে তিয়র সপরিবারে বিনষ্ট হইবেন। পরশ পাথরের গুণে তিয়রের বহু ধন-দৌলত হইল এবং তিনি রাজা বলিয়া পরিচিত হইলেন। তিনি একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং ১২৬টি পুষ্করিণী খনন করাইয়া ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই বাংলার নবাব তাহার ধনসম্পত্তি প্রাপ্তির কথা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিয়র ভাবিলেন হয়তো এরূপভাবে ধনপ্রাপ্তির জন্য নবাবের হাতে প্রাণ হারাইতে হইতে পারে এবং পাছে মহিলাদের সম্ভ্রম হানি হয় এই জন্য সঙ্গে করিয়া একজোড়া বার্ত্তাবাহী কপোত লইয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন যে তাঁহার অবস্থা শোচনীয় জানিলে এবং মৃত্যু নিশ্চিত বুঝিলে পায়রা দুইটি ছাড়িয়া দিবেন। তিয়র রাজাকে নবাব সসম্মানে ছাড়িয়া দিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে তিনি যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, পায়রা দুটি হঠাৎ ছাড়া পাইয়া যায়। ঘরে পায়রা ফিরিতে দেখিয়া তিয়র রাজার স্ত্রী ও সন্তানগণ একটি নৌকায় করিয়া বড় পুকুরের মধ্যস্থলে পৌঁছিয়া নৌকার তলদেশে ছিদ্র করিয়া ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তিয়র রাজা প্রাণপণ শক্তিতে ঘোড়া ছুটাইয়া ঘরে ফিরিয়া দেখিলেন সব শেষ হইয়া গিয়াছে, তখন তিনিও বড় পুকুরে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন; এইরূপে সন্ন্যাসীর অভিশাপ পূর্ণ হইল। এই বড় পুকুরটিকে লোকে এখনও দেখাইয়া থাকে। গ্রামের যে স্থানে গড়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে উহাকে দানা-মণিঘর বা 'ধনপোতার' দানা বলা হয়; লোকের বিশ্বাস উহার নীচে তিয়র রাজার ধনদৌলত প্রোথিত আছে।

ঈশ্বরীপুর—সাতক্ষীরা হইতে নৌকা-পথে প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণে যমুনা ও ইছামতী নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটে অবস্থিত ঈশ্বরীপুর বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক

স্মৃতিবিজড়িত স্থান। এই স্থানের পুরাতন নাম যশোহর এবং এখানেই প্রাচীন যশোর রাজ্যের রাজধানী ছিল। ভারতচন্দ্রের অমর কবিতায় যশোর নগর ও যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের নাম বাঙালীর নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

"যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
বরপুত্র ভবানীর খ্যাত হৈল পৃথিবীর
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাই আঁটে তায়
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
অযুত তুরঙ্গ সাথী ষোড়শ হলকাহাতী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"

ষোড়শ শতাব্দীতে (১৫৬৩-১৫৭২ খৃষ্টাব্দে) স্থলেমান করবানী যখন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন শিবানন্দগুহ নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহার প্রধান কানুনগো ছিলেন। এই শিবানন্দের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ স্থলেমানের পুত্র দায়ুদের সমবয়স্ক ও সহপাঠী ক্রীড়াসঙ্গী ছিলেন। রাজ্যলাভ করিবার পর দায়ুদ শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে রাজস্ব বিভাগে অতি উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়া উভয়কে যথাক্রমে রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্তরায় উপাধি প্রদান করেন; ইঁহারা দুজনে খুড়তুতো জাঠতুতো ভাই ছিলেন। বসন্তরায় সমগ্র বাংলা মুলুকের সম্পূর্ণ রাজস্বের হিসাব প্রস্তুত করিয়া গৌড় দরবারে খ্যাতি লাভ করেন। টোড়রমল্লের "আসল তুমার জমা" নামক বাংলার প্রসিদ্ধ রাজস্ব হিসাব বসন্তরায়ের হিসাবের সাহায্যে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া কথিত।

এই সময়ে সুন্দরবন অঞ্চল অনেকটা বেওয়ারিশ অবস্থায় পড়িয়াছিল। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় দায়ুদের নিকট হইতে উহা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া গভীর অরণ্য মধ্যে যমুনা নদীর তটে যশোহর নামে এক নগরের পত্তন করেন। অতঃপর রাজমহলের যুদ্ধে সম্রাট্ আক্‌বরের ফৌজের হস্তে পরাজিত হইয়া সুলতান দায়ুদখাঁ যখন সপ্তগ্রামে আশ্রয় গ্রহণের পর ওড়িষ্যার দিকে পলায়ন করেন, তখন তিনি তাঁহার বিপুল অর্থরাশি রাজা বিক্রমাদিত্য ও রাজা বসন্তরায়ের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া যান। দায়ুদের পতনের পর উভয় ভ্রাতা সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে যশোহর রাজ্যের সনদ প্রাপ্ত হন। গৌড় হইতে আনীত বিপুল ধনরাশির সাহায্যে সুন্দরবনের নব নির্ম্মিত শহরের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। প্রবাদ. গৌড়ের যশ হরণ করিয়া এই শহরের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় ইহার পুরাতন স্থানীয় নাম যশোর পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নামকরণ হয় "যশোহর"। এই নামকরণ বসন্তরায়ের বলিয়া কথিত। তাঁহার চেষ্টায় যশোহরে ও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এই সময়ে কালীঘাটে কালীমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়া একটি পর্ণকুটীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; বসন্তরায়ই মূর্ত্তির জন্য প্রথম পাকা মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

স্বনামখ্যাত প্রতাপাদিত্য রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র। তাঁহার জন্ম তারিখ ও স্থান লইয়া মতভেদ আছে। অনেকের অনুমান ১৫৬০।৬১ খৃষ্টাব্দে গৌড় নগরে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই প্রতাপ বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কথিত আছে যে প্রতাপের কোষ্ঠী গণিয়া জ্যোতিষীরা বলিয়াছিলেন যে তিনি পিতৃদ্রোহী হইবেন। এই জন্য রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে বিশেষ ভাল চোখে দেখিতেন না এবং সর্ব্বদাই দূরে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। যুবক প্রতাপকে তিনি আগ্রায় বাদশাহী দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। প্রতাপাদিত্য বাদশাহ আকবরের সুনজরে পড়িয়া যশোহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় পিতা ও পিতৃব্য বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যশোহর রাজ্যের সনদ নিজ নামে করিয়া লইয়া আসিলেন। এইরূপে কোষ্ঠীর ফল ফলিল বলিয়া কথিত।

বা যশোহরের ৮।১০ মাইল দক্ষিণে যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে ধূমঘাট নামক স্থানে এক নূতন নগরী স্থাপন করিয়া তথায় প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হইল। ধূমঘাটের ধ্বংসাবশেষ এক্ষণে তীরকাটি জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত। এই স্থানে নূতন রাজধানী ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার কারণ দক্ষিণের সমুদ্রপথ হইতে মগ ও পর্ত্তুগীজ আক্রমণ প্রতিহত করিবার সুবিধার জন্য বলিয়া অনুমিত হয়। ধূমঘাটের দুর্গ নির্ম্মাণের প্রধান ভার ছিল প্রতাপাদিত্যের বিশ্বস্ত পাঠান সেনানায়ক কমল খোজার উপর। কিছুদিনের মধ্যে ঈশ্বরীপুর হইতে ধূমঘাট পর্য্যন্ত সমস্ত অঞ্চলই যশোহর নামে পরিচিত হইল।

রাজদণ্ড গ্রহণ করিবার পর প্রতাপ বঙ্গোপসাগরের উপকূলভাগে মগ ও পর্ত্তুগীজ বা ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের অত্যাচার দমনে মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে এই জলদস্যুদের লুণ্ঠনে ও অত্যাচারে দক্ষিণবঙ্গ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা বহু স্ত্রী পুরুষ ধরিয়া লইয়া ক্রীতদাসরূপে নিয়োজিত করিত এবং ওলন্দাজ ফরাসী ও ইংরেজ বণিকের নিকট বিক্রয় করিত। স্থল হইতে বন্দীদিগকে ধরিয়া লইয়া হাতের তালু ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সরু বেত চালাইয়া হালি গাঁথিয়া তাহাদিগকে জাহাজের পাটাতনের নীচে বোঝাই দিয়া লইয়া যাইত। খাদ্যের জন্য সকাল বিকাল কাঁচা চাউল ছড়াইয়া দিত। ভাগীরথী হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তাহাদের এইরূপ উপদ্রব চলিত। পর্ত্তুগীজ বা ফিরিঙ্গী দস্যুগণ পূর্ব্বে হারমাদ নামে অভিহিত হইত, যথা, কবিকঙ্কন চণ্ডীতে "রাত্রিদিন বাহে ডিঙ্গা হারমাদের ডরে"। হারমাদ কথাটি পর্ত্তুগীজ শব্দ আর্মাডা (armada) বা নৌবহর হইতে উদ্ভূত। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই পর্ত্তুগীজগণকে প্রতক্কীচ কহিত। আলোয়ালের পদ্মাবতী কাব্যে প্রতক্কীচের উল্লেখ আছে। প্রতাপাদিত্য অচিরেই মগ ও হারমাদ দস্যুদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন। তাহাদের অনেকে তাঁহার সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল। চব্বিশ পরগণা, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার সমুদ্রতীরে স্থানে স্থানে এই সকল মগ ফিরিঙ্গীদিগের বংশধরের বাস আছে। সুন্দরবনে হরিণঘাটার মোহনায়, সমুদ্রতীরে, সন্দীপে, আদিনাথ ও কাকস্‌বাজারে বহু মগপল্লী আছে।

তৎকালে বাংলার দক্ষিণভাগে বা ভাটি অঞ্চলে "দ্বাদশ ভৌমিকের" প্রাধান্য ছিল। ইহাদিগকে লোকে "বার ভুঁইয়া" বলিত। শীঘ্রই প্রতাপ বারভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠ ভুঁইয়ারূপে

পরিচিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যবল ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং সেনাবাহিনীতে গোলন্দাজ, তীরন্দাজ, বরকন্দাজ, ঢালী, আসোয়ার (অশ্বারোহী), মল্ল প্রভৃতি নানা শ্রেণীভাগ ছিল। বাঙালী, পাঠান, পর্ত্তুগীজ, মগ, কুকী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় সৈনিক তাঁহার সেনাদলে ছিল। তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে মহাবীর কালিদাস রায়, বিজয়রাম ভঞ্জ, সূর্য্যকান্ত গুহ, সুখময় ঘোষ, কমল খোজা ও হায়দার মনক্লী প্রধান ছিলেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য বড় বড় নদীর মোহনায় তাঁহার অসংখ্য রণতরী সুসজ্জিত থাকিত এবং রাজ্যের নানাস্থানে তিনি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকটি প্রধান দুর্গ ছিল—ধূমঘাট দুর্গ, গড়কমলপুর, হায়দারগড়, সাগরদ্বীপ, বেদকাশী, জগদ্দল প্রভৃতি। ধূমঘাটের ৪।৫ মাইল উত্তরে জাহাজঘাটায় নৌ-বিভাগের প্রধান কেন্দ্র ছিল এবং পর্ত্তুগীজ জাতীয় ফ্রেডারিক ডুড্লি (Frederick Dudley) এই স্থানের সর্ব্বাধ্যক্ষ ছিলেন। জাহাজঘাটার ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। ইহার কিছু উত্তরে জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামতের জন্য কতকগুলি ডক্ (Dock) ছিল; ফ্রেডারিক্ ডুড্লির নামে এই স্থানটির নাম হইয়াছে দুধলি।

রাজ্যাভিষেকের কিছুকাল পরেই সম্ভবতঃ ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি একটি বৃহৎ কল্পতরু দানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন বলিয়া কথিত। যে যাহা চাহিয়াছিল তাহাকে তাহা দেওয়া হইয়াছিল। একটি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য রাজমহিষীকে প্রার্থনা করিয়া বসিলে প্রতাপ বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া সত্যপালনে প্রস্তুত হইলেন এবং মহিষী তাঁহার ইঙ্গিতে ব্রাহ্মণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। ব্রাহ্মণ অপ্রস্তুত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং মহিষীকে নিজ কন্যা সম্বোধন করিয়া মহারাজাকে পুনরায় দান করিলেন। পণ্ডিতগণের ব্যবস্থামত প্রতাপ মহিষীর ওজনে অর্থ ব্রাহ্মণকে দিয়া পত্নীকে পুনঃ গ্রহণ করিলেন।

প্রতাপাদিত্য বহু পণ্ডিতকে বৃত্তি দিতেন। তাঁহার সভাপণ্ডিতগণের মধ্যে তাঁহার গুরুদেব কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন, অবিলম্ব সরস্বতী ও কবি ডিম্ ডিম্ সরস্বতী সমধিক প্রসিদ্ধ। অবিলম্ব সরস্বতীর নাম হয় মুখে মুখে বিনাবিলম্বে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া। তৃতীয় ব্যক্তি প্রকাণ্ড দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু দ্রুত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন না বলিয়া নাম হয় ডিম্ ডিম্। ইতিমধ্যে প্রতাপের পিতা বিক্রমাদিত্যের পরলোক ঘটিয়াছিল। রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া মনোমালিন্যের ফলে প্রতাপ খুল্লতাত রাজা বসন্তরায়কে ও তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করেন; কেবল একটি পুত্র রাঘব কচুবনে লুকাইয়া রক্ষা পান; এজন্য পরে তিনি কচুরায় নামে পরিচিত হন। এই ঘটনা সম্বন্ধে প্রতাপের চরিতকারগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, যে রাজা বসন্তরায়ের পুত্রেরাই প্রতাপকে প্রথম আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং আত্মরক্ষার্থ প্রতাপ তাঁহাদিগকে ও রাজা বসন্তরায়কে হত্যা করিতে বাধ্য হন। আবার কাহারও কাহারও মতে রাজা বসন্তরায়ের হত্যাকাণ্ড প্রতাপের স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ। যাহা হউক, এই ঘটনার পর হইতেই প্রতাপের পতনের সূচনা হয়। কচুরায় পরে যশোহর-রাজবংশের জনৈক কর্ম্মচারী দুর্গাদাস নামক এক ব্যক্তির সহায়তায় আগ্রার বাদশাহের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতাপের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। বাদশাহের আজ্ঞায় প্রতাপের বিরুদ্ধে ফৌজ

প্রেরিত হয়। প্রবাদ, যে প্রতাপ ক্রমান্বয়ে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত ২২ জন বাদশাহী সেনাপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। লোকের বিশ্বাস রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যশোরেশ্বরীর অনুগ্রহেই তিনি এই সকল যুদ্ধ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কথিত আছে, একদিন সুরাপানে জ্ঞান হারাইয়া প্রতাপ যখন জনৈক অসহায়া রমণীর স্তনচ্ছেদনের আদেশ দিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবী যশোরেশ্বরী রাজকন্যার রূপ ধারণ করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হন। স্বীয় কন্যা জ্ঞানে প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে চিরদিনের জন্য রাজপুরী হইতে দূর হইয়া যাইতে বলেন। "তথাস্তু" বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হন। বিস্মিত প্রতাপাদিত্য তখন দেবী মন্দিরে গিয়া দেখিতে পান যশোরেশ্বরী যথার্থই বিমুখ হইয়াছেন; পাষাণ প্রতিমার মুখ দক্ষিণ হইতে পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। প্রবাদ, তদবধি দক্ষিণদিকের রাজ্য জঙ্গলময় হইয়া উঠে এবং পশ্চিমদিকের জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়া যায়।

প্রতাপের হস্তে উপর্য্যুপরি বাদশাহী ফৌজের পরাজয় ঘটিবার পরে মুঘল সেনাপতি রাজা মানসিংহ বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া বঙ্গে আগমন করেন। প্রথম যুদ্ধে তাঁহারও পরাজয় ঘটে এবং তিনি সুন্দরবন অঞ্চল হইতে হটিয়া আসিতে বাধ্য হন। অতঃপর বর্ষাকালে খাদ্যাদির অভাবে যখন তাঁহার সেনাগণ দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হয়, তখন যশোহর রাজের কর্ম্মচারী পূর্ব্বোক্ত দুর্গাদাস প্রতাপাদিত্যের দুর্গের জন্য সংগৃহীত রসদ মানসিংহকে অর্পণ করেন এবং এক গুপ্ত পথ দেখাইয়া মুঘল বাহিনীকে রাজধানীর সন্নিকটে আনয়ন করেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপ সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং মুঘলের সামন্ত রাজা হইতে স্বীকৃত হন। বসন্তরায়ের পুত্র কচু বা রাঘবরায় পিতৃসম্পত্তি ফিরিয়া পান। আকবরের মৃত্যুর পর সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে ইসলামখাঁ বাংলার নবাব হইয়া রাজমহলে আসেন। ইনি পরে ঢাকা নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তথায় তাঁহার দুর্গ ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রতাপাদিত্য সামন্ত রাজা হইলেও সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে ছিলেন না। তাঁহাকে দমন করিবার জন্য ইসলামখাঁর ব্যবস্থায় সেনাপতি এনায়েৎখাঁ বিপুল মুঘলবাহিনী লইয়া যশোহর রাজ্য আক্রমণ করেন। প্রতাপাদিত্যের নৌ-বাহিনী এই যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং সেনাপতি কমল খোজা নিহত হন। সঙ্গে সঙ্গে গুজব রটিল, যশোরেশ্বরী দেবী চলিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, আরও কিছুদিন যুদ্ধ করিয়া জয়ের আশা নাই দেখিয়া প্রতাপাদিত্য এনায়েৎ খাঁর শিবিরে গিয়া আত্মসমর্পণ করেন; আশা করিয়াছিলেন এবারেও পূর্ব্বের ন্যায় সন্ধি স্থাপিত হইবে। এনায়েৎখাঁ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করেন এবং ঢাকায় প্রেরণ করেন। ইসলামখাঁ কিন্তু তাঁহাকে শৃঙ্খলিত ও বন্দী করেন। তাঁহার বন্দী হওয়ার খবর শুনিয়া ধূমঘাট হতাশায় মুহ্যমান হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে গ্রামবাসী নরনারীর উপর মুঘল সৈন্যগণের অত্যাচারের জন্য রাজকুমার উদয়াদিত্য শত্রুপক্ষকে পুনরায় আক্রমণ করেন এবং ঈশ্বরীপুরের নিকটস্থ নকীপুরের উত্তরে বিস্তৃত কুশলীর মাঠে শেষযুদ্ধে বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করেন। এই সংবাদে রাজমহিষী শরৎকুমারী অন্যান্য স্ত্রীপরিবার ও শিশু সন্তান সহ গুপ্ত পথে নৌকা বাহিয়া দুর্গের বাহিরে যাইয়া নৌকার তলদেশে ছিদ্র করিয়া জলে ডুবিয়া জীবনাহুতি দেন। ধূমঘাট দুর্গের উত্তর পশ্চিম কোণে সেই স্থান এখনও "শরৎখানার দহ" নামে পরিচিত। এদিকে প্রতাপাদিত্য ঢাকায় কিছুদিন

বন্দী অবস্থায় থাকিয়া লৌহ পিঞ্জরে নৌকাযোগে আগ্রায় প্রেরিত হন। পথিমধ্যে বারাণসীতে ৫০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে যে, যে চৌষট্টি যোগিনীর ঘাট তিনি একবার বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন এবং যাহার উপর কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, গঙ্গাস্নান করিবার অনুমতি পাইলে, সেই ঘাটে স্নানের সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ বলেন বারাণসীতে অঙ্গুরীয়কে লুক্কায়িত বিষপানে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

প্রতাপের পতনের পর সম্রাট জাহাঙ্গীর কচুরায়কে "যশোরজিৎ" উপাধি দিয়া যশোর রাজ্যের সনদ প্রদান করেন। অসময়ে উপকারকারী দুর্গাদাস কচুরায়ের সুপারিশে বাদশাহের নিকট হইতে কয়েকটি পরগণা ও ভবানন্দ মজুমদার উপাধি লাভ করেন। ইনিই নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রাচীন যশোহর রাজ্যের রাজধানী ঈশ্বরীপুর এখন ধ্বংসস্তূপ ও কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন দুর্গের মৃৎপ্রাকার, হামামখানা, বারদুয়ারী প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, প্রতাপাদিত্যের মুসলমান কর্ম্মচারিবৃন্দের উপাসনার স্থান টেঙ্গা মসজিদ নামক একটি পুরাতন বৃহৎ মসজিদ এবং যশোরেশ্বরী দেবীর বিগ্রহ অতীত দিনের স্মৃতি বহন করিতেছে। অনেকের মতে কষ্টি পাথরের এই কালী মূর্ত্তিতে এরূপ ভীষণভাব প্রতিফলিত হইয়াছে, যাহা সম্বলপুরের সম্বলেশ্বরী মন্দিরের শনিমূর্ত্তিতে ভিন্ন অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। কাহারও মতে যশোরেশ্বরীর আদি মূর্ত্তি মহারাজ মানসিংহ অম্বরে লইয়া যান এবং পরে কচুরায় এখানে নূতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু অধিকাংশের মতে ইহাই প্রাচীন মূর্ত্তি এবং মহারাজ মানসিংহ শ্রীপুর হইতে চাঁদরায় কেদার রায়ের শীলাময়ী দেবীকে অম্বরে লইয়া যান। যশোরেশ্বরীর আবির্ভাব সম্বন্ধে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যে ধূমঘাটে যখন প্রতাপাদিত্যের নূতন রাজধানী ও গড় হইতে ছিল, তখন তাঁহার প্রধান সেনানায়ক কমল খোজা নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধানে থাকা কালীন গভীর অন্ধকার রাত্রে দক্ষিণের অরণ্য মধ্যে এক স্থানে এক অগ্নি শিখা জ্বলিতে দেখিতেন। প্রতাপাদিত্য এই খবর পাইলে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ইহার উৎপত্তির কারণ সন্ধান করিবার হুকুম করেন। অগ্নি শিখার দিক্ লক্ষ্য করিয়া গভীর জঙ্গল পরিষ্কার করিলে পুরাতন একটি ধ্বংস-স্তূপ বাহির হয় এবং ইহার নীচ হইতে যশোরেশ্বরীর প্রস্তর মূর্ত্তি পাওয়া যায়। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া স্থির করিলেন, ইহা একান্ন পীঠের অন্যতম যশোরের পীঠ দেবতা; এই স্থানে দেবীর পাণিপদ্ম পতিত হইয়াছিল। সাড়ম্বরে নূতন মন্দিরে দেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল। চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, প্রতাপের সাহায্যার্থ ভবানী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়াছেন। কবি ভারতচন্দ্র তাই প্রতাপের বিষয়ে লিখিয়াছেন "বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর।" প্রবাদ দেবীর মূর্ত্তি জ্বালাময়ী বলিয়া মন্দিরে ছাদ থাকিত না, জ্বালা বাহির হইবার জন্য ফাটিয়া যাইত; সেই জন্য মন্দিরের ছাদে চিমনীর মত ফাঁক রাখা হইয়াছে। কবিরাম রচিত "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক পুরাতন পুস্তকে লিখিত আছে যে পুরাকালে অনরি নামক এক ব্রাহ্মণ দেবীর জন্য একশত দ্বার-যুক্ত একটি প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার পর ধেনুকর্ণ নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজা জীর্ণ মন্দিরের বদলে নূতন আর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। যশোরেশ্বরী মন্দির মধ্যে একটি অপরূপ সুন্দর পাথরের গণ্ডা মূর্ত্তি অন্নপূর্ণা রূপে পূজিত হইতেছে। যশোরেশ্বরীর ভৈরবের নাম চণ্ড ভৈরব।

প্রতাপাদিত্য চণ্ড ভৈরবের জন্য যে ত্রিকোণ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। চণ্ড ভৈরব এখন যশোরেশ্বরীর মন্দিরের মধ্যে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। কথিত আছে, চণ্ড ভৈরবের জন্য মহারাজ লক্ষ্মণ সেন একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। টেঙ্গা মস্‌জিদের নিকটেই জঙ্গলাকীর্ণ একটি পরিত্যক্ত মন্দির দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, মহারাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিবার পর এই মন্দিরে শিব স্থাপন করিয়াছিলেন।

চণ্ড ভৈরবের মন্দির, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে

টেঙ্গা মসজিদ হইতে উত্তর দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইলে ঈশ্বরীপুরের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে ইছামতী নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে একটি ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে ৪০টি পূর্ব্ব পশ্চিমে শায়িত কবর আছে। মুসলমানগণের কবর উত্তর দক্ষিণে শায়িত হয়, সেজন্য এগুলি খৃষ্টানদিগের কবর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই স্থানটি বাংলাদেশের সর্ব্বপ্রথম গীর্জার ধ্বংসাবশেষ। প্রতাপাদিত্যের অনুমতি পাইয়া জেসুইট সম্প্রদায় ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে এই গীর্জা প্রতিষ্ঠা করিয়া যীশুর গীর্জা নাম করণ করেন। এই বৎসরই ব্যাণ্ডেলের ও চট্টগ্রামের গীর্জা নির্ম্মিত হয়। স্পেনদেশীয় জেসুইট ভ্রমণকারী ডুজারিকের (Pierre Du Jarric) বিবরণ হইতে জানা যায় যে ঈশ্বরীপুরের গীর্জাই বাংলার প্রথম, চট্টগ্রামেরটি দ্বিতীয় এবং ব্যাণ্ডেলেরটি তৃতীয়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী তারিখে গীর্জা প্রতিষ্ঠার উৎসবে প্রতাপাদিত্য যোগ দিয়াছিলেন। এ গীর্জা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই; সন্দ্বীপ লইয়া আরাকানী ও পর্ত্তুগীজদিগের বিরোধের জন্য যে গোলমাল উপস্থিত হয় তাহার ফলে ঈশ্বরীপুরের পাদরীগণ পলাইতে বাধ্য হন এবং গীর্জাটি খৃষ্টানদিগের শত্রুগণ কর্ত্তৃক অগ্নিদগ্ধ হয়।

ঈশ্বরীপুর হইতে ৩ মাইল দূরে গোপালপুর গ্রামে প্রতাপাদিত্য ৪টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত; ইহাদের ৩টি একেবারে পড়িয়া গিয়াছে এবং চতুর্থটির নীচের তলা কিছু দাঁড়াইয়া আছে; এই মন্দিরের উপর তলায় প্রতাপাদিত্য পুরী হইতে অতি সুন্দর গোবিন্দ বিগ্রহ আনিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন। বল্লভাচার্য্য নামক একজন ওড়িয়া ব্রাহ্মণকে এই বিগ্রহের সেবার জন্য তিনি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। বিগ্রহটি এখন ঈশ্বরীপুর হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে কাটুনিয়া গ্রামে আছে। এই গ্রামে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বংশীয় কয়েক ঘরের বাস আছে। এখানকার দোল উৎসব সমগ্র খুলনা জেলায় বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ঈশ্বরীপুর হইতে কয়েক মাইল উত্তর-পশ্চিমে ধামাইল বা ডামরেলী পরগণার অন্তর্গত মুস্তাফাপুর গ্রামে একটি বিরাট নবরত্ন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে; ইহার নয়টি চূড়াই পড়িয়া গিয়াছে, ইহা ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত। ইহার মধ্যে কোনও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহা সমাজ মন্দির রূপে সমাজপতিগণের মিলন ও আলোচনার জন্য নির্ম্মিত হয়। রাজা বিক্রমাদিত্য সমাজ ব্যবস্থার জন্য নয় জনকে নিযুক্ত করিয়া উজ্জয়িনীর মহারাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় তাঁহাদের নবরত্ন নাম দেন এবং তাঁহাদের মিলনকেন্দ্র বলিয়া মন্দিরটির নাম হয় নবরত্ন মন্দির।

গোবরডাঙ্গার নিকটস্থ ইছাপুরে নবরত্ন মন্দির ব্যতীত যশোহর খুলনায় এত বড় মন্দির আর কোথাও নাই। সৌন্দর্য্যে ও কারুকার্য্যে মন্দিরটি অপূর্ব্ব এবং দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ কান্তজীর মন্দিরের কথা মনে করাইয়া দেয়। গর্ভ মন্দিরের পশ্চিম ও দক্ষিণ-গাত্রে দশ অবতার, যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি নানারূপ চিত্র অঙ্কিত।

১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ জেস্যুইট পাদরী ফ্রানসিস্ ফারনান্‌ডেজ, ডোমিনিক ডিজোসা, মেলকিওর ফনসেকা ও এন্‌ড্রু বাউয়েস প্রথম বঙ্গে আসেন। ফরনানডেজ ও ফনসেকার চিঠিপত্রে যে চ্যাণ্ডিকানের রাজার কথা আছে, তিনি প্রতাপাদিত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইঁহাদের চিঠিপত্র প্রভৃতি হইতে ডুজারিক যে ইতিহাস প্রণয়ন করেন তাহাতে প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে জেস্যুইটগণের গীর্জ্জা প্রতিষ্ঠার কথা আছে; ইহা আগে বলা হইয়াছে। চ্যাণ্ডিকানের অবস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে ধূমঘাট এবং নিকটবর্ত্তী স্থানই এই চ্যাণ্ডিকান। প্রতাপাদিত্যের পিতা মহারাজ বিক্রমাদিত্য গৌড়েশ্বর দাউদের নিকট হইতে সুন্দরবনে যে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া ইতিহাস বিশ্রুত যশোহর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তাহার নাম চাঁদ খাঁ চক। এই চাঁদ খাঁ শব্দের বৈদেশিক বিকৃতি চ্যাণ্ডিকান বলিয়া অনুমিত হয়। প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের প্রায় প্রারম্ভেই জেস্যুইট পাদরীগণ তাঁহার নিকট আসেন; সুতরাং তখনও পুরাতন নাম চাঁদ খাঁ টিকিয়া থাকিবারই কথা; নূতন নাম যশোহর একেবারে ইহাকে চাপা দিতে পারে নাই।

প্রতাপাদিত্যের সময় রাজধানী ঈশ্বরীপুরকে কাশী বলা হইত; রাজধানীর শহরতলী প্রভৃতি পূর্ব্বদিকে কপোতাক্ষী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উপরে বর্ণিত গোপালপুরে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে, উহাকে মণিকর্ণিকা বলা হইত। কাশীর অপর পারে স্থিত

ব্যাসকাশী বা বেদকাশীর অনুকরণে কপোতাক্ষীর অপর পারকে বেদকাশী বলা হইত। এখানে যে সকল মন্দির ছিল তাহার অবশেষ একমাত্র ৬।৭টি অতি চমৎকার প্রস্তর স্তম্ভ বর্ত্তমান। এখানে "কালী খালাস খাঁ" নামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে, ইহা দৈর্ঘ্যে ১,০০০ ফুটের উপর, প্রস্থে ৬০০ ফুট। বেদকাশী ঈশ্বরীপুর হইতে পূর্ব্বদিকে ১২।১৪ মাইল হইবে এবং সুন্দরবনের ২১১ নং লাটে অবস্থিত। এই স্থানে প্রতাপাদিত্যের একটি দুর্গ ছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকের নিকট ইহা "বড়বাড়ী" নামে পরিচিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ২২৫০ ফুট ও প্রস্থে ১২০০ ফুট।

কালিয়া—খুলনা-বোয়ালমারি কিংবা খুলনা-মাদারীপুর স্টীমার পথে খুলনা হইতে প্রায় ১৮ মাইল দূরে নড়াইল মহকুমার প্রসিদ্ধ বৈদ্য-প্রধান গ্রাম কালিয়া। কথিত আছে মগ ও বর্গীর অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটি দুর্গম জলাভূমির মধ্যে গ্রামটি স্থাপিত হয়।

মহম্মদপুর—খুলনা-বোয়ালমারি স্টীমার পথে খুলনা হইতে নদী পথে প্রায় ৬৫ মাইল দূরে মধুমতী নদীর তটে যশোহর জেলায় মাগুরা মহকুমায় অবস্থিত মহম্মদপুর যশোহর জেলার একটি গৌরবের স্থান। পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের কালুখালি-ভাটিয়াপাড়াঘাট শাখা লাইনের বোয়ালমারি বাজার নামক স্টেশনে নামিয়াও এই স্থানে যাওয়া যায়। বোয়ালমারি বাজার হইতে এই স্থান ৬।৭ মাইল পশ্চিমে। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের "সীতারাম" নামক উপন্যাসের সহিত শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই পরিচিত। এই মহম্মদপুরে রাজা সীতারাম রায়ের রাজধানী ছিল। সীতারামের আদি নিবাস ছিল বীরভূম জেলায়। জাতিতে তিনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার পিতা উদয়নারায়ণ প্রথমে রাজ-মহলে নবাব সরকারে কার্য্য করিতেন, পরে ভূষণা পরগণায় তহশীলদার পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। তাঁহার পত্নীর নাম দয়াময়ী। কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত মহীপতি গ্রামে দয়াময়ীর পিত্রালয়ে অনুমান ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সীতারামের জন্ম হয়। উদয়নারায়ণ ক্রমে একটি ক্ষুদ্র তালুক ক্রয় করেন এবং মধুমতী নদীর অপর পারে হরিহর নগরে বাস করিতে থাকেন। হরিহর নগরে এখনও সীতারামের ভ্রাতা লক্ষ্মী নারায়ণের বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন। সীতারামের মাতা দয়াময়ী তেজস্বিনী নারী ছিলেন। কথিত আছে অল্প বয়সে একটি খড়্গের সাহায্যে এক দল ডাকাতকে তিনি পরাস্ত করিয়াছিলেন। মহম্মদপুরে আজও "দয়াময়ী তলা" নামে একটি স্থান দৃষ্ট হয়; এই স্থানে সীতারামের সময়ে বারোয়ারী উৎসব হইত। সীতারামের অভ্যুদয় সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বাংলার তদানীন্তন ভৌমিক রাজগণ যথা সময়ে রাজকর না দেওয়ায় দিল্লীর বাদশাহ সীতারামকে তাঁহাদের নিকট হইতে বাকী রাজকর আদায়ের জন্য সৈন্য সামন্তসহ প্রেরণ করেন। সীতারাম আসিয়া তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করেন এবং পরে বাদশাহের সহিত বিবাদের ফলে তাঁহার পতন ঘটে। মতান্তরে সীতারাম ভূষণা পরগণার অন্তর্গত মধুমতীর পূর্ব্বপারস্থিত হরিহরনগর নামক একটি ক্ষুদ্র তালুকের অধিপতি ছিলেন। বর্ত্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী শ্যামনগর নামক গ্রামেও তাঁহার কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল। প্রবাদ, একদিন এই স্থান দিয়া অশ্বারোহণে যাইবার সময় সীতারামের অশ্বের

পদ মৃত্তিকার মধ্যে আটকাইয়া যায়। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অশ্ব পদ তুলিতে অসমর্থ হইলে সীতারাম লোকজন ডাকাইয়া এই স্থান খনন করাইয়া দেখিতে পান যে মৃত্তিকা নিম্নস্থ একটি মন্দির-চূড়ার চক্রে তাঁহার অশ্বের পদ আটকাইয়া গিয়াছে। মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে ক্রমশঃ একটি দেবমন্দির ও তন্মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণের বিগ্রহ আবিষ্কৃত হইল। ইহাকে বিশেষ শুভ লক্ষণ মনে করিয়া সীতারাম এই স্থানেই স্বীয় বাসভবন নির্ম্মাণ করিলেন এবং আরও বহু লোকজনকে আনাইয়া এই স্থানে বসবাস করাইলেন। এইরূপে রাজধানী মহম্মদপুরের সৃষ্টি হইল। প্রবাদ, মহম্মদ শাহ নামক স্থানীয় এক ফকিরের নাম হইতে মহম্মদপুর নাম হইয়াছে। অচিরেই সীতারামের প্রভাবে সমগ্র ভূষণা তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল এবং বহু দস্যুসর্দ্দার তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দলবলসহ তাঁহার সেনাবাহিনীতে যোগদান করিল। সীতারাম স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই ভূষণার ফৌজদার মীর আবু তোরাপের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতীর হস্তে আবু তোরাপ নিহত হইলেন। মেনাহাতীর প্রকৃত নাম রামরূপ (মতান্তরে মৃন্ময়) ঘোষ। ইনি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। বিরাট কলেবর ও বিপুল শক্তির জন্য ইনি "মেনাহাতী" আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। মেনাহাতীর অর্থ ছোটখাট স্ত্রী হস্তী, তাঁহাকে একটি ছোটখাট হাতী বলিয়াই মনে হইত। আবু তোরাপের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ মেনাহাতী ও সীতারামকে দমন করিবার জন্য বক্স আলিখাঁ ও দিঘাপতিয়ার দয়ারাম রায়ের নেতৃত্বে বহু সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করিলেন। জনশ্রুতি যে মহাবীর মেনাহাতী অক্ষয় কবচের অধিকারী ছিলেন; কোনরূপ অস্ত্র দ্বারা তাঁহার দেহ বিদ্ধ হইত না। একদিন দোল মঞ্চের নিকট দিয়া যাইবার সময় সীতারামের জনৈক বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীর পরামর্শ মত শত্রুসৈন্য তাঁহাকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়া ফেলিল। সাত দিন পর্য্যন্ত তাহাদের হস্তে নিদারুণ নির্য্যাতন ভোগ করিবার পর আর সহ্য করিতে না পারিয়া মহাবীর মেনাহাতী স্বীয় অক্ষয় কবচ পরিত্যাগ করেন এবং মৃত্যুকে বরণ করিয়া লন। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে, যে তাঁহার মৃতদেহ হইতে মস্তকটি কাটিয়া লইয়া মুর্শিদাবাদে পাঠান হয়। মানুষের মাথা যে এত বড় হইতে পারে তাহা দেখিয়া নবাব মুর্শিদকুলী বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং বলেন যে এরূপ মহাবীরকে হত্যা করা কোন মতেই উচিত হয় নাই, নবাব মাথাটি সসম্ভ্রমে মহম্মদপুরে ফিরাইয়া দিলেন। ইতিমধ্যে সেনাপতির মস্তকহীন দেহ যথারীতি সৎকার করিয়া অস্থি সমাহিত করা হয়; মস্তকটিও তথায় সমাহিত করিয়া সীতারাম একটি উচ্চ সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মহম্মদপুরের কাষ্ঠঘর পাড়া হইতে ভূষণার দিকে যে রাস্তাটি গিয়াছে উহারই উপর মেনাহাতীর সমাধিস্তম্ভ ছিল; এখন ইহার চিহ্নও নাই। মেনাহাতীর মৃত্যুর পর সীতারামের পতন ঘটে। যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া তিনি মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন। কথিত আছে, দয়ারাম রায় বিজয়-চিহ্ন হিসাবে সীতারামের সুন্দর বিগ্রহ দিঘাপতিয়ায় লইয়া যান। দিঘাপতিয়া রাজবাটীতে এই মূর্ত্তি এখনও পূজিত হয়; ইহার পাদদেশে খোদিত আছে "দয়ারাম বাহাদুর"। দয়ারাম রায়ই সঙ্গে করিয়া সীতারামকে মুর্শিদাবাদ লইয়া যান। পথিমধ্যে দিঘাপতিয়ায় যাইবার সময়ে তাঁহাকে নাটোর রা কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিয়া যান; সেই কক্ষ এখনও লোকে দেখাইয়া থাকে

মুর্শিদাবাদে কয়েক-মাস বন্দী থাকিবার পর তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন, কেহ কেহ বলেন তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করেন। মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইয়াছিল।

মহম্মদপুরে সীতারামের বহু কীর্ত্তি আজিও বিদ্যমান আছে। উহাদের মধ্যে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, রামসাগর, সুখসাগর ও কৃষ্ণসাগর নামক দীঘি, দোলমঞ্চ ও রাজভবনের ধ্বংসাবশেষ, সিংহদরওয়জা, মালখানা, তোষাখানা, দশভুজা মন্দির, লক্ষ্মী-নারায়ণের অষ্টকোণ মন্দির, কৃষ্ণজীর মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মহম্মদপুরের দুর্গটি প্রায় সমচতুষ্কোণ; ইহার প্রধান প্রবেশদ্বার পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। অতীতে এই দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ খাত দিয়া মধুমতীর স্রোত প্রবাহিত হইত। সীতারামের দুইটি প্রধান বড় কামানের নামকরণ হইয়াছিল কালে খাঁ ও ঝুম ঝুম খাঁ। রামসাগর দীঘিটি দৈর্ঘ্যে প্রায়

সীতারামের দোলমঞ্চ, মহম্মদপুর [প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে]

১৫০০ ফুট ও প্রস্থে ৬০০ ফুট। ইহার জল এখনও বেশ নির্ম্মল ও ব্যবহারোপযোগী আছে। সুখসাগরের মধ্যে একটি দ্বীপ আছে। কৃষ্ণসাগর দীঘিটি মহম্মদপুর দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে কানাই নগর গ্রামে অবস্থিত। এই দীঘিটির আয়তন ১০০০ ফুট × ৩০০ ফুট। এই গ্রামে সীতারাম রায়ের প্রতিষ্ঠিত হরে-কৃষ্ণ বিগ্রহের একটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। মন্দিরটি অতি সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট, ইহাই সীতারামের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ মন্দির। মন্দির গাত্রে কৃষ্ণ বলরাম ও নানা দেব-দেবীর ছবি সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে চিত্রিত আছে। পূর্ব্ব দিকের মন্দির গাত্রের কারুকার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। গর্ভগৃহে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; এই জন্য স্থানটির নাম হইয়াছিল কানাই নগর বা যদুপতি নগর। এখানে অষ্টপ্রহর হরিনাম কীর্ত্তন হইত। এ অঞ্চলে এখনও

কোনও কিছু না থামিয়া এক ভাবে হইতে থাকিলে "কানাই বাড়ীর কীর্ত্তনের" সহিত তাহার তুলনা করা হয়। সীতারামের পতনের পর ভূষণারাজ্য নাটোর রাজবংশের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। নাটোর রাজ কর্ত্তৃক ১৮০০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামচন্দ্রজী ও শিবের মন্দির মহম্মদপুরের অন্যতম দ্রষ্টব্য।

মহম্মদপুর এখন একটি বিরল-বসতি পল্লীগ্রাম মাত্র। ইহার সমৃদ্ধির সময়ে মধুমতী নদী এই স্থানের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত ছিল। বর্ত্তমানে নদী প্রায় দুই মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে এক ভীষণ মহামারীর ফলে মহম্মদপুর একেবারে বিধস্ত হইয়া যায় এবং তাহার পর হইতে ক্রমশঃ ইহা একটি নগণ্য গণ্ডগ্রামে পরিণত হয়। মহম্মদপুরের নিকটস্থ সূর্য্যকুণ্ড গ্রামে সীতারামের বংশের তাঁহার একমাত্র প্রপৌত্র রাধাকান্তের দৌহিত্র বংশের বাস আছে।

বাগের হাটের খান্‌জাহান আলির মত সীতারামেরও একদল বেলদার সৈন্য ছিল। কথিত আছে সংখ্যায় ইহারা ২,২০০ ছিল এবং যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময়ে জলাশয় খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট দূর করাই তাহাদের কাজ ছিল। কথিত আছে, সীতারাম প্রতিদিন নবখনিত জলাশয়ের জলে স্নান করিতেন এবং এই জন্য প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থান হইতে রাজধানীতে জল আনা হইত। এইরূপে তিনি বহু পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

সীতারামের সৈন্যদলে বহু মুসলমান ছিলেন। কথিত আছে, তিনি মুসলমান সেনাপতিদিগকে ভাই বলিয়া ডাকিতেন এবং হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য সতত চেষ্টিত ছিলেন। গ্রাম্য কবিদের গানে ও গাথায় ইহার প্রমাণ আজও পাওয়া যায়। যদুনাথ ভট্টাচার্য্য কৃত "সীতারাম রায়" নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত কবিতাটি উদ্ধৃত হইল;—

"শুন সবে ভক্তিভাবে করি নিবেদন।
দেশ গায়েতে যা হইল শুন দিয়া মন॥
রাজাদেশে হিন্দু বলে মুসলমানে ভাই।
কাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই॥
হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাশন মুসলমানে খায়।
মুসলমানের রস পাটালী হিন্দুর বাড়ী যায়॥
রাজা বলে আল্লা হরি নহে দুই জন।
ভজন পূজন যেমন ইচ্ছা করুক্‌গে তেমন॥
মিলে মিশে থাকা সুখ, তাতে বাড়ে বল।
ডরেতে পলায় মগ ফিরিঙ্গীরা খল॥
চুলে ধরে নারী ল'য়ে চড়তে নারে নায়।
সীতারামের নাম শুনিয়া পলাইয়া যায়॥"

মহম্মদপুর হইতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে এবং কালুখালি-ভাটিয়াপাড়া শাখা লাইনের ভাটিয়াপাড়া স্টেশনের প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে নবগঙ্গা নদীর তীরে **রায়গ্রামে** মেনাহাতীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামশঙ্কর নারায়ণ বিগ্রহের জন্য একটি অতি সুন্দর জোড় বাংলা

মন্দির এবং একটি সুন্দর শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শিব মন্দিরে যে শ্লোক উৎকীর্ণ আছে তাহা হইতে জানা যায় যে মেনাহাতীর মৃত্যুর ১০ বৎসর পরে মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। মন্দির দুটি এখনও বিদ্যমান। রায়গ্রামে রামশঙ্করের বংশীয়গণের বাস আছে।

মহম্মদপুর হইতে প্রায় ৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে নবগঙ্গার পশ্চিমকূলে **সত্রাজিৎপুর** একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। খুলনা হইতে মাগুরা পর্য্যন্ত যে দৈনিক স্টীমার সার্ভিস্ আছে, তাহার উপর সত্রাজিৎপুর একটি স্টীমার স্টেশন। শত্রুজিৎ বা সত্রাজিৎ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি বারভূঁইয়ার অন্যতম ভূষণাধিপতি মুকুন্দরাম রায়ের পুত্র। ইনি মুঘলদিগের অধীনতা স্বীকার করিলেও সুবিধা পাইলেই নিজ ক্ষমতা বাড়াইতে চেষ্টা করিতেন। নবাব ইস্‌লাম খাঁর সাহায্যে ইনি প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। ইনিই ভূষণা হইতে উঠিয়া আসিয়া যশোহর জেলায় নবগঙ্গাতীরে সত্রাজিৎপুরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথাকার প্রসিদ্ধ সিংহবংশের ইনি আদি পুরুষ। সত্রাজিৎ মুঘল নবাবদিগকে নানারূপে উত্যক্ত করিয়াছিলেন। কোচবিহার ও কোচহাজোর রাজাদিগের সহিত মুঘলদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। অবশেষে সম্রাট সাজাহানের সময় ধৃত হইয়া ঢাকায় আন্দাজ ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার মৃত্যুতে সত্রাজিৎপুরের রাজ-গৌরব ও স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।

মাদারীপুর—খুলনা হইতে প্রতিদিন প্রসিদ্ধ কুমার-মধুখালী-বিল পথে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ হইয়া মাদারীপুর পর্য্যন্ত স্টীমার যাতায়াত করে। ইহা প্রায় ১৭ ঘণ্টার পথ। মাদারীপুর ফরিদপুর জেলার একটি সদর মহকুমা। বলিতে গেলে এই জেলায় শুধু ফরিদপুর ও মাদারীপুরই শহর পদবাচ্য। একদিকে আড়িয়ল খাঁ ও অন্য দিকে কুমার নদ থাকায় শহরটির দৃশ্য অতীব মনোরম। কথিত আছে, শাহ মাদার নামে জনৈক ফকীর এই স্থানে বাস করিতেন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে মাদারীপুর। শাহ মাদারের দরগাহ্ ও সমাধি শহরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ইঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। স্থানীয় বণিক্‌গণ সন্ধ্যাদীপ জ্বালিবার সময়ে ভক্তিভরে তাঁহার নাম লইয়া থাকেন।

অবস্থানের বৈশিষ্ট্যের জন্য মাদারীপুর একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। পাটের কারবারের জন্য দেশী বিদেশী বহু ব্যবসায়ী এখানে এবং পার্শ্বস্থ চরমুগরিয়াতে অবস্থান করেন এবং চারিদিকে পাটের গুদাম দৃষ্ট হয়।

আড়িয়লখাঁর ভাঙ্গনে মাদারীপুর বহুবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এক শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে, ব্রহ্মপুত্রের গঙ্গায় বা পদ্মায় মিলিত হইবার আগে আড়িয়লখাঁর খাত দিয়াই পদ্মা দক্ষিণে সমুদ্রে গিয়া পড়িত। এখন পদ্মা এ খাত ছাড়িয়া পূর্ব্বদিকে সরিয়া গিয়াছে।

কবি নবীনচন্দ্র সেন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মাদারীপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আগমন করেন। তাঁহার রঙ্গমতী কাব্য এই স্থানেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

মাদারীপুরের ঠিক দক্ষিণেই ঘাটমাঝি গ্রাম। বহুকাল পূর্ব্বে মেঘা মিঞা নামে এখানে এক জমিদার ছিলেন; তাঁহার কর্ম্মচারী রতিরাম তাঁহারই জমিদারীতে একটি তালুক ক্রয় করিলে দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। জমিদার রতিরামের তালুক লুণ্ঠন

করিতে আসিলে গুরুতর দাঙ্গা বাধিয়া যায়; মেঘা মিঞা তাহাতে নিহত হন এবং রতিরাম মেঘা মিঞার জমিদারীর বহু স্থানে লুণ্ঠন করেন। এই ঘটনার কথা স্থানীয় লোক এখনও ভুলিয়া যান নাই; তাঁহারা ইহা স্মরণ করিয়া বলিয়া থাকেন—

মেঘা মিঞা চেগা হইল বিধি হইল বাম।
ঘাটমাঝি লুটিয়া নিল বুড়া রতিরাম॥

বরিশাল হইতে আড়িয়লখাঁর পথে মাদারীপুর হইয়া পালং নদী ও নরিয়া খাল দিয়া পদ্মার কূলে অবস্থিত ফরিদপুর জেলার তারপাশা পর্য্যন্ত দৈনিক স্টীমার যাতায়াত করে। মাদারীপুর হইতে তারপাশার পথে ফরিদপুর জেলার কয়েকটি প্রসিদ্ধ স্থান পড়ে। মাদারীপুর হইতে নয় ঘণ্টার রাস্তা **পালং** একটি ছোটখাট শহর হইয়া উঠিয়াছে। এখানে থানা, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে। পালংএর দেড় মাইল উত্তর-পূর্ব্বে **কুরাশী** গ্রামে অনেকগুলি পুরাতন পুকুর, মঠ ও শিব মন্দির দৃষ্ট হয়। কিংবদন্তী যে এই গুলির প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায় এক কোটী শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থানটিকে কাশীর সমান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু কোটি পূর্ণ হইবার সময় একটি শিব অন্তর্হিত হইয়া যান। কোটী শিব পূর্ণ হইল না বলিয়া ইহা কাশীর সমকক্ষ হইল না, সে জন্য নাকি ইহা কুরাশী নামে অভিহিত। পালংএর ৩।৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে **ছয়গাঁ** একটি ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম এবং সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য পূর্ব্ব কাল হইতে প্রসিদ্ধ। আচার্য্য চূড়ামণির বংশীয় কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম এবং হরিচরণ বিদ্যালঙ্কার, বৈয়াকরণ রামহরি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এই গ্রামের লোক। এই স্থানে বহু নারিকেল গাছ দৃষ্ট হয় বলিয়া লোকে ইহাকে নারিকেলী ছয়গাঁও বলিয়া থাকে। ইহার দক্ষিণ দিকের পার্শ্বস্থ গ্রাম **দেভোগে** "বারভূঁইয়া"দের অন্যতম চাঁদ ও কেদার রায়ের জ্ঞাতি বংশীয়দের বাস আছে। দেভোগ হইতে বুড়িরহাট পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিবার সময়ে মাটির নীচে হইতে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত বৃষ পাওয়া গিয়াছিল; উহা এখন ঢাকার চিত্রশালায় আছে। পালং হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বদিকে মাত্রৈসার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানকার সিদ্ধপীঠ দিগম্বরী তলার প্রসিদ্ধি আছে। গোসাঞি ভট্টাচার্য্য নামে একজন সাধক এই পীঠে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। নৈয়ায়িক গঙ্গাচরণ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। গোসাঞি ভট্টাচার্য্যের জন্মস্থান রামভদ্রপুর **মাত্রৈসার** হইতে দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বে। পালং হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে **ধানুকা** গ্রাম সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ; বহু পণ্ডিত এই গ্রামে জন্মিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ৺চন্দ্রমণি ন্যায়পঞ্চানন সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন; তাঁহার সময়ে ন্যায় শাস্ত্রে বাংলাদেশে তিনি অন্যতম প্রধান ছিলেন। মহারাজ রঞ্জিৎ সিং ইঁহাকে কিছু দিনের জন্য সভাপতি করিয়া পঞ্জাবে লইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহার বংশীয়গণ বহুদিন যাবৎ নবদ্বীপের প্রাধান্য মানেন নাই। ইঁহারা সুপ্রসিদ্ধ ময়ুরভট্টের সন্তান বলিয়া কথিত। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ৺বলরাম বাচস্পতি ১৬৭৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে ছয়টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন; ইহাদের মধ্যে শ্যামাঠাকুরাণী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মীগোবিন্দ, শিব ও অম্বিকার মন্দির প্রধান। শ্যামাঠাকুরাণী প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধি আছে। ইঁহার সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রবাদ একবার শত্রুদল কর্ত্তৃক তাঁহার পূজারীর বাটী আক্রান্ত

হইলে তিনি স্বয়ং খাঁড়া হাতে আসিয়া তাহাদের বিনাশ করেন। ধানুকার নিকটবর্ত্তী আমতলী গ্রামের পণ্ডিত রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী অমরকোষের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। পালংএর ৩ মাইল পশ্চিমে পালং নদীর অপর পারে বড় বিনোদপুর একটি বড় গ্রাম। পূর্ব্বকালে একবার এখানকার প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া জমিদারগণের কাছারী লুণ্ঠন করাতে তাহাদের দমন করিবার জন্য সরকারকে ফৌজ পাঠাইতে হয়; গ্রামের বাহিরে যে স্থানে বিদ্রোহীরা ফৌজের সহিত লড়িয়াছিল তাহা "রণখোলা" নামে পরিচিত হইয়া আছে। সেই ঘটনা লইয়া ও অঞ্চলে একটি ছড়া চলিত আছে—

বাজিল রণের কাড়া,
সিপাহী হইল খাড়া,
বিনোদপুরে পইল সাড়া।

.. ..

পালং ছাড়িয়া তারপাশা ষ্টীমার পথে নরিয়া খালের উপর জপসা স্টেশন মাদারীপুর হইতে ১০ ঘণ্টার পথ। **জপসা** একটি প্রাচীন গ্রাম। পূর্ব্বে ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ সমৃদ্ধ ছিল। জপসার ৩।৪ মাইল পশ্চিমে রাজনগরে রাজা রাজবল্লভের বহু মন্দির প্রাসাদ প্রভৃতি ছিল। পদ্মার একটি শাখা কীর্ত্তিনাশা ইহাদের ধ্বংস করে; সেই হইতে কীর্ত্তিনাশা নাম। রাজনগর, জপসা, ভোজেশ্বর, প্রভৃতি গ্রাম নদী গর্ভে গিয়াছিল; আবার চর পড়িয়া নূতন বসতি হইয়াছে। জপসার দেড় মাইল দক্ষিণে নরিয়া খালের পশ্চিম কূলে ভোজেশ্বর গ্রাম। সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য এই গ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীহর্ষ উপাধ্যায়, দুর্গাদাস বেদাচার্য্য, রঘুনাথ বেদান্তবাগী, গোবিন্দদেব শিরোমণি, কৃষ্ণদেব স্মৃতিরত্ন, ভবানীপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ, রামরত্ন বিদ্যাবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় তারিণীচরণ শিরোমণি, পার্ব্বতীনাথ বিদ্যাভূষণ, গুরুচরণ বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বহু পণ্ডিত বংশপরম্পরায় জ্ঞানশলাকা জ্বালাইয়া রাখিয়া এই গ্রামকে প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। ভোজেশ্বরের অপর পারে নরিয়া খালের পশ্চিম কূলে মাসুরা গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে প্রসিদ্ধ গ্রাম **ফতেজঙ্গপুর** অবস্থিত। এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতগণের ইহা প্রধান কেন্দ্র ছিল। বহু পুরুষ ধরিয়া এখানকার জ্যোতিষীগণ পঞ্জিকা প্রকাশ করিতেন এবং সমগ্র বাংলার পঞ্জিকার সময় গণনা এখানকার পঞ্জিকার সময় ধরিয়া করা হইত। জ্যোতির্ব্বিদদিগের পুরাতন মন্দির ও বাটী এখনও বর্ত্তমান। পূর্ব্বে এই স্থান চাঁদ ও কেদার রায়ের অধিকারে ছিল। তখন ইহার নাম ছিল শ্রীনগর। কথিত আছে, মহারাজ মানসিংহ যখন মুঘল বাহিনী লইয়া পূর্ব্ব-বঙ্গ বশে আনিতে যান সে সময়ে তাঁহার সহকারী কিলমক্ প্রথমে পরাজিত হইয়া এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন মানসিংহ স্বয়ং তাঁহার সাহায্যে আগমন করেন এবং এই যুদ্ধে কেদার রায় আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। বিজয়ের প্রতীক স্বরূপ মানসিংহ শ্রীনগর নাম বদলাইয়া ফতেজঙ্গপুর নাম রাখেন। এখনও এই গ্রামের এক অংশ নগর নামে পরিচিত। মাসুরার দুই মাইল পূর্ব্বদিকে ধামারণ গ্রামে একটি সূর্য্য মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মাসুরার দেড় মাইল উত্তরে জপসার ঠিক অপর পারে নরিয়া খালের উপর **কানুরগাঁ** একটি পুরাতন গ্রাম। এ অঞ্চলে খ্যাত "কানুরগাঁয়ের বশিষ্ঠ" বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদর মধ্যে আনন্দচন্দ্র সার্ব্বভৌম, দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি সমধিক

প্রসিদ্ধ। কানুরগাঁয়ের অন্তর্গত বকৃসীবাজার পল্লীর রায়-বংশের গোবিন্দচন্দ্র রায় আগ্রা সহরে হেমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার "কতকাল পরে বল ভারতরে, দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে" এবং "নির্ম্মল সলিলে বহিছ সদা, তটশালিনী সুন্দর যমুনে ও" এই গান দুখানি সকলেই শুনিয়াছেন। কানুরগাঁয়ের এক মাইল উত্তরে নরিয়া খালের উপর **লোনসিংহ** একটি পুরাতন সমৃদ্ধ গ্রাম। ৺ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় যখন এখানকার স্কুলে পণ্ডিতের কার্য্য করিতেন সে সময়ে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে লোনসিংহ হইতে অবলাবান্ধব নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। ফরিদপুর, পালং. মাদারীপুর প্রভৃতি থানার এবং ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি জেলার কয়েকটি থানার প্রতি বর্গ মাইলে ১৩০০ এরও অধিক সংখ্যক লোকের বসতি, পৃথিবীর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে এত ঘন বসতি আর নাই। ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে পশ্চিম ইউরোপের গ্রামাঞ্চল ইহার এক চতুর্থাংশ লোকসংখ্যা বহন করিতে পারে না এবং চীন দেশে যে সকল অংশে কৃত্রিম উপায়ে জল সেচনের ব্যবস্থা নাই, তথায় গ্রামাঞ্চলে প্রতি বর্গ মাইলে লোক সংখ্যা ১০০০ এর বেশী নয়।

জপসার পরেই তারপাশা স্টীমার পথে **নরিয়া** স্টেশন। ইহা একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের নরিয়া মেলের নাম এই গ্রামের নাম হইতেই হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সোহং স্বামী কিছুকাল এই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে দোস্ত ফিরিঙ্গী নামক একজন পর্ত্তুগীজ বণিক এই গ্রামের একধারে বাস করিতেন, তিনি একজন বাঙালী কৃষকের মেয়েকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের সন্তানাদি না হওয়ায় এই গ্রামের প্রসিদ্ধ ঘটক রায় বংশের ইন্দ্রনারায়ণকে তাঁহাদের সম্পত্তি প্রদান করেন; ইন্দ্রনারায়ণকে তাঁহারা স্নেহ করিতেন। ইন্দ্রনারায়ণের পুত্রগণ নবাব সরকারের খাজনা বন্ধ করিলে নবাব সৈন্য নরিয়াতে আসিয়া ঘটক রায়দের গৃহ লুণ্ঠন করে, এই সময়ে ছোট খাট একটি যুদ্ধ হইয়াছিল। পরাজিত হইয়া তাঁহারা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হন। সেই যুদ্ধের কাহিনী লইয়া একটি সুন্দর ছড়া রচিত হইয়াছিল, তাহা এ অঞ্চলে এখনও চলিত আছে। ছড়াটি এইরূপ:—

তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রইয়া
নৈরার ঘটক যুদ্ধ করে কচু বনে রইয়া,
ঘটক পলাইলরে নৈরার সোণার পুরী কারে দিলা রে।
দিন নাই ক্ষণ নাই রত্রি অন্ধকার,
একুশ দিনে সোনার লঙ্কা হক ছারকার
ঘটক পলাইলরে নৈরার সোণার পুরী কারে দিলা রে।
.....................তেতৈলের পাতে,
রঘু ঘটক তীর ছাড়ে ডান হাতে বাঁ হাতে .
ঘটক পলাইলরে............. .... ।

নরিয়ার দেড় মাইল পূর্ব্বদিকে **কেদারপুর** গ্রাম। দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম কেদার রায় এই স্থানে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া অসম্পূর্ণ রাখিয়া

যান; বাড়ীর চারিদিকে পরিখার চিহ্ন এবং বিক্ষিপ্ত ইষ্টক রাশি আজিও দৃষ্ট হয়। কেদারপুর হইতে মেঘনা আড়াই মাইল পূর্ব্ব দিকে। কেদার রায়ের নাম হইতেই গ্রামের নাম কেদারপুর হইয়াছে এরূপ অনুমিত হয়; এবং মেঘনার পূর্ব্ব কূলে নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর শহরের নাম চাঁদরায় হইতে হইয়াছে এরূপ কেহ কেহ অনুমান করেন। কেদারপুর গ্রামে রাজা শ্রীচন্দ্রদেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ পাল রাজগণের পতনের পর বাংলায় অল্পকাল খড়্গবংশ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন; এই বংশের পতনের পর বৌদ্ধমতাবলম্বী চন্দ্র বংশ বঙ্গে রাজত্ব করেন। ইঁহাদের অদিপুরুষ পূর্ণচন্দ্র রোহতাসগড়ের রাজা ছিলেন। তাঁহার পৌত্র ত্রৈলোক্য-চন্দ্র পূর্ব্ব ও দক্ষিণভাগে (হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপে) রাজ্য স্থাপন করেন। ইঁহার রাণীর নাম কাঞ্চনা। ইঁহাদের পুত্র শ্রীচন্দ্রদেবের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল। কেদারপুর হইতে এক মাইল দক্ষিণে নলতা গ্রামে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

পাটগাতি—খুলনা-বরিশাল স্টিমার পথে প্রায় ৬ ঘণ্টার পথ। এখান হইতে ঘাঘর নদী দিয়া নৌকাযোগে ৭ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলার অন্যতম প্রধান স্থান **কোটালীপাড়ায়** যাইতে হয়। ইহা সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য সুপরিচিত এবং বহু বিখ্যাত পণ্ডিত এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কথিত আছে, যে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তবংশ হইতেই এককালে ১৬টি টোল চালান হইত; তাহা ছাড়া অন্য টোল তো ছিলই। সম্প্রতি কোটালীপড়ার প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত বামনদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। "আনন্দ লতিকা" নামক চম্পূ কাব্যের রচয়িত্রী সুপ্রসিদ্ধা জয়ন্তী দেবী এই বংশের কন্যা বলিয়া কথিত। ইঁহার স্বামী কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌমও বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন।

কোটালীপাড়া থানার অন্তর্গত মদনপাড় গ্রামে মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের পুত্র এবং কেশব সেনের ভ্রাতা বিশ্বরূপ সেনের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই তাম্র-শাসনদ্বারা মহারাজ বিশ্বরূপ সেন তাঁহার চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে শ্রীবিশ্বরূপ দেবশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত বিক্রমপুরভাগে কিছু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিখিত এই তাম্রশাসনের বহু অক্ষর আধুনিক বাংলা হরফের মত। বাকী অক্ষরগুলি আধুনিক বাংলা লিপির প্রাচীন রূপ। (বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য—দীনেশ চন্দ্র সেন)

হুলারহাট—খুলনা-বরিশাল স্টীমার পথে প্রায় ১০ ঘণ্টার পথ। এখান হইতে বাখরগঞ্জ জেলার অন্যতম মহকুমা সদর **পিরোজপুর** ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দামোদর নামক ক্ষুদ্র নদের দক্ষিণে অবস্থিত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে পিরোজপুর শহরের পত্তন হয়। নিকটস্থ রাজগঞ্জহাট চাউল ও সুপারির বড় গঞ্জ।

পিরোজপুরের ৩ মাইল উত্তরে রায়ের কাঠি নামক প্রসিদ্ধ গ্রাম। রায়ের কাঠির রায়েরা বাখরগঞ্জ জেলার একটি পুরাতন বংশ। ইঁহারা দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। কথিত আছে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মদন মোহন রায় চব্বিশ পরগণার দেগঙ্গা হইতে এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এখামকার পুরাতন কালী মন্দিরের সংস্কৃতে লিখিত

ফলক হইতে জানা যায় যে ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে রুদ্রনারায়ণ রায় এই কালীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মন্দির নির্ম্মিত হয়।

হুলারহাট হইতে উত্তর-পূর্ব্বে পিরোজপুর মহকুমার অন্তর্গত স্বরূপকাঠি থানা হইয়া বানরীপাড়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ স্টীমার যাতায়াত করে। হুলারহাট হইতে বানরী-পাড়া ৪ ঘণ্টার পথ।

ঝালকাঠি—খুলনা-বরিশাল স্টীমার পথে খুলনা হইতে ৮৭ মাইল দূর। মেল স্টীমারে সাড়ে আট ঘণ্টার পথ। ইহা বরিশাল জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত বন্দর। স্থানটি ঝালকাঠি ও নলচিটি নামক দুইটি নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত। ইহা সেগুন কাঠের একটি বড় গঞ্জ। এখান হইতে প্রতি বৎসর বহু সহস্র টাকার দাইল, কলাই, ধান, নারিকেল ও সুপারি চালান যায়।

ঝালকাঠির ৩ মাইল দক্ষিণে **পোনাবালিয়া-সামরাইল** গ্রামে একটি প্রাচীন শিব মন্দির আছে। এই শিব স্বয়ম্ভু বলিয়া কথিত ও ত্র্যম্বকেশ্বর ভৈরব নামে পরিচিত। শিবরাত্রির দিন এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয় এবং এই উপলক্ষে খুব বড় মেলা হয়। বাখরগঞ্জ জেলার ঝালকাঠি ও বানরীপাড়া থানার লোক সংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে ১৩০০ এরও উপরে। (মাদারীপুর দ্রষ্টব্য)।

বরিশাল—বাখরগঞ্জ জেলার সদর শহর বরিশাল কীর্ত্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত এবং খুলনা হইতে জলপথে ১০৪ মাইল দূর। মেল স্টীমারে সাড়ে দশ ঘণ্টার পথ। খুলনা ও বরিশালের মধ্যে প্রত্যহ দুই বার স্টীমার যাতায়াত করে। কলিকাতা হইতে ২৪ পরগণা, খুলনা ও ফরিদপুর জেলার নানা স্থান হইয়া বরাবর খাল দিয়া বরিশাল প্রভৃতি স্থানে নৌকার চলাচল আছে। এই খাল দৈর্ঘ্যে ১,১২৭ মাইল, ইহার মধ্যে মাত্র ৪৭ মাইল কৃত্রিম। খালটি সার্কুলার ও ঈস্টর্ণ খাল নামে পরিচিত। এই খাল দিয়া পূর্ব্ববঙ্গ আসাম প্রভৃতি স্থান হইতে নৌকাযোগে মাল আসিয়া থাকে। এগুলি পৃথিবীর প্রধান খাল পথের অন্যতম। কলিকাতা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত দুইটি খাল পথ আছে; একটি ভাঙড় খাল দিয়া শিবসা নদীতে পড়িয়া খুলনা এবং তথা হইতে ভৈরব দিয়া পিরোজপুর হইয়া বরিশাল। অপরটি আদিগঙ্গা ও বিদ্যাধরী দিয়া ক্যানিং এবং তথা হইতে সুন্দর বনের জলপথে বরিশাল। বরিশাল শহরের নদী তীর দিয়া ষ্ট্র্যাণ্ড রোড নামে একটি সুন্দর রাস্তা আছে। বহু লোকে সকাল ও সন্ধ্যায় এই রাস্তায় বেড়াইয়া থাকে। বরিশাল হইতে পটুয়াখালি, মাদারীপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নানা স্থানে স্টীমার যাতায়াত করে। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে ব্রজমোহন কলেজ নামে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, ছেলেদের জন্য দুইটি ও মেয়েদের জন্য একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটি মূক-বধির বিদ্যালয় আছে। ব্রজমোহন কলেজটি বরিশালের স্বনামধন্য নেতা বাংলার অন্যতম সুসন্তান ৺অশ্বিনী কুমার দত্ত কর্তৃক স্বীয় পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার "ভক্তি যোগ" নামক উপাদেয় গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ। প্রসিদ্ধ স্বদেশী যাত্রা গানের প্রবর্ত্তক মুকুন্দ দাস বরিশালের অধিবাসী ছিলেন।

বরিশাল শহরে খৃষ্টান মিশনারীগণের অনেকগুলি কর্ম্মকেন্দ্র আছে। ১৮৪৪।৪৫ খৃষ্টাব্দে এখানে যে ইংরেজ কলেক্টর ছিলেন, তিনি একটি বাঙ্গালী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাটীর সম্মুখে সমারোহে চড়ক পূজা করিতেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে জেলার সদর বরিশাল শহর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণে **বাখরগঞ্জ** গ্রামে ছিল; ইহা বরিশাল পটুয়াখালি স্টীমার পথে রঙ্গশ্রী স্টেশনের পার্শ্বে অবস্থিত; রঙ্গশ্রী শীতল পাটীর জন্য প্রসিদ্ধ। মুর্শিদাবাদ নবাব-সরকারের কর্ম্মচারী আগা বাখরের নাম হইতে গ্রামটির নাম হইয়াছে বাখরগঞ্জ এবং এই গ্রামে জেলার সদর অবস্থিত ছিল বলিয়া সমগ্র জেলারও নাম হইয়াছে বাখরগঞ্জ। ১৭৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত আগা বাখর কার্য্যতঃ এই অঞ্চলের সর্ব্বময় শাসক ছিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের পরে তিনি ঢাকায় অবস্থান করিয়া চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নায়েব নাজিমকে হত্যা করিলে পরদিন স্বয়ং ঢাকায় নিহত হন। আগা বাখরের মৃত্যুর পর এ অঞ্চল রাজা রাজবল্লভের অধিকারে আসে। কথিত আছে তিনি নিজ প্রতাপ বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যাণ্ডেল হইতে কতকগুলি পর্ত্তুগীজ পরিবার আনাইয়া বাখরগঞ্জ গ্রামের ৩ মাইল দক্ষিণে শিবপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করান। এই গ্রামে এখনও একটি পর্ত্তুগীজদিগের গীর্জ্জা আছে এবং গ্রামটি পাদ্রী শিবপুর নামেও অভিহিত হয়। এখানকার গীর্জ্জাটি ও খৃষ্টানগণ মাদ্রাজের মায়লাপুরের বিশপের ডাইওসীসের অন্তর্গত। বাখরগঞ্জ-শিবপুর অঞ্চল চাউল ও সুপারির কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ। শিবপুরের ডোমিঙ্গো ডিসিল্‌ভা নামক এক ব্যক্তি চাউলের কারবারে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। প্রতি বৎসর তাঁহার মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার চরম পত্র অনুসারে খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু দরিদ্রদিগের মধ্যে ৫০০৲ টাকা বিতরিত হয়।

বরিশাল হইতে ৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে **সুজাবাদ** গ্রামে একটি পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। সম্রাট সাজাহানের পুত্র শাহ সুজা যখন বাংলার সুবাদার ছিলেন, তখন মগদিগের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা জন্য এই দুর্গটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সুজাবাদ গ্রাম এখনও শাহ সুজার নাম বহন করিতেছে।

বরিশাল হইতে ৬ মাইল উত্তর পশ্চিমে **লাখুটিয়া** গ্রামে রায় উপাধিধারী প্রসিদ্ধ জমিদার বংশের বাস। লাখুটিয়া হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত একটি কাটা খাল আছে। এই রায় বংশের ৺ইন্দ্রলাল রায় প্রথম বাঙালী বৈমানিক সেনানীর কার্য্য করেন; গত মহাযুদ্ধে তিনি অনেকগুলি শত্রুপক্ষীয় বিমানপোত ধ্বংস করিয়া অবশেষে বীরের মত নিহত হন।

মাধব পাশা—বরিশাল শহর হইতে ৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে মাধব পাশা একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রাম। বরিশাল হইতে মাধব পাশা পর্য্যন্ত একটি রাস্তা আছে।

মুঘলযুগে বাখরগঞ্জ জেলা সরকার বাক্‌লার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎপূর্ব্বে এই অঞ্চলের নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ। এখনও এখানকার পরগণার নাম বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ। প্রবাদ, ইতিহাস বিশ্রুত রাজা দনুজমর্দ্দনদেবের গুরু তপস্বী চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তীর

নামানুসারে রাজ্যের নাম হয় চন্দ্রদ্বীপ। কথিত আছে, একদিন রাত্রিকালে নৌকায় নিদ্রাকালীন চন্দ্রশেখরের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে নৌকার নিকটস্থ জলমধ্যে স্থিত বিগ্রহ তিনি যেন উঠাইবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার কথামত দনুজমর্দ্দনদেব জলে ডুব দিয়া কাল পাথরের দুইটি মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। আজও মাধবপাশায় এই দুটি মূর্ত্তি কাত্যায়ণী ও মদন গোপাল পূজিত হইতেছেন।

মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ রাজগণের শেষ রাজধানী। এই গ্রামে অনেক ভগ্নাবশেষ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। দুর্গাসাগর নামক একটি সুবৃহৎ প্রাচীন দীঘি বর্ত্তমান আছে, উহা রাজা জয়নারায়ণের মাতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাজারের নিকট কামান-তলায় একটি পিতলের কামান পড়িয়া আছে। দনুজমর্দ্দনদেবের বংশের পুরুষশাখা কিছু কাল পরে লুপ্ত হইলে, এই বংশের কন্যাশাখার বসু-বংশীয় পরমানন্দ রাজ্যাধিকার পান। ইঁহার প্রপৌত্র রাজা কন্দর্পনারায়ণ পটুয়াখালী মহকুমার বৌফল থানার অন্তর্গত তেতুলিয়া নদীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত পুরাতন রাজধানী কচুয়া পরিত্যাগ করিয়া মাধবপাশায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কচুয়া পরিত্যাগ করিবার কারণ কেহ বলেন মগের অত্যাচার, আবার কেহ বলেন তেতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন। রাজা কন্দর্পনারায়ণ বার ভূঁইয়াদিগের অন্যতম ছিলেন এবং মাধবপাশায় ১৪।১৫ বৎসর সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কন্দর্পনারায়ণ বীর ও সাহসিক ছিলেন। দেশ রক্ষার্থ মগ ও ফিরিঙ্গীদিগের সহিত বহুবার যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে ভ্রমণকারী র‍্যাল্‌ফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বাক্‌লায় আগমন করেন। ফিচের বিবরণী হইতে কন্দর্পনারায়ণের বীরত্বের কথা জানা যায়। তিনি প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক ছিলেন এবং প্রতাপের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র রামচন্দ্র রাজা হন। জেসুইট্ পাদ্রী ফন্‌সেল প্রতাপাদিত্যের রাজধানী যশোহর যাইবার পথে বাক্‌লায় নয় বৎসর বয়স্ক রাজা রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; ফন্‌সেল ইঁহাকে অমায়িক ও বুদ্ধিমান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রামচন্দ্রের সহিত পিতৃবন্ধু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা রাজকুমারী বিমলার বিবাহ হইয়াছিল। কথিত আছে, প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্রের মধ্যে বিবাহরাত্রে মনোমালিন্য ঘটায় রাজপুত্রী বিবাহের পর অনেক দিন পিত্রালয়ে অবস্থান করেন। বহুকাল পরে প্রতাপাদিত্যের অনুমতি লইয়া বিমলা অনেকগুলি নৌকায় পিত্রালয়ের বহুবিধ উপহার লইয়া স্বামীর রাজধানীর দিকে যাত্রা করিলেন। মাধব-পাশার নিকট আসিয়া তিনি নৌকা বাঁধিলেন, আশা করিয়াছিলেন সংবাদ পাইয়া রাজা রামচন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবেন। কিন্তু রামচন্দ্র আসিলেন না, এদিকে রাণীকে দেখিবার জন্য রাজ্যের নানা স্থান হইতে প্রজার দল তথায় আসিতে লাগিল। দরিদ্র ও ভিক্ষুকগণ বিমলার নিকট বহু অর্থ পাইল, ক্রমে সে স্থানে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া হাট বসিতে লাগিল এবং ইহা "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামে পরিচিত হইল। এইরূপ বহুদিন নৌকায় অবস্থানের পর রামচন্দ্র আসিয়া পত্নীকে প্রাসাদে লইয়া গেলেন। এই কাহিনীকে আংশিক ভাবে ভিত্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ উপন্যাস "বৌঠাকুরাণীর হাট" রচিত। রামচন্দ্র ও বিমলা কীর্ত্তিনারায়ণ ও বাসুদেব নামে দুইটি সাহসী ও বীর পুত্র সন্তান লাভ করেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর কীর্ত্তিনারায়ণ রাজা হইয়াছিলেন,

ইনি জলযুদ্ধে পারদর্শী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের পৌত্র প্রেমনারায়ণের মৃত্যুতে বসু বংশের পুরুষধারা লুপ্ত হয় এবং প্রেমনারায়ণের জামাতা গৌরীচরণ মিত্র সম্পত্তির অধিকারী হন। এই মিত্র বংশীয়গণ আজও মাধবপাশায় অবস্থান করিতেছেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে বাকী খাজানার দায়ে বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ পরগণা বিক্রীত হইয়া এই পুরাতন বংশের হস্তচ্যুত হয়।

কচুয়া—বরিশাল পটুয়াখালি স্টীমার পথে পটুয়াখালির আগের স্টেশন বাগা বন্দর হইতে পূর্ব্বে ১০ মাইল দূরে বৌফল থানার নিকটেই তেতুলিয়া নদীর পশ্চিম কূলে কচুয়া গ্রাম। বাগা হইতে বৌফল পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা আছে। বাগা বালাম চাউলের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধ। মেঘনার শাখা তেতুলিয়া নদী বাখরগঞ্জ জেলার পূর্ব্বাংশ সুবৃহৎ দক্ষিণ সাহাবাজপুর দ্বীপটিকে জেলার অপরাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। সাহাবাজপুর দ্বীপের পূর্ব্বদিকে বিশাল মেঘনা প্রবাহিতা, ইহার অপর পারে নোয়াখালি জেলা।

কচুয়া মহারাজ দনুজমর্দ্দনদেবের বংশীয় চন্দ্রদ্বীপ রাজগণের আদি বাসস্থান। এই স্থান হইতেই রাজা কন্দর্পনারায়ণ রাজধানী উঠাইয়া মাধবপাশায় লইয়া যান।

পাণ্ডুয়ায় এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের নানা স্থানে দনুজমর্দ্দন দেবের অনেকগুলি রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল মুদ্রা আবিষ্কারের ফলে তাঁহার রাজত্বকাল নির্ণীত হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত মুদ্রাই ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দে (১৪১৭, ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে) মুদ্রিত। মুদ্রাগুলি হইতে জানা যায় যে ১৪১৭ ও ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ দনুজমর্দ্দন দেবের অধিকারে ছিল। মহারাজ গণেশের পুত্র গৌড়রাজ জালাল উদ্দীন মহম্মদ শাহের মুদ্রা ফিরোজাবাদে ৮১৮, ৮১৯, ৮২২, ৮২৩, ৮২৮ ও ৮৩৪ হিজরায় মুদ্রিত হইয়াছিল; কিন্তু ৮২০ এবং ৮২১ হিজরায় মুদ্রিত তাঁহার কোনও মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। ঐতিহাসিকেরা এইরূপ অনুমান করেন যে ৮২০ ও ৮২১ হিজরায় অর্থাৎ ১৪১৭ ও ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে দনুজমর্দ্দনদেব পাণ্ডুয়ায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং জালাল উদ্দীন মহম্মদশাহ পরাজিত হইয়া তথা হইতে বিতাড়িত হন। স্বাধীনতার প্রতীক স্বরূপ দনুজমর্দ্দনদেব নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁহার মুদ্রার একদিকে বাংলা অক্ষরে নিজ নাম এবং অপরদিকে "চণ্ডীচরণ পরায়ণস্য" লিখিত আছে। দনুজমর্দ্দন ব্যতীত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালে মুসলমান অধিকৃত আর্য্যাবর্ত্তের কোনও স্থানে কোনও হিন্দু রাজা ভারতীয় লিপি ও ভাষায় স্বীয় নামে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। ইহা তাঁহার প্রতাপ ও সাহসিকতার পরিচায়ক। উত্তর বঙ্গে পাণ্ডুয়া হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গ পর্য্যন্ত দনুজমর্দ্দনদেবের অধিকারে ছিল। অনুমান হয় ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে দনুজমর্দ্দনদেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার দুই এক বৎসর পরেই তিনি পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ হইতে বিতাড়িত হন। ফিরোজাবাদে জালাল উদ্দীন মহম্মদ শাহের নামে ৮২২ হইতে ৮২৪ হিজরায় অর্থাৎ ১৪১৯ হইতে ১৪২১ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত রজত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গে মহেন্দ্রদেবের ১৪১৮ হইতে ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত অনেকগুলি রজত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। পাণ্ডুয়া হস্তচ্যুত হইবার পর দনুজমর্দ্দনদেবের বংশের রাজ্য সীমা বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপেই পর্য্যবসিত হয়। বহুকাল তাঁহারা এ অঞ্চলে রাজত্ব করেন।

কচুয়ার কমলসাগর নামে প্রকাণ্ড দীঘি এই বংশের প্রতিষ্ঠিত। রাজা জয়নারায়ণদেবের কন্যা কমলা এই দীঘিটি কাটাইয়াছিলেন। কথিত আছে, পুষ্করিণীটি খননের পর কমলা স্বপ্ন পান যে তিনি পুষ্করিণীটি হাঁটিয়া পার না হইলে উহাতে জল উঠিবে না। তদনুসারে তিনি উহা হাঁটিয়া পার হইতে গেলে মধ্য পথে যাইতে না যাইতে চারিদিক হইতে জল উঠিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে; তদবধি তিনি এই দীঘিতে পদ্ম ফুলে পরিণত হইয়া আছেন। কমলার চারিদিকে জল আসিতেছে দেখিয়া তাঁহার স্বামী তাঁহাকে শীঘ্র উপরে আসিতে বলিলে তিনি বলেন তিনি উঠিতে পারিতেছেন না। তিনি আরও বলিলেন যে তাঁহার একমাত্র শিশু সন্তানটিকে প্রতিদিন ঘাটে রাখিয়া গেলে তিনি তাহাকে স্তন্যদান করিবেন। সেইমত শিশুটিকে প্রত্যহ সকালে ঘাটে রাখিয়া আসা হইত এবং কমলা জল হইতে উঠিয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতেন। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য একদিন সকালে ঘাটের নিকট লুকাইয়া রহিলেন এবং কমলা উঠিয়া আসিয়া যখন শিশুকে দুধ খাওয়াইতেছিলেন তখন তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন। কমলা পলাইয়া সেই যে জলে লুকাইলেন তাহার পর আর কখনও উঠেন নাই।

কচুয়ায় পুরাতন রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ কিছু কিছু এখনও দৃষ্ট হয়। কচুয়ার নিকটবর্ত্তী বৌফল থানার অন্তর্গত কালালিয়া গ্রামে খুব বড় হাট বসে। এ অঞ্চলের মুগের দাইল অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত।

শিকারপুর—বরিশাল শহর হইতে ১৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত শিকারপুর গ্রাম ভারতের একপঞ্চাশৎ শক্তি পীঠের অন্যতম পীঠ। গ্রামটি সুগন্ধা বা সুনন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে বিষ্ণুচক্রচ্ছিন্ন সতী দেহের নাসিকা পড়িয়াছিল। এই স্থানে দেবীর নাম সুগন্ধা বা উগ্রতারা। দেবীর ভৈরব ত্র্যম্বকেশ্বর ঝালকাঠির নিকটবর্ত্তী পোনাবালিয়া-সামরাইল গ্রামে অবস্থিত; কথিত আছে, পূর্ব্বকালে পোনাবালিয়া-সামরাইলের পার্শ্ব দিয়া সুগন্ধা নদী প্রবাহিত ছিল; শিকারপুর ইহার পূর্ব্বকূলে এবং পোনাবালিয়া-সামরাইল পশ্চিমকূলে অবস্থিত ছিল। শিবরাত্রির সময়ে শিকারপুরে খুব বড় মেলা বসে। কোজাগরী পূর্ণিমা হইতে শ্যামাপূজার দিন পর্য্যন্ত এবং দোলযাত্রা উপলক্ষেও এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। বরিশাল শহর হইতে মোটরবাস, মোটর লঞ্চ ও নৌকাযোগে শিকারপুর যাওয়া যায়।

গৈলা—বরিশাল মাদারীপুর-তারপাশা স্টীমার পথে বরিশাল শহর হইতে প্রায় ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী গৌরনদী স্টেশনে নামিয়া বাখরগঞ্জ জেলার অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রাম গৈলায় যাইতে হয়। গৌরনদী হইতে গৈলা প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে। গৈলা এক সময়ে পণ্ডিতপ্রধান স্থান ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণের টীকাকার পণ্ডিত ত্রিলোচন কবিকণ্ঠাভরণ গৈলার অধিবাসী ছিলেন। এখানে কবীন্দ্র কলেজ নামে একটি সংস্কৃত কলেজ আছে; গৈলা নিবাসী পণ্ডিত ৺ মদনমোহন কবীন্দ্র ইহার প্রতিষ্ঠাতা।

গৈলা গ্রাম হইতে ২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে **ফুল্লশ্রী** গ্রাম "পদ্মাপুরাণ" বা "মনসামঙ্গল" গ্রন্থ প্রণেতা প্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি বিজয় গুপ্তের জন্মস্থান। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয় গুপ্তের জন্ম হয়। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি "মনসামঙ্গল" রচনা করেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মনসা দেবীর বিগ্রহ আজও এখানে নিত্য পূজা পাইতেছেন। বিজয় গুপ্তের মনসা খুব জাগ্রত বলিয়া লোকের বিশ্বাস, এজন্য নানাস্থান হইতে এখানে যাত্রীর সমাগম হয়।

গৌরনদী হইতে ২ মাইল পশ্চিমে **চাঁদসী** অবস্থিত চাঁদসীর দেশীয় চিকিৎসকগণ বাংলায় প্রসিদ্ধ।

ইদিলপুর—বরিশাল-চাঁদপুর-ঢাকা স্টীমার পথে **বদরটুনি** স্টেশন বাখরগঞ্জ জেলার উত্তর সীমান্তে নয়াভাঙ্গানী ও মেঘনা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। নয়াভাঙ্গানীর অপর পারেই ফরিদপুর জেলা। নয়াভাঙ্গানীর নাম হইতে প্রতীয়মান হয় ইহা পদ্মার নূতন খাত। বদরটুনি থানার ২।৩ মাইল পশ্চিমে নয়াভাঙ্গানী নদীর উপর আবুপুর বা ইদিলপুর গ্রাম। ইদিলপুর পরগণা পুরাতন সরকার বাক্‌লার চারিটি পরগণার অন্যতম। চাঁদ রায় কেদার রায়ের সময় ইহা বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল; পরে কেদার রায়ের সেনাপতি রঘুনন্দন চৌধুরী ইহা প্রাপ্ত হন। চৌধুরীরা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ জমিদার ছিলেন। ভাটগানে শুনা যায় "ইদিলপুরের জমিদার দোহাই মানে বাঘে যার।" এই পরগণায় প্রচুর সুপারি এবং কিছু কিছু কমলা লেবু জন্মিয়া থাকে।

ইদিলপুর পরগণার কোনও গ্রামে সেন বংশীয় রাজা কেশব সেনের একটি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহার তারিখ ১১২৬ খৃষ্টাব্দ। ইহাতে রাজা কেশব সেন তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে ঈশ্বর দেবশর্ম্মা নামক এক ব্রাহ্মণকে জেলার দক্ষিণাংশে চণ্ডভণ্ড নামক একটি আদিম ও অর্দ্ধসভ্য জাতির অত্যাচার দমন করিবার জন্য তিন খানি গ্রাম দান করেন। কেশব সেন মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পুত্র। এই তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতা মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দক্ষিণ সমুদ্রের কূলে শ্রীক্ষেত্রে, বারাণসীতে, বিশ্বেশ্বর ক্ষেত্রে এবং গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম ত্রিবেণীতে "সমর জয় স্তম্ভ মালা" স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইদিলপুর পরগণার অপর একটি গ্রামে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্র-দেবের (মাদারীপুর দ্রষ্টব্য) একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।

পটুয়াখালি—বরিশাল শহর হইতে স্টীমার পথে দক্ষিণে প্রায় ৭ ঘণ্টার পথ। ইহা একটি মহকুমা সদর। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এখানে যখন প্রথম দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয় তখন ইহা জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। ক্রমে ইহা শহরে পরিণত হইয়াছে।

পটুয়াখালি হইতে দক্ষিণে এক দিকে আমতলি ও অপর দিকে খেপুপাড়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ স্টীমার যাতায়াত করে।

পটুয়াখালি-আমতলি স্টীমার পথে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে বিঘাই ও আয়লা নদীর সঙ্গমস্থলে আয়লা স্টেশনে পৌঁছান যায়। আয়লা নদীর অপর বা উত্তর পারে **মসজিদবাড়ী** গ্রাম। এখানে ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি পুরাতন মসজিদ আছে; ইহা সরকারী রক্ষিত কীর্ত্তি বিভাগের অধীন। কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত এই মসজিদের প্রস্তর ফলক হইতে জানা যায় যে ইহা সুলতান মহম্মদ শাহের পুত্র সুলতান বারবক্ শাহের রাজ্যকালে খান্ মোয়জ্জম আজিয়াল খান্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। দক্ষিণ

বঙ্গে ইহাই মুসলমান শাসনকালের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মসজিদ ও নিদর্শন। পটুয়াখালি হইতে আমতলি থানা প্রায় ৪ ঘণ্টার রাস্তা; এখানে অনেক মগের বাস আছে।

পটুয়াখালি-খেপুপাড়া স্টীমার পথে **গলাচিপা** ৪ ঘণ্টার রাস্তা; এই থানায় বহু মগ বাস করেন। গলাচিপা হইতে কিঞ্চিদধিক আরও ৪ ঘণ্টা দক্ষিণে যাইলে নীলগঞ্জ নদীর উত্তর কূলে **খেপুপাড়া** গ্রাম। এখানকার খেপু নামধেয় জনৈক মগ অধিবাসীর নাম হইতে গ্রামের নাম হইয়াছে খেপুপাড়া। ইহা টিয়াখালী নামক সরকারী আবাদের অংশ। এখান হইতে নৌকাপথে বাহির সমুদ্রের উপর কুয়াকাটা গ্রাম নিকটেই। কুয়াকাটার এক মাইল পূর্ব্বে লাটাচাপনি গ্রামে সাগর সৈকতে একটি বালিয়াড়ির উপর একটি সুন্দর ডাক-বাংলা আছে। এখানকার সমুদ্রের দৃশ্য অতি মনোরম।

নদী পথের দৃশ্য

ভোলা—বরিশাল-সন্দ্বীপ-চট্টগ্রাম স্টীমার পথে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার পথ। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভীষণ বন্যার পর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ সাহাবাজপুর মহকুমা সদর এই গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। তদানীন্তন সদর আলা ৺রমেশ চন্দ্র দত্ত আই সি এস্ মহাশয় স্থানটি নির্ব্বাচন করেন। ইহা তেতুলিয়া বা ইলসা নদীর পূর্ব্বকূলে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এখন ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। সুপারি, লঙ্কা, নারিকেল এবং পানের কারবারের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ।

দৌলতখাঁ—বরিশাল-সন্দ্বীপ-চট্টগ্রাম স্টীমার পথে ভোলার এক স্টেশন পরে সাহাবাজপুর দ্বীপে মেঘনা নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের বন্যায় ইহার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। ইহা সুপারির কারবারের একটি বিশেষ কেন্দ্র। এ অঞ্চলে

মেঘনার বান প্রসিদ্ধ। সারা বৎসর ধরিয়াই এই বান দৃষ্ট হয়; কিন্তু জোয়ারের সময়ে ইহা বিরাট আকার ধারণ করে এবং ১৪।১৫ ফুট উচ্চ হইয়া জলরাশি আসিতে দেখা যায়; গভীর জলে ইহা বিশেষ বুঝা যায় না। দেউলার বান দক্ষিণ সাহাবাজ দ্বীপ এবং নোয়াখালি জেলার হাতিয়া দ্বীপের মধ্য দিয়া আসিয়া মেঘনা নদী এবং সংশ্লিষ্ট জলপথ দিয়া উত্তরে উঠিতে থাকে; অপর দিকে চাটগাঁর বান সন্দ্বীপ ও নোয়খালির মধ্য দিয়া উপরে আসিয়া প্রথমতঃ পশ্চিমে ও পরে দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়া দেউলার বানের সম্মুখীন হয়। দেউলার বানের আঘাত খাইয়া ইহা প্রত্যাবর্ত্তন করে।

(ঘ) রাণাঘাট-লালগোলাঘাট-গোদাগাড়ীঘাট-কাটিহার

বীরনগর—কলিকাতা হইতে ৫১ মাইল দূর। চূর্ণীনদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ইহা একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহার পুরাতন নাম উলা। প্রবাদ উলুবনের জঙ্গল কাটিয়া গ্রামটি প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল উলা। কাহারও কাহারও মতে জ্ঞানী অর্থে ইরাণীয় শব্দ আউল হইতে উলা হইয়াছে। অপর মতে আরব্য শব্দ "উলা" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান হইতে উলা নামের উৎপত্তি; পুরাকালে এই সমৃদ্ধ গ্রামটির প্রাধান্য নাম হইতে সূচিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এতদঞ্চলে ডাকাতের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। উলার অধিবাসিগণ কয়েকবার ডাকাতের দল ধরিয়া প্রভূত সাহসের পরিচয় দেন বলিয়া তদানীন্তন কলিকাতা কোর্ট অব্ সার্কিটের জজ সাহেবের প্রস্তাবে সরকার কর্ত্তৃক গ্রামটিকে বীরনগর আখ্যা প্রদত্ত হয়।

দ্বাদশ মন্দির, বীরনগর

অতীত সমৃদ্ধির চিহ্ন স্বরূপ বড় বড় বাড়ী, দীঘি, প্রাচীন গড়ের খাত ও ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি আজিও এখানে দৃষ্ট হয়। বীরনগরের পুরাতন খ্যাতি ও বনিয়াদী কুলমর্য্যাদা এ অঞ্চলে প্রচলিত গ্রাম্য ছড়াতে স্থান পাইয়াছে, যথা—

উলার মেয়ে কুলকুনুটি*, নদের মেয়ের খোপা;
শান্তিপুরে নথ নাড়া দেয়, গুপ্তিপাড়ার চোপা

* কুল কুনুটি—কুলগর্ব্বিতা (নদীয়া-কাহিনী, কুমুদ নাথ মল্লিক)

উলায় পূর্ব্বে কয়েকটি টোল বা চতুষ্পাঠী ছিল। এখানকার প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণের মধ্যে চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণরাম ন্যায়পঞ্চানন, সদাশিব তর্কালঙ্কার, শিবশিব তর্করত্ন, ভবানীচরণ ন্যায়ভূষণ, মুকুন্দমোহন ন্যায়রত্ন ও কবি দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। অত্রত্য সারণ সিদ্ধান্তের দুইটি কন্যা সংস্কৃতে গভীর জ্ঞানের জন্য সেকালে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে পাণ্ডিত্য ও কৌলীন্য গৌরবের জন্য উলা প্রসিদ্ধ ছিল।

এখানকার দ্রষ্টব্যের মধ্যে বটবৃক্ষতলে প্রাচীন উলাইচণ্ডী দেবী, দ্বাদশ মন্দির, মুস্তৌফিদের জোড় বাংলা, ভক্তিবিনোদ কেদার নাথ দত্ত মহাশয়ের জন্মভিটা প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। উলাই চণ্ডীর পুরাতন পূজাপদ্ধতি, যথা হাড়ীজাতীয় ব্যক্তি দ্বারা চণ্ডীর

প্রথম পূজা এবং শূকর বলিদান প্রভৃতির প্রবাদ হইতে অনেকে মনে করেন এই মূর্ত্তি বৌদ্ধ যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় উলাই চণ্ডীর পূজা উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী মেলা হয় এবং এই সময়ে বিন্ধ্যবাসিনী ও মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তির বারোয়ারী পূজা হয়। রোগ শান্তি ও মনস্কামনা পূর্ণ হইবে এই বিশ্বাসে উলাই চণ্ডীর বট বৃক্ষের শিকড়ে লোকে ইট বাঁধিয়া পূজা দিয়া থাকে।

এক সময়ে ভাগীরথী বীরনগর গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিতা ছিল। বর্ত্তমান বীরনগর গ্রামের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগ দিয়া ডাকাতের খাল ও বারমেসে খাল বলিয়া যে অতি প্রাচীন এক গভীর জলাভূমি দেখা যায় অনেকে অনুমান করেন যে উহাই ভাগীরথীর
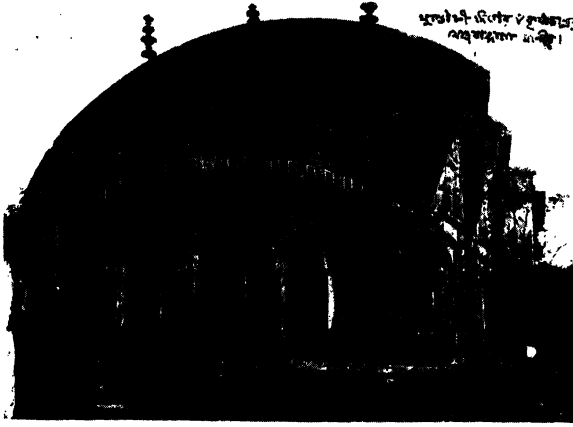
জোড় বাংলা মন্দির, বীরনগর

প্রাচীন খাত। কবিকঙ্কণের চণ্ডী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে শ্রীমন্ত সদাগর যখন সিংহলে যাইতেছিলেন তখন উলার নীচে গঙ্গার দহে ভীষণ ঝড় উঠায় তিনি জাহাজ নোঙ্গর করিয়া বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে উলাই চণ্ডী দেবীর পূজা করিয়া নৌবহর সমেত রক্ষা পাইয়াছিলেন। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত উলা নিবাসী কবি দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ভাগীরথী বা গঙ্গা তীরে উলার অবস্থান এবং উলাই চণ্ডী বা উলুই চণ্ডীর মেলা সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। যথা—

অম্বিকা পশ্চিম পারে শান্তিপুর পূর্ব্ব ধারে,
রাখিয়া দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।
উল্লাসে উলায় গতি বট মূলে ভগবতী,
যথায় পাতকী নহে ছাড়া॥
বৈশাখেতে যাত্রা হয়, লক্ষ লোক লক্ষ্য হয়,
পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যচয়।
নৃত্য গীত নানা নাট দ্বিজ করে চণ্ডী পাঠ,
মানে যে মানসা সিদ্ধি হয়॥

সুপণ্ডিত ও বঙ্গ ভাষায় কয়েক খানি দার্শনিক ও ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ রচয়িতা দ্বারভাঙ্গা রাজের ম্যানেজার চন্দ্রশেখর বসু এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের "বীরাঙ্গনার পত্রোত্তর কাব্য" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক কবি হেমচন্দ্র মিত্র বীরনগরের অধিবাসী ছিলেন।

বীরনগর এক সময়ে বিশেষ স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল এবং ইহার লোক সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার ছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া মহামারীতে এই সমৃদ্ধ পল্লীটি বিধ্বস্ত হইয়া যায় সম্প্রতি কয়েক বৎসর বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎসাহের সহিত গ্রামে ম্যালেরিয়া দমনের কার্য্য চলিতেছে এবং বহু বিঘা জমি লইয়া এই স্থানে একটি স্বাস্থ্যকর আদর্শ পল্লী বসতি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে।

বীরনগরে বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, মিউনিসিপ্যালিটি, দৈনিক বাজার, পানীয় জলের নলকূপ প্রভৃতির সুবিধা আছে।

বীরনগরের পার্শ্ববর্ত্তী পালিতপাড়া গ্রামে প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কানাইলাল ও নীলমণি আচার্য্য নামক দুই সহোদর দেবী প্রতিমা সাজাইবার সুপ্রসিদ্ধ "ডাকের সাজের" উদ্ভাবন করেন।

কৃষ্ণনগর সিটি—কলিকাতা হইতে ৬২ মাইল দূর। ইহা নদীয়া জেলার সদর শহর। কৃষ্ণনগর শহরের উত্তর দিয়া জলঙ্গী নদী প্রবাহিতা। জলঙ্গী নদীয়া জেলার উত্তরে মুর্শিদাবাদ জেলার সীমানার নিকটে পদ্মা হইতে উঠিয়া কিছু দূর এই দুই জেলার সীমা রক্ষা করিয়া কৃষ্ণনগর সিটি স্টেশনের কিছু উত্তরে লালগোলা লাইনের নীচ দিয়া চলিয়া গিয়া নবদ্বীপের বিপরীত দিকে ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। এককালে গঙ্গার প্রধান ধারা জলঙ্গী দিয়া বহিত। (পাবনা দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের নাম ছিল রেউই। নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাজা রাঘব পূর্ব্ব বাসস্থান মাটিয়ারী ("বাণপুর" স্টেশন দ্রষ্টব্য) ত্যাগ করিয়া এই স্থানে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন এবং উহার চতুর্দ্দিক পরিখার দ্বারা বেষ্টিত করেন। এই পরিখা "শহর পানার গড়" নামে পরিচিত। রাজা রাঘবের পুত্র মহারাজ রুদ্র এই স্থানের নাম রাখেন কৃষ্ণনগর। কথিত আছে, তৎকালে রেউইএ অনেক গোপের বসতি ছিল এবং তাহারা মহাসমারোহে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিত। এইজন্য রুদ্র রেউই এর নাম কৃষ্ণনগর রাখেন। রুদ্ররায়ের সময়ে জমিদারীর আয় বৃদ্ধি পায় এবং তিনি বাদশাহকে ১০ লক্ষ টাকা কর দিতেন। রুদ্রের পৌত্র রঘুরাম বীরত্বের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার ন্যায় ধনুর্দ্ধারী এদেশে কেহ ছিল না। বারাকোটির যুদ্ধে তিনি মুর্শিদকুলী খাঁর পক্ষ অবলম্বন করিয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন এবং রাজশাহীর বিদ্রোহী রাজা উদয়নারায়ণের সেনাপতি আলী মহম্মদকে তীর বিদ্ধ করিয়া নিহত করেন। সাধারণের নিকট তিনি "রঘুবীর" নামে পরিচিত ছিলেন। রঘুরামের পুত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নদীয়া রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার বিরুদ্ধে ক্লাইভের সহিত যোগদান করায় পলাশীর যুদ্ধের পর তিনি ক্লাইভের সুপারিশে দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে "রাজরাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত কয়েকটি কামান তিনি ক্লাইভের নিকট হইতে উপহার লাভ করেন। ঐ কামানগুলি আজিও

কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে রক্ষিত আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গুণগ্রাহী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি নিজে সংস্কৃত শাস্ত্র, সঙ্গীত ও অস্ত্রচালনা বিদ্যা সযত্নে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজসভায় বহু গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির সমাগম হইত। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রামরুদ্র বিদ্যানিধি, গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া মহাকবি ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর" রচনা করেন। উদ্ভটকবি রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর নামও উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চৌরাশী পরগণা ও চারি সমাজের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার অধস্তন বংশধরগণের সময়ে এই বিস্তীর্ণ অধিকার ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া সাধারণ জমিদারীতে পরিণত হয়। নদীয়া রাজবংশের বহু কীর্ত্তিকলাপ আজিও বিদ্যমান আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও শ্রীশচন্দ্র কয়েকটি সাধন সঙ্গীতের রচয়িতা।

বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগরে দ্রষ্টব্য বস্তুর মধ্যে নদীয়া রাজপ্রাসাদ, রাজবংশের ঠাকুর বাড়ী ও কৃষ্ণনগর কলেজ নামক প্রথম শ্রেণীর সরকারী কলেজের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজবাটীর সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গনে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মহাসমারোহে "বার দোল" পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপলক্ষে নদীয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে দ্বাদশটি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহকে আনিয়া একসঙ্গে দোলায় বসানো হয়। মৃৎশিল্পের জন্য কৃষ্ণনগরের খ্যাতি জগৎ বিখ্যাত। শহরের অন্তঃপাতী গোয়াড়ি ও ঘুর্ণী নামক স্থানে বহু কুম্ভকারের বাস। নানা প্রকার দেব প্রতিমা, জীবজন্তু, ফল, পুষ্প, মডেল ও তৈজসপত্রাদি নির্ম্মাণে ইঁহাদের কৃতিত্ব অতি অদ্ভুত। শিল্পচাতুর্য্য ও বর্ণকৌশল এমন সুন্দর যে জিনিষগুলি দেখিলে স্বাভাবিক বলিয়া ভ্রম হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশের মনীষিগণ কর্ত্তৃক ইঁহাদের শিল্পনৈপুণ্য বিশেষ-ভাবে সমাদৃত হইয়াছে। শিল্প চর্চ্চার এই বিশেষ বিভাগে ইঁহারা বাংলার গৌরব আজিও সমভাবে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ঘুর্ণী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রসিদ্ধ সভাসদ বিদূষক গোপাল ভাঁড়ের জন্মস্থান বলিয়া কথিত।

"ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্" নামক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নদীয়া রাজবংশের বিবরণীর সম্পাদক দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় ও তদীয় সুযোগ্য পুত্র বিখ্যাত কবি—নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (সাধারণের নিকট ডি, এল, রায় নামে সমধিক পরিচিত) কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত স্বদেশী সঙ্গীত ও হাসির গান এখনও লোকের মুখে মুখে ফিরে। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে জন্মতিথি উপলক্ষে কৃষ্ণনগরে কবির জন্মভিটায় সাহিত্যিকগণ সমবেত হন। এদেশের আদালতে প্রথম বাঙালী ব্যারিষ্টার সুবিখ্যাত মনোমোহন ঘোষ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ব্যারিষ্টার ও অসাধারণ বাগ্মী লালমোহন ঘোষ কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস বিক্রমপুরে হইলেও ইঁহাদের পিতার আমল হইতে ইঁহারা কৃষ্ণনগরেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া-ছিলেন। মনোমোহন ঘোষ তাঁহার সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব ছিলেন। লালমোহন মাইকেল মধুসূদন দত্তের "মেঘনাদ বধ" কাব্য ইংরেজীতে সুন্দর অনুবাদ করিয়াছিলেন। "বাঙ্গালা ব্যকরণ" প্রণেতা লোহারাম শিরোরত্ন কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন; তাঁহার ভাগিনেয় সুপণ্ডিত ও ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায়ও কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন ও প্রতিপালিত হন। "রাজস্থানের পুরাবৃত্ত", "জয়াবতীর উপাখ্যান" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ও কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন। বাংলা ভাষায় বহু বালবোধ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরচয়িতা শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ জগদানন্দ রায়ও কৃষ্ণনগরের লোক ছিলেন। পুণ্যশ্লোক শিক্ষাব্রতী রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ও এখানকার অধিবাসী ছিলেন।

কৃষ্ণনগরে "সর ভাজা" ও "সরপুরিয়া" নামক মিষ্টান্ন বিশেষ বিখ্যাত।

নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি, দেপাড়া

কৃষ্ণনগরের দুই মাইল দক্ষিণে দোগাছিয়া গ্রামে প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে মূলার মহোৎসব উপলক্ষে একটি মেলা হয়। এই সময়ে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নিত্যানন্দ প্রভুর একটি পাগড়ী প্রদর্শিত হয়।

কৃষ্ণনগর হইতে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দেবপল্লী বা **দেপাড়া** নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। এই স্থানে নৃসিংহদেবের একটি অতি প্রাচীন বিগ্রহ আছে। এতদঞ্চলে এই নৃসিংহের মাহাত্ম্য খুব বেশী। ইঁহার প্রসাদী অন্নের দ্বারা স্থানীয় নবজাত শিশুর অন্নপ্রাশন হইয়া থাকে। নদীয়া রাজ বংশের প্রদত্ত ভূসম্পত্তির আয় হইতে এই দেব

বিগ্রহের নিত্য সেবা হয়। এই বিগ্রহ কাহার দ্বারা কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত তাহা জানা যায় নাই। স্থানীয় লোকে ইঁহাকে অনাদি বা স্বয়ং-প্রকাশ বলিয়া বিশ্বাস করেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে এখানে উৎসব হইয়া থাকে।

পথের পার্শ্বে একটি জঙ্গলাবৃত উচ্চ ভূখণ্ডের একাংশে নৃসিংহদেবের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটিও অতি প্রাচীন। মন্দির প্রাঙ্গনটির ইতস্ততঃ ভগ্ন প্রস্তর ও ইষ্টক পড়িয়া আছে। অনুমান হয়, বহু পূর্ব্বে এই দেবতার মন্দির হয়ত খুবই বড় ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষের উপরই বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাঙ্গনের একদিকে কয়েক খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ বেলে পাথর পড়িয়া আছে; ইষ্টকস্তূপের মধ্যে নানা মাপের ইট দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার অতি প্রাচীন ও কারুকার্য্যখচিত।

নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি এক বৃহৎ কষ্টি পাথরের উপর খোদিত। ইহার উচ্চতা প্রায় চারি ফুট; পদতলে প্রহ্লাদ ও অঙ্কে হিরণ্যকশিপু অবস্থিত। বহু স্থানেই মূর্ত্তিটির অঙ্গহানি ঘটিয়াছে। সাধারণতঃ অঙ্গহীন বিগ্রহের পূজা হয় না, কিন্তু লোকে এই বিগ্রহকে "অনাদি" বলিয়া বিশ্বাস করে বলিয়া ইঁহার পূজা যথা নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। জনশ্রুতি যে এই মূর্ত্তির অঙ্গে একখানি পরশ পাথর ছিল, জনৈক লোভী সন্ন্যাসী উহা অপহরণ করিবার জন্যই মূর্ত্তিটির অঙ্গহানি ঘটাইয়াছে।

দেপাড়া গ্রামটি একটি প্রকাণ্ড বিলের পার্শ্বে অবস্থিত। এই বিলের একাংশের নাম চামটার বিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই বিল হইতে একটি ব্রোঞ্জ ধাতু নির্ম্মিত অতি সুন্দর উগ্রতারা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন যে চামটার বিল কথাটি সম্ভবতঃ চামুণ্ডার বিল কথার অপভ্রংশ। এককালে হয়ত এই বিলের নিকটে কোন স্থানে চামুণ্ডা দেবীর মন্দির ছিল।

একটি ছোট মাপের লাইন কৃষ্ণনগর সিটি হইতে এক দিকে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী শান্তিপুরে এবং অপর দিকে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী নবদ্বীপ ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে।

দীঘনগর - ছোট লাইনে কৃষ্ণনগর সিটি হইতে ৬ মাইল এবং শান্তিপুর হইতে ৪ মাইল দূর। নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র রাজা রাঘব প্রজাগণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য এখানে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করান। দীঘি হইতেই স্থানের নাম দীঘনগর হয়। ১৫৯১ শকে (১৬৬৯ খৃষ্টাব্দ) রাঘব এই দীঘির তীরে এক বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে রাঘবেশ্বর নামে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ একটি শ্লোকে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

আমঘাটা—কৃষ্ণনগর সিটি হইতে ৫ মাইল দূর। আমঘাটার অনতিদূরে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত হরিহরের মন্দির অবস্থিত। এই স্থানটির পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বে অলকানন্দা নামে একটি নদী প্রবাহিত হইত। ভাগীরথীর সহিত সংযোগ থাকায় ইহার জল গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত। অধুনা উহার স্রোত একরূপ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অলকানন্দার তীরে একটি সুরম্য প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং

উহার নাম রাখেন "গঙ্গাবাস"। প্রাসাদের নাম হইতে স্থানটিও গঙ্গাবাস নামে পরিচিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাবাসে হরিহর মূর্ত্তি এবং আরও ছয়টি দেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং পূজার জন্য ভূসম্পত্তির ব্যবস্থাও করেন। বর্ত্তমানে একমাত্র হরিহর ও কালভৈরবের মন্দির ছাড়া গঙ্গাবাসের পূর্ব্ব গৌরবের আর কিছুই নাই। বর্ত্তমান শতকের প্রারম্ভে গঙ্গাবাসের ভগ্ন প্রাসাদের স্তূপ হইতে চারিটি কামান পাওয়া যায়। ঐ কামানগুলি বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগরের রাজবাটিতে রক্ষিত আছে। হরিহর মন্দিরের গাত্রে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ আছে—
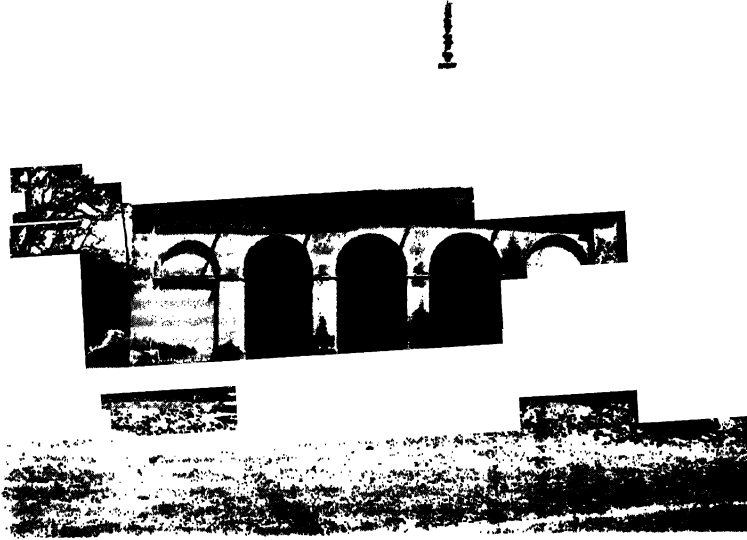
হরিহর মন্দির, গঙ্গাবাস

"গঙ্গাবাসে বিধি শ্রুত্যানুগত সুকৃতং ক্ষৌণীপালে সকেঽস্মিন্
শ্রীযুক্তঃ বাজপেয়ী ভুবি বিদিত মহারাজরাজেন্দ্র দেবঃ।
ভেত্তুং ভ্রান্তিং মুরারিত্রিপুরহর ভিদামজ্ঞতাং পামরাণাং
অদ্বৈতং ব্রহ্মরূপং হরিহরমমুয়া স্থাপয়ল্লোলয়াচ॥"

অর্থাৎ—

অজ্ঞ পামরগণ বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে যে ভেদ বুদ্ধি করে তাহা নিরসনের জন্য অশ্বমেধযজ্ঞকারী মহারাজ রাজেন্দ্র যথাবিধি অনুসারে এই গঙ্গাবাসে অদ্বৈতব্রহ্ম হরিহরের মন্দির স্থাপন করিলেন।

কথিত আছে যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বহু আয়াসে ও অর্থব্যয়ে চিত্রকূট হইতে শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্ন আনিয়া গঙ্গাবাসে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহা এখনও দৃষ্ট হয়। ৎকালে গঙ্গাবাস হরিহরক্ষেত্র ও মহাবারাণসী নামেও পরিচিত হইত।

আমঘাটা স্টেশনের নিকটে প্রাচীন **সুবর্ণ বিহারের** ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। অনেকে অনুমান করেন যে পূর্ব্বে এই স্থানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পাল রাজবংশ কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুবর্ণ বিহার নামটিই এই মতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পোষক। এই ধ্বংসাবশেষ প্রায় দুই বিঘা জমি লইয়া বিস্তৃত এবং প্রায় ১০ হাত উচ্চ। ইহা ইষ্টক ও প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। এই স্তূপ হইতে বহু ইষ্টকাদি লইয়া স্থানীয় অধিবাসিগণ গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে লাগাইয়াছে।

প্রবাদ যে, প্রাচীন কালে এখানে সুবর্ণ নামে একজন কুম্ভকার জাতীয় রাজা বাস করিতেন। শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি সপরিবারে মৃত্তিকা নিম্নস্থ নিরাপদ গৃহে প্রবেশ করেন এবং পরে দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ নির্গমনের পথ না পাইয়া সেখানেই চিরদিনের জন্য সপরিবারে সমাহিত হন।

বর্ত্তমানে সুবর্ণ বিহারের ধ্বংস স্তূপের উপর গৌড়ীয় মঠ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়া উহার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ নিত্য সেবা প্রাপ্ত হইতেছেন।

নবদ্বীপঘাট—কৃষ্ণনগর সিটি হইতে ৮ মাইল দূর। গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর সঙ্গম স্থলের উপর এই স্থান অবস্থিত। এখানে নামিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারস্থ শহর নবদ্বীপ ও পূর্ব্বপারস্থ (জলঙ্গী নদীর উত্তর পারে একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত) মায়াপুরে যাইতে হয়। (পূর্ব্ব ভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল-বারহাড়োয়া শাখার "নবদ্বীপধাম" স্টেশন দ্রষ্টব্য)। এই স্থানটির প্রকৃত নাম স্বরূপগঞ্জ। ইহা প্রাচীন নবদ্বীপ মণ্ডলের গোদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত। ইহার নিকটবর্ত্তী "সুরভিকুঞ্জ" ও "স্বানন্দ সুখদকুঞ্জ" বৈষ্ণবগণের দ্রষ্টব্য স্থান। স্বানন্দ সুখদকুঞ্জে গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলী ও সমাধি মন্দির বিরাজমান। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্য শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজীর ভজন কুটীরও এই কুঞ্জ মধ্যে অবস্থিত।

নবদ্বীপঘাট হইতে নৌকাযোগে জলঙ্গী বা খড়িয়া নদী পার হইয়া পদব্রজে বা গরুর গাড়ীতে করিয়া **মায়াপুরে** যাইতে হয়। ইহাকে স্থানীয় কেহ কেহ মিঞাপুর বলিয়া থাকেন। স্টেশন হইতে মায়াপুরের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। নবদ্বীপঘাটের ঠিক্ পূর্ব্ববর্ত্তী স্টেশন মহেশগঞ্জে নামিয়াও পদব্রজে মায়াপুরে যাওয়া যায়। এই পথের দূরত্ব এক মাইলের কিছু বেশী।

বহু পণ্ডিত, ভক্ত ও পুরাতত্ত্ববিদের মতে মায়াপুরই প্রাচীন নবদ্বীপ এবং এই স্থানই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান। প্রাচীন ইতিহাস ও বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রভৃতিতে উল্লিখিত আছে যে নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বতটে অবস্থিত। গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত শহর নবদ্বীপকে তাঁহারা প্রাচীন নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত কোলদ্বীপ বা কুলিয়া-পাহাড়পুর হইতে অভিন্ন মনে করেন। তাঁহাদের মতে প্রাচীন নবদ্বীপ নগর গঙ্গার ভাঙ্গনে নদীসাৎ হইবার উপক্রম হইলে এই স্থানের অধিবাসিগণ পশ্চিমপারস্থিত কুলিয়ার চরে গিয়া বসবাস করেন এবং সেই স্থানেই কালক্রমে বর্ত্তমান নবদ্বীপ শহর গড়িয়া উঠে। তাঁহারা আরও বলেন, যে সেনবংশীয় নৃপতি বল্লাল নবদ্বীপ বা নদীয়ায় গঙ্গাবাসের জন্য যে একটি

প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন ইহা অবিসম্বাদী ঐতিহাসিক সত্য। বল্লালের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজিও গঙ্গার পূর্ব্বতীরে মায়াপুর হইতে অর্দ্ধ মাইল উত্তরে বামনপুকুর গ্রামে বিদ্যমান আছে। প্রাচীন নবদ্বীপের অন্ততঃ একাংশ যে এই স্থানে অবস্থিত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থে নবদ্বীপই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া উল্লিখিত আছে, উহাতে মায়াপুরের কোন উল্লেখ নাই। তবে প্রাচীন নবদ্বীপ যে বিভিন্ন নামে পরিচিত বহু পল্লীতে বিভক্ত ছিল তাহার উল্লেখ আছে। নরহরি চক্রবর্ত্তী (বৈষ্ণব নাম ঘনশ্যাম দাস) প্রণীত "ভক্তি রত্নাকর" নামক গ্রন্থে নবদ্বীপ মধ্যবর্ত্তী মায়াপুরই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥"

শাস্ত্রমতে ভগবানের আবির্ভাব স্থানকে যোগপীঠ বলা হয়। সুতরাং নরহরি চক্রবর্ত্তীর মতে মায়াপুরই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান। "ভক্তি রত্নাকর" গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলীর ঐতিহাসিকতা বৈষ্ণব ও পণ্ডিত সমাজের বিশেষ অনুমোদিত। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক কাশীর দণ্ডী সমাজের নেতা প্রকাশানন্দ সরস্বতী (শ্রীচৈতন্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত নবনাম প্রবোধানন্দ সরস্বতী) প্রণীত "নবদ্বীপ শতক" ও জগদানন্দের "প্রেম বিবর্ত্ত" নামক গ্রন্থে মায়াপুরের সবিশেষ উল্লেখ আছে। ১২৫২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "কায়স্থ কৌস্তুভ" নামক পুস্তকে "উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র" হইতে ধৃত একটি বচনে মায়াপুরই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা "মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ।" "নদীয়াকাহিনী" নামক ঐতিহাসিক পুস্তকে ও "বিশ্বকোষ" অভিধানে মায়াপুরকেই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত মায়াপুর পল্লীই যে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান সে সম্বন্ধে আরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে বর্ত্তমান মায়াপুর যে প্রাচীন মায়াপুর এবিষয়ে তথা প্রাচীন নবদ্বীপের প্রকৃত অবস্থান লইয়া মত বিরোধের অবসান আজিও হয় নাই।

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা জগন্নাথদাস বাবাজী সর্ব্বপ্রথম বর্ত্তমান মায়াপুরের প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রশিষ্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সময়ই মায়াপুরের সমধিক প্রচার হয় এবং এখানে মঠ মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। বর্ত্তমানে মায়াপুর ক্রমশঃ একটি সুন্দর শহরে পরিণত হইতেছে এবং এখানে বহু দেবায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজকাল নবদ্বীপধামের যাত্রিগণের মধ্যে অনেকেই শহর নবদ্বীপ ও মায়াপুর এই উভয় স্থানই দর্শন করিয়া থাকেন। নিম্নে মায়াপুরের প্রধান দ্রষ্টব্য গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল ঃ—

(ক) **শ্রীশ্রীযোগপীঠ মন্দির** বা শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান ঃ—এই মন্দির খুব উচ্চ ও দেখিতে অতি সুন্দর। রাত্রিকালে ইহার চূড়াসকল বিচিত্রবর্ণ বিদ্যুৎ আলোকের দ্বারা উদ্ভাসিত করা হয় এবং বহু দূর হইতে ইহা দৃষ্টিপথে পড়ে। বাংলাদেশের আর

কোথাও সারা বছর ধরিয়া মন্দির চূড়ায় এই ভাবে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা নাই। এই মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীগৌর-রাধামাধব, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ও লক্ষ্মী প্রিয়া দেবী এবং পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাস আচার্য্যের বিগ্রহ বিরাজমান। মন্দির প্রাঙ্গনের উত্তর পার্শ্বে ক্ষেত্রপাল নামক শিবের মন্দির অবস্থিত ও তৎপার্শ্বে নিম্ববৃক্ষতলে শচীমাতার সূতিকা গৃহে শয়ান শিশু নিমাই, নিকটে শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র উপবিষ্ট; ইহাই চৈতন্য দেবের জন্মস্থান বলিয়া এখানে পূজিত হয়।
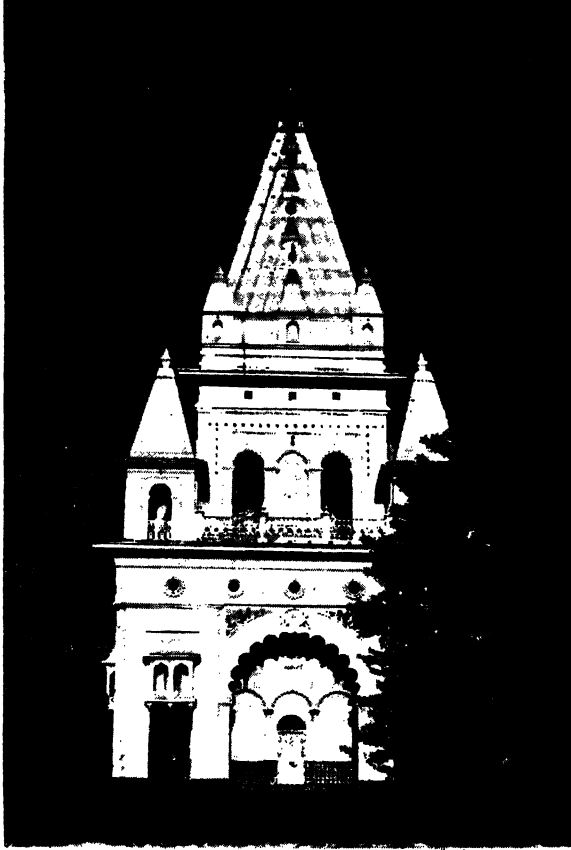
যোগপীঠ মন্দির মায়াপুর

যোগপীঠ মন্দিরের পূর্ব্বদিকে নৃসিংহদেবের মন্দির ও দক্ষিণদিকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্‌টিট্যুট্‌ নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন দ্বিতল ছাত্রাবাস অবস্থিত।

(খ) যোগপীঠ মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরে "খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা" বা **শ্রীবাস অঙ্গন** অবস্থিত। এখানে ভক্তগণ সহ সংকীর্ত্তনরত গৌর-নিতাই ও অন্যান্য বিগ্রহ স্থাপিত আছেন। প্রবাদ, এই স্থানে কাজী সংকীর্ত্তন দলের মৃদঙ্গ বা খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম "খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা" হয়।

(গ) **শ্রীবাস অঙ্গন** হইতে পাকা রাস্তা ধরিয়া কিঞ্চিৎ উত্তরমুখে গেলে পথিপার্শ্বে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ্চ ইন্‌স্‌টিট্যুট্" নামক বৈষ্ণব গবেষণাগার ও **অদ্বৈত ভবন** দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) পূর্ব্বোক্ত পথে উত্তরদিকে আর একটু অগ্রসর হইলে গৌড়ীয়-মঠের পূর্ব্বাচার্য্য সরস্বতী মহারাজের ভজনস্থলী "ভক্তি-বিজয় ভবন" ও তাঁহার সমাধি দৃষ্ট হয়। ইহার নিকটেই এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপর **শ্রীচৈতন্য মঠ** অবস্থিত। এই মঠটির শিল্প-নৈপুণ্য
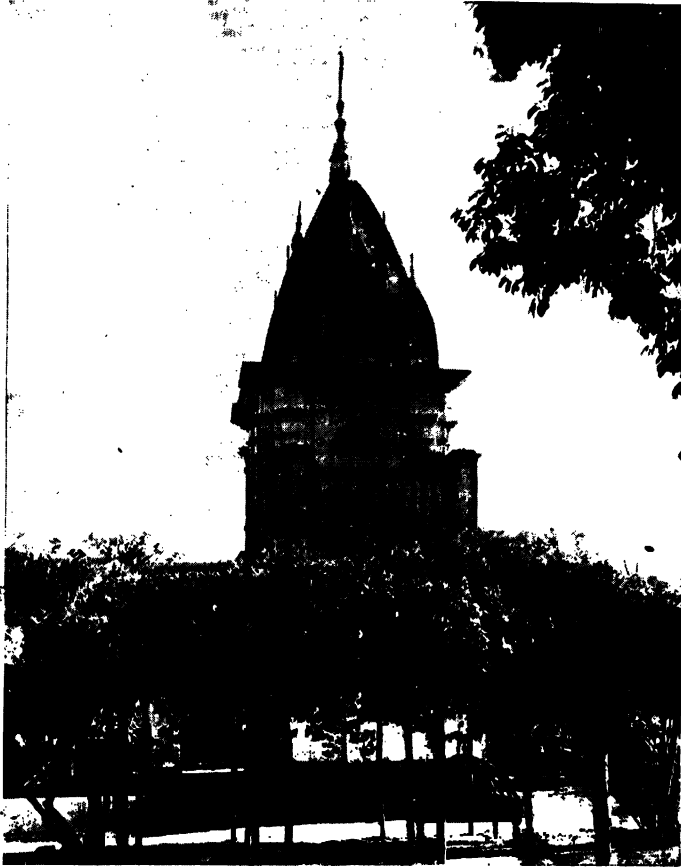
শ্রীবাস অঙ্গন মন্দির, মায়াপুর

বিশেষ প্রশংসনীয়। ইহার মোট উনত্রিশটি চূড়া আছে। মধ্যস্থলের গোলাকৃতি চূড়াটি ও তদুপরি স্থাপিত বিষ্ণুধ্বজ বহু দূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মঠের মধ্যে গৌরাঙ্গদেব ও রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি নিত্য পূজিত হন। ইহার সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে প্রত্যহ অপরাহ্নে শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ হয়। এই মঠের চারিদিককার চারিটি কক্ষে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয় যথা, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক ও রামানুজের প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। ইহার পার্শ্বেই দক্ষিণদিকে **বল্লাল দীঘির** লুপ্তপ্রায়

খাত দৃষ্ট হয়। এই দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব্ব তীরে **মুরারি গুপ্তের ভবন** অবস্থিত। এখানকার মন্দির মধ্যে রামসীতার বিগ্রহ স্থাপিত আছেন। চৈতন্য মঠের নিকটে গৌর-কিশোর দাস বাবাজীর সমাধি মন্দির ও ললিতাপ্রিয় দাস বাবাজীর সমাধি মন্দির অবস্থিত। শেষোক্ত মন্দির মধ্যে চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও তাঁহার পত্নীর মূর্ত্তি আছে।

(ঙ) **চাঁদকাজীর সমাধি ও বল্লাল ঢিবি** ঃ— মায়াপুর হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তরে বামনপুকুর নামক গ্রামে চাঁদকাজীর সমাধি ও মহারাজ বল্লাল সেনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বল্লাল ঢিবি দৃষ্ট হয়। চাঁদকাজীর প্রকৃত নাম মৌলানা সিরাজুদ্দিন।

চাঁদকাজীর সমাধি, বামনপুকুর

কথিত আছে, তিনি গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের শিক্ষক ছিলেন। এই কাজী প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তনে বাধা দেন ও একবার সংকীর্ত্তনকারিগণের খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে নগরমধ্যে সংকীর্ত্তন রহিত হইলে, শ্রীচৈতন্যদেব ঐ আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এক বিরাট সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রার সহিত কাজীর ভবনে গিয়া উপস্থিত হন এবং যুক্তি তর্কের দ্বারা তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করেন। কাজীর সমাধির উপর প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন একটি শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গোলক-চাঁপা ফুলের গাছ আছে। এত বড় ও এত প্রাচীন গোলক-চাঁপা গাছ বড় একটা দেখা যায় না। একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের মধ্যে এই সমাধিটি অবস্থিত। ভক্ত বৈষ্ণবগণ এই সমাধিকে প্রণাম, অর্চ্চনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। নিকটেই কাজীর প্রাসাদের

ভগ্নাবশেষ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি কারুকার্য্য খচিত প্রস্তর স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

বল্লাল ঢিবিটি প্রায় চারিশত ফুট লম্বা ও ২৫।৩০ ফুট উচ্চ। বর্ত্তমানে ইহা সরকারী রক্ষিত কীর্ত্তি বিভাগের অন্তর্গত। দূর হইতে ঢিবিটিকে একটি পাহাড়ের ন্যায় দেখায়। এই ঢিবি খনন করিলে সেনরাজগণের সময়ের অনেক রহস্য প্রকাশিত হইতে পারে বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এই ঢিবি উত্তর-পূর্ব্বদিকে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চিমদিকের বহু অংশ গঙ্গা-গর্ভসাৎ হইয়াছে। এই দিকে গঙ্গার একটি জলপূর্ণ খাত এখনও বিদ্যমান আছে। এই ঢিবি হইতে বহু প্রস্তর ও ইষ্টক আনীত হইয়া কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এখনও এই ঢিবির মধ্যে নানা মাপের ইষ্টক ও প্রস্তর দৃষ্ট হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোক এই স্থান খনন করিয়া কতকগুলি কাঠের বারকোষ, একটি বাক্সে রক্ষিত জীর্ণ শাল ও রেশমী কাপড় এবং কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা পাইয়াছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণের পক্ষে এই ঢিবিটি একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু।

পূর্ব্ব বর্ণিত দ্রষ্টব্যগুলি ছাড়া মায়াপুরে গৌরকুণ্ড, নিতাইকুণ্ড, শ্রীধর অঙ্গন, মহাপ্রভুরঘাট, মাধাইয়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট, নগরিয়া ঘাট, জয়দেবের পাট, শিবের ডোবা প্রভৃতি আরও বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। বর্ত্তমানে মায়াপুর হইতে গঙ্গা প্রায় দুই মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। তবে এককালে যে গঙ্গা এই স্থানের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহা গঙ্গার পরিত্যক্ত খাতসমূহ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

মায়াপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর ও যথাক্রমে গঙ্গা ও জলঙ্গী নদী। স্থানটি বিশেষ স্বাস্থ্যকর, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও অত্যধিক লোক কোলাহল বিবর্জ্জিত। এখানে গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে তারঘর ও ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গৌড়ীয় মঠ কর্ত্তৃক পরিচালিত "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" নামক একখানি সংবাদপত্র এই স্থান হইতে বাহির হয়। এখানে দাতব্য চিকিৎসালয় ও কয়েকটি ধর্ম্মশালা আছে। চৈতন্য মঠে সমাগত অতিথিবর্গকে অন্ন প্রসাদ দানের ব্যবস্থাও আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমা (দোল পূর্ণিমা) উপলক্ষে গৌড়ীয় মঠের তত্ত্বাবধানে শ্রীধাম নবদ্বীপ বা প্রাচীন নবদ্বীপ মণ্ডলের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐ পরিক্রমায় বহু ভক্ত যোগদান করেন। সমস্ত বৈষ্ণবপর্ব্বই এখানে মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মুড়াগাছা—কলিকাতা হইতে ৭৩ মাইল দূর। ইহা একটি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। সুপ্রসিদ্ধ রস-সাহিত্যিক ৺ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। এই স্থানে সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর একটি মন্দির আছে।

দেবগ্রাম—কলিকাতা হইতে ৮৭ মাইল দূর। ইহা একটি প্রাচীন পল্লী। এই স্থানে কয়েকটি ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন ও উচ্চ ভূখণ্ড দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে সেন রাজগণের সময়ে এখানে একটি জয়-স্কন্ধাবার বা সেনানিবাস ছিল। পূর্ব্বে

এই স্থান সংস্কৃত চর্চ্চার একটি বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। স্বনামখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী দেবগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যেরূপ ভক্ত তেমনই পণ্ডিত ছিলেন। আওরঙ্গজেবের সময়ে মথুরা ও বৃন্দাবন বিধ্বস্ত হইবার পর বিশ্বনাথের চেষ্টায় ও দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহের সেনাপতি জয়পুররাজ দ্বিতীয় জয়সিংহের সাহায্যে উক্ত তীর্থদ্বয়ের লুপ্তগৌরবের পুনরুদ্ধার হয়। জয়সিংহ বিশ্বনাথের প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া শিষ্যের ন্যায় তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। প্রায় একশত বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে বিশ্বনাথের লোকান্তর ঘটে। বৈষ্ণব সমাজে বিশ্বনাথ কৃত টীকা ও মৌলিক গ্রন্থগুলি বিশেষ আদরের সহিত পঠিত হয়। তাঁহার "সারার্থ দর্শনী" নামে ভাগবতের টীকা "সারার্থ বর্ষিণী" নামে ভগবদগীতার টীকা, "সুবোধিনী" নামে অলঙ্কারকৌস্তুভের টীকা ও তৎ প্রণীত মৌলিক সংস্কৃত গ্রন্থ "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত," "চমৎকার চন্দ্রিকা," "প্রেম সম্পুট," "ব্রজরীতি চিন্তামণি" প্রভৃতি তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও ভক্তির পরিচায়ক। তিনি চব্বিশখানি টীকা ও মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি হরিবল্লভ বা বল্লভ এই ভনিতা দিয়া অনেক সুন্দর পদাবলীও রচনা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনধামে বিশ্বনাথের এতদূর প্রভাব ছিল, যে অনেকে তাঁহাকে সুবিখ্যাত রূপ গোস্বামীর অবতার বলিয়া মনে করিতেন। তৎকালে বৈষ্ণবপ্রধানগণ কর্ত্তৃক তাঁহার নামের এইরূপ একটি ব্যাখ্যা প্রচারিত হইয়াছিল ঃ—

"বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যায়াভবৎ ॥"

"সকলকে মহাদেবের ন্যায় ভক্তির পথ দেখাইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম বিশ্বনাথ এবং ভক্তমণ্ডলীর শীর্ষস্থান অধিকার করায় ইনি চক্রবর্ত্তী।"

পলাশী—কলিকাতা হইতে ৯৩ মাইল দূর। এ লাইনে ইহাই নদীয়া জেলার শেষ স্টেশন। স্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে ইতিহাস-বিশ্রুত পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র অবস্থিত। কথিত আছে, পূর্ব্বে এই অঞ্চলে বহু পলাশ বৃক্ষ থাকায় এই স্থানের নাম হয় পলাশী, কিন্তু বহুকাল হইতে ইহাদের কোন চিহ্নই নাই। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুন বৃহস্পতিবার এই স্থানে বাংলার শেষ স্বাধীন নৃপতি নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনাবাহিনীর সহিত ক্লাইভের অধিনায়কতায় ইংরেজ সৈন্যের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে জয়লাভ করিয়া ইংরেজ কার্য্যতঃ বাংলার আধিপত্য লাভ করেন। মীরজাফর ও দুর্লভরামের অধীনে নবাবের প্রায় ৪৫,০০০ সৈন্য ছিল। কিন্তু ইঁহারা গোপনে ইংরেজ পক্ষ গ্রহণ করায় যুদ্ধকালে নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। ইহার ফলে মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈন্য কর্ত্তৃক নবাবের বিপুল বাহিনী পরাজিত হয়। পলাশী-প্রান্তরবাহিনী ভাগীরথীর তটে একটি ঘন সন্নিবিষ্ট আম্রকুঞ্জের মধ্যে ক্লাইভ শিবির সন্নিবেশ করেন। ইহার অদূরে ভাগীরথীর দুইটি বড় বাঁকের সম্মুখভাগে নবাব বাহিনী অবস্থান করিতে থাকে। নবাব পক্ষীয় সিনফ্রে বা সেন্ট্ ফ্রায়াস্ নামে একজন ফরাসী সেনাপতির অধীন গোলন্দাজ সৈন্য ইংরেজ শিবির লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বপ্রথম গোলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। সিনফ্রের পশ্চাতে যথাক্রমে সিরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদন বা মীর মর্দ্দান এবং রাজা

মোহনলাল সসৈন্যে উপস্থিত ছিলেন। সকাল আটটার সময় প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে গোলায় গোলায় যুদ্ধ চলিতে থাকে। ক্লাইভ জয়ের আশা সুদূর পরাহত দেখিয়া ইংরেজ সৈন্যকে হটিয়া আসিয়া আম্রকানন মধ্যে অবস্থান করিতে আদেশ দিলেন। এই সময়ে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় নবাবের সমস্ত বারুদ জলে ভিজিয়া নষ্ট হইয়া যায়, ইংরেজ পক্ষ নিজেদের বারুদ রক্ষা করিতে সমর্থ হন। ইংরেজ সৈন্যকে আম্রকাননে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মীরমদন একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আম্রকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হন। সহসা ইংরেজ শিবির হইতে—

"ছুটিল একটি গোলা রক্তিম বরণ।
বিষম লাগিল পায়ে সেই সাংঘাতিক ঘায়ে,
ভূতলে হইল মীরমদন পতন॥"

মীরমদনের পতনের পর মহাবীর মোহনলাল সসৈন্যে আম্রকুঞ্জের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মীরমদনের পতনের সংবাদ শুনিয়া নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মীরজাফরকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার পদতলে উষ্ণীষ রাখিয়া এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আবেদন করেন। মীরজাফর সে দিবস তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য পরামর্শ দেন। তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে সিরাজ মোহনলালকে যুদ্ধে ভঙ্গ দিবার জন্য আদেশ প্রেরণ করেন। মোহনলাল ইহাতে প্রথমে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু মীরজাফরের কথায় নবাব কর্তৃক পুনঃপুনঃ আদিষ্ট হইয়া তিনি বিরক্তিসহকারে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। মোহনলাল যুদ্ধে ভঙ্গ দিলে নবাব সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং ইংরেজ সৈন্য তাঁহাদিগকে নব বিক্রমে আক্রমণ করে। ফরাসী সেনাপতি সিনফ্রে কাহারও কথায় রণে ভঙ্গ না দিয়া স্বীয় গোলন্দাজ সৈন্যসহ ইংরেজ সৈন্যের গতি প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় ইংরেজ সৈন্য নবাবের শিবির অধিকার করিল। ইহার পূর্ব্বেই নবাব উষ্ট্রারোহণে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে চলিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে পলাশীর ইতিহাস বিশ্রুত যুদ্ধের অবসান হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষে মাত্র ৭০ জন লোক হত ও আহত হয়। সেই রাত্রিতেই ক্লাইভ পলাশী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রায় ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত দাদপুর গ্রামে শিবির সন্নিবেশ করেন এবং পরদিন প্রাতে মীরজাফর তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিনন্দিত করেন। দাদপুরে নবাবদিগের একটি বাটী ছিল। দাদপুর পলাশীর পরের স্টেশন রেজীনগর হইতে প্রায় ২ মাইল উত্তরে।

ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তনের ফলে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রের অধিকাংশ স্থান নদীসাৎ হইয়া এখন চরভূমিতে পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষিণে এখন তেজনগর বা নূতন পলাশী গ্রাম বসিয়াছে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণকারী ভ্যালেন্টিন পলাশীর বিখ্যাত আম্রকুঞ্জ দেখিয়াছিলেন ঃ বাগানের শেষ আম্রবৃক্ষটি শুষ্ক হওয়ায় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাহার মূলদেশ উৎপাটিত করিয়া পলাশী বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পুরাতন আমগাছের আর কোন চিহ্নই নাই। পলাশী পরগণার কিছু অংশ রাণী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। কথিত আছে, তিনি এখানে একলাখ আমগাছের বাগান

করিয়াছিলেন। এই জন্য এই স্থান লাখবাগ নামেও অভিহিত হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকার কর্ত্তৃক পলাশীর মাঠে শেষ আম্রবৃক্ষটির ৬০।৭০ হাত দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে গ্রেনাইট প্রস্তরনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তৎস্থলে একটি অপেক্ষাকৃত বড় স্তম্ভ ও তাহার নিকটে দর্শকগণের বিশ্রামের জন্য একটি ডাকবাংলা নির্ম্মাণ করেন।

পলাশী হইতে ৪।৫ মাইল এবং পরের স্টেশন রেজীনগরের নিকটে অবস্থিত ফরিদপুর গ্রামের ফরিদতলা নামক স্থানে ফরিদ সাহেব নামক জনৈক মুসলমান সাধুর সমাধির নিকট সিরাজের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদনের সমাধি অবস্থিত। কথিত আছে, মীরমদনের ইচ্ছানুসারেই তাঁহাকে ফরিদ সাহেবের পবিত্র সমাধি ভবনে সমাহিত করা হয়।

মীরমদনের সমাধি, ফরিদতলা

পলাশীর যুদ্ধ এবং সিরাজদ্দৌলার পরাজয় সম্বন্ধে তৎকালীন গ্রাম্য কবিগণের রচিত গান আজিও পলাশীর নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় –

"কি হলোরে জান,
পলাশী ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলিপড়ে রয়ে,
একলা মীরমদন বল কত নেবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্ত্তি গায়,
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীর মদনের গায়।
কি হলোরে জান,
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
নবাব কাঁদে সিপুই কাঁদে আর কাঁদে হাতী,
কল্‌কেতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী।

কি হলোরে জান,
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানি নিশান।
ফুলবাগে ম'ল নবাব খোসবাগে মাটী,
চাঁদোয়া টাঙ্গায়ে কাঁদে মোহনলালের বেটী।
কি হলোরে জান,
পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানি নিশান।"

এরূপ কথিত হয়, যে সিরাজ মহিষী লুৎফউন্নেসা মোহনলালের ভগিনী ছিলেন। বেভারিজ সাহেবেরও এই মত। গ্রাম্য কবি ভগিনীকে বেটী করিয়াছেন। অপর মতে লুৎফউন্নেসা আলিবর্দ্দী-পরিবারে ক্রীতদাসী ছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধ অবলম্বনে রচিত কবিবর নবীন চন্দ্র সেনের "পলাশীর যুদ্ধ" নামক কাব্য শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই পরিচিত।

পলাশীর স্টেশনের নিকটে একটি প্রকাণ্ড চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

বেলডাঙ্গা কলিকাতা হইতে ১০৫ মাইল দূর। ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানেও একটি চিনির কারখানা আছে।

বহরমপুর কোর্ট—কলিকাতা হইতে ১১৬ মাইল দূর। মীর কাসিমের পতনের পরে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলার নবাবের সৈন্য-সামন্ত কাড়িয়া লইলেন তখন হইতে বহরমপুরের উৎপত্তি। নবাবকে আজ্ঞাধীন রাখিবার জন্য রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিকট ইংরেজ সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন বোধে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রথম এই স্থানে সেনানিবাস তৈয়ারী হয়। বহরমপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে ব্রহ্মপুর হইতে; এখানকার আদি মৌজা বা গ্রামের নাম ব্রহ্মপুর। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বহরমপুরে গোরাবারিক্ বা ক্যাণ্টনমেণ্ট নির্ম্মাণ শেষ হয়। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের অবস্থা হীন হইয়া আসিলে সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হয় এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এখানকার সেনানিবাস উঠিয়া যায়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানে মাত্র একটি দেশীয় সেনাদল ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বহরমপুরেই সর্ব্বাগ্রে বিদ্রোহ বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। মীরাট ও দিল্লীর পূর্ব্বে বহরমপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়াছিল। কিন্তু প্রারম্ভেই তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হয় বলিয়া এখানে কিছু হাঙ্গামা হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোহের পর পুনরায় এখানে ইংরেজ সেনাদল রাখা হয়। স্থানীয় দ্বিতল ও একতল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শূন্য সেনানিবাস এখন কাছারী এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের বাসস্থান হইয়াছে। বহরমপুরের দক্ষিণদিকে গঙ্গাতীরে অনেকদিন পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি (Agent to the Governor General-এর) বাড়ী ও কাছারী ছিল। এক্ষণে ইহা কলেক্টরের বাটী ও সার্কিট হাউস রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই বাটীতে ক্লাইভ কিছু কাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। সেনানিবাসের প্রধান বাজার এখনও গোরাবাজার নামে পরিচিত।

বহরমপুর মুর্শিদাবাদ জেলার সদর মহকুমা।

এখানকার কৃষ্ণনাথ কলেজ স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত। ইংরেজ সরকার ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কলেজের অনুকরণে এই বৃহৎ ও সুন্দর কলেজ ভবনটি নির্ম্মিত করাইয়া ছিলেন। এরূপ সুদৃশ্য কলেজ বাংলা দেশে অল্পই আছে; ভাগীরথীকূলে অবস্থিত এই সুরম্য কলেজ ভবন ও ইহার ঘড়িঘর বহরমপুরের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সরকার কলেজটির ব্যয়বহনে অসমর্থ হইলে মহারাণী স্বর্ণময়ী উহার ভার গ্রহণ করিয়া কলেজটিকে রক্ষা করেন। প্রাতঃস্মরণীয় পরলোকগত মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সাহায্যে এই কলেজের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি হয়। বাংলার নানাস্থানের বহু ছাত্র এখানে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহাদের থাকিবার জন্য অনেকগুলি ছাত্রাবাস আছে।

রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য সরকার প্রতিষ্ঠিত একটি সেরিকালচারাল ফার্ম্ এখানে আছে।

বর্ত্তমান বহরমপুর জেলখানা পূর্ব্বে সেনা নিবাসের হাঁসপাতাল ছিল। বহরমপুরের পূর্ব্বদিকে ইংরেজ শাসনের প্রথম আমলের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গোরা-বাজার হইতে তিন মাইল পূর্ব্বদিকে মাদাপুরে পুরাতন জেলখানা এবং বহরমপুর কোর্ট স্টেশনের উত্তরে বাবুলবনায় একটি পুরাতন খৃষ্টান গোরস্থান আছে; এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ইংরেজ সেনা নায়ক জর্জ্জ টমাসের সমাধি আছে; টমাস্ নৌবিভাগের কর্ম্ম ছাড়িয়া বেগম সমরু প্রভৃতির অধীনে সেনানায়কের কার্য্য করিয়া প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। মালদহের গোয়ালমাটি নীলকুঠির ক্রাইটন সাহেবও এখানে শায়িত; ইনি গৌড়ের ধ্বংস স্তূপ লইয়া বহু অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করেন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ ডক্টর রামদাস সেন বহরমপুরের অধিবাসী ছিলেন; বহরমপুরের সুবিখ্যাত গ্রন্থাগার তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। তৎপ্রণীত "ঐতি-হাসিক রহস্য" "ভারত রহস্য" "রত্ন রহস্য" "বুদ্ধদেব চরিত" প্রভৃতি গ্রন্থ সুধীসমাজে বিশেষ সমাদৃত। বহরমপুর কলেজের নিকটে এই মনীষীর প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বনামখ্যাত রাষ্ট্রনৈতিক নেতা বৈকুণ্ঠনাথ সেন, "উদ্ভ্রান্ত প্রেম" প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, টডের "রাজস্থানের" বঙ্গানুবাদক যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিখ্যাত ঐতি-হাসিক নিখিলনাথ রায়ের নামও বহরমপুর প্রসঙ্গে স্মরণীয়। নিখিলনাথ রায়ের ঐতিহাসিক চিত্র "মুর্শিদাবাদ কাহিনী" বাংলা ভাষার একটি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ।

এই বহরমপুরেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বাংলা তারিখ সন্ ১৩১৫ সালের ১৭ই ও ১৮ই কার্ত্তিক অনুষ্ঠিত হয়।

বহরমপুর হইতে এক মাইল দক্ষিণে চালতিয়া-মালতিয়া গ্রামে প্রতিবৎসর ৯ই চৈত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রামের পূজা উপলক্ষে প্রায় এক মাস ব্যাপী একটি মেলা বসে।

বহরমপুর হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভাগীরথীর অপর পারে রাঙ্গামাটির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আসা যায়। পূর্ব্ব ভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল-বারহাড়োয়া শাখার "চিরতী" স্টেশন দ্রষ্টব্য।

বহরমপুর জেলখানার উত্তরে খাগড়া বাজার; ইহা রেশমী কাপড় ও কাঁসার বাসনের জন্য সমগ্র বাংলা দেশে প্রসিদ্ধ। খাগড়া বহরমপুরেরই অংশ বিশেষ।

মুর্শিদাবাদের হস্তিদন্তের শিল্পের কথা সুপ্রসিদ্ধ; এক কালে এই শিল্পীরা ভারতবর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতেন; কিন্তু এখন লোকের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই শিল্প-ধারাটি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। খাগড়ায় চিরকালই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদিগের বাস ছিল; এখন মাত্র দু এক ঘর দেখিতে পাওয়া যায়। মাথরা, দৌলতবাজার প্রভৃতি গ্রামে এখন আর কোনও শিল্পী দেখিতে পাওয়া যায় না। মুর্শিদাবাদের এই শিল্পের বিশেষত্ব হইতেছে অতি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত কাজ। ইহার জন্য প্রায় ৭০।৮০ রকমের বিভিন্ন যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। নানা রকম দেবদেবীর মূর্ত্তি, জন্তু জানোয়ার, গরুর গাড়ী, নৌকা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের কাজ দেখিতে পাওয়া যায়। মূর্ত্তিগুলি হাতীর দাঁত সম্পূর্ণ কুঁদিয়া বাহির করা হয়; শিল্পীরা জোড় দেওয়া মোটেই পছন্দ করেন না। মুর্শিদাবাদের নবাবী আমল হইতে এই শিল্পের উৎপত্তি; কথিত আছে প্রথমে দিল্লী হইতে একজন শিল্পীকে লইয়া আসা হয়; তিনি যখন দরজা বন্ধ বরিয়া কাজ করিতেন, তখন একজন হিন্দু ভাস্কর লুকাইয়া দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া দেখিয়া ইহা শিখিয়া লন এবং তাঁর পুত্র তুলসীকে ইহা শিখাইয়া দেন; কথিত আছে তুলসী অতি সুদক্ষ শিল্পী হইয়া উঠেন। একবার তীর্থ করিয়া ১৭ বৎসর পরে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলে নবাবের আদেশে স্মৃতি হইতে পূর্ব্বেকার নবাবের একটি অতি সুন্দর মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন; পূর্ব্বতন নবাবের সহিত মূর্ত্তিটির আশ্চর্য্য রকম সৌসাদৃশ্য দেখিয়া নবাব প্রীত হইয়া তাঁহাকে গত ১৭ বৎসরের পুরা মাহিনা এবং একটি বাটী প্রদান করেন। এখনও তুলসীর নাম উঠিলে শিল্পীরা তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকেন।

খাগ্‌ড়ার অপর পারে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে পূর্ব্ব ভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল-বারহাড়োয়া লুপ শাখার খাগ্‌ড়াঘাট রোড্ স্টেশন অবস্থিত। এই স্টেশনের পূর্ব্বদিকে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বহরমপুর-খাগ্‌ড়ার অপর পারে ভৃঙ্গেশ্বর মন্দিরের নিকট ভীমের গদা নামে প্রস্তর স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়; এগুলি বৌদ্ধযুগের বলিয়া অনুমিত হয়।

খাগ্‌ড়ার ঠিক উত্তরেই ভাগীরথী কূলে **সৈয়দাবাদ**; পূর্ব্বে ইহা কাশীমবাজারের শহরতলী বলিয়া গণ্য হইত। এখানে ফরাসীদিগের কুঠি ছিল; ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে চন্দননগর হইতে একদল ফরাসী এখানে আসিয়া বাণিজ্যে লিপ্ত হন। সুপ্রসিদ্ধ ডুপ্লে (Dupleix) কিছুকাল এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত ফরাসী কুঠির মনোমালিন্য হইলে নবাব সৈন্য কুঠি পরিবেষ্টিত করে এবং ফরাসীগণকে ৫০ হাজার সিক্কা টাকা দিয়া নবাবকে তুষ্ট করিতে হয়। ক্রমে ইংরেজ বণিকদিগের সহিত বাণিজ্যে প্রতিযোগিতায় ফরাসীরা হটিয়া যান। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে যুদ্ধ বাধিলে বহরমপুরের ইংরেজ সেনা নায়ক ফরাসী কুঠি অধিকার করিয়া লন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বহরমপুর হইতে মুর্শিদাবাদ লালবাগ পর্য্যন্ত নদী তীর দিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার সময়ে ফরাসী কুঠিকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়; ইহার চিহ্নমাত্র যদিও এখন আর নাই স্থানটি এখনও ফরাসডাঙ্গা নামে পরিচিত। বহরমপুরের জলের কল ফরাসডাঙ্গায় অবস্থিত।

সৈয়দাবাদে ফরাসীদিগের আবাস স্থান বা **ফরাসডাঙ্গার** পূর্ব্বদিকে আর্মেনীয় বণিকগণের বাস ছিল। তাঁহার ফরাসীদিগের পূর্ব্বে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে এ অঞ্চলে আগমন করেন। তাঁহারা সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে একখণ্ড ভূমির সনন্দ পাইয়া তাঁহাদের গির্জা প্রতিষ্ঠা করেন। সৈয়দাবাদের যে অংশে আর্মেনীয়গণ বাস করিতেন তাহা শ্বেতাখাঁর বাজার নামে পরিচিত ছিল; আর্মেনীয়গণ এসিয়াবাসিগণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গৌর বা শ্বেতবর্ণ হওয়ায় তাঁহারা শ্বেতা খাঁ নামে অভিহিত হইতেন। **শ্বেতাখাঁর বাজার** এখন **আমানিগঞ্জ** (আর্মানীগঞ্জ) নামে পরিচিত। পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন আর্মেনীয় গির্জাটির পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান সুবৃহৎ **আর্মেনীয় গির্জাটি** নির্ম্মিত হয়। এ সময়ে বহু আর্মেনীয় বণিক সৈয়দাবাদে বাস করিতেন। পূর্ব্বে আর্মেনীয়া হইতে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর নূতন পুরোহিত আনয়ন করা হইত। এখনও এখানে একটি আর্মেনীয় পুরোহিত পরিবার গির্জাটির তত্ত্বাবধান করেন। গির্জার প্রাঙ্গনে অনেক সমাধিতে আর্মেনীয় ভাষায় লিখিত ফলক দৃষ্ট হয়। এই গির্জাটি সৈয়দাবাদের একটি দেখিবার জিনিষ। আমানিগঞ্জের অপর পারে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে খোশবাগ অবস্থিত; মুর্শিদাবাদ দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব সমাজে সম্মানিত কবিরাজ হরিরামাচার্য্য ও তাঁহার ভ্রাতা রামকৃষ্ণ আচার্য্যের বংশধরগণের গৃহে বহুদিন হইতে কৃষ্ণরায় ও মোহন রায়ের বিগ্রহ পূজিত হইতেছে। সৈয়দাবাদের অপর পারে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে বুঁধুই পাড়া গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা ঠাকুরঝির সহিত শ্রীনিবাসের ভক্ত শিষ্য রামকৃষ্ণ চট্টরাজের পুত্র গোপীজনবল্লভের বিবাহ হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্যের দুই পৌত্র রাধামাধব ঠাকুর ও সুবলচন্দ্র ঠাকুর এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। সুবলচন্দ্র তাঁহার পিসীমা হেমলতা ঠাকুরঝির মন্ত্র শিষ্য। এই সুবলচন্দ্রের শিষ্য মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার মালিহাটী বা মেলেটি গ্রাম নিবাসী প্রসিদ্ধ পদ কর্ত্তা যদুনন্দন দাস হেমলতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশাবলী ও শিষ্য সম্প্রদায় বিষয়ক একখানি পদ্য গ্রন্থ ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে বুঁধুইপাড়ায় সমাপ্ত করেন। হেমলতা এই গ্রন্থের নাম দেন "কর্ণানন্দ"; বৈষ্ণব সমাজের তদানীন্তন ইতিহাস ইহাতে পাওয়া যায়। যদুনন্দন আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

সৈয়দাবাদের পূর্ব্বাংশ **কুঞ্জঘাটায়** নবাব মীরজাফরের দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ মহারাজা নন্দকুমার রায়ের একটি প্রকাণ্ড ও পুরাতন বাড়ী বর্ত্তমান আছে। তাঁহার এক দৌহিত্রের বংশধরেরা এখানে বাস করিতেছেন; ইঁহারা কুঞ্জঘাটার রাজবংশ নামে পরিচিত। কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে মহারাজা নন্দকুমারের আমলের বহু পুরাতন দলিলপত্র ও স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত আছে। ইহাদের মধ্যে পুরীধামে ভক্তগণ বেষ্টিত শ্রীচৈতন্যদেবের একখানি অতি সুন্দর প্রাচীন তৈল চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইহা নিয়মিত ভক্তি সহকারে পূজিত হইয়া থাকে। কথিত আছে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে ওড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র দেবের আদেশে ইহা অঙ্কিত হয়। তৎকালের বৈষ্ণব ভক্তগণের মতে চৈতন্যদেবের সহিত এই চিত্রের বিশেষ মিল আছে। পুরাতন হইলেও ছবিটি দেখিলে নূতন আঁকা বলিয়া ভ্রম হয়। মহারাজ নন্দকুমার চিত্রখানি তাঁহার গুরু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য রাধামোহন ঠাকুরের

নিকট হইতে উপহার লাভ করেন। কথিত আছে, একবার নন্দকুমার বঙ্গের নানাস্থান হইতে এক লক্ষ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পদধূলি সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রাখিয়াছিলেন। এই ধূলি কুঞ্জঘাটার রাজবাটীতে এখনও রক্ষিত আছে।

নন্দকুমারের পৈতৃক নিবাস ছিল বীরভূম জেলার অন্তর্গত ভদ্রপুর বা ভাতুর গ্রামে। এই স্থানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তথায় তাঁহার জন্ম ভবন এখনও দৃষ্ট হয়। তাহা ছাড়া নন্দকুমার নির্ম্মিত দেওয়ান খানা আছে। নন্দকুমারের পিতা মুর্শিদাবাদে রাজস্ব বিভাগে কার্য্য করিতেন। বাল্যকাল হইতে নন্দকুমার পিতার সহিত থাকিয়া এই কার্য্যে দক্ষতা অর্জ্জন করেন এবং প্রথমে আমিনী কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া স্বীয় প্রতিভাবলে বাংলার নবাব মীরজাফরের দেওয়ানের পদ পর্য্যন্ত লাভ করেন। মীরজাফর তাঁহার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতেন। তিনিই দিল্লীর বাদশাহকে অনুরোধ করিয়া নন্দকুমারকে মহারাজা উপাধি প্রদান করাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিপত্তি দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া কতকগুলি লোক তাঁহার শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ কার্য্যতঃ এ দেশের অধিকার লাভ করিলে ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারল ওয়ারেন হেস্টিংসের সহিত নন্দকুমারের ভীষণ মনোমালিন্য হয়। পরে তিনি কিরূপে জাল করার অপরাধে অপরাধী গণ্য হইয়া তৎকালীন ইংলণ্ডীয় আইন অনুসারে সুপ্রীম কোর্টের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন তাহা শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই অবগত আছেন। নন্দকুমারের অসাধারণ প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার কথা তাঁহার শত্রুপক্ষও স্বীকার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্র নৈতিক ব্যাপারে ভারতীয়গণের মধ্যে তিনি বিশেষ প্রভাবশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন ; এই জন্য তিনি "কালা কর্ণেল" আখ্যা পাইয়াছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার ফাঁসী হইলে বহু লোক ব্রহ্মহত্যার জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাস করেন। তাঁহার মৃত্যুতে এ দেশে চারিদিকে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। নন্দকুমারের প্রতিষ্ঠার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত গ্রাম্য গীতি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

মহারাজ নন্দকুমার রে
তোর রাজপাট জমিদারী কারে দিলিরে
নন্দকুমার রায় ছিল বাংলার অধিকারী।
হেষ্টিং সাহেব এলো জান্ করিবারে বারি ॥
নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ গঙ্গার পানে চেয়ে
আর না আসিবে বাছা যোড়া ডিঙ্গি বেয়ে।
খোপেতে কৌতর কাঁদে ফোহারাতে হাঁস
যোড় বাংলায় কাঁদে সোনার গুল্‌তে বাঁশ।
ছোট রাণী উঠে বলে বড় রাণী গো দিদি।
সিঁতে ছিল কড়া সিঁদুর বঞ্চিত করলেন বিধি ॥

(মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিলনাথ রায়, ৪০৯ পৃষ্ঠা)

এই গ্রাম্য গীতে দুইটি রাণীর কথা থাকিলেও তাঁহার এক পত্নী ক্ষেমঙ্করীর কথাই শুধু জানা যায়। নন্দকুমারের একমাত্র পুত্র রাজা গুরুদাস গৌড়াধিপতি উপাধি পাইয়াছিলেন। কলিকাতার বীডন উদ্যানের নিকট রাজা গুরুদাসের নামে একটি রাস্তা এখনও আছে। কলিকাতায় নন্দকুমারের আবাস বাটীর স্থলেই বীডন উদ্যান হইয়াছে।

কাশীমবাজার—কলিকাতা হইতে ১১৮ মাইল দূর। এই স্থান বহরমপুরের উত্তরে ও সৈয়দাবাদের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। মুর্শিদাবাদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই কাশীমবাজার বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পূর্ব্বে ইহার পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইত। মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুরের মধ্যে তৎকালে একটি বড় বাঁক ছিল এবং বহমরপুর হইতে নৌকা যোগে মুর্শিদাবাদ যাইতে প্রায় একদিন লাগিত। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে একটি খাল কাটিয়া এই বাঁকের দুই প্রান্ত সংলগ্ন করিবার ফলে, সেই খাল দিয়াই ভাগীরথীর প্রবাহ চলিতে আরম্ভ করে এবং ফলে বড় বাঁকটি একটি বাওড় বা বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়। এই কারণেই ভীষণ ব্যাধির প্রকোপে বাঁকের উপর অবস্থিত কাশীমবাজার প্রভৃতি বন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই বাঁকের উপর কাশীমবাজারে ইংরেজদিগের, কালিকাপুরে ওলন্দাজদিগের, সৈয়দাবাদের শ্বেতাখাঁর বাজারে (বর্ত্তমান নাম আমানিগঞ্জ) আর্ম্মেনীয়দিগের ও সৈয়দাবাদ ফরাসডাঙ্গায় ফরাসীদিগের বাণিজ্য কুঠি অবস্থিত ছিল। কাশীমবাজার ও নিকটবর্ত্তী এই সকল স্থানে তৎকালে রেশমের বিস্তৃত কারবার ছিল। কথিত আছে, যে কাশীমবাজারের সমৃদ্ধির সময় এখানে এত অধিকসংখ্যক ঘন সন্নিবিষ্ট অট্টালিকা ছিল যে লোকে পর পর ছাদের উপর দিয়া দুই তিন ক্রোশের উপর চলিয়া যাইতে পারিত। ইংরেজগণের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা কাশীমবাজারের ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করেন। সেই সময়ে ওয়াটস্ সাহেব কুঠির রেসিডেণ্ট্ ও ওয়ারেন হেষ্টিংস একজন সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। উভয়েই বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন। কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে বাৎসরিক ২০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৩০০ টাকা বেতনে কাশীমবাজার কুঠির সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন। সপ্তগ্রামের পতনের পর ও কলিকাতার উত্থানের পূর্ব্বে কাশীমবাজার বাংলার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। সে সময়ে পদ্মা, ভাগীরথী ও জলঙ্গীর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড কাশীমবাজার দ্বীপ নামে কথিত হইত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুর্শিদাবাদে বাংলার রাজধানী ঢাকা হইতে স্থানান্তরিত হইলে কাশীমবাজারের বাণিজ্য গৌরব বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়। কাশীমবাজারই মুর্শিদাবাদ-রেশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। নানা রকমের রেশমী কাপড় এখানে প্রস্তুত হইত। ইউরোপের জন্য গাউনপিস্ কোড়া, অসমীয়া মহিলাদিগের জন্য মেঘলা ও রিয়া, ব্রহ্মদেশীয়দিগের জন্য ফুলিকাট্ চেক্, বাংলা ও আরব দেশের জন্য বিভিন্ন নমুনার রেখী, ধারী ও চারখানা, বাংলা ও মহারাষ্ট্রের জন্য মটকা ও চেলীর ধুতি ও শাড়ী, বাংলার জন্য শাদা রেশমের তাজপাড়, কল্কাপাড়, পদ্মপাড়, ভোমরাপাড় শাড়ী, ধানী, কট্কাপাড়, ফিতাপাড়, ঘুন্সীপাড়, চুড়িপাড় ধুতি, বালুচর বুটীদার শাড়ী, উত্তর ভারতের জন্য নানা রকম চুড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হইত।

বর্ত্তমানে কাশীমবাজারের পূর্ব্ব গৌরবের চিহ্ন বিশেষ কিছুই নাই। ভাগীরথীর মজিয়া যাওয়া বাওড়ের ধারে ইংরেজ রেসিডেন্সীর ভগ্নাবশেষ ও পার্শ্বে একটি সমাধিস্থান

বিদ্যমান। উহাতে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের প্রথমা পত্নী মেরী ও শিশুকন্যা এলিজাবেথের সমাধি আছে। তাহা ছাড়া লেফটন্যাণ্ট্ কর্ণেল জন্ ম্যাটকের পত্নী সুবিখ্যাত ক্রমওয়েলের পিস্তুতো ভাই ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ জননায়ক জন্ হ্যামডেনের নাতনী বলিয়া বর্ণিত সারা ম্যাটকের সমাধি আছে। রেসিডেন্সী সমাধির কিছু পশ্চিমে কাশীমবাজার স্টেশনের ঠিক্ উত্তরেই কালিকাপুরের ওলন্দাজ সমাধি ক্ষেত্রটি অবস্থিত। ইহাতে কতকগুলি সমাধি স্তম্ভ ও একটি উচ্চ সৌধ আছে। দুইটি সমাধি ক্ষেত্রই সরকারী "রক্ষিত-কীর্ত্তি"

ওলন্দাজ কবরখানা, কালিকাপুর

বিভাগের অধীন। কালিকাপুরে ওলন্দাজদিগের কুঠি, দুর্গ বা গির্জ্জার কোন চিহ্নই আর নাই। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কালিকাপুর কুঠি দখল করেন। কালিকাপুরের পশ্চিমে সৈয়দাবাদ অবস্থিত।

কাশীমবাজারের পুরাকীর্ত্তির মধ্যে মহাজন টুলি নামক মহল্লায় জৈন বণিকগণের **নেমিনাথ মন্দির** আজিও সুসংস্কৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। এই মন্দিরটি বহু পুরাতন। মন্দিরের মধ্যে নেমিনাথ, পরেশনাথ (পার্শ্বনাথ) প্রভৃতি চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি আছে। নেমিনাথের মূর্ত্তি প্রস্তর নির্ম্মিত এবং সর্ব্বোচ্চ আসনে রক্ষিত।

নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে জৈন যতিগণের চরণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে উদ্যান মধ্যে একটি পুরাতন পুকুর আছে। উহার নাম মধুগড়ে। কথিত আছে বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে কাশীমবাজার নিবাসী জৈন মহাজনগণ নিজেদের ধনরত্ন বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া এই পুকুরের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরে উহার সমুদয়ের উদ্ধার সাধন আর হয় নাই, উহা নাকি "যখের ধনে" পরিণত হইয়া গিয়াছিল।

কাশীমবাজারের **ব্যাসপুর** নামক স্থানে একটি সুন্দর মন্দির মধ্যে এক প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের পিতা রামকেশব শর্ম্মা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রাচীরের ইষ্টকে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। ইহা এ অঞ্চলের একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

কাশীমবাজার রাজবংশের নাম বাংলাদেশে সুপরিচিত। কান্তবাবু বা কৃষ্ণকান্ত নন্দী এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কাশীমবাজারে কান্তবাবুর একটি রেশমের দোকান ছিল। তিনি বাল্যকালে বাংলা, ফার্সী ও সামান্য ইংরেজী শিখিয়াছিলেন। কথিত আছে, যে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক মুর্শিদাবাদে বন্দী অবস্থায় থাকিবার সময় কোন ক্রমে পলাইয়া আসিয়া কাশীমবাজারে আশ্রয়ের সন্ধান করিতে থাকেন। নবাব সৈন্যের ভয়ে কেহই তাঁহাকে আশ্রয় দিতে চাহে না, তখন কান্তবাবু নিজ বিপদ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে নিজের দোকানে আশ্রয় দেন। নবাব সৈন্যগণ তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া চলিয়া গেলে কান্তবাবু তাঁহার পলায়নের আয়োজন করিয়া দেন। কথিত আছে, গোপনতার জন্য কান্তবাবু ওয়ারেন্ হেস্‌টিংসের উপযোগী খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করিতে পারেন নাই এবং পান্তাভাত ও চিংড়ি মাছ দিয়াই অতিথি সৎকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উত্তরকালে হেষ্টিংস্ যখন ভাগ্য পরিবর্ত্তনের ফলে ভারতের ভাগ্য বিধাতা হইলেন, তখন পূর্ব্বকৃত উপকারের কথা স্মরণ করিয়া তিনি কান্তবাবুকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং নিজে সহায় হইয়া তাঁহাকে বহু ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ যখন চেৎসিংহের প্রাসাদ আক্রমণ করেন সে সময়ে কান্তবাবু তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কথিত আছে, তিনি সৈন্যগণের অত্যাচার হইতে মহিলাদিগকে রক্ষা করিবার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি কাশীরাজমাতার নিকট হইতে বহু মূল্য নানারূপ অলঙ্কার পাইয়াছিলেন; ইহা ব্যতীত রাজ প্রাসাদ হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা, একমুখ রুদ্রাক্ষ, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, রামচন্দ্রী মোহর প্রভৃতি পাইয়াছিলেন। এ সমস্তই রেসিডেন্সী সমাধির অনতিদূরে কাশীমবাজার রাজ বাড়ীতে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পরাজিত চেৎসিংহের প্রাসাদ হইতে কান্তবাবু একটি পাথরের দালান উঠাইয়া আনিয়া কাশীমবাজারে নিজ বাটীতে স্থাপন করেন। কাশীমবাজার রাজ বাটীতে উহা এখনও দৃষ্ট হয়। কাশীমবাজার রাজবংশের রাজা কৃষ্ণনাথের পত্নী দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী ও অশেষ গুণমণ্ডিত দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নাম বাংলাদেশে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

কাশীমবাজারের পার্শ্বেই, বহরমপুর হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে **চুণাখালি** একটি পুরাতন স্থান। এখানে মসনদ আউলিয়া নামক এক ফকিরের সমাধি আছে। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে চুণাখালি প্রভূত উন্নতি লাভ করে এবং এই স্থান একটি বাণিজ্য

কেন্দ্র হইয়া উঠে। পূর্ব্বে চূণাখালি একপ্রকার কাগজের জন্য বিখ্যাত ছিল। চূণাখালি হইতে মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে উহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি মনোরম দেওদার বীথি নিশাত বাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে। চূণাখালি এখন আমের জন্য প্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলে নানা জাতীয় আম জন্মিয়া থাকে যথা কাহিতুর, রাণীপদম্, শাদৌল্লা, বোম্বাই, চিম্‌নি, নাক্কি প্রভৃতি।

মুর্শিদাবাদ—কলিকাতা হইতে ১২২ মাইল দূর। শহরটি স্টেশন হইতে প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। ইহা স্বাধীন বাংলার শেষ রাজধানী।

মুর্শিদাবাদের পুরাতন নাম মুখসুদাবাদ বা মুখসুসাবাদ। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে এখানে মুখসুদনদাস (মধুসূদনদাস) নামে এক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবের আখড়া ছিল; তিনি প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং সেই অর্থসাহায্যে এই নগর নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহার নাম হয় মুখসুদাবাদ। অন্যমতে মুখসুদন দাস একজন নানকপন্থী সন্ন্যাসী ছিলেন; তিনি গোড়েশ্বর হুসেন শাহের অসুখ সারাইয়া দিলে দরবার হইতে এই স্থানে বহু ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন, এবং ক্রমে ইহা নগরে পরিণত হয়। অপর একটি জনপ্রবাদ অনুসারে মখ্‌সুস্ আলি খাঁ নামে একজন ধনী ব্যবসায়ী আধুনিক মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে কাশীম-বাজারের পার্শ্বস্থ চূণাখালিতে বাস করিতেন এবং তাঁহার নাম হইতেই চূণাখালির উত্তরাংশের নাম হয় মখসুসাবাদ বা মুখসুসাবাদ। আইন-ই-আকবরীতে মুর্শিদাবাদের নাম নাই। "আকবরনামা" গ্রন্থে বাংলার এককালের শাসনকর্ত্তা সৈয়দখাঁর ভ্রাতা মুখসুস্ খাঁ নাকে এক ব্যক্তির নাম দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন এই মুখসুসখাঁই যখন ফৌজদার বা নায়েব দেওয়ানরূপে চূণাখালিতে ছিলেন, তখনই উহার উত্তরাংশ মুখসুসাবাদ নাম প্রাপ্ত হয়। আজিও এঅঞ্চলের প্রাচীন লোকেরা মুর্শিদাবাদকে মুখসুদাবাদ বলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমস্ত ইংরেজী কাগজপত্রে ও আর্মি, হলওয়েল প্রভৃতি প্রথম ইংরেজ লেখকগণের বিবরণীতে মুখসুদাবাদ নামই আছে। মুখসুদাবাদের প্রাচীন ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় না। আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজ্যকালে ১৬৬৬ খৃস্টাব্দে টাভার্নিয়ার এই স্থানে আসিয়াছিলেন এবং ইহাকে একটি প্রধান স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি ইহার নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন "মদেসু-বাজারকী" (Madesoubazarki)। লাহোর চিত্রশালায় রক্ষিত ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত আওরঙ্গজেবের একটি টাকা হইতে জানা যায় যে সে সময়ে মখসুসাবাদে মুঘলদের একটি টাঁকশাল ছিল। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে শোভা সিং ও রহিম খাঁর বিদ্রোহের সময় মুখসুদাবাদ লুণ্ঠিত হইয়াছিল। কাশীমবাজারের বণিকগণ বিদ্রোহীদের নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং উপঢৌকন দিয়া সন্তুষ্ট করায় তাঁহাদের শহর লুণ্ঠিত হয় নাই।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে বাংলাদেশের রাজধানী প্রথমে জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকায় ছিল। সে সময়ে আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উস্‌শান বাংলার সুবাদার বা নবাব নাজিম ছিলেন এবং মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০১ খৃষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত

হইয়া ঢাকায় আগমন করেন। তৎকালে নবাব নাজিম ও দেওয়ান দুইটি পৃথক ও স্বাধীন পদ ছিল। অল্পদিনের মধ্যে আজিম উস্-শানের সহিত মুর্শিদকুলী খাঁর বিশেষ মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। অবশেষে দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ রাজস্ব বিভাগের সমস্ত কর্ম্মচারী সহ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মুখসুদাবাদে আসিয়া তাঁহার দপ্তর ও কর্ম্মস্থল স্থানান্তরিত করেন। তাহার সঙ্গে দর্পনারায়ণ কাননগো ও জগৎ শেঠদের পূর্ব্বপুরুষ মাণিকচাঁদও আসিয়া ছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর গৃহ-বিচ্ছেদে যখন মুঘল সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হয় সেই সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ফরুকশিয়ারের সময়ে বাংলার নবাবী পদও লাভ করিয়াছিলেন। তদবধি মুখসুদাবাদের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া মুর্শিদাবাদ হয় এবং ইহাই বাংলার রাজধানী হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যেই মুর্শিদকুলী খাঁ সমগ্র বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন।

মুর্শিদকুলী খাঁ ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছিলেন। শৈশবে দারিদ্র্য নিবন্ধন তাঁহার পিতা তাঁহাকে জনৈক ইরাণদেশীয় বণিকের নিকট বিক্রয় করেন। বণিক তাঁহাকে ইস্পাহানে লইয়া গিয়া পুত্রের ন্যায় লালন পালন ও শিক্ষা দান করেন। মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁহার নাম হয় মহম্মদ হাদী। বয়োপ্রাপ্ত হইয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন ও বেরারের দেওয়ানের অধীনে একটি সামান্য কার্য্য গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার কার্য্য কুশলতার জন্য দ্রুত পদোন্নতি হয় এবং সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁহাকে হায়দারাবাদের দেওয়ানি পদে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি বাংলার দেওয়ানি পদলাভ এবং "কারতলব খাঁ" উপাধি লাভ করিয়া ঢাকায় আগমন করেন। ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে গমনের কথা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে এবং সেই স্থানেই কর্ম্ম নৈপুণ্যের জন্য বাদশাহের নিকট হইতে "মুর্শিদকুলী মতিমন্ উল্ মুল্ক্ আলাউদ্দৌলা জাফরখাঁ নাসিরী নাসির জঙ্গ" এই উপাধি লাভ করেন এবং তদবধি মুর্শিদকুলীখাঁ নামেই পরিচিত হন।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের সময় তোড়রমল্ল "আসলজমা তুমার" নামক বাংলার রাজস্বের জমাবন্দোবস্তের কাগজ প্রস্তুত করেন। তাহার পর শাহ্ সুজা পুনরায় বাংলার রাজস্বের ব্যবস্থা করেন এবং মুর্শিদকুলী খাঁ জমা বন্দোবস্তের আমূল সংস্কার করিয়া একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত করেন; তিনি যে কাগজ প্রস্তুত করেন তাহার নাম "জমা কামেল তুমারী"। মুর্শিদকুলীখাঁর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজাদের খাজনা কিছু চড়িয়া যাইলেও জমিদারগণ অতিরিক্ত খাজনা আদায় করিতে পারিতেন না। এই বন্দোবস্ত নবাব মীর কাসিমের সময় পর্য্যন্ত প্রায় একভাবেই প্রচলিত ছিল। রাজস্ব বাড়াইবার জন্য তিনি অনেক জমিদারের প্রতি কঠোর ও নির্ম্মম ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। রাজস্ব বিভাগের সুবন্দোবস্ত ব্যতীত নবাব নাজিম হইয়া দেশ শাসনেরও নানারূপ উন্নতি সাধন করেন। চোর ডাকাত দমন করিবার জন্য মহম্মদ জান নামক তাঁহার এক বিশ্বাসী ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন; ইঁহার সাথে সাথে তীরন্দাজ ও কুঠারধারী লোক যাইত বলিয়া ইনি সাধারণ্যে 'কড়ালী' নামে পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে, মুর্শিদকুলী খাঁ কাটোয়া হইতে বর্দ্ধমান হইয়া জগন্নাথ পর্য্যন্ত পথে শান্তিরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। চোর ডাকাতের উপদ্রব তিনি বহুলাংশে দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি বিচার

প্রথারও সংস্কার করেন। তাঁহার সময়ে নিজামত, দেওয়ানী, কাজী ও ফৌজদারী এই চারি প্রকারের আদালত প্রতিষ্ঠিত ছিল। নিজামত আদালতে তিনি কাজী মুফতী ও উলেমা গণের সাহায্যে স্বয়ং বিচার করিতেন। বিচারে তিনি কঠোর ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কথিত আছে, ন্যায়ের অনুরোধে তিনি নিজের একমাত্র পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং হুগলীর কোতোয়াল একটি বালিকাকে অপহরণ করায় মুর্শিদকুলী খাঁর আদেশে লোষ্ট্র নিক্ষেপে নিহত হন। মুর্শিদকুলী খাঁর এক জন মাত্র পত্নী ছিলেন। তাঁহার নাম নসেরুবানু বেগম। মুর্শিদকুলী খাঁ বিলাসিতা সহ্য করিতে পারিতেন না; আহারাদিতেও তিনি সংযমী ছিলেন বলিয়া কথিত। কেবল বরফ ব্যবহার করিতেন বলিয়া রাজমহল পাহাড়ে বরফ জমাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্ ছিলেন। কথিত আছে, বহু ফকীর ও দরিদ্র ব্যক্তি প্রত্যহ তাঁহার নিকট হইতে আহার পাইত এবং পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গাদিকেও আহার দিতেন। দুর্ভিক্ষ যাহাতে না হয় সেজন্য তিনি বিশেষ চেষ্টিত থাকিতেন। ইউরোপীয় বণিক্‌গণ যাহাতে আহারের প্রয়োজনের বেশী শস্যাদি জাহাজে উঠাইতে না পারেন সেজন্য হুগলীর ফৌজদারের প্রতি বিশেষ আদেশ ছিল। সরকারী কাগজপত্রে তিনি লাল কালীতে সহি করিতেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদকে রাজধানীর উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান নিজামত কেল্লা নামক স্থানে কেল্লা, প্রাসাদ, দরবারগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার দরবারগৃহ বা "চেহেল সেতুন" চল্লিশটি স্তম্ভ সংযুক্ত ছিল; ইহাদের কোনও চিহ্ন মাত্র নাই। বর্ত্তমান সুবৃহৎ মণিবেগমের মসজিদ যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানেই চেহেলসেতুন বিরাজ করিত। কাট্‌রার বিরাট্ মস্‌জিদটি শুধু এখনও তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। যদিও ভূমিকম্পে মসজিদটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তথাপি উহা মুর্শিদাবাদের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু। শহরের পূর্ব্বদিকে লালবাজার নামক মহল্লায় ইহা অবস্থিত; লাল বা পশ্চিম দেশীয় নবাব সরকারের কর্ম্মচারিগণ এই স্থানে বাস করিতেন বলিয়া ইহার নাম হয় লালবাজার। ১১৩৭ হিজরায় (১৭২৩ খৃষ্টাব্দে) মুর্শিদকুলীখাঁ মক্কাশরীফের সুপ্রসিদ্ধ বৃহৎ মসজিদের অনুকরণে এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার চারিপাশে একটি বাজার বসাইয়া ছিলেন। কাট্‌রা বা বাজারের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম কাট্‌রা মসজিদ। সোপান শ্রেণী পার হইয়া পূর্ব্বমুখী তোরণ দ্বারের উপর দ্বিতল নহবৎখানা, তাহার পরেই একটি প্রকাণ্ড সমচতুষ্কোণ অঙ্গন দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৬৫ ফুটেরও অধিক। ইহার পরই ভগ্নোন্মুখ পাঁচটি গম্বুজ বিশিষ্ট বিরাট্ মসজিদ। ছোট ছোট বাংলা ইটে এই বিশাল গম্বুজগুলির খিলান কিরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। চারিকোণের চারিটি মিনারের দুইটি মাত্র এখনও অবশিষ্ট; দক্ষিণ-পশ্চিমের মিনারে উঠিতে পারা যায় এবং তথা হইতে মুর্শিদাবাদের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। মস্‌জিদ অঙ্গনের তিন দিকে দ্বিতল বাটীতে নীচের তলায় দোকান ছিল এবং উপরের তলায় কোরাণ পাঠকদিগের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। কথিত আছে, এই মস্‌জিদে ৭০০ কারী বা কোরাণ পাঠক থাকিতেন। মসজিদ নির্ম্মাণের দুই বৎসর পরে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করিবার পর মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ইচ্ছা ও ব্যবস্থা অনুসারে মস্‌জিদের সোপান শ্রেণীর নীচে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তিনি বলিয়াছিলেন এই স্থানে সমাহিত হইয়া ভক্ত উপাসক মণ্ডলীর

পদধূলি তিনি বক্ষে ধারণ করিতে চাহেন। মস্‌জিদের দ্বারে একখণ্ড কষ্টি পাথরে ইরাণীয় ভাষায় লিখিত আছে "স্বর্গ মর্ত্ত্য উভয় লোকের যিনি গৌরব, আরবের মহম্মদের জয় হউক। যে ব্যক্তি তাঁহার দ্বারের ধূলি নহে, তাহার মস্তকে ধূলি বর্ষিত হউক।" মানসিক করিয়া বহু লোকে এই সমাধির উপর মালার অর্ঘ্য দিয়া থাকেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে শিল্পী হজেস্ এই মস্‌জিদ দেখিয়াছিলেন এবং ইহার একটি রঙীন চিত্র তাঁহার Select Views in India গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন।

কাটরা মস্‌জিদের অনতিদূরে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে গোবরানালার উপর শহর রক্ষার জন্য মুর্শিদকুলী খাঁ একটি তোপখানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহল্লাটি এখনও তোপখানা নামে পরিচিত। অতীতের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ জাহানকোষা বা জগজ্জয়ী নামে একটি প্রকাণ্ড

জাহান্‌কোষা কামান

কামান পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৮ ফুট এবং পরিধিতে ৪।।০ ফুট। বহুকাল জমিতে পড়িয়া থাকার সময় নীচ হইতে একটি অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়া দুইটি গুঁড়ির সাহায্যে কামানটিকে ভূমি হইতে প্রায় ১৮ ইঞ্চি উপরে উঠাইয়াছে। কামানের গায়ে ইরাণীয় ভাষায় লিখিত নয় খণ্ড পিতলের ফলক আছে। এই ফলক হইতে জানা যায় যে সাজাহানের রাজত্বকালে ইস্‌লাম খাঁ যখন বাংলার সুবাদার, তখন জাহাঙ্গীর নগরে দারোগা শের মহম্মদ ও পরিদর্শক হরবল্লভ দাসের পর্য্যবেক্ষণে প্রধান কর্ম্মকার জনার্দ্দন ১০৪৭ হিজরা জমাদিয়স্ সানি মাসে (অক্টোবর ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে) এই কামান নির্ম্মাণ করেন। ইহার ওজন ২১২ মণ এবং ইহাতে ২৮ সের বারুদ লাগে বলিয়া লিখিত আছে। সাধারণ লোকে কামানটিকে সিঁদূর লিপ্ত করিয়া পুষ্প, দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন দিয়া পূজা করিয়া থাকে।

মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন খাঁ বা সুজাউদ্দৌলা বিহার ও ওড়িষ্যার সুবাদারী প্রাপ্ত হন। তিনি শাসন কার্য্য পরিচালনার সুবিধার জন্য একটি মন্ত্রণা সভা গঠিত করিয়াছিলেন। ইহাতে ইতিহাস প্রসিদ্ধ আলিবর্দ্দী খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা হাজী আহম্মদ, জগৎশেঠ ফতেচাঁদ এবং দেওয়ানী কার্য্যে অভিজ্ঞ রায় আলমচাঁদ ছিলেন। তখনকার যুগে ইহা অভিনব ব্যবস্থা বলিতে হইবে। আলিবর্দ্দী খাঁ পরে বিহারের শাসক বা নায়েব নাজিম পদে প্রেরিত হন। রাজস্ব ব্যাপারে

জন্য আলমচাঁদকে সুজা খাঁ বাদশাহের নিকট হইতে "রায়রায়ান" উপাধি আনাইয়া তাঁহাকে ভূষিত করেন। দেওয়ানী কার্য্য ক্রমশঃ রায়রায়ানদিগের হস্তে আসিয়া পড়ে এবং আলমচাঁদই প্রথম নায়েব দেওয়ান হইতে প্রধান দেওয়ানের পদে উন্নীত হন। এইরূপে রাজস্ব মন্ত্রীর সমস্ত কার্য্য রায়রায়ানগণ করিতে থাকেন। কাননগোগণের কার্য্য ছিল রাজস্ব বিষয়ক কাগজ পত্র রক্ষা করা। রায়রায়ান পদ বহু দিন প্রচলিত ছিল এবং ইংরেজী আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর ইহার লোপ হয়। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে যে সকল জমিদার বন্দী হইয়াছিলেন তিনি তাঁহাদের মুক্তি দিয়া, তাঁহাদের করভার হ্রাস করিয়া উদারতা ও ন্যায়পরতার সহিত শাসন কার্য্য আরম্ভ করেন। তিনি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের প্রজাবৃন্দের প্রীতি ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় ছিলেন এবং মুক্ত-হস্তে দান করিতেন। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে নির্ম্মিত প্রাসাদ ও অট্টালিকা প্রভৃতি তাঁহার মনোমত না হওয়ায় তাহাদের ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া সুন্দর সুন্দর ও সুসজ্জিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার নির্ম্মিত ত্রিপলিয়া তোরণদ্বার মুর্শিদাবাদে এখনও একটি দ্রষ্টব্য, এত উচ্চ তোরণদ্বার বাংলাদেশে খুব কমই আছে।

মুর্শিদাবাদের অপর পারে **ডাহাপাড়া** গ্রামে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে সুজা খাঁ ফর্হাবাগ (বা সুখ কানন) নামে একটি অতি মনোরম ও সুসজ্জিত উদ্যান ও প্রমোদ বাটিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রিয়াজ-উস্ সলাতিনে বর্ণিত হইয়াছে যে ইহা কাশ্মীরের উদ্যানগুলি হইতেও রমণীয় ছিল এবং সুরলোকের উদ্যানও ইহার নিকট ম্লান মনে হইত, স্বর্গের পরীরা ফর্হাবাগের শোভায় মুগ্ধ হইয়া তথায় আসিয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিত; আরও লিখিত হইয়াছে, পরীদের কথা শুনিয়া ভীত হইয়া সুজা খাঁ ধূলিবৃষ্টি দ্বারা উদ্যানের সৌন্দর্য্য ম্লান করিয়া তাহাদের আগমন বন্ধ করেন। শেষের দিকে নবাব সুজাউদ্দীন শাসন কার্য্য একরূপ মন্ত্রণা পরিষদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং নিজে ফর্হাবাগে প্রমোদ বিলাসে সময় কাটাইতেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে তাঁহার মৃত্যু হইলে ফর্হাবাগের কিছু দক্ষিণে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। যে স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয় উহা এখন রোশনিবাগ নামে পরিচিত। রোশনিবাগ এখনও একটি ছায়াশীতল মনোরম উদ্যান। সুজা খাঁর সমাধিটি দৈর্ঘ্যে ১০॥ ফুট; এত বড় সমাধি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। সুজা খাঁর প্রিয় ফর্হাবাগ আজ প্রায় চিনিতে পারা যায় না; দু একটি ভগ্নাবশেষ ও নামটি এখন বর্ত্তমান। এই ডাহাপাড়া গ্রামে মুর্শিদকুলীর সহিত আগত প্রধান কাননগো দর্পনারায়ণ প্রকাণ্ড বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। প্রধান কাননগোগণ তখন "বঙ্গাধিকারী" নামে অভিহিত হইতেন এবং উত্তরাধিকারক্রমে এই পদ পাইতেন। কথিত আছে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ ভগবান্ রায় রাজা তোড়রমলের রাজস্ব বন্দোবস্তের সময় প্রধান কাননগো পদে উন্নীত হন এবং কার্য্য কুশলতার জন্য সম্রাট আকবরের নিকট হইতে বঙ্গাধিকারী উপাধি প্রাপ্ত হন; তদবধি এই উপাধি চলিয়া আসে। তৎকালে জমিদারগণ বঙ্গাধিকারীদিগকে যথেষ্ট ভয় করিতেন এবং সম্মানে তাঁহারা নবাব ও জগৎশেঠদের পরেই ছিলেন। ডাহাপাড়া হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে কিরীটকণা গ্রামে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রাচীন তীর্থ স্থান ও উপপীঠ কিরীটেশ্বরী অবস্থিত। পূর্ব্বভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল-বারহাড়োয়া শাখার "লালবাগ কোর্ট রোড" স্টেশন দ্রষ্টব্য।

সুজা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ মাত্র এক বৎসরের জন্য নবাব হইয়াছিলেন; কথিত আছে, যে তিনি শত্রু কর্ত্তৃক প্রাণ নাশের এত ভয় করিতেন যে পিতার সমাধির সময়ও দুর্গ ছাড়িয়া যান নাই। শাসনকার্য্য তিনি বিশেষ কিছুই দেখিতেন না এবং পিতার আমলের মন্ত্রণা-সভার উপরই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সহিত মনোমালিন্য হওয়ায়, মন্ত্রণা-সভার রায়রায়ান আলমচাঁদ, হাজী আহম্মদ ও জগৎ শেঠ ফতেচাঁদ আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সরফ্‌রাজকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চেষ্টিত হন। অবশেষে আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত মুর্শিদাবাদের ২২ মাইল উত্তরে গিরিয়ার যুদ্ধে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সরফ্‌রাজ খাঁ নিহত হন। পূর্ব্ব ভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল-বারহাড়োয়া শাখার "জঙ্গীপুর" স্টেশন দ্রষ্টব্য।

সরফ্‌রাজের মাহুত তাঁহার মৃতদেহ লইয়া কোনওরূপে মুর্শিদাবাদে চলিয়া আসে এবং রাত্রিকালে গোপনে তাঁহাকে নেক্‌টাখালির প্রাসাদে সমাহিত করা হয়। মুর্শিদাবাদ স্টেশন হইতে লালবাগে যাইবার পথে এই সমাধি দৃষ্ট হয়, ইহা এক্ষণে সরকারী "রক্ষিত কীর্ত্তি" বিভাগের রক্ষণাধীন। মুর্শিদাবাদের নবাবগণের মধ্যে এক মাত্র সরফ্‌রাজ খাঁই রণক্ষেত্রে প্রাণ দান করেন। ইঁহার পরই আলিবর্দ্দী খাঁ মসনদে আরোহণ করেন এবং দিল্লীর বাদশাহের নিকট বহু মূল্য উপঢৌকন পাঠাইয়া বাংলা দেশের ও ওড়িষ্যার নবাবী প্রাপ্ত হন। এই সময়ে দিল্লীর বাদশাহের ক্ষমতা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল এবং আলিবর্দ্দী ১৬ বৎসর স্বাধীনভাবেই মুর্শিদাবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দিল্লীতে কখনও রাজস্ব প্রেরণ করেন নাই।

১৭৪১ হইতে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার রাজত্বের অধিকাংশ সময়েই আলিবর্দ্দী খাঁকে ওড়িষ্যা ও বিহারের বিদ্রোহ দমন করিতে এবং মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিগের সহিত যুদ্ধে কাটাইতে হইয়াছে। বাংলা তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল এবং একবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধের জন্য বাংলার জমিদারবৃন্দ তাঁহাকে দেড় কোটি টাকা দিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ঢাকার শাসনকর্ত্তা নওয়াজেস মহম্মদ খাঁর উপর মুর্শিদাবাদ রক্ষার ভার ন্যস্ত থাকিত। আলিবর্দ্দী খাঁ বর্গী বা মহারাষ্ট্রীয়দিগের বারংবার আক্রমণ ও অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। ১৭৪১-৪২ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে যখন নবাব কাটোয়ার নিকট মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বাধাদানে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে একদল মহারাষ্ট্রীয় মীর হাবীবের নেতৃত্বে মুর্শিদাবাদ নগরী লুণ্ঠিত করিয়া জগৎশেঠদিগের নিকট হইতে দুই ক্রোড় টাকা লইয়া যায়। নবাব আলিবর্দ্দী তাড়াতাড়ি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহারাষ্ট্রীয়েরা পলায়ন করে। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে বারংবার যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া ওড়িষ্যা প্রদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ছাড়িয়া দিয়া এবং বাংলার চৌথ হিসাবে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ইহার পর পাঁচ বৎসর শান্তিতে রাজত্ব করিয়া ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে পরলোক গমন করেন। আলিবর্দ্দী খাঁ হিন্দু মুসলমান প্রজার প্রতি সমভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং নানা বিপদের মাঝেও শান্তিতে রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত তাঁহার বিশেষ বিরোধের সৃষ্টি হয় নাই। একবার ইংরেজদের একটি

রণতরী হুগলীর বণিকদিগের জাহাজ আটক করিলে আলিবর্দ্দী খাঁ কাশিমবাজারের কুঠি অবরোধ করেন এবং ইংরেজরা নবাবকে ১২ লক্ষ টাকা খেসারৎ দিতে বাধ্য হন।

আলিবর্দ্দী খাঁর একমাত্র পত্নী আদর্শ সহধর্ম্মিণী ছিলেন। কথিত আছে, রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যাপারে নবাব তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধের সময় আলিবর্দ্দী খাঁর পার্শ্বে নবাব-বেগমও যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেন এবং অপরিসীম সাহসের সহিত রণক্ষেত্রের বিপদ ও রণের সম্মুখীন হইয়া স্বামীকে উৎসাহ দান করিতেন।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার পূর্ব্ব নির্দ্দেশানুসারে তাঁহার দৌহিত্র সিরাজ-উদ্-দৌলা ১৮ বৎসর বয়সে বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর পত্নী এবং সিরাজের বড় মাসীমা ও জ্যেঠাইমা ঘসেটী বেগম বরাবর তাঁহার বিপক্ষে ছিলেন এবং তিনি যাহাতে সিংহাসন না পান তার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। সেই জন্য সিরাজ মসনদ পাইয়া ঘসেটী বেগমের মতিঝিলের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন এবং কথিত আছে নওয়াজেস্ মহম্মদ কর্ত্তৃক সঞ্চিত প্রায় ৬১ লক্ষ টাকার স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য ধন দৌলত কাড়িয়া লন। ইহার অল্প পরেই ইংরেজদের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হয় এবং তিনি তাঁহাদিগকে এ দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সঙ্কল্প করেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি কাশীমবাজারের ইংরেজদের কুঠি দখল করেন এবং এইরূপে দুপক্ষে সংগ্রাম সুরু হইয়া যায় এবং সিরাজ-উদ্-দৌলা কলিকাতা দখল করেন। ইহার পর ক্লাইভ কলিকাতা পুনর্গ্রহণ করেন এবং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সিরাজের সহিত ক্লাইভের সন্ধি হয়। (দমদম্ ক্যাণ্টনমেণ্ট দ্রষ্টব্য।) এই বৎসরই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে তাঁহার স্থানে বসাইতে মীরজাফর, জগৎশেঠ, রায় দুর্লভ, উমিচাঁদ এবং ক্লাইভের মধ্যে ষড়যন্ত্র হয়। ইহা স্মরণীয় যে মীরজাফর আলিবর্দ্দী খাঁর সংসারে থাকিয়া মানুষ হন এবং সদ্বংশজাত বলিয়া আলিবর্দ্দী তাঁহার সহিত বৈমাত্রেয় ভগিনী শাখানমের বিবাহ দেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন মীরজাফর প্রভৃতির ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে সিরাজ-উদ্-দৌলা ক্লাইভের হস্তে পরাজিত হন। (পলাশী দ্রষ্টব্য।) সিরাজ-উদ্-দৌলা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে মুর্শিদাবাদে পলাইয়া আসিয়া পরদিন ২৪শে জুন শুক্রবার রাত্রে কিছু পরিমাণ অর্থ, অলঙ্কার ও পত্নী লুৎফউন্নিসা ও চারি বৎসরের শিশুকন্যা ওম্মৎজাহুরাকে লইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ভগবানগোলা হইতে নৌকাযোগে রাজমহলের দিকে যাত্রা করিলেন। ইতি মধ্যে মীরজাফর মুর্শিদাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং যুদ্ধের ছয় দিন পরে ২৯শে জুন ক্লাইভ সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে আসিয়া মীরজাফরকে সিরাজ-উদ্-দৌলার শূন্য মস্‌নদে বসাইলেন। এ দিকে সিরাজ-উদ্-দৌলা তিন দিন তিন রাত অনাহারে কাটাইয়া নৌকাযোগে রাজমহলের দিকে পৌঁছিলেন; এই সময়ে তিনি কিছু খিচুড়ী খাইতে চাহেন এবং একজন সামান্য ফকির খিচুড়ী রাঁধিয়া দিতে রাজী হয়। এই ফকির তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া গোপনে মীরজাফরের জামাতা মীর কাশিম ও ভ্রাতা মীর দাউদকে সংবাদ দিলে তাঁহারা সিরাজকে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। তাঁহাকে মীরজাফরের নবাব হইবার পূর্ব্বেকার বাসস্থান জাফরাগঞ্জের বাটীতে বন্দী করিয়া রাখা হয়। জাফরাগঞ্জ মুর্শিদাবাদের নিজামত কেল্লার এক মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই জাফরাগঞ্জের বাটীতে

পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে মীরজাফরের সহিত কাশীমবাজারের ইংরেজ কুঠিয়াল ওয়াট্‌সের গুপ্ত সন্ধি হয়। এই মন্ত্রণায় দুর্লভরাম, জগৎশেঠ প্রভৃতি যোগ দিয়াছিলেন। কথিত আছে ওয়াট্‌স্ সাহেব গোপনতার জন্য পাল্কি করিয়া পর্দ্দানশীন রমণী সাজিয়া মন্ত্রণায় যোগ দিতে আসিয়াছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুলাই তারিখে নবাব মীরজাফরের পুত্র মীরণের প্ররোচনায় মহম্মদীবেগ নামক এক ব্যক্তির হস্তে জাফরাগঞ্জের বাটীতে হতভাগ্য কারারুদ্ধ সিরাজ মাত্র ২০ বৎসর বয়সে নৃশংভাবে নিহত হন। কথিত আছে, মীরণের অনুচরবর্গ সিরাজকে হত্যা করিতে অনুরুদ্ধ হইলে তাঁহারা কেহই সম্মত হন নাই। অবশেষে আলিবর্দ্দী এবং তাঁহার বেগমের অন্নে ও যত্নে পালিত কৃতঘ্ন মহম্মদী বেগ এই কার্য্যে অগ্রসর হয়। সৈয়র-মুতাক্ষরীনে লিখিত আছে, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া সিরাজ একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাজ্যের এক প্রান্তে সামান্যভাবেও কি তাঁহাকে জীবন যাপন করিতে দেওয়া যায় না। পর মুহূর্ত্তেই বলিয়া উঠেন, "না, তাহারা তা দিবে না" এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘাতকের তরবারির আঘাতে খণ্ডিত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হন। যে গৃহে সিরাজকে নিহত করা হইয়াছিল তাহা এখন পড়িয়া গিয়াছে এবং স্থানটিকে প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান জাফরাগঞ্জ প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। মুর্শিদাবাদবাসিগণ এই স্থানটিকে এখনও "নিমকহারামী দেউড়ী" বলিয়া থাকেন। জাফরাগঞ্জের প্রাসাদে মীরণের বংশধরগণ এখনও বাস করেন। জাফরাগঞ্জ নাম মীরজাফরের নাম হইতে হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, মুর্শিদকুলী খাঁর অপর নাম জাফর খাঁ হইতে হইয়াছে। এই জাফরাগঞ্জেই আবার মীরজাফর এবং তাঁহার দুই পত্নী মণি বেগম ও বচু বেগম হইতে তদ্বংশীয় নবাব-নাজিম-দিগের সমাধিভবন, ইহা পশ্চিম মুখে রাজপথের উপরে অবস্থিত এবং সমাধিদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা মুর্শিদাবাদের একটি দ্রষ্টব্য স্থান। ইহা সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রতিদিন একশত কারী বা কোরাণ পাঠক এই স্থানে আসিয়া মৃতদিগের উদ্দেশ্যে কোরাণ পাঠ করেন।

সিরাজের হত্যার পর তাঁহার মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে তাঁহার মাতার বাটীর সম্মুখ দিয়া সারা মুর্শিদাবাদ শহরে ঘুরাইয়া খোশ্‌বাগে মাতামহ আলিবর্দ্দী খাঁর সমাধির নিকট সমাহিত করা হয়। খোশ্‌বাগ—মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহল্লার কিছু দক্ষিণে ভাগীরথীর অপর বা পশ্চিমকূলে অবস্থিত। নদীকূলে উদ্যান মধ্যে অবস্থিত এই সমাধি ভবনটি এখানকার অপর একটি দ্রষ্টব্য। আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহার মাতাকে সমাহিত করিবার জন্য এই মনোরম উদ্যানটি নির্ম্মাণ করেন এবং তিনি নিজেও মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রকাশিত ইচ্ছানুসারে এই স্থানে সমাহিত হন। আলিবর্দ্দীর দক্ষিণে তাঁহার পত্নীর এবং সিরাজের পাদদেশে তৎপত্নী লুৎফউন্নেসার সমাধি। সিরাজের পূর্ব্বপার্শ্বে তাঁহার ভ্রাতা মির্জ্জা মেহেদীর সমাধি; কথিত আছে মীরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করিলে পঞ্চদশ বর্ষীয় মির্জ্জা মেহেদী প্রথমে কারারুদ্ধ হন এবং পাছে মুক্ত হইয়া মসনদের দাবীদার হন সেই আশঙ্কায় তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য মীরজাফর পুত্র মীরণকে আদেশ দান করেন, সৈয়র মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে দুই খানি তক্তার মধ্যে বালককে দড়ি দিয়া কষিয়া বাঁধিয়া হত্যা করা হয়। এই সমাধিগৃহটির মধ্যে আরও দুইটি কবর

আছে। ইহা ছাড়া খোশ্‌বাগে আরও সমাধি দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বদিকে ইহার একটি সুবৃহৎ প্রবেশদ্বার আছে; ইহার চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত এবং ইহা দুইটি প্রাঙ্গনে বিভক্ত।

সিরাজের হত্যার পর আলিবর্দ্দী খাঁর বেগম ও কন্যা ঘসেটী ও আমিনা বেগম ও সিরাজ মহিষী লুৎফউন্নেসা ও শিশু কন্যা উম্মৎ জাহুরা নানা রূপ লাঞ্ছিত ও কারাগারে বন্দী থাকিবার পর ঢাকায় নির্ব্বাসিত হন। কথিত আছে, সিরাজের মৃত্যুর পর লুৎফ-উন্নেসাকে পুনরায় বিবাহের কথা বলিলে তিনি সদর্পে বলিয়াছিলেন যে যে হস্তিপৃষ্ঠে চলিতে অভ্যস্ত, সে কি কখনও গর্দ্দভ পৃষ্ঠে আরোহণ করে? কিছু কাল ঢাকায় থাকিবার পর ইংরেজদের চেষ্টায় লুৎফউন্নেসা মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়া নবাব আলিবর্দ্দী ও সিরাজের সমাধির তত্ত্বাবধানের ভার পান। তিনি নিজের জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা বৃত্তি এবং সমাধির জন্য মাসিক ৩০৫৲ টাকা বৃত্তি পাইতেন। তাঁহার জীবিত কালেই কন্যা উম্মৎ জাহুরার মৃত্যু হয়। সুতরাং লুৎফউন্নেসার পর তাঁহার চার দৌহিত্রী সমাধি তত্ত্বাবধানের ভার পান। এখন ইহা সরকারের হাতে।

মীরজাফর সিংহাসনে উঠিয়া নানাদিক্ দিয়া অর্থাভাব বোধ করেন এবং দেওয়ান রায়দুর্লভ ও শেঠদিগকে উৎপীড়ন করিতেন। এইরূপে তাঁহাদিগের সহিত বিশেষ মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। অতঃপর মীরজাফর ইংরেজদিগের কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার প্রয়াস পান। ইংরেজেরা অতঃপর তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে মসনদে স্থাপন করেন। মীরকাসিম রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে লইয়া গিয়া তাঁহার সেনাবাহিনী ইউরোপীয় আদর্শে সুগঠিত করেন এবং অযোধ্যার নবাবের সহিত যোগ দিয়া প্রথম হইতেই ইংরেজদের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হন। বাণিজ্যের শুল্ক লইয়া ইংরেজ কোম্পানির সহিত তাঁহার বিবাদ সুরু হয়; কোম্পানি এবং কোম্পানির কর্ম্মচারীরা বিনা শুল্কে ব্যবসায় করিবার দাবী করেন, ইহার উত্তরে নবাব দেশী বিদেশী সকল ব্যবসায়ীকেই শুল্ক মকুফ আদেশ দান করেন। কোনও মিটমাট না হওয়ায় যুদ্ধ বাধিয়া যায়। ইংরেজদের পাটনাস্থ কুঠির জন্য প্রেরিত অস্ত্র শস্ত্র বোঝাই কয়েক খানি নৌকা গঙ্গাপথে মুঙ্গের দিয়া যাইবার সময় নবাব কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। নবাব পক্ষীয় সেনা কর্ত্তৃক কাশিম-বাজার কুঠিও অধিকৃত হয়। ইহার পর ইংরেজ পক্ষ মুর্শিদাবাদ অধিকার করে। কিন্তু উভয় পক্ষে সত্যকার যুদ্ধ মুর্শিদাবাদ হইতে ২০ মাইল উত্তরে সুতীর নিকট গিরিয়ার প্রান্তরে বাঁশলই ও ভাগীরথীর মোহানার নিকট ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ১লা অগস্ট মাসে সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে নবাব-সৈন্য পরাজিত হয়। ইহা গিরিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ বা সুতীর যুদ্ধ নামে পরিচিত। (পূর্ব্ব ভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল-বারহাড়োয়া শাখার জঙ্গীপুর রোড স্টেশন দ্রষ্টব্য)। গিরিয়ায় পরাজিত হইয়া নবাব সৈন্য রাজমহল হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে গঙ্গার তীরে উধুয়া নালায় শিবির স্থাপন করে। ১১ই অগস্ট ইংরেজ সৈন্য উধুয়ানালার ৪ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে ফুদকিপুর নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। উধুয়া নালার সুন্দর অবস্থান হেতু ইংরেজ সৈন্য প্রথমে কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই; অবশেষে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাত্রিশেষে ইংরেজ বাহিনী কৌশলে এবং অতর্কিতে নবাব পক্ষীয়

শিবির আক্রমণ করিয়া ৫ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে উহা অধিকার করিয়া লয়। নবাব পক্ষ সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। মীরকাসিম মুঙ্গের হইতে পলায়ন করিয়া প্রথমে অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাজ্য ফিরিয়া পাইবার আশা নির্ম্মূল হইলে রোহিলখণ্ড অঞ্চলে পলায়ন করেন। দারিদ্র্যে এবং প্রায় অজ্ঞাতভাবে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে, তাঁহার একমাত্র সম্পত্তি তুইখানি শাল বিক্রয় করিয়া তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

মীরকাসিমকে সিংহাসন চ্যুত করিবার মনঃস্থ করিলে পুনরায় মীরজাফরকেই ইংরেজগণ বাংলার মসনদে বসাইবার জন্য স্থির করেন। মীরজাফর ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে পুনরায় মুর্শিদাবাদে নবাব পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মীরজাফরের মৃত্যু হইলে তাঁহার জীবিত পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নজম উদ্দৌলা ২০ বৎসর বয়সে মসনদ প্রাপ্ত হন্। মীরজাফরের জীবিত কালেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণের মৃত্যু হয়। কথিত আছে তাঁহার বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়। আরও কথিত হয় যে সিরাজ উদ্দৌলার মাতা আমীনা এবং মাসীমা ঘসেটী বেগমকে মীরণ ঢাকায় নৌকা ডুবাইয়া হত্যা করেন। মরিবার সময় তাঁহারা অভিশাপ দেন, যেন তাঁহার বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়। নজমউদ্দৌলার সময়ে লর্ড ক্লাইভ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফ হইতে কার্য্যতঃ বাংলার সুবাদারী গ্রহণ করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই অগস্ট ক্লাইভ দিল্লীর সম্রাট্ শাহ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। নবাবের প্রাসাদের খরচ ও বিচার কার্য্যের ভারের জন্য বার্ষিক ৫৩, ৮৬, ১৩১, সিক্কা টাকা বরাদ্দ হয়। পর বৎসর লর্ড ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে দরবার করিয়া নবাবের পার্শ্বে দেওয়ান রূপে বসিয়া প্রথম পুণ্যাহ করেন। ইহার অল্প পরেই ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে নজমউদ্দৌলা হঠাৎ মারা যান এবং তাঁহার ষোড়শ বর্ষীয় ভ্রাতা সৈফউদ্দৌলা নবাব নাজিম হন। ইহার নিজামতী বৃত্তি কমাইয়া বার্ষিক ৪১,৮৬, ১৩১ সিক্কা টাকায় নির্দ্ধারিত হয়। পরবর্ত্তী নবাব মুবারক উদ্দৌলার সময় উহা কমাইয়া ১৬ লক্ষ টাকা করা হয় এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উহা ঐরূপই থাকে। মুবারক উদ্দৌলার সময়ে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ বিচার কার্য্যও নবাব নাজিমের হস্ত হইতে উঠাইয়া লইয়া নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। তদবধি মুর্শিদাবাদ আর রাজধানী রহিল না এবং নবাবেরও আর রাজকীয় কোন ক্ষমতাই থাকিল না। মুবারক উদ্দৌলার পর বাবরজঙ্গ, আলিজা, ওয়ালাজা, হুমায়ুনজা ও ফেরিতুনজা বা মনসুর আলি নবাব নাজিম পদে অধিষ্ঠিত হন। শেষোক্তই মুর্শিদাবাদের শেষ নবাব নাজিম এবং তাহার সময়ে নবাব নাজিমদিগের অবশিষ্ট অধিকার খর্ব্ব করা হইলে ফেরিতুনজা বিলাতে গিয়া হাউস অব কমন্সে অভিযোগ করেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি নবাব নাজিম উপাধি পরিত্যাগ করেন। তাহার পর হইতে তাঁহার বংশীয়েরা বংশানুক্রমে মুর্শিদাবাদের নবাববাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইতেছেন।

মুর্শিদাবাদের দ্রষ্টব্য গুলির মধ্যে উত্তর প্রান্তে অবস্থিত **জাফরাগঞ্জ** এবং মধ্যভাগে অবস্থিত **কাট্‌রা মসজিদ, তোপখানা, জাহানকোষা কামান,** নবাব সুজাউদ্দীনের **ত্রিপলিয়া তোরণদ্বার** এবং নবাব **সরফরাজ খাঁর সমাধির** কথা উপরে বলা হইয়াছে। কাট্‌রা মসজিদের দক্ষিণে অনতিদূরে কদম শরীফ বা কদম রসুল নামে একটি

মসজিদ আছে। উহার মধ্যে গৌড় হইতে আনীত ইসলাম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদের পদচিহ্ন-ধারী বলিয়া কথিত একটি প্রস্তরখণ্ড কিছুকাল রক্ষিত ছিল; পরে উহা গৌড়ে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়া ছিল। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

শহরের মধ্যভাগেই লালবাগ মহল্লা; তথায় লালবাগ মহকুমার আদালত প্রভৃতি অবস্থিত। লালবাগের ঠিক উত্তরেই ভাগীরথী তীরে **নিজামত কেল্লার** মধ্যে মুর্শিদাবাদের **হাজারদুয়ারী** নামক প্রসিদ্ধ ও প্রকাণ্ড পুরাতন নবাব প্রাসাদ অবস্থিত। ইহার নিকটে নবাব বাহাদুরের বর্ত্তমান প্রাসাদ অবস্থিত। হাজারদুয়ারী নবাব নাজিম হুমায়ুনজা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নয় বৎসর সময়ে জেনারেল ম্যাকলাউড নামক এঞ্জিনীয়রের তত্ত্বাবধানে দেশীয় কারিকরের দ্বারা এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। গম্বুজবিশিষ্ট ত্রিতল এই বিরাট প্রাসাদটি ইতালীয় স্থাপত্যরীতিতে নির্ম্মিত। প্রাসাদের নিম্নতলে তোষাখানা এবং নানা পুরাতন তলোয়ার, বন্দুক, প্রভৃতিতে পূর্ণ অস্ত্রাগার; দোতলায় সুসজ্জিত দরবারঘর, বৈঠকখানা, খাবারঘর প্রভৃতি এবং তেতলায় বহু পুরাতন পুস্তকাদি পূর্ণ গ্রন্থাগার, শয়নকক্ষ এবং নাচঘর অবস্থিত। এই প্রাসাদে পুরাতন প্রথায় অঙ্কিত নবাব নাজিমদিগের এবং অন্যান্য বহু সুন্দর সুন্দর চিত্রাদি রক্ষিত আছে।
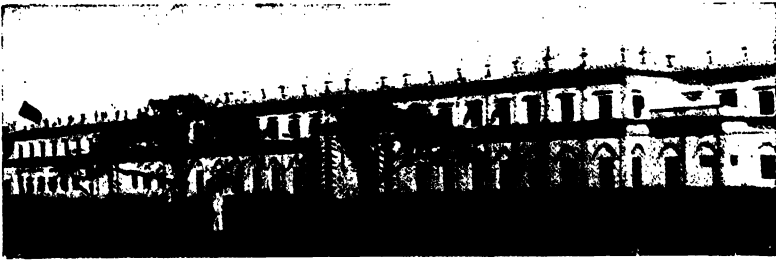
ইমাম্‌বাড়া

নিজামত কেল্লার মধ্যে হাজারদুয়ারীর উত্তরে মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধ **ইমামবাড়া** অবস্থিত। ইহা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে শেষ নবাব নাজিম মনসুর আলি বা ফেরিদুনজা কর্ত্তৃক মাত্র ৮।১০ মাসের মধ্যে নির্ম্মিত হয়। হুগলীর বিখ্যাত ইমামবাড়া অপেক্ষাও ইহা বৃহৎ। বাংলাদেশের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ইমামবাড়া; দৈর্ঘ্যে ইহা ৬৮০ ফুট। ইহার ভিতর বাঁশ. রঙীন কাপড় ও কাঁচ দিয়া নির্ম্মিত শতাধিক বর্ষ পুরাতন দুইটি কৃত্রিম পাহাড় আছে। মহরমের সময় তাজিয়ার সহিত এখনও ইহাদের বাহির করা হয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলার প্রতিষ্ঠিত সুন্দর ইমামবাড়াটি আগুণ লাগিয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহার পর বর্ত্তমান ইমামবাড়াটি নির্ম্মিত হয়। রিয়াজ-উস্-সলাতীন সিরাজ-উদ্দৌলার ইমামবাড়ার বহু প্রশংসা করিয়াছেন; ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে মুর্শিদাবাদে এরূপ সুন্দর ও প্রসিদ্ধ অট্টালিকা আর নাই এবং সারা হিন্দুস্থানে ইহার তুলনা মেলে না। ইহার অনুকরণে মুর্শিদাবাদে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার নিজ নিজ গৃহ-ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা করেন। সিরাজের ইমামবাড়ার অবশিষ্ট আছে পুরাতন মেদিনা টুকু; উহা বারদুয়ারী

প্রাসাদ ও বর্ত্তমান ইমামবাড়ার মধ্যে অবস্থিত। মেদিনার নীচে এক মানুষ পর্য্যন্ত মাটি কাটিয়া যথারীতি কার্ব্বালা হইতে মাটি আনিয়া ভর্ত্তি করা হইয়াছিল।

শহরের দক্ষিণে হাজারদুয়ারী প্রাসাদের প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে বহরমপুরে যাইবার পুরাতন পথের উপর অশ্ব ক্ষুরাকৃতি সুপ্রসিদ্ধ মোতিঝিল অবস্থিত। কাশ্মীরেও একটি মোতিঝিল আছে। কাহারও মতে ইহা ভাগীরথীর পুরাতন একটি খাদ এবং অপর মতে ইহার ধারে অট্টালিকা নির্ম্মাণের ইটের জন্য ঝিল খনন করিয়া মাটি লওয়া হয়। ইহাতে অনেক অল্প মূল্যের মুক্তা পাওয়া যায় বলিয়া মোতিঝিল নাম হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে ঝিলের জল কমিয়া গেলে এই সকল মুক্তা সংগ্রহ করা হয়। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ মোতিঝিলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পশ্চিম তীরে সাঙ্গীদালান নামক প্রাসাদ, একটি মস্‌জিদ ও অন্যান্য অট্টালিকা ও উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন; গৌড়ের ভগ্নাবশেষ হইতে প্রস্তরাদি আনাইয়া প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মোতিঝিলের উদ্যান বাটিকা তিনদিকে ঝিলদ্বারা স্বাভাবিক
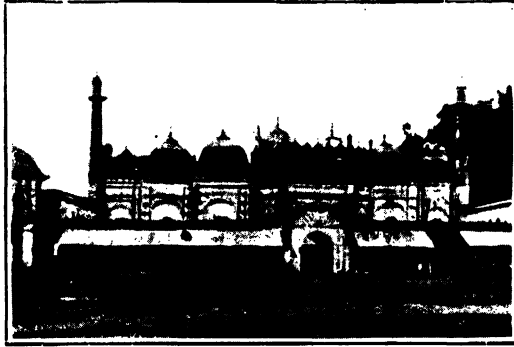
মোতিঝিল

পরিখায় রক্ষিত ছিল; পশ্চিম দিকে একটি বিশাল তোরণদ্বার নির্ম্মিত হইয়াছিল। মোতিঝিলের প্রাসাদ ক্রমে ভাঙ্গিয়া আসিলে নবাব মনসুর আলি খাঁর সময়ে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়; উহার ভগ্নাবশেষ এবং তোরণদ্বারের চিহ্ন এখনও দৃষ্ট হয়। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর মস্‌জিদটি এখনও বিদ্যমান; ইহার গম্বুজ তিনটি হইতে সুন্দর প্রতিধ্বনি বাহির হয়। এই মস্‌জিদের মধ্যে নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ, তাঁহার দত্তকপুত্র ও সিরাজ উদ্দৌলার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক্রাম উদ্দৌলা, তাঁহার শিক্ষক ও ধাত্রীর সমাধি আছে। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ অধিকাংশ সময় মোতিঝিলের প্রাসাদে আমোদ-প্রমোদে কাটাইতেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ও পরদুঃখকাতর ছিলেন। সৈয়র-মুতাক্ষরীণে লিখিত হইয়াছে যে মুর্শিদাবাদের অভাবগ্রস্ত অনাথ বিধবা সকলে তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাইতেন এবং মাসে ৩৭,০০০৲ টাকা তিনি ইহাতে ব্যয় করিতেন। তাঁহার অতি প্রিয় দত্তকপুত্র এক্রাম উদ্দৌলা বসন্ত রোগে মারা গেলে তিনি শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠেন। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর যখন তাঁহাকে সমাহিত করিবার জন্য মোতিঝিলের মস্‌জিদে লইয়া আসা হয়, তখন অগণিত নরনারী সঙ্গে আসিয়াছিল।

সৈয়র-মুতাক্ষরীণে লিখিত হইয়াছে যে কবরের মধ্যে নামইবার জন্য মৃতদেহ যখন তুলিয়া ধরা হয় তখন এই জনসমুদ্র হইতে এরূপ শোকধ্বনি ও রোদন উত্থিত হইয়াছিল যেন আকাশ বিদীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহার তুলনা কেহ কখনও দেখে নাই। ইহা হইতে নওয়াজেসের জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ২৪এ জুলাই ইংরেজ সৈন্যের হস্তে এই মোতিঝিলে নবাব মীর কাসিমের সৈন্যগণ পরাজিত হইয়া গিরিয়ায় গিয়া শিবির স্থাপন করে। ইংরেজদের দেওয়ানী গ্রহণের পর ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল মোতিঝিল প্রাসাদে ক্লাইভ ধুমধামের সহিত প্রথম পুণ্যাহ সম্পন্ন করেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর মোতিঝিলে পুণ্যাহ হইয়াছিল; ইহার পর রাজস্ব বিভাগ কলিকাতায় চলিয়া যায়। মোতিঝিলের প্রাসাদে নবাব দরবারের ইংরেজ রেসিডেন্টগণ কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলেন।

মোতিঝিলের পূর্ব্ব তীরে **কোঁয়ারপাড়া** বা কুমারপুর গ্রামে রাধামাধবের স্নান যাত্রা উপলক্ষে একটি বড় মেলা হয়। কথিত আছে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুপ্রসিদ্ধ জীব গোস্বামীর শিষ্যা হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণী বৃন্দাবন হইতে আসিয়া এই স্থানে রাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন; অপর মতে হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শিষ্য জীব গোস্বামীর বংশীয় বংশীবদন গোস্বামী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি, এক্রাম উদ্দৌলার মৃত্যুর পর নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ মন্দিরের বাদ্যধ্বনিতে অত্যন্ত বিরক্তি অনুভব করেন এবং বৈষ্ণবগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য গোঁসাঞজীর নিকট মুসলমানী খানা পাঠাইয়া দেন। গোঁসাঞজীর সম্মুখে থালার ঢাকা খুলিলে দেখা গেল খানার পরিবর্ত্তে এক ছড়া যুঁই ফুলের মালা রহিয়াছে। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ এই খবর অবিশ্বাস করিয়া পুনরায় নিজে দেখিয়া খানা প্রেরণ করেন। সে বারও খানার বদলে যুঁই ফুলের মালা পাওয়া গেল। তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং গোঁসাঞজীকে ভক্তি করিতে থাকেন। তিনি মন্দিরের সমীপস্থ চারিটি ঘাটের নিকট মাছ ধরিতে বা পাখী মারিতে নিষেধ করিয়া আদেশ জারি করেন।

মোতিঝিলের পূর্ব্বদিকে **মুবারক মুঞ্জিল** নামে নবাব বাহাদুরদিগের একটি মনোরম উদ্যান আছে; মুর্শিদাবাদের পতনের শেষের দিকে এই স্থানে নিজামত আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালত অবস্থিত ছিল। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এই পরিত্যক্ত বাটীগুলি নবাব হুমায়ুনজাকে বিক্রয় করা হয় এবং তিনি তথায় লাল বাংলা নামক একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া স্থানটিকে একটি সুন্দর উদ্যানে পরিণত করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমদিগের সুপ্রসিদ্ধ মসনদ যাহা এক্ষণে কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে স্থানান্তরিত হইয়াছে, কিছুকাল লাল বাংলায় রক্ষিত ছিল। ১৮১৭ হইতে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সদর দেওয়ানী আদালতের জজ ফেণ্ডাল্ সাহেবের নামানুসারে লোকে মুবারক মঞ্জিলকে **ফেণ্ডালবাগও** কহিয়া থাকে।

ভাগীরথীর অপর বা পশ্চিম কূলে অবস্থিত **খোশবাগ, রোশনীবাগ, ফর্হাবাগ** ও **ডাহাপাড়ার** কথা আগেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদের উত্তরে জাফরাগঞ্জের ঠিক অপর পারে মোতিঝিলের অনুকরণে সিরাজ উদ্দৌলা **হীরাঝিল** নামে একটি সুন্দর

ঝিল এবং তাহার তীরে একটি প্রকাণ্ড ও অতি মনোরম বিলাসভবন ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থান সিরাজের অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং এই প্রাসাদেই মসনদ স্থাপন করিয়া রাজকার্য্য সমাধান করিতেন। সিরাজের উপাধি মনসুর-উল-মুলক হইতে স্থানটির নাম মনসুরগঞ্জ ও প্রাসাদটি **মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ** বা লালকুঠি নামে অভিহিত হয়। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রস্তরাদি আনাইয়া এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয় এবং ইহাকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করিতে সিরাজ বহু আয়াস পাইয়াছিলেন। প্রাসাদ নির্ম্মিত হইলে বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী প্রভৃতি ইহা দেখিতে আসিয়া সিরাজ উদ্দৌলার মার্জ্জিত রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাইয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন শুক্রবার রাত্রিতে লুৎফউন্নেসার সহিত জন্মের মত সিরাজ তাঁহার এই প্রিয় প্রাসাদ ছাড়িয়া পলায়ন করেন। নবাব হইয়া মীরজাফরও প্রথমে মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে অবস্থান করেন; পরে নিজামত কেল্লায় আলিবর্দ্দীর প্রাসাদে চলিয়া যান। হীরাঝিল ও মনসুরগঞ্জ প্রাসাদের চিহ্নই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ঝিলটি ভাগীরথী গর্ভে বিলীন হইয়াছে। প্রাসাদের অবস্থাও তাহাই; কেবল দু একটি ভিত ও চত্বর দেখিতে পাওয়া যায়। হীরাঝিলের উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে **মুরাদবাগে** ক্লাইভ, হেষ্টিংস্ এবং অন্যান্য ইংরেজ রেসিডেন্টগণ বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানও প্রায় ভাগীরথীর গর্ভে গিয়াছে।

মুর্শিদাবাদের গৌরব-রবি আজ অস্তমিত। এককালে ভাগীরথীর উভয় কূল ব্যাপিয়া প্রাসাদে অট্টালিকায় ঝলমল করিত। পলাশীযুদ্ধের পর মুর্শিদাবাদ সম্বন্ধে ক্লাইভ লিখিয়াছিলেন যে এই নগরী লণ্ডন নগরীর মতই বিস্তৃত, জনাকীর্ণ ও ধনশালী; শুধু পার্থক্য এই যে পূর্ব্বোক্ত শহরের অধিবাসিগণের মধ্যে কেহ কেহ লণ্ডনবাসিগণের অপেক্ষা অসীম ধনবান।

মুর্শিদাবাদের কথা শেষ করিবার আগে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ **ব্যারা** বা বেরা পর্ব্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের রাত্রিকালে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ খাজা খিজিরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আলোকমালায় বিভূষিত করিয়া বাঁশ ও কলা গাছের শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ তরণী বর্ষাস্ফীত ভাগীরথীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। প্রধান আলোকযান দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ১২০ ও ৯০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদের গৌরবময় যুগে ইহা আরও অনেক বড় হইত। বহু সংখ্যক কলা গাছ বাঁধিয়া বাঁশ ও বাখারির সাহায্যে রঙীন কাগজ দিয়া নানারকম ঘর বাড়ী ও যুদ্ধের জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া অসংখ্য প্রদীপ দিয়া এগুলিকে সজ্জিত করা হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট বহু যান ও অগণিত কমল (কর্পূর-পূর্ণ মাটির প্রদীপ) ভাসিতে থাকে। মুর্শিদাবাদের নবাববংশীয়গণ জাঁকজমকের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া জাফরাগঞ্জের নিকট নদী তীরে গিয়া এই উৎসবে যোগদান করেন। কতকগুলি সিপাহী ও নিজামতী ব্যাণ্ড খাজা খিজিরের জন্য রুটি, ক্ষীর, পান প্রভৃতি লইয়া প্রধান আলোকযানে আরোহণ করিলে ধীরে ধীরে নদী বক্ষে এই আলোকমালা সঙ্গীত যোগে চলিতে থাকে। নদীবক্ষ ও তীর হইতে নানাবর্ণের সুন্দর সুন্দর আতসবাজী আকাশে উঠিয়া উৎসবের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে। পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের পশ্চিম তীরে রোশনীবাগে বাঁশ দিয়া ত্রিতল গৃহাদি

নির্ম্মিত করিয়া আলোকমালায় সজ্জিত করা হইত; নদীবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া ইহারা আলোক-উৎসবের সৌন্দর্য্য বহুগুণে বর্দ্ধিত করিত; ইহা হইতেই রোশনীবাগের নামের উৎপত্তি। এক্ষণে রোশনীবাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সময় হইতে এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে বলিয়া কথিত। ব্যারার জাঁকজমক পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া যাইলেও ইহা এখনও মুর্শিদাবাদের একটি স্মরণীয় উৎসব এবং বহু স্থান হইতে এই উপলক্ষে জন সমাগম হয়।

সিরাজ উদ্দৌলা ব্যারার পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার **নাওয়ারা** নামে আর একটি উৎসবের প্রবর্ত্তন করেন বলিয়া কথিত। উক্ত দিবসে বৈকাল বেলায় বহু সুসজ্জিত তরণী লইয়া নদীজলে অগণিত কদম্ব ফুলের মালা ভাসাইয়া নবাব নদীবক্ষে দরবার করিতেন। এ উৎসব বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

আজ মুর্শিদাবাদের পূর্ব্ব গৌরব ভ্রষ্ট হইলেও অতীতের বহু স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া বাংলার এই পুরাতন রাজধানী শিক্ষার্থী, ভ্রমণকারী ও অনুসন্ধিৎসুর নিকট তীর্থরূপে বিরাজ করিতেছে।

বন্যা নিবারণের জন্য ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে ভগবানগোলা হইতে প্রায় পলাশী পর্য্যন্ত **ললিতাকুরী** বাঁধ নামে প্রায় ৫৭ মাইল লম্বা একটি বাঁধ আছে। এই বাঁধ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, যদিও ইহার জন্য মুর্শিদাবাদ অঞ্চল বন্যার হাত হইতে রক্ষা পায়, কিন্তু বন্যার জলের পলিমাটি হইতে বঞ্চিত হইয়া জমির উর্ব্বরা শক্তির ক্ষতি হয় এবং এই পলি নদী গর্ভে জমিয়া নদীতল উচ্চ হইয়া উঠিয়া নদী প্রবাহের বাধা সৃষ্টি করে।

নশীপুর রোড—কলিকাতা হইতে ১২৫ মাইল দূর। নশীপুরে পশ্চিম দেশীয় অগ্রবাল বণিক্ জাতীয় এক ঘর বড় জমিদারের বাস। এই বংশ নশীপুরের রাজবংশ নামে পরিচিত। ইতিহাস প্রসিদ্ধ দেবীসিংহ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। মুর্শিদাবাদের গৌরবের দিনে ভাগ্যান্বেষী দেবীসিংহ সুদূর পাণিপথ হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হন। বহু চেষ্টা ও উমেদারির পর তিনি মুর্শিদাবাদের দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর অধীনে পূর্ণিয়ার ইজারা ও সেই সঙ্গে উক্ত অঞ্চলের শাসনভার প্রাপ্ত হন। রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি যে সকল পন্থা অবলম্বন করেন, তাহা তাঁহার চরিত্রকে চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। হেষ্টিংস্ বাধ্য হইয়া ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে দেবীসিংহকে পূর্ণিয়ার কার্য্য হইতে পদচ্যুত করেন কিন্তু পরে আবার তাঁহাকে দিনাজপুর, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানের ইজারা প্রদান করিয়া দিনাজপুরের নাবালক রাজার দেওয়ান পদে প্রেরিত করেন। তিনি পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং উত্তর বঙ্গে প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। তাঁহার করভার, নিপীড়ন ও নানা অত্যাচারে অবশেষে উত্তর বঙ্গের প্রজাগণ বিদ্রোহী হয় এবং উহা দমন করিবার জন্য কোম্পানির সৈন্যগণের সাহায্য লইতে হইয়াছিল। মোগলহাট, পাটগ্রাম প্রভৃতি স্থানে খণ্ডযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশেষে কর্ত্তৃপক্ষকে দেবীসিংহের অত্যাচারের অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অত্যাচারে সমগ্র উত্তরবঙ্গ পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে থাকে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমর উপন্যাস "দেবী চৌধুরাণী"তে

দেবীসিংহের উৎপীড়নের উজ্জ্বল আলেখ্য অঙ্কিত করিয়াছেন এবং এতৎপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "পৃথিবীর ওপারে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হলে দাঁড়াইয়া এডমণ্ড বার্ক দেবীসিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বার্ক দেবীসিংহের ছবিসহ অত্যাচার অনন্তকাল সমীপে পাঠাইয়াছেন।" দেবীসিংহ নিঃসন্তান ছিলেন, স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতার দ্বিতীয় পুত্র বলবন্ত সিংহকে তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। বলবন্ত সিংহের পুত্র গোপালসিংহ অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করায় দেবীসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাহাদুর সিংহের অপর বংশধরেরা জমিদারীর অধিকারী হন। বাহাদুর সিংহের তৃতীয় পুত্র রাজা উদ্বন্ত সিংহ বহু সৎকার্য্যের দ্বারা খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার সময় হইতেই নশীপুরের রাজবংশ বংশানুক্রমিক রাজা উপাধির অধিকারী। নশীপুরের রাজবাটী ও ঠাকুরবাটী এখানকার দ্রষ্টব্য বস্তু। প্রতিবৎসর মহাসমারোহের সহিত রাজবাটীতে তুলসী বিহার ও ঝুলন যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

মহিমাপুর নশীপুরের নিকটবর্ত্তী মহিমাপুরে বিখ্যাত জগৎ শেঠবংশীয় বণিকগণের বাস। জগৎশেঠ কাহারও নাম নহে, ইহা একটি উপাধি বিশেষ। যোধপুর নিবাসী হীরানন্দ শেঠের কনিষ্ঠ পুত্র শেঠ মাণিকচাঁদ বাণিজ্য উপলক্ষে বাংলার তৎকালীন রাজধানী ঢাকায় একটি গদী সংস্থাপন করেন। সেই সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার দেওয়ানি লাভ করিয়া ঢাকায় অবস্থান করিতেন। কার্য্য উপলক্ষে মাণিকচাঁদের সহিত তাঁহার পরিচয় ও ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। আজিম-উস্-শানের সহিত মনোমালিন্যের ফলে মুর্শিদকুলী যখন ঢাকা ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে আসেন, শেঠ মাণিকচাঁদও তাঁহার সহগামী হন এবং মুর্শিদাবাদের নিকটবর্ত্তী ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে মহিমাপুরে নিজের বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার দত্তকপুত্র ফতেচাঁদ বাদশাহ মহম্মদশাহের নিকট হইতে "জগৎশেঠ" উপাধি লাভ করেন। মুর্শিদকুলীর সহিত সংস্রবের ফলে শেঠবংশ ক্রমে ক্রমে রাজ্য পরিচালনা বিষয়েও প্রাধান্য লাভ করেন। বাংলার রাজস্ব দিল্লীর রাজকোষে শেঠদিগের হুণ্ডী মারফত প্রেরিত হইত। দিল্লীতে তাঁহাদের আত্মীয়দের গদীতে হুণ্ডী ভাঙ্গান হইত। শেঠ বংশের ঐশ্বর্য্যের কথা প্রবাদের ন্যায় লোকের মুখে মুখে ফিরিত। সারা হিন্দুস্থানে তাঁহাদের সমকক্ষ কেহ ছিল না। কথিত আছে যে তাহাদের গদীতে দশ কোটী টাকার কারবার চলিত। নবাব আলিবর্দ্দীর সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাদের গদী লুণ্ঠন করিয়া দুই কোটী টাকা লুণ্ঠন করিলেও তাঁহাদের কিছুই ক্ষতি হয় নাই। পরবর্ত্তীকালে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সহিত কোন কারণে শেঠবংশের মনোমালিন্য ঘটে এবং সিরাজের সিংহাসনচ্যুতির ষড়যন্ত্রে তৎকালীন জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদ বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। নানারূপ ঘটনাচক্রে ও কালবশে জগৎ শেঠদিগের বিপুল বিত্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং ইংরেজ আমলে তাঁহাদের অবস্থা ক্রমশঃ অবনতির দিকে যায়। এই বংশীয় ইন্দ্রচাঁদ ইংরেজ সরকারের নিকট হইতে (লর্ড কর্ণওয়ালিশের শাসনকালে) শেষ "জগৎশেঠ" উপাধি লাভ করেন। অবশেষে এই বংশীয়গণের এইরূপ হীনাবস্থা হয় যে ইহারা কয়েক পুরুষ যাবত ইংরেজ প্রদত্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হন। জগৎ-শেঠগণের বিস্তৃত বাসভবনের অধিকাংশ গঙ্গার গর্ভসাৎ হইয়াছে। ঠাকুরবাটীর প্রাঙ্গনে কয়েকটি সুন্দর কারুকার্য্যমণ্ডিত প্রস্তরখণ্ড অতীতের গৌরবময় স্মৃতি বহন করিতেছে।

শেঠবংশ জৈন হইলেও, বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ইঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পুনরায় তাঁহারা জৈন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

শেঠদিগের বাটীর উত্তরে সতীচৌরা বা সতীস্থান নামে একটী মন্দির দৃষ্ট হয়। এই স্থানে কোনও সতী সহমৃত হওয়ায় মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়।

জিয়াগঞ্জ—কলিকাতা হইতে ১২৭ মাইল দূর। ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত ইহা একটি পুরাতন স্থান। জিয়াগঞ্জ ও গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত আজিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নওলাক্ষা, তুগোরিয়া, কোঠারি ও নাহার প্রভৃতি উপাধিধারী বহু জৈন বণিকের বাস। মুর্শিদাবাদের উন্নতির সময়ে পশ্চিমদেশ হইতে আসিয়া এই বণিকগণ বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিলেন। ইঁহাদের নির্ম্মিত জৈন মন্দিরগুলি এতদঞ্চলের দ্রষ্টব্য বস্তু। জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত।

জিয়াগঞ্জের প্রাচীন নাম গাম্ভীলা। বিন্ধ্যাচলের প্রধান পাণ্ডা গোঁসাইএর বংশীয়া "জিয়া," নামক জনৈকা বৃদ্ধা এখানে আসিয়া ভাগীরথী তীরে বাস করেন। তাঁহার অনুরক্ত বণিকগণ তাঁহার নাম অনুসারে এই স্থানের গাম্ভীলা নাম পরিবর্ত্তন করিয়া জিয়াগঞ্জ নাম রাখেন। গাম্ভীলা বৈষ্ণবগণের নিকট প্রিয় স্থান। নরোত্তম দাস ঠাকুরের শিষ্য মহাপণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী গাম্ভীলায় বাস করিতেন। এই স্থানেই নরোত্তম গঙ্গানারায়ণের প্রার্থনা অনুসারে চিতা শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছিলেন ("খেতুর রোড" দ্রষ্টব্য)। এই গাম্ভীলা পাটেই অতি অদ্ভুতভাবে নরোত্তমের অন্তর্ধান ঘটে। এ সম্বন্ধে "নরোত্তম বিলাসে" উল্লিখিত হইয়াছে।

> "বুধরি হইতে শীঘ্র চলিলা গাম্ভীলে।
> গঙ্গা স্নান করিয়া বসিলা গঙ্গা কূলে॥
> আজ্ঞা কৈল রামকৃষ্ণ গঙ্গানারায়ণে।
> মোর অঙ্গ মার্জ্জন করহ দুইজনে॥
> দোহে কিবা মার্জ্জন করিব পরশিতে॥
> দুগ্ধ প্রায় মিশাইল গঙ্গার জলেতে॥"

১৫০৯ শকাব্দে কোজাগর লক্ষ্মীপূজার পরবর্ত্তী পঞ্চমী তিথিতে ঠাকুর নরোত্তমের তিরোভাব ঘটে। আজিও প্রতিবৎসর এই দিনে জিয়াগঞ্জে তাঁহার তিরোভাব মহোৎসব উপলক্ষে মেলা হইয়া থাকে। প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে গাম্ভীলার মেলায় নরোত্তম ঠাকুরের মৃন্ময়ী মূর্ত্তি বিক্রয় হইত। জিয়াগঞ্জ নিবাসী জনৈক ভদ্রলোক সম্প্রতি এইরূপ একটি মূর্ত্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ "আশুতোষ স্মৃতি চিত্রশালায়" উপহার প্রদান করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিটি নরোত্তম দাসের সন্ন্যাস অবস্থার। মূর্ত্তিটি হাঁটু গাড়িয়া উপবিষ্ট ও যুক্তহস্ত। চোখ দুটি ভাব বিহ্বল, দেহ দীর্ঘাকার, নাসিকা উন্নত, বক্ষ প্রশস্ত, মস্তকের কেশরাশি চূড়ারূপে বদ্ধ, মুখমণ্ডল গুম্ফ ও শ্মশ্রুতে প্রায় সমাচ্ছন্ন, অঙ্গের বর্ণ সুবর্ণ কান্তি, পরিধানে রক্ত কৌপীন ও সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের তিলক। মূর্ত্তিটির কারুকার্য্য অতি সুন্দর। জিয়াগঞ্জের নিকটবর্ত্তী কুমার পাড়া গ্রামের কুমারগণ এইরূপ মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গাম্ভীলার মেলায় বিক্রয় করিত।

জিয়াগঞ্জের নিকটবর্ত্তী সাধকবাগ অপর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। এখানে মস্তরাম সাধুর আখড়া অবস্থিত। মস্তরামের প্রকৃত নাম সদানন্দ। তিনি শারীরিক ও যৌগিক শক্তির জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। পায়ে হাঁটিয়া তিনি ভাগীরথী পারাপার হইতেন বলিয়া প্রবাদ। তিনি মুর্শিদকুলী খাঁ, আলিবর্দ্দী ও নবাব সিরাজউদ্দৌলার সমসাময়িক ব্যক্তি। কথিত আছে, একবার নবাব আলিবর্দ্দী তাঁহাকে একখানি শাল ও কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। উহা প্রাপ্তিমাত্র তিনি শাল খানিকে সম্মুখস্থ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ও মুদ্রাগুলিকে নদীর জলে ফেলিয়া দেন। এই সংবাদ শুনিয়া আলিবর্দ্দী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রেরিত দ্রব্যগুলি ফেরত চাহিয়া পাঠান। মস্তরাম তৎক্ষণাৎ অগ্নিকুণ্ড হইতে সেইরূপ দশখানি শাল ও নদীর জল হইতে প্রায় পঞ্চগুণ স্বর্ণমুদ্রা তুলিয়া দিয়া নবাবের বিস্ময় উৎপাদন করেন। আলিবর্দ্দী তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে একখানি ঢাল ও তরবারি উপহার দেন। আলিবর্দ্দী প্রদত্ত ঢাল ও তরবারি এখনও সাধকবাগের আশ্রমে দেখিতে পাওয়া যায়। নাটোরের মহারাণী ভবানী, বড়নগরের রাজা উদয়নারায়ণ ও মহিষাদলের রাজা প্রভৃতি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ মস্তরামের একান্ত অনুগত ছিলেন। মস্তরাম বাবাজীর খড়ম, যষ্টি ও ব্যবহৃত কয়েকটি অলঙ্কার সাধকবাগে সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে। রোগ আরোগ্য কামনায় ও বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় এখনও বহু ব্যক্তি এই আখড়ায় পূজা দিয়া থাকেন। রথযাত্রা উপলক্ষে আখড়ায় সমারোহে উৎসব হইয়া থাকে।

সাধকবাগের অপরপারে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বড়নগর অবস্থিত। পূর্ব্বভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল বারহাড়োয়া শাখার "আজিমগঞ্জ জংশন" স্টেশন দ্রষ্টব্য।

ভগবানগোলা—কলিকাতা হইতে ১৩৪ মাইল। বর্ত্তমানে ইহা একটি নগণ্য পল্লী হইলেও এক সময়ে বাংলা দেশের একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল। বর্ত্তমান ভগবান গোলা রেল স্টেশন হইতে পুরাতন ভগবানগোলা প্রায় ৪ মাইল দূর। ইহার একদিকে ভাগীরথী, অপর দিকে জলঙ্গী ও নিকটেই পদ্মা প্রবাহিত হইত। দেশ বিদেশ হইতে আগত বাণিজ্য তরীতে ভগবান গোলা তখন সুশোভিত থাকিত। মুর্শিদাবাদের অভ্যুদয়ের সময়ে ইহার অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হয়। ঐতিহাসিক হলওয়েল লিখিয়াছেন তৎকালে ভগবানগোলায় ধান্য, দাইল, পলাণ্ডু প্রভৃতি শস্য, তুলা, রেশম, বস্ত্র, নীল, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি ব্যবসায়ের একটি বৃহৎ কেন্দ্র ছিল এবং এই গঞ্জ হইতে বার্ষিক ৩০ লক্ষ টাকার কর উঠিত। এত বড় বাজার তৎকালে পৃথিবীর আর কোথাও ছিল কিনা সন্দেহ। শোভাসিংএর বিদ্রোহ কালে তাঁহার সহযোগী রহিম খাঁর সহিত ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ভগবানগোলায় মুঘল পক্ষীয় জবরদস্ত খাঁর ভীষণ যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া বর্দ্ধমানের দিকে পলাইয়া যায়। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর রাজত্ব কালে মহারাষ্ট্রীয় বর্গীগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নদীতীর ব্যতীত ভগবানগোলার অন্যান্য দিকে পরিখা খনিত ও কাষ্ঠের প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং এই স্থানে নবাবের নৌ সেনার আড্ডা ছিল। ভাস্কর পণ্ডিত ও আলিভাইএর নেতৃত্বে মহরাষ্ট্রীয়গণ চারিবার ভগবান গোলা আক্রমণ করিয়া প্রতিহত হয়। অতঃপর ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে বর্গীগণ পুনরায়

এই স্থান আক্রমণ করে ও নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধনরত্ন লুণ্ঠন ও গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া চলিয়া যায়। পুরাতন আমলের কতকগুলি পরিখার চিহ্ন ছাড়া বর্ত্তমানে ভগবানগোলায় বিশেষ দ্রষ্টব্য অন্য কিছুই নাই।

পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিরাজ উদ্দৌলা যখন মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করেন, তখন এই ভগবানগোলা হইতেই নৌকা যোগে রাজমহল অভিমুখে যাত্রা করেন।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে বিশপ হীবার এই স্থান দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভ্রমণ বিবরণীতে ইহার শান্ত শ্যামল পল্লীশ্রীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহা লইয়া একটি কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন।

ভগবানগোলার নিকটবর্ত্তী তেলিয়া বুধুরি গ্রাম বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ ও তদীয় অনুজ বিখ্যাত পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহারা উভয় ভ্রাতাই সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম দাসের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। স্বকৃত পদে নরোত্তম দাস বহু স্থানে রামচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। রামচন্দ্রের ভ্রাতা গোবিন্দ কবিরাজ প্রথমে ঘোর শাক্ত ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের কৃপায় দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে তেলিয়া বুধুরী গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্য আসিলে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। গোবিন্দ দাসের রচিত পদাবলী বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ।

ভগবানগোলার নিকটস্থ বিল সমূহে মোতিঝিলের ন্যায় অল্প মূল্যের মুক্তা পাওয়া যায়।

লালগোলা—কলিকাতা হইতে ১৪১ মাইল দূর। ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে রাজা উপাধিধারী একঘর পশ্চিম দেশীয় জমিদারের বাস। আচারে ব্যবহারে এই বংশ এখন পুরাপুরি বাঙালী হইয়া গিয়াছেন। এই রাজবংশের বহু কীর্ত্তি মুর্শিদাবাদের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বংশ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও সাহিত্য সেবিগণের বিশেষ উৎসাহ দাতা।

প্রতিবৎসর মহাসমারোহে লালগোলায় রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

লালগোলা হইতে ৪ মাইল দূরে পদ্মার তীরে লালগোলাঘাট স্টেশন। এই স্থান হইতে রেলের খেয়া-স্টীমারে করিয়া প্রায় আট মাইল দূরবর্ত্তী পদ্মা ও মহানন্দার সঙ্গমের নিকট অবস্থিত রাজশাহী জেলার অন্তর্গত গোদাগাড়ীঘাটে গিয়া মাঝারি মাপের লাইনের গাড়ীতে উঠিয়া মালদহ ও কাটিহার যাইতে হয়। লালগোলাঘাটের দৃশ্য অতি সুন্দর, বিশেষতঃ বর্ষাকালে পদ্মার গৈরিক জলোচ্ছ্বাসে যখন পদ্মা ও মহানন্দার মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ চরভূমি জলে ডুবিয়া যায়, তখনকার দৃশ্য আরও সুন্দর। পদ্মার তীরে অবস্থিত বলিয়া লালগোলাঘাট স্টেশনটিকে প্রায় প্রতি বৎসরই বিভিন্ন স্থানে সরাইয়া লইতে হয়। সেই জন্য স্টেশনের অফিস প্রভৃতি পদ্মা মধ্যবর্ত্তী একখানি বড় ফ্লাটের উপর অবস্থিত।

গোদাগাড়ী—গোদাগাড়ী ঘাটের পরের স্টেশন গোদাগাড়ী কলিকাতা হইতে ১৫৭ মাইল দূর। বর্ত্তমান রেল স্টেশন হইতে পুরাতন গোদাগাড়ী প্রায় দুই মাইল দূরে মহানন্দার তীরে অবস্থিত। গোদাগাড়ী একটি পুরাতন বন্দর। বর্গীর হাঙ্গামার সময় যখন মহারাষ্ট্রীয়েরা মুর্শিদাবাদের আশ-পাশ ও ভগবানগোলা লুণ্ঠন করিতে আসিত, তখন অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান ধনজন সহ গোদাগাড়ীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। একবার বর্গীর ভয়ে স্বয়ং নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ধনরত্ন ও স্ত্রী কন্যাদি স্বীয় জামাতা নওয়াজেশ্ মহম্মদ খাঁর তত্ত্বাবধানে গোদাগাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পুরাতন গোদাগাড়ীতে সেই সময়ের নির্ম্মিত একটি ভগ্নপ্রায় মসজিদ্ এবং একটি কেল্লার ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। গোদাগাড়ীর সন্নিকটে রাজশাহী জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া একটি নদী পদ্মা বা গঙ্গায় পড়িয়াছে। এই ক্ষুদ্র নদীটিও পদ্মা নামে অভিহিত। কেহ কেহ মনে করেন গঙ্গা যখন ভাগীরথীর খাদ ছাড়িয়া ক্রমেই পূর্ব্ব দিকে বহিতে আরম্ভ করে সেই সময়ে এই ক্ষুদ্র নদীটির খাত দিয়া প্রবাহিতা হওয়ায় ইহারই নাম পদ্মা হইয়াছে।

আমনুরা জংশন—কলিকাতা হইতে ১৭১ মাইল দূর। গোদাগাড়ী ছাড়িয়া আমনুরার দিকে কিছু দূর যাইলেই বরেন্দ্র ভূমির বিশিষ্ট দৃশ্য আরম্ভ হইবে। উঁচু নীচু লাল মাটির বিস্তৃত প্রান্তরে সজাগ প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া অসংখ্য তাল গাছ সত্যই মনোরম মনে হয়। বাংলার সাধারণ দৃশ্য হইতে ইহার পার্থক্য সুস্পষ্ট। ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে বাংলার পশ্চিম প্রান্তে বীরভূম ও মেদিনীপুরের সীমান্ত ভূমির দৃশ্যের সহিত। আমনুরা পূর্ব্বে একটি ছোট স্টেশন ছিল। কিন্তু প্রধান লাইনের আব্দুলপুর হইতে মালদহ জেলার মহানন্দা তীরবর্ত্তী গঞ্জ চাপাই-নবাবগঞ্জ পর্য্যন্ত বড় মাপের লাইন নির্ম্মিত হওয়ার পর বড় মাপের ও মাঝারি মাপের লাইনের জংশন স্টেশনরূপে আমনুরা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই স্টেশনটিকে অবলম্বন করিয়া মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে একটি ছোট শহর গড়িয়া উঠিতেছে।

আমনুরা স্টেশন অতিক্রম করিবার পর গাড়ী কিছুদূর অগ্রসর হইলে লাইনের দুই দিকে মধ্যে মধ্যে উচ্চ জাঙ্গাল দৃষ্ট হয়। এই উচ্চ জাঙ্গালের নামই বরিন্দ বা উচ্চ ভূমি। ইহার নাম হইতেই উত্তর বঙ্গের একাংশের নাম বরেন্দ্র ভূমি হইয়াছে। পূর্ব্বে বরিন্দ অঞ্চলে বহু অরণ্য ছিল। সাঁওতালেরা আসিয়া বহু পুরুষ ধরিয়া এই সকল অরণ্যের অধিকাংশকে এখন কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। বরেন্দ্র ভূমির মৃত্তিকার রঙ সাধারণতঃ লাল। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চল যে বহু পুরাতন সে কথা "বাংলার সাধারণ পরিচয়" অধ্যায়ে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

রোহনপুর—কলিকাতা হইতে ১৮৭ মাইল দূর। ইহা পুনর্ভবা নদীর উপর অবস্থিত। স্টেশনের উত্তরেই ইহার উপর রেলওয়ে সেতু। পুনর্ভবা এক মাইলের কিছু উত্তর পশ্চিম দিকে গিয়া মহানন্দার সহিত মিশিয়াছে। রোহনপুর এ অঞ্চলে ধান ও চাউলের কারবারের একটি প্রধান কেন্দ্র।

মালদহ—কলিকাতা হইতে ২০৭ মাইল দূর। স্টেশন হইতে মহানন্দা পার হইয়া মালদহ শহরে পৌঁছিতে হয়। মালদহের পুরাতন নাম ইংরেজবাজার। পুরাতন মালদহে যখন রেশমের বড় আড়ং ছিল তখন ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এই স্থানে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কুঠি তথা হইতে উঠাইয়া আনিয়াছিলেন। কুঠির চারিদিকে সুদৃঢ় প্রাচীর দিয়া সুরক্ষিত ছিল; ইহা এখন আদালত ও সরকারী দপ্তররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ওলন্দাজ ও ফরাসীরাও এখানে কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন! মুসলমানেরা রাজ্য হারাইলে ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা এই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন বলিয়া ইংরেজবাজার ক্রমশঃ জেলার সদর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহানন্দা নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়া শহরের সহিত স্টেশনকে সংযুক্ত করিয়া দিবার একটি প্রস্তাব আছে। এখন খেয়া নৌকাযোগে গোরুরগাড়ী, মোটর প্রভৃতি পারাপারের ব্যবস্থা আছে। বর্ষাকালে মহানন্দার জলোচ্ছ্বাস হইতে শহর রক্ষা করিবার জন্য নদী তীর দিয়া একটি উচ্চ বাঁধ আছে। মহানন্দা মালদহ
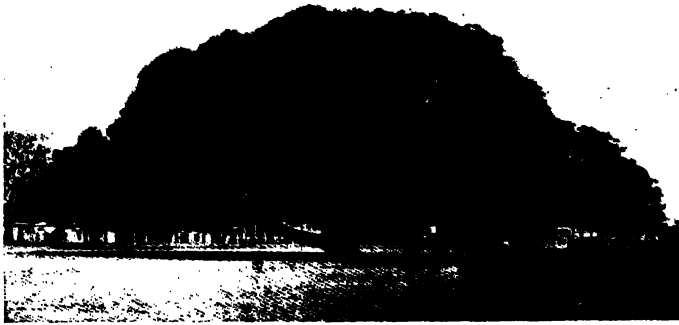
বৃন্দাবনী আমগাছ, মালদহ

জেলার প্রধান নদী। মহানন্দার প্রাচীন নাম নন্দা বা অপরনন্দা। মহানন্দা প্রাচীন নদী। মহাভারতে কৌশিকী নদীর পর নন্দা ও অপরনন্দা নামক দুইটি নদীর উল্লেখ আছে। মহানন্দা তাহাদের অন্যতম। মালদহ কতদিনের প্রাচীন স্থান তাহা বলা কঠিন। রামায়ণে মলদ ও করুষ নামে দুইটি স্থানের নাম আছে। কথিত আছে, তাড়কা রাক্ষসীর উৎপাতে এস্থান দুইটি নির্ম্মনুষ্য হইয়া যায়। অর্থাৎ অনার্য্যদের উৎপাতে এস্থানের আর্য্যদের উপনিবেশ বিনষ্ট হইয়াছিল। পৌরাণিক ভূগোলেও মলদ বা মালদরাজ্যের নাম আছে। মালদহের সহিত এই মলদরাজ্যের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কিনা তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই।

মালদহের পার্শ্বস্থ বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান যুগের রাজধানী গৌড় ও পাণ্ডুয়া এই স্থানের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।

মালদহ আমের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। এখান হইতে প্রতি বৎসর ৮।১০ লক্ষ টাকার আম নানা দেশে রপ্তানি হয়। এখানে নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট আম হয়, তাহাদের মধ্যে গোপালভোগ

কোহাপাহাড়িয়া প্রভৃতি প্রধান। বর্ত্তমানে ল্যাঙ্গড়া প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। মালদহের এই আমের খ্যাতি দুই শত বৎসরের অধিক নহে। এখানকার কাছারীর হাতার মধ্যে যে বিস্তৃত মাঠ আছে, তাহার মধ্যে একটি শত বর্ষের প্রাচীন আম গাছ আছে; এই গাছটি বৃন্দাবনী আম গাছ বলিয়া বিখ্যাত। শাখা প্রশাখায় সুবিস্তৃত এই আম গাছটির ঘনপল্লব ও শ্যামপত্রাবরণযুক্ত শোভা সকলেরই মনোরঞ্জন করে।

মালদহের রেশম-শিল্প জগদ্বিখ্যাত। গৌড়ের হিন্দু রাজাদের সময়ও এখানকার পট্ট বস্ত্র প্রসিদ্ধ ছিল এবং সপ্তগ্রাম, ঢাকা ও সুবর্ণ গ্রামে রপ্তানি হইত। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে শেখ ভীক্ নামে মালদহী বস্ত্রের ব্যবসায়ী তিন জাহাজ রেশমী কাপড় লইয়া রুশিয়ায় যাত্রা

জহরাকালী, মালদহ

করিয়াছিল, তাঁহার দুইটি জাহাজ ইরাণীয় উপসাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পুরাতন মালদহে ওলন্দাজদিগের একটি রেশমের কুঠি ছিল; ঈস্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানির কুঠি পরে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের রেশমী সূতা এই জেলায় প্রস্তুত হয় এবং ৬৫ হইতে ৭০ লক্ষ টাকার রেশমী সূতা ও কাপড় এখান হইতে রপ্তানি হয়। এই ব্যবসায়টির বেশীরভাগ মাড়োয়ারীদের দ্বারা

পরিচালিত হয়। এখানকার রেশমী ধুতি, শাড়ী ও রুমালের বিশেষ খ্যাতি আছে। উদু, গুল বিশি, বুল বুল চশম, চাঁদতারা, কদমফুলী, মাপচর, কলিন্তরাক্ষী (কপোতাক্ষী ?) প্রভৃতি নানা রকম রেশমী ও রেশমী-সূতী মিশ্র কাপড় এখানে প্রস্তুত হয়। রং করিবার জন্য এখান হইতে মট্‌কা মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে রপ্তানি হয়। জাপানী প্রভৃতি বৈদেশিক রেশমী বস্ত্রের আমদানীর জন্য এই পুরাতন শিল্পের আজ কাল ক্ষতি হইতেছে। মালদহে গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত একটি সেরিকালচারাল ফার্ম্ আছে।

মালদহ শহরের মধ্যে দর্শনীয় স্থান হইতেছে—রিয়াজ-উস্-সলাতীন প্রণেতা গোলাম হুসেনের কবর, চিত্রশালা, গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ও জহরতলা থান নামে পরিচিত প্রাচীন শক্তিপীঠ প্রভৃতি। মালদহের চিত্রশালায় বরেন্দ্রভূমি হইতে সংগৃহীত বহু প্রস্তর

গান্ধীধর্ম্মশালা, মালদহ

মূর্ত্তি ও শিলালিপি প্রভৃতি রক্ষিত আছে। অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে ইহা একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। মালদহ শহরে একটি বড় মসজিদ আছে। উহা আকবরের রাজত্বকালে জনৈক ধনী বণিক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মালদহ পূর্ব্বে শাক্ত প্রধান স্থান ছিল। এস্থানে মঙ্গলচণ্ডী, কালী ও সর্ব্বমঙ্গলা-দেবীর পূজার বেদী সর্ব্বত্র দেখা যাইত এবং বাশুলি, মশান-চামুণ্ডা প্রভৃতি অনেক পিশাচ-দেবতার পূজা হইত। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মালদহ জেলার অনেকেই বৈষ্ণব মত অবলম্বন করিয়াছেন। এখন মালদহকে একটি বৈষ্ণবপ্রধান স্থান বলা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী মালদহে আসিয়াছিলেন।

মোকৃতুম্ শাহ, কুতুব শাহ ও পিরাণপীর (আখিসেরাজ) এই তিন জন পীর মালদহে বিশেষ বিখ্যাত। স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ইঁহাদের বিষয়ে নানারূপ গল্প ও কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়। গল্প আছে, মোকতুম শাহ বাঘের উপর চড়িয়া বেড়াইতেন এবং খড়ম পায়ে দিয়া নদী পার হইতেন।

মালদহের "গম্ভীরা" নামক লোক সঙ্গীত জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহার প্রচলন আছে। সাধারণতঃ বৎসরের শেষে চৈত্র মাসের শেষ তিন দিন এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একটি সামিয়ানার নীচে শিবের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া এই উৎসব পালিত হয় এবং বিগত বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী নৃত্য, গীত ও অভিনয় সহযোগে সমালোচিত হয়। দিনাজপুর অঞ্চলের শিব-ভক্ত বাণরাজা এই উৎসব প্রচলন করেন বলিয়া কথিত। পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমানগণের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে গম্ভীরা রচিত হইত। রুচি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরে সমসাময়িক সমাজ-নৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এই সঙ্গীতের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

মালদহ স্টেশনের কাছে একটি ধর্ম্মশালা আছে। তিন দিন পর্য্যন্ত তথায় বিনা ভাড়ায় থাকিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত শহরের মধ্যে একটি পান্থশালা আছে। এই পান্থশালায় দৈনিক এক পয়সা করিয়া ভাড়া হিসাবে দিতে হয়।

মালদহ শহরে মাড়োয়ারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গান্ধী ধর্ম্মশালা নামে একটি বড় ধর্ম্মশালা আছে। হিন্দুমাত্রেই এখানে বিনা ভাড়ায় তিন দিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন। এই ধর্ম্মশালাটি বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। মালদহ শহরে হিন্দু ও মুসলমানের হোটেলের অভাব নাই। মালদহের মোহনভোগ, রসকদম্ব ও খাজার বেশ নাম আছে।

মালদহ হইতে নৌকাপথে ৬ মাইল দক্ষিণে মহানন্দার দক্ষিণ কূলে ভোলাহাট একটি বৃহৎ গ্রাম; ইহা একটি রেশম শিল্পের কেন্দ্র। গ্রামের প্রধান রাস্তার উপর গৌড় হইতে আনীত একটি সুন্দর কারুকার্য্য মণ্ডিত ক্ষোদিত প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়।

গৌড়—ইংরেজ বাজার বা বর্ত্তমান মালদহ শহর হইতে বাংলার বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান যুগের রাজধানী ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। গৌড়ের শেষ সীমানা ইংরেজ বাজার হইতে ১২ মাইলেরও অধিক। বরাবর পাকা রাস্তা আছে এবং ট্যাক্সি, বাস বা গরুর গাড়ী করিয়া সহজেই এই বিস্তীর্ণ পরিত্যক্ত প্রাচীন রাজধানী দেখিয়া আসা যায়। বন্যা হইতে রক্ষা করিবার জন্য শহরের চারি দিকে তৎকালে যে বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল উহা এখনও বর্ত্তমান; দৈর্ঘ্যে উত্তর-দক্ষিণে উহা সাড়ে সাত মাইল এবং প্রস্থে পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় দুই মাইল।

গৌড় নামের প্রসিদ্ধি ও প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে "বাংলার সাধারণ পরিচয়" অধ্যায়ে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গৌড় নাম এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঁচটি গৌড়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্কন্দ পুরাণে পঞ্চ গৌড়ের উল্লেখ আছে; ইহাদের মধ্যে বাংলা দেশের গৌড়ই সমধিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বাংলার প্রাচীন হিন্দু নৃপতিগণের মধ্যে অনেকেরই "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে বর্ণিত আছে যে সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতার দৌহিত্র গৌড় এই ভূভাগের রাজা ছিলেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে গৌড়ের এবং গৌড়ভট্টদিগের লগুড় যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতার কথা আছে। এ অঞ্চল পুরাকালে গুড়ের কারবারের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করায় গুড় হইতে গৌড় নমের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ

অনুমান করেন। গৌড়সারঙ্গ গৌড়ী প্রভৃতি রাগ রাগিণীর নাম হইতে পুরাকালে এই স্থানের সংস্কৃতিগত উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। দিল্লী ও উত্তর ভারতের গৌড় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা বংশ পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছেন যে তাঁহাদের আদি পুরুষ গৌড় হইতে মহারাজ জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ উপলক্ষে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া উত্তর ভারতে বাস স্থাপন করেন।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত বংশীয় নৃপতিগণের অধঃপতন ও ক্ষমতা লোপের সহিত বাংলায় স্থানীয় শাসকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীন রাজা হইয়া পড়েন। যুক্ত প্রদেশের বড়বাঁকি জেলার হড়াদা গ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগে মৌখরী বংশীয় রাজা ঈশান বর্ম্মা সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত গৌড় রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; ইহা হইতে অনুমিত হয় যে গৌড় তখন স্বাধীন ছিল। শিলা লিপিতে গৌড়গণকে "সমুদ্রাস্ত্রয়ান্" বলা হইয়াছে। "ইহা হইতে বোধ হয় সূচিত হইতেছে যে গৌড়গণ নৌবলে বলীয়ান্ ছিলেন।" ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত চারি খানি তাম্র লিপি হইতে জানা যায় এই যুগে দক্ষিণবঙ্গে ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব নামে রাজা ছিলেন। ধর্ম্মাদিত্যের তাম্রশাসনে দেখা যায় তাঁহার সময়ে গৌড়ের অংশ-বিশেষের শাসক ছিলেন মহারাজ স্থাণু দত্ত। ইহার পর রাজা শশাঙ্ক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়াধিপতি হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণে। (পূর্ব্ব ভারত রেলপথের ব্যাণ্ডেল-বারহাড়োয়া শাখার চিরোতী স্টেশন দ্রষ্টব্য)। কহ্লন মিশ্র প্রণীত "রাজ তরঙ্গিনীতে" বর্ণিত আছে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে কাশ্মীরের অধিপতি ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় কান্যকুব্জের পরাক্রান্ত রাজা যশোবন্তকে পরাস্ত করিয়া মগধ পর্য্যন্ত অধিকার করিলে গৌড়পতি বহু হস্তী উপহার দিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন; তাঁহার নিমন্ত্রণে গৌড়পতি কাশ্মীরে যাইলে, পরিহাসপুর বা বর্ত্তমান পরসপোর নগরের পরিহাসকেশব মন্দিরে বিগ্রহের সম্মুখে ললিতাদিত্য প্রতিজ্ঞা করেন যে তিনি অতিথির কোনও ক্ষতি করিবেন না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা তিনি রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং ত্রিগামী নামক স্থানে গৌড়পতিকে হত্যা করেন। এই বার্ত্তা শুনিয়া গৌড় হইতে একদল যোদ্ধা প্রতিশোধ লইবার জন্য কাশ্মীর গমন করিয়া পরিহাসকেশবের মন্দির অবরোধ করেন এবং ভ্রমবশতঃ পরিহাসকেশবের পরিবর্ত্তে রাম স্বামীর রজতবিগ্রহ ধ্বংস করিয়া যুদ্ধে প্রাণ দান করেন। অনুমিত হয় ইহারা বৌদ্ধ ছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে কহ্লনের সময়েও কাশ্মীরে গৌড়বাসিগণের বীরত্বের খ্যাতি ছিল এবং রাম স্বামীর মন্দির শূন্য পড়িয়াছিল। কহ্লন গৌড়বাসিগণকে গৌড়রাক্ষস বলিয়াছেন। রাজতরঙ্গিনীতে আরও লিখিত আছে, যে ললিতাদিত্যের পৌত্র কাশ্মীর রাজ বিনয়াদিত্য জয়াপীড় দিগ্বিজয়ে বাহির হইলে সেই সুযোগে তাঁহার শ্যালক জজ্জ কাশ্মীর সিংহাসন অধিকার করেন; জয়াপীড় তখন নিজ সৈন্য দিগকে বিদায় দিয়া ছদ্মবেশে গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত জয়ন্ত নামক সামন্তরাজের অধীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে উপস্থিত হন। তাঁহার কথা প্রকাশ হইলে রাজা জয়ন্ত তাঁহার একমাত্র কন্যা কল্যাণীদেবীকে জয়াপীড়ের সহিত বিবাহ দেন। জয়াপীড় গৌড়ের পাঁচজন নরপতিকে হারাইয়া শ্বশুরকে গৌড়ের সর্ব্বময় অধীশ্বর করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। কহ্লন মিশ্র বর্ণিত কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় ও বিনয়াদিত্য জয়াপীড়ের গৌড়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সত্য কিনা সে

বিষয়ে ঐতিহাসিকদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যাহা হউক, অনেকে মনে করেন গৌড়পতি জয়ন্তই পরে আদিশূর নামে খ্যাত হন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়া ছিলেন। এই শূরবংশীয় এগার জন রাজার পর অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী প্রসিদ্ধ পালবংশীয় রাজগণের অভ্যুত্থান হয়। শূরবংশীয় রাজগণের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান।

বহুকাল ধরিয়া দেশে শক্তিশালী রাজার অভাবে বাহির হইতে বার বার আক্রমণ ও মৎস্যন্যায় বা অরাজকতায় অতিষ্ঠ হইয়া প্রজাগণ মিলিত হইয়া "সর্ব্ববিদ্যাবিৎ" দয়িত-বিষ্ণুর পৌত্র ও "খণ্ডিতারাতি" ব্যপটের পুত্র গোপালকে গৌড়ের রাজা নির্ব্বাচিত করেন। ইনিই প্রথম গোপালদেব নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ এবং গৌড়বঙ্গ-মগধের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ এই সময়কার গৌড়বঙ্গের অবস্থার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে "প্রতিদিন এক এক জন রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাঁহাদিগকে সংহার করিতেন। কিছু দিন পরে গোপালদেব রাজপদ লাভ করিয়া রাজ্ঞীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।" গৌড়ের নিকটবর্ত্তী খালিমপুর গ্রামে প্রথম গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইতেও প্রথম গোপালদেবের নির্ব্বাচনের কথা জানা যায়। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন প্রথম গোপালদেবের রাজ্য কাল হইতেই গৌড় নগরের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে এবং বাংলার পালবংশীয় রাজাদিগের সময়েই গৌড় মহানগরীর প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হয়। গোপালদেব রাজ্য সুরক্ষিত করিয়া ও শাসনের সুব্যবস্থা করিয়া মগধে একটি বিশাল বিহার স্থাপন করেন এবং তাহা হইতেই বর্ত্তমান বিহার নগর ও বিহার প্রদেশের নামের উৎপত্তি। গোপালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধর্ম্মপালের রাজ্য বহু দূর বিস্তৃত ছিল, তিনি কান্যকুব্জ জয় করিয়া ইন্দ্ররাজের পরিবর্ত্তে চক্রায়ুধকে সিংহাসনে বসাইয়া ছিলেন। তাঁহার খালিমপুরের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে তাঁহার প্রাধান্য সুদূর সিন্ধু, কান্দাহার, পঞ্জাব ও কাঙ্গড়ার রাজগণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া ছিলেন। তিনি জামালগঞ্জের নিকট পাহাড়পুরে সোমপুর মহাবিহার ও ভাগলপুরের নিকট বিক্রমশিলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূট বংশীয় পরবলের কন্যা রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রায় ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র দেবপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতৃরাজ্য আরও বিস্তৃত করিয়াছিলেন ও কম্বোজ, কামরূপ, উৎকল, গুর্জ্জর ও রাষ্ট্রকূটরাজদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দেবপাল-দেবের মুঙ্গেরে ও নালন্দায় দুখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে; উভয় তাম্রশাসনেই দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্য হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ ও "বরুণ নিকেতন" হইতে "ক্ষীরোদ সমুদ্র" অর্থাৎ পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নালন্দার তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে সুমাত্রা ও যবদ্বীপের রাজা শৈলেন্দ্র বংশীয় শ্রীবালপুত্রদেব দেবপালদেবের রাজ্যান্তর্গত বৌদ্ধ তীর্থ নালন্দায় একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন এবং ইহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তৎকর্ত্তৃক দেবপালদেব অনুরুদ্ধ হইয়া রাজগৃহ বিষয়ে পাঁচ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন

খানির দূতক ছিলেন ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলের অধিপতি শ্রীবল বর্ম্মা। দেবপালদেব আফগানিস্থানের অন্তর্গত নিংরাহার নগরের ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেবকে নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভট্টগুরব মিশ্রের শিলাস্তম্ভলিপিতে দেবপালদেবের বিস্তৃত রাজ্যের কথা উল্লেখ আছে। (জয়পুরহাট স্টেশন দ্রষ্টব্য।) দেবপালদেব ৮২০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আন্দাজ ৮৬০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। দেবপালদেবের পর প্রথম শূরপাল বা প্রথম বিগ্রহপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল এই পাঁচজন রাজার সময়ে প্রথমে গুর্জ্জররাজ ভোজদেব ও মহেন্দ্রপাল এবং পরে হিমালয়ের কম্বোজ জাতির নিকট পাল রাজত্ব বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবং শেষোক্ত রাজার সময়ে পালবংশীয় রাজগণ কম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক গৌড় দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের পুত্র প্রথম মহীপাল রাঢ়ে বা সমতটে পিতৃ সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং শীঘ্রই গৌড় মগধ, তিরহুত (মিথিলা) ও বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়া দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে উত্তরাপথের কেকল্লবংশীয় গাঙ্গেয় ও তৎ পুত্র কর্মদেব ও দাক্ষিণাত্যের চোলবংশীয় রাজেন্দ্র চোল ও চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় জয়সিংহ ভারতের সর্ব্বত্র প্রবল প্রতাপে রাজ্যজয় ও বিস্তারে ব্যস্ত থাকিলেও মহীপালদেব যে পিতৃরাজ্যের অনেকাংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার শক্তির সম্যক পরিচায়ক। দিনাজপুরের নিকটস্থ বাণগড়ে মহীপালদেবের এক খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। প্রথম মহীপালদেব ভক্ত বৌদ্ধ ছিলেন এবং সারনাথে বহু মন্দির ও চৈত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন ও "অষ্টমহাস্থান শৈল-গন্ধকূটী" পুনর্নির্ম্মিত করাইয়া ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে, আন্দাজ ১০৩০ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের একটি প্রসিদ্ধ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; ইহাতে তিব্বত হইতে ভিক্ষুরাও যোগ দিয়াছিলেন। পালরাজগণের মধ্যে প্রথম মহীপালদেবের খ্যাতির কথা পল্লী গাথা ও গীতিতে বাংলার নানা স্থানে কিছুকাল পূর্ব্বেও শ্রুত হইত; কোচবিহার ও ওড়িষ্যার স্থানে স্থানে এখনও তাহার রেশ পাওয়া যায়। প্রথম মহীপালদেব প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া (৯৮৮-১০৩৬ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করিবার পর পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র নয়পালদেব গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন; তাঁহার সময়ে বিক্রমশিলা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর অতীশ তিব্বত রাজ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মে নূতন করিয়া প্রাণ সঞ্চার করেন। নয়পালদেবের পাকশালার অধ্যক্ষ চক্রপাণি দত্ত চরক ও সুশ্রুতের টীকা লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। নয়পালদেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল রাজা হন। চেদীরাজ কর্ম্মদেব তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হন এবং তাঁহার সহিত কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ দিয়া সন্ধি করেন, কিন্তু কল্যাণরাজ চালুক্যবংশীয় আহবমল্ল গৌড়রাজকে পরাজিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের সময় হইতেই দ্বিতীয় পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল অত্যাচারী হওয়ায় ক্ষৌণীনায়ক দিব্যক কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। [সান্তাহার দ্রষ্টব্য]। দ্বিতীয় মহীপাল দেবের পর তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপাল পর পর "গৌড়াধিপতি" বলিয়া ঘোষিত হন।

"রামপালের অভিষেক কালে পাল-রাজগণের অধিকার বোধ হয় ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যস্থিত 'ব' দ্বীপে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল।" বরেন্দ্র ভূমি ও গৌড় সিংহাসন তখন দিব্যকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের অধিকারে ছিল। রামপাল পিতৃরাজ্য পুনরধিকার করিবার জন্য সামন্তরাজগণের সাহায্য লইয়া নৌ সেতু দ্বারা ভাগীরথী পার হইয়া ভীমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া গৌড় অধিকার করেন। রামপাল ওড়িষ্যা, কামরূপ ও মিথিলা জয় করেন। রামপাল রমাবতী নামে একটি নূতন রাজধানী ও জগদ্দল নামে মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। রামপালদেবের সান্ধি-বিগ্রহিক প্রজাপতি নন্দীর পুত্র সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিতম্" গ্রন্থে পালবংশীয়দের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ লিখিয়াছেন, রামপালদেব ৪৬ বৎসর গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রামপালের পর তাঁহার পুত্র কুমারপালদেব গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন; তাঁহার অল্পকাল রাজত্ব মধ্যেই ওড়িষ্যারাজ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ ভাগীরথী তীরবর্ত্তী ভূভাগ অধিকার করেন এবং কর্ণাট দেশীয় চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় সামন্ত সেনের পৌত্র বিজয়সেন রাঢ় অধিকার করেন। কুমারপালদেবের পর তাঁহার শিশুপুত্র তৃতীয় গোপালদেব অল্পকালের জন্য রাজা হইয়া সম্ভবতঃ গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন এবং রামপাল দেবের কনিষ্ঠপুত্র মদনপালদেব গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন; তাঁহার রাজ্য মগধ ও উত্তরবঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল। মদনপালদেব তাঁহার অষ্টম রাজ্যাঙ্কে বিজয়সেন কর্ত্তৃক গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া মগধে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইনিই সম্ভবতঃ পাল বংশের শেষ রাজা। ইঁহার পর খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মগধের পূর্ব্ব ভাগে গোবিন্দপাল নামে এক রাজা ছিলেন; অনেকে অনুমান করেন ইনি পালবংশীয়। ইনি মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের সহিত যুদ্ধ করিয়া সসৈন্যে নিহত হন। এ যুদ্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ দেশ রক্ষার্থ অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। বিজেতৃগণ জয়ী হইয়া উদ্দণ্ডপুর সঙ্ঘারাম ও বিক্রমশিলা মহাবিহারের রাশি রাশি গ্রন্থ ভস্মীভূত করিয়াছিল। প্রায় চারি শতাব্দী ধরিয়া রাজত্ব করিবার পর বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এই বাঙালী রাজবংশ লুপ্ত হইয়া যায়। পাল রাজগণের ইতিহাস বাঙালী জাতি ও বাংলা দেশের ইতিহাস। তাঁহাদের সময়ে জাতীয় জীবনে নানা দিকে উন্নতি দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ ধর্ম্মপাল ও দেবপালদেবের রাজত্ব কালে গৌড়-মগধ-বঙ্গে শিল্প সাধনার চরম উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়; গৌড় ও মগধ তখন ভাস্কর্য্যের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁহাদের সময়ে দুই জন বিশিষ্ট ভাস্কর ধীমান ও বীটপালের কথা তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথ উল্লেখ করিয়াছেন। পাল যুগের অনুপম মূর্ত্তি প্রভৃতিগুলি এই শিল্পিদ্বয় এবং তাঁহাদের শিষ্যসম্প্রদায়ের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

পাল রাজগণের রাজধানী প্রাচীন গৌড়ের চিহ্নমাত্র নাই। বর্ত্তমান গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের কয়েক মাইল উত্তরে কালিন্দী নদীর নিকটে এই রাজধানী অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। সম্ভবতঃ তাঁহাদের প্রাসাদাদির উপকরণ লইয়া পরবর্ত্তী সেন ও পাঠান রাজগণের রাজধানী নির্ম্মিত হয়। তাঁহাদের কীর্ত্তিগুলি এখনও গৌড়ের ভগ্ন প্রাসাদ ও মস্‌জিদের অঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্ণাটদেশীয় সেনবংশজ বিজয় সেনের গৌড় বিজয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজশাহী জেলার দেবপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত শিলালিপি প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে বিজয় সেন গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া কামরূপরাজ ও কলিঙ্গরাজকে পরাজিত করেন। (খেতুর রোড স্টেশন দ্রষ্টব্য।) প্রায় ৩৫ বৎসরকাল রাজত্ব করিবার পর বিজয় সেনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বঙ্গদেশে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তক বল্লাল সেন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। বল্লাল সেন কৃত 'দান সাগর" ও "অদ্ভুত সাগর" নামক স্মৃতি ও জ্যোতিষ বিষয়ক গ্রন্থে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। বল্লাল সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন ১১১৩ খৃষ্টাব্দে গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। চালুক্য বংশসম্ভূতা তাঁহার মাতার নাম রামদেবী। লক্ষ্মণ-সেনদেবের পাঁচখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে জানা যায় যে লক্ষ্মণসেন বারাণসী, প্রয়াগ, কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষদিকে মগধের কতকাংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। ইঁহার সময়ে সেনবংশ উন্নতির চরমশীর্ষে উন্নীত হয়। ধোয়ী, জয়দেব প্রভৃতি কবিগণ তাঁহার সভাসদ্ ছিলেন। রামপাল দেবের রাজত্বকাল হইতে গৌড়ীয় ভাস্করশিল্পের পুনরুন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের সময়ে গৌড়ীয় শিল্প উন্নতির অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। এই যুগের নিদর্শনগুলি প্রথম পাল সাম্রাজ্যের শিল্প নিদর্শনসমূহের সমতুল্য না হইলেও তদপেক্ষা অধিক হীন নহে। লক্ষ্মণসেনদেবের অভিষেকের সময় হইতে লক্ষ্মণ সংবৎ বা লসং নামে একটি নূতন অব্দ গণনা করা হয়। বুদ্ধগয়ার দু'খানি শিলালিপিতে লসং ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অব্দ সেন রাজ্যের অন্তর্গত মিথিলায় বহুকাল প্রচলিত ছিল এবং আধুনিক কালেও কখনও কখনও দৃষ্ট হয়। প্রায় ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্রদ্বয় গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পর ও ১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সেন রাজগণের রাজত্বকালের সামান্য চিহ্নই গৌড়ে এখন দৃষ্ট হয়। আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে বল্লালসেন গৌড়ে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সাদুল্লাপুরে এই প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ও সুবৃহৎ মৃৎপ্রাকার দেখা যায়; ইহা বল্লালবাড়ী বা বল্লালভিটা নামে অভিহিত। বল্লালের প্রতিষ্ঠিত বিশাল বড় সাগরদীঘিও এই স্থানে বর্ত্তমান। এত বড় জলাশয় বাংলাদেশে আর নাই বলিলেই হয়। দৈর্ঘ্যে ইহা ৪৮০০ ফুট প্রস্থে ২৪০০ ফুট। সাগরদীঘির উত্তর-দক্ষিণে এক মাইল দূরে গঙ্গার একটি প্রাচীন ও পরিত্যক্ত খাতে সাদুল্লাপুরের গঙ্গাস্নানের ঘাট অবস্থিত। কথিত আছে, কোন কোন মুসলমান সুলতানের আমলে এই একটি মাত্র ঘাটে হিন্দুরা স্নান আহ্নিকাদি করিতে পারিতেন। পৌষ সংক্রান্তি, ভাদ্র পূর্ণিমা, ভাদ্র সংক্রান্তি ও দশহরায় বহুকাল হইতে এই স্থানে মেলা বসে। লক্ষ্মণসেন রাজা হইয়া রাজধানীর উত্তরস্থ শহরতলীতে দুর্গ ও প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করিয়া ঐ স্থানের নাম রাখেন লক্ষ্মণাবতী। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে লখনৌতী বলিতেন। বর্ত্তমান মালদহ বা ইংরেজ বাজারের নিকটে রাজমহল রাস্তার উপর একটি উচ্চভূমি দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত স্থানে লক্ষ্মণসেনের প্রাসাদাদি ছিল।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিলজী সেন রাজগণের নিকট হইতে গৌড় ও রাঢ় জয় করেন। মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ বর্ণিত ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র অষ্টাদশ অশ্বারোহীর সাহায্যে বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক নোদিয়া নগর অধিকার ও রাজা লক্ষ্মণ-সেনের কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন কাহিনী আধুনিক ঐতিহাসিকগণ গ্রহণ করেন না, কারণ তৎকালে লক্ষ্মণসেন জীবিত ছিলেন না এবং অর্দ্ধ শতাব্দী পরে গৌড়রাজ মুগীস্‌-উদ্দীন য়ুজবক নোদিয়া বিজয় করিয়া সেই ঘটনা স্মরণার্থ নূতন মুদ্রা বাহির করেন। কোন্‌ সময়ে কিরূপে মুসলমানগণ গৌড় জয় করিয়াছিলেন তাহা অজ্ঞাত। বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় অধিকারের পর প্রায় ১২৫ বৎসরকাল সেনবংশীয় রাজগণ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। পাঞ্জাবের উত্তর ও পূর্ব্বস্থিত হিমালয়ের অন্তর্গত কাশ্মীর, পুঞ্চ, সুকেত, মণ্ডী ও জুঙ্গার পার্ব্বত্য রাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতিগণ বাংলার সেন রাজবংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মণ্ডী ও সুকেত রাজবংশের কুল পঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে লক্ষ্মণসেনের বংশধর সুরসেন ১২৫৯ বিক্রমাব্দে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক গৌড় হইতে বিতাড়িত হইয়া প্রয়াগে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রূপসেন পাঞ্জাবে গমন করিয়া রূপর নামক স্থানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন এবং ক্রমে ক্রমে মণ্ডী, সুকেত প্রভৃতি রাজ্য এই বংশের অধিকারে আসে।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী তিব্বত অভিযান হইতে ফিরিবার পথে দেবকোটে পরলোক গমন করিলে তাঁহার সহকারীদের মধ্যে প্রথম আলিমর্দ্দন ও পরে গিয়াস উদ্দীন দিল্লীর অধীনে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১২১১ হইতে ১২২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং বীরভূমের রাজনগর হইতে গৌড়ের মধ্য দিয়া দিনাজপুরের দেবকোট পর্য্যন্ত একটি রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ করেন। ইনি ঘাতক কর্ত্তৃক নিহত হইলে পর পর কয়েকজন সুলতান দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক মনোনীত হন। সম্রাট শম্‌স্‌-উদ্দীন আলতমাশের এক পুত্র নাসির-উদ্দীন গৌড়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১২৩৭ খৃষ্টাব্দের সুলতানা রিজিয়ার মুদ্রায় প্রথম লখ্‌নৌতী টাঁকশালের নাম দৃষ্ট হয়। ১২৭৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট গিয়াস্‌-উদ্দীন বলবনের সময়ে তুগ্রল খাঁ মুগীস্‌-উদ্দীন উপাধি লইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সম্রাট তুগ্রলকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করেন। তুগ্রল পরাজিত ও নিহত হন এবং সম্রাট বিদ্রোহীদিগকে দলে দলে ফাঁসী দিয়া এরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন যে কিছুকাল আর বিদ্রোহ দেখা দেয় নাই। সম্রাট পুত্র নাসির-উদ্দীন বগ্‌রা খাঁ গৌড়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

পরে আবার গৌড়ীয় সুলতানগণ সুবিধা পাইলেই দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিতেন। গৌড়রাজ ফকর-উদ্দীন মবারক শাহ, ইখতিয়ার-উদ্দীন গাজী শাহ, আলাউদ্দীন আলি শাহ ও শম্‌স্‌-উদ্দীন ইলিয়াস্‌ শাহ নিজ নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করাইয়া দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ-বিন-তোগলক শাহের রাজত্বের শেষ দিকে গৌড়ের স্বাধীনতার অকাট্য প্রমাণ দিয়াছেন। এ সময়ে গৌড়বঙ্গ যখন স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল, মগধ বা বিহার দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা মানিয়া চলিত। ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে শম্‌স্‌-উদ্দীন ইলিয়াস্‌ শাহ্‌ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া পুরাতন গৌড়ের ২০ মাইল উত্তরে পাণ্ডুয়া নগরীতে রাজধানী

স্থানান্তরিত করেন। দিল্লীশ্বর মহম্মদ-বিন্-তোগলক শাহ তাঁহার প্রভুত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। কথিত আছে এই সময়ে দামনাশের শিখিবাহন বা শিখাই সান্যাল এবং ভাজনীর সুবুদ্ধিরায় ভাতুড়ী প্রভৃতি হিন্দুদিগের মধ্য হইতে ৫০ হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া শম্স্-উদ্দীন ইলিয়াস্ শাহের বিরাট সেনাবাহিনী গঠনে ও অন্যান্য নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। শম্স্-উদ্দীন কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ শিখাই সান্যালকে প্রসিদ্ধ চলনবিলের দক্ষিণাংশ ও ভাতুড়ীদিগকে উত্তরাংশের জমিদারী প্রদান করেন। শিখাই সান্যালের গড়বেষ্টিত বাসভবন সান্যালগড় বা সাঁতোর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুবুদ্ধিরাম ভাতুড়ী গৌড়ের সুলতানকে বার্ষিক মাত্র এক টাকা কর দিতেন; এজন্য ইহার বংশ "একটাকিয়া" ভাতুড়ী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দিল্লীশ্বর মহম্মদ-বিন্-তোগলকের পর তৎপুত্র সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলক বাংলাকে দমন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন। কথিত আছে, গৌড়েশ্বর শম্স্-উদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ নিজ রাজধানীতে সম্রাট শম্স্-উদ্দীন আলতমাশ নিৰ্ম্মিত দিল্লীর প্রসিদ্ধ স্নানাগারের অনুকরণে একটি স্নানাগার নির্ম্মাণ করায় সম্রাট ফিরোজ শাহ্ তোগলক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাংলা আক্রমণের উদ্যোগ করেন। ত্রয়োদশ বৎসর ধরিয়া বাংলা স্বাধীনতা ভোগ করিতেছিল, এইবার সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলক স্বয়ং ৭০ হাজার সৈন্য সহ গৌড়াভি-যানে বাহির হন। শম্স্-উদ্দীন ইলিয়াস্ শাহ রাজধানী পাণ্ডুয়া পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডুয়ার ২০ মাইল উত্তরে নদী ও অরণ্যবেষ্টিত একডালার দুর্ভেদ্য দুর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ফিরোজ শাহ তোগলক পাণ্ডুয়া বিনা আয়াসেই অধিকার করিলেন, রাজধানীর নিরীহ অধিবাসীদের উপর তিনি কোনও অত্যাচার করেন নাই। নিজ নামানুসারে তিনি পাণ্ডুয়ার ফিরোজাবাদ নামকরণ করেন। একডালা দুর্গ ২২ দিন ধরিয়া অবরোধ করিয়াও সম্রাট-পক্ষ ইহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সম্মুখে বর্ষার ভয়ে সম্রাটপক্ষ অধিক দিন অপেক্ষা করা সুবিধাজনক নহে ভাবিয়া কৌশলে গৌড়ীয়গণকে দুর্গ হইতে বাহির করিবার জন্য অবরোধ উঠাইয়া কিছুদূর হটিয়া গিয়া শিবির স্থাপন করিলেন এবং রটাইয়া দিলেন যে তাঁহারা দিল্লী ফিরিয়া যাইতেছেন। ইসিয়াস্ শাহ শত্রুপক্ষকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবার জন্য ১০ হাজার অশ্বারোহী, ২ লক্ষ পদাতিক ও ৫০টি হাতী লইয়া অগ্রসর হইলেন। এই সুযোগে সম্রাটপক্ষীয়গণ দক্ষিণে বামে ও মধ্যে ৩০ হাজার করিয়া অশ্বারোহী ও হস্তিদল রাখিয়া প্রচণ্ডবেগে সহসা ইলিয়াস্ শাহের পক্ষকে আক্রমণ করিলেন। এই ভীষণ যুদ্ধে সহদেব নামে একজন বাঙালী সেনাপতি গৌড়রাজের পক্ষে বীরত্বের সহিত লড়িয়া এক লক্ষ আশি হাজার বাঙালী সৈন্যসহ নিহত হন। ইহা এক-ডালার যুদ্ধ নামে খ্যাত। ইলিয়াস্ শাহ শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন তিনি প্রতারিত হইয়াছেন এবং রণে ভঙ্গ দিয়া পুনর্ব্বার দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলক দ্বিতীয় বার দুর্গ অবরোধ করিলেন, কিন্তু এবারেও কিছুতেই দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না এবং শেষ অবধি সদলবলে দিল্লী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে সম্মান জনক সন্ধি স্থাপিত ও গৌড় রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় এবং তখন হইতে বাংলার স্বাধীনতা দিল্লীর বাদশাহগণ কর্ত্তৃক প্রকাশ্য ভাবে স্বীকৃত হয়। অতঃপর শম্স্-উদ্দীন ইলিয়াস শাহ সুবর্ণগ্রাম অধিকার করেন;

সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্ত্তা ফখর-উদ্দীন মবারক শাহ যুদ্ধে নিহত হন এবং তাঁহার আত্মীয় ও অনুচরগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়েন; কেবল জামাতা জাফর খাঁ সমুদ্রপথে পলাইয়া সিন্ধু প্রদেশে তত্তায় উপস্থিত হন এবং তথা হইতে দিল্লী গিয়া বাদশাহ ফিরোজ শাহ তোগলকের অনুগ্রহ লাভ করিয়া উজীর পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পরামর্শে ও প্ররোচনায় বাদশাহ দ্বিতীয় বার ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে ৭০ হাজার অশ্বারোহী, ৪৭০টি হস্তী ও অসংখ্য পদাতিক সৈন্য লইয়া গৌড় আক্রমণে যাত্রা করেন। পথে জৌনপুরে ৬ মাস অবস্থান করিয়া গৌড়ে আসিতে আসিতে সুলতান শমস্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহ পরলোক গমন করেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিকন্দর শাহ গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রবাদ অনুসারে সিকন্দর শাহ শমস্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহের হিন্দু মহিষী ফুলমতী বেগমের পুত্র। ফিরোজ শাহ তোগলক আসিয়া পৌছিলে সিকন্দর শাহ পিতার ন্যায় একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাদশাহী সেনা তৃতীয় বার একডালা দুর্গ অবরোধ করে। এবারও দুর্গ অজেয় রহিল। অবশেষে সন্ধির কথাবার্ত্তা সুরু হইল; বাদশাহের পক্ষ হইতে রাষ্ট্রনীতিকুশল হয়বৎ খাঁ নামক একজন বাঙালী গৌড় রাজ সিকন্দর শাহের নিকট দূত হইয়া গিয়া সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সম্রাট ফিরোজ শাহের প্রস্তাব মত স্থির হয়, সিকন্দর শাহ জাফর খাঁকে তাঁহার শ্বশুরের রাজ্য সুবর্ণগ্রাম বা পূর্ব্ববঙ্গ ফিরাইয়া দিবেন এবং সম্রাট দিল্লী ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু জাফর খাঁ শেষ পর্য্যন্ত রাজ্য গ্রহণে স্বীকৃত হন নাই, কারণ তথায় তাঁহার কোনও বন্ধু বা অনুচর ছিল না। তখন হইতে সিকন্দর শাহ ও তাঁহার বংশীয়গণ গৌড় ও পূর্ব্ববঙ্গ সমগ্র রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর হন। সম্রাট ফিরোজ শাহ তোগলক দিল্লী ফিরিয়া যাইবার পর প্রায় দুই শতাব্দী কাল বাংলার স্বাধীন সুলতানগণের দিল্লীর বাদশাহের সহিত কোনও সম্বন্ধ ছিল না। সুলতান সিকন্দর শাহ পাণ্ডুয়ার সুপ্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। (আদিনা স্টেশন দ্রষ্টব্য।) সিকন্দর শাহ বাংলা দেশ জরীপ করিয়া রাজস্ব নির্ণয় করেন; তাঁহার প্রবর্ত্তিত গজকাটি সিকন্দরী গজ নামে আজিও পরিচিত। তিনি নিজে দীর্ঘকায় পুরুষ ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, এজন্য সিকন্দর চৌহাতা ও পীর নামে অভিহিত হইতেন। ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিদ্রোহী পুত্র গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের সহিত যুদ্ধে সিকন্দর শাহ পরাজিত ও নিহত হন। কথিত আছে শমস্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহ ও তৎপুত্র সিকন্দর শাহের ফৌজদার কংসরামের বজ্রবাহু জনার্দ্দন নামে এক বীর পুত্র ছিলেন। নানা যুদ্ধে তিনি সাহসিকতার জন্য খ্যাত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরা ও আরাকান রাজের মধ্যে যুদ্ধ হইলে তিনি আরাকান রাজের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে আরাকান রাজকন্যা মৌসংকে বিবাহ করিয়া সিংহলে গমন করেন এবং সেখানকার রাজা হন; এই কাহিনী অনুসারে বিজয় সিংহের প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে আর একজন বাঙালী সিংহলের সিংহাসন অধিকার করেন।

গিয়াস-উদ্দীন আজম্ শাহ্ ধর্ম্মভীরু ও ন্যায়নিষ্ঠ রাজা ছিলেন। কথিত আছে একদিন শিকারকালে গিয়াস-উদ্দীনের নিক্ষিপ্ত একটি তীর দৈবক্রমে একটি বালককে নিহত করে। বালকের অসহায়া বিধবা মাতা কাজী সিরাজ-উদ্দীনের নিকট বিচার প্রার্থনা করিলে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সুলতানকে আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য কাজী সাহেব একজন হরকরা প্রেরণ করিলেন। হরকরা সুলতান সমক্ষে যাইতে সাহস

না পাইয়া অসময়ে আজান দিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করে। অসময়ে আজান দিবার কারণ জানিতে চাহিলে হরকরা সুলতানকে কাজীর আদেশ নিবেদন করে। সুলতান গিয়াস-উদ্দীন বস্ত্রের নীচে একটি ছোট তলোয়ার লুকাইয়া আদালতে উপস্থিত হইলেন। কাজী সাহেব বস্ত্র মধ্যে একটি চাবুক লুকাইয়া রাখিয়া সুলতানকে রাজোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং বিচারে তাঁহাকে উচিত পরিমাণ অর্থ দিয়া বিধবার ক্ষতিপূরণ করিতে আদেশ দিলেন। সুলতান সানন্দে তাহা পালন করিলেন এবং তলোয়ারটি বাহির করিয়া বলিলেন যে তাঁহার পদমর্য্যাদার ভয়ে কাজী যদি সুবিচার না করিতেন তাহা হইলে কাজীর মস্তক ছেদন করিতেন। কাজীও চাবুক বাহির করিয়া বলিলেন, সুলতান যদি বিচারালয়ের আদেশ না মানিতেন, এই চাবুকের দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠদেশ দীর্ণ করিতেন। গিয়াস-উদ্দীন আজম শাহ ইরাণের প্রসিদ্ধ কবি হাফেজকে নিজ রাজসভায় নিমন্ত্রণ করিয়া লোক পাঠাইয়াছিলেন; কবি অবশ্য আসিতে পারেন নাই। কথিত আছে, একবার অত্যন্ত পীড়িত হইলে মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া তিনি সর্ব্ব, গুল ও লালা নামে তিন জন অবরোধবাসিনীকে মৃত্যুর পর তাঁহার শব ধুইবার ভার দিয়াছিলেন, ইহা লইয়া তাঁহাদের সকলে বিদ্রূপ করিলে গিয়াস উদ্দীন একটি কবিতার প্রথমাংশ রচনা করেন; বাংলা তথা হিন্দুস্থানে কেহ ইহার শেষাংশ রচনা করিতে না পারিলে তিনি সিরাজ নগরে কবি হাফেজের নিকট উহা প্রেরণ করিয়াছিলেন। হাফেজ অবিলম্বে উহা পূরণ করিয়া তাহার সহিত সুলতানের নামে একটি গজল লিখিয়া পাঠাইয়া দেন।

গিয়াস্-উদ্দীন আজম শাহের রাজত্বের শেষদিকে ভাতুড়িয়া পরগণার হিন্দু জমিদার ও গৌড়ের রাজস্ব ও শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী রাজা গণেশ বা কংসনারায়ণ বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন। রিয়াজ-উস-সলাতীন অনুসারে তাঁহার আদেশে বা চক্রান্তে গিয়াস-উদ্দীন এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্র নিহত হইলে গণেশ পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদের গৌড় সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন গিয়াস উদ্দীনের মৃত্যুর পর অন্তর্যুদ্ধে গৌড় রাজ্য বিপর্য্যস্ত হইলে গণেশ স্বয়ং রাজা হইয়া শান্তি ও সুশাসন স্থাপন করেন। বারেন্দ্র কুলশাস্ত্র মতে গণেশ ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কায়স্থ কুলপঞ্জিকায় তাঁহাকে কায়স্থ ও দিনাজপুর রাজবংশের আত্মীয় বলা হইয়াছে। রিয়াজ-উস্-সলাতীন অনুসারে মুসলমানগণের প্রতি রাজা গণেশের অত্যাচারের জন্য পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধ পীর সেখনূর কুতব্-উল্-আলম্ জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শাহ্ শার্কীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইব্রাহিম শাহ সসৈন্যে গৌড়াভিমুখে অগ্রসর হইলে রাজা গণেশ শেখনূর কুতব-উল-আলমের শরণাপন্ন হন এবং নিজ পুত্র যদুকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে স্বীকৃত হইলে শেখনূর কুতব-উল-আলমের কথায় জৌনপুরের সুলতান ফিরিয়া যান। যদু মুসলমান হইয়া জলাল-উদ্দীন নাম গ্রহণ করেন; রিয়াজ-উস্-সলাতীন অনুসারে গণেশ সুবর্ণধেনু ব্রত করিয়া জলাল-উদ্দীনকে পুনরায় হিন্দু করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি গণেশের মৃত্যুর পর পুনরায় মুসলমান হন। রিয়াজ-উস্-সলাতীনে গণেশের কেবল নিন্দাই আছে, সেজন্য ঐতিহাসিকেরা রিয়াজের পক্ষপাতদুষ্ট বিবরণ সর্ব্বথা গ্রহণ করেন না। তারিখ-ই-ফেরেশতায় ইব্রাহিম শাহ কর্তৃক গৌড়রাজ্য আক্রমণের কোন উল্লেখই নাই এবং গণেশের বহু প্রশংসা আছে। গণেশ মুসলমানদিগকে বিশেষ সমাদর করিতেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর রাজধানীর বহু মুসলমান তাঁহার শব মুসলমানের ন্যায়

সমাহিত করিতে চাহিয়াছিলেন। রাজা গণেশ ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া অনুমান ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। রাজা গণেশ একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ও বিশেষ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন ইহা নিঃসন্দেহ। তাঁহার সময় হইতে গৌড়বঙ্গে পুনরায় সংস্কৃত চর্চ্চা আরম্ভ হয় এবং বাংলা ভাষারও উন্নতির সুত্রপাত হয়।

রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র যদু জলাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহ্ নাম লইয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তবকাৎ-ই-আক্‌বরী অনুসারে যদু রাজ্যলোভে মুসলমান হইয়াছিলেন। আবার প্রবাদ অনুসারে প্রাক্তন মুসলমান সুলতান বংশের কোন কুমারীর প্রেম মুগ্ধ হইয়া তিনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম আসমানতারা, মতান্তরে ফুলজানি বেগম। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে জলাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহ ফিরোজাবাদ টাঁকশালে নিজ নামে মুদ্রাঙ্কিত করিতে থাকেন। জলাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে কায়স্থবংশীয় দনুজমর্দ্দন দেব পাণ্ডুয়া হইতে জলাল-উদ্দীনকে বিতাড়িত করিয়া গৌড়রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। আদিনা মস্‌জিদের ৩।৪ মাইল উত্তর পূর্ব্ব কোণে দনুজমর্দ্দন দেবের একটি রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার কথা "কলিকাতা-খুলনা-বাগেরহাট" অধ্যায়ে বিস্তারিত বলা হইয়াছে। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই দনুজমর্দ্দনদেবের মৃত্যুর পর জলাল-উদ্দীন পুনরায় সমগ্র গৌড়বঙ্গ অধিকার করেন; চট্টগ্রামে আবিষ্কৃত তাঁহার মুদ্রা হইতে জানা যায় যে তাঁহার আধিপত্য সুদূর চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার রাজ্যকালে রাজধানী পাণ্ডুয়ার গৌরব ও সৌন্দর্য্য বহুরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং ইহা সুবিস্তৃত জনবহুল নগরীতে পরিণত হইয়াছিল এবং গৌড়ও পুনরায় সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। সতের বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র শাম্‌স্‌উদ্দীন আহম্মদ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাণ্ডুয়ার প্রসিদ্ধ একলাখী সমাধি মন্দিরে জলাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহ, তাঁহার পত্নী ও পুত্র শাম্‌স্‌উদ্দীন আহম্মদ শাহকে সমাহিত করা হয়। কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যে সুলতান জলাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহের পত্নী আসমানতারা পুত্র সুলতান শাম্‌স্‌উদ্দীন আহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর গণেশ বংশীয় মুসলমান শাখা লুপ্ত হইলে শ্বশুরের ভিটা ভাতুড়িয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং হিন্দু বিধবাদের মত কৃচ্ছ্র সাধন করিতেন। সুলতান শাম্‌স্‌উদ্দীন আহম্মদ শাহকে হত্যা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ সুলতান শাম্‌স্‌উদ্দীন ইলিয়াস শাহের বংশীয় নাসিরউদ্দীন মহমুদ শাহ গৌড় সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি রাজধানী পুনরায় গৌড়ে ফিরাইয়া লইয়া যান। গৌড়ের সুপ্রসিদ্ধ কোতওয়ালী দরওয়াজা নাসিরউদ্দীন মহমুদ শাহ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রুকন্ উদ্দীন বারবক্ শাহ্ ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার সময় হইতে প্রাসাদ রক্ষায় হাবশী ক্রীতদাস নিযুক্ত হয়। আরবদেশীয় ইসমাইল গাজী নামক ইঁহার সেনাপতি গৌড়ের উত্তরে ছুটিয়াপটিয়া নামক একটি জলাভূমি বা নদীর উপর বহু আয়াসে একটি সেতু নির্ম্মাণ করিয়া যশস্বী হন। ইসমাইল গাজী ওড়িষ্যা ও কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, হুগলী জেলার অন্তর্গত মন্দারণের রাজা গজপতি বিদ্রোহী হইলে ইসমাইল গাজী তাঁহাকে পরাস্ত করেন এবং পরে ঘোড়াঘাটে হিন্দু সেনাপতি ভান্দসী রায়ের চক্রান্তে বারবক শাহের আদেশক্রমে নিহত হন। তাঁহার দেহ হুগলী জেলার মন্দারণে এবং মস্তক রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ার গ্রামে সমাহিত আছে। রুকন্-উদ্দীন বারবক্ শাহের রাজত্বকালে গৌড়ে শান্তি

সমৃদ্ধি ছিল। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শম্‌স্‌-উদ্দীন ইউসফ শাহ সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার সময়ে শ্রীহট্ট বিজিত হয়। তাঁহার নামের শিলালিপি শ্রীহট্টে আবিষ্কৃত সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি। তাঁহার সময়ে রাঢ়ে পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজ্য বিজিত হইয়াছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গৌড়ে সুলতানদিগের হাব্‌শী ক্রীতদাসগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন এবং রাজ অনুগ্রহে প্রধান প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। এই হাব্‌শী প্রীতি হইতে ইলিয়াস শাহের বংশের পতন হয়। এই বংশের শেষ রাজা জলালউদ্দীন ফতে শাহ্‌কে নিহত করিয়া হাব্‌শী ক্রীতদাস বারবগ সিংহাসন অধিকার করিলে জলালউদ্দীনের অনুরক্ত হাব্‌শী কর্ম্মচারী মালিক আদিল বারবগকে হত্যা করিয়া নিহত রাজার শিশুপুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিতে চেষ্টিত হন। কিন্তু জলালউদ্দীন ফতে শাহের পত্নী বলেন তাঁহার পুত্র সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত কোন যোগ্য ব্যক্তি রাজ্য শাসন করিবেন। তখন উজীর খাঁজাহান কর্ত্তৃক আহূত মন্ত্রণা সভায় রাজ্যের প্রধানগণ মিলিত হইয়া মালিক আদিলকে অনুরোধ করিলে তিনি সৈফউদ্দীন ফিরোজ শাহ নাম লইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সুলতান সৈফউদ্দীন ফিরোজ শাহ্‌ ন্যায়নিষ্ঠ ও দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। গৌড়ের ফিরোজ মিনার ইনি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে গৌড় সিংহাসনে উঠিয়া ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। ইহার পর কিছু কাল ধরিয়া গৌড় সিংহাসনের অবস্থা অনিশ্চিত ও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। রিয়াজ-উস-সলাতীন এ সময়ের কথা লিখিয়াছেন যে. যে রাজাকে যে হত্যা করিত সেই রাজা বলিয়া সম্মানিত হইত। পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক ফরিয়া-দ-সৌজা বলিয়াছেন গৌড়ে পুত্র পিতৃ-সিংহাসন পায় না, প্রভু-হত্যাকারী ক্রীতদাসই সিংহাসনের অধিকারী হয়। তারিখ-ই-ফেরেস্তা বিদ্রূপ করিয়াছেন যে প্রভুকে হত্যা না করিলে কেহ গৌড় সিংহাসনের অধিকারী হয় না।

ইহার পর ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে হাব্‌শী রাজাদের অত্যাচারে প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইলে সুলতান শম্‌স্‌উদ্দীন মজাফার শাহ নিহত হন এবং রাজ্যের প্রধানগণ কর্ত্তৃক আলাউদ্দীন হুসেন শাহ রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ইনি আরব দেশ হইতে আগত ও সৈয়দ-বংশীয় ছিলেন। হুসেন শাহের রাজ্যপ্রাপ্তির সহিত পালরাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম গোপালদেবের নির্ব্বাচনের বেশ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে. হুসেন শাহ সিংহাসন আরোহণ করিলে তাঁহার সৈন্যগণ গৌড় লুণ্ঠন করে; এই অপরাধে তিনি বার হাজার সৈন্যের প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন। হুসেন শাহ রাজা হইয়াই হাব্‌শী ক্রীতদাসগণকে দূর করেন এবং পুরাতন বনিয়াদী আফগান ও হিন্দুগণকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। বসু বংশীয় পুরন্দর খাঁ তাঁহার উজীর ছিলেন, সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-প্রধান রূপ ও সনাতন প্রথম জীবনে হুসেন শাহের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সনাতন তাঁহার "দবীরখাস" (প্রাইভেট সেক্রেটারী) ও রূপ "সাকর মল্লিক" বা রাজস্ব বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁহাদের ভ্রাতা অনুপ টাঁকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন। অনুপের পুত্র জীবগোস্বামী পরবর্ত্তী কালে বৈষ্ণব জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আলাউদ্দীন হুসেন শাহ ওড়িষ্যা, আসাম ও বিহার অধিকার করেন। দিল্লীর সম্রাট

সেকন্দর লোদী হুসেন শাহের রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু শেষে সন্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। ইহার পর হুসেন শাহ ত্রিপুরা রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু মহারাজ ধন্যমাণিক্যের বীর সেনাপতি চয়চাগের নিকট তাঁহার সেনাপতি বার বার তিনটি অভিযানে পরাজিত হন ; চতুর্থবার সেনাপতি গৌর মল্লিকের সহযোগিতায় স্বয়ং আক্রমণ করিয়া ত্রিপুরারাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (আসাম বাংলা রেলপথের আগরতলা স্টেশন দ্রষ্টব্য।) হুসেন শাহের রাজত্ব কালে শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাইবার পথে গৌড়ের নিকট রামকেলী গ্রামে অবস্থান করিয়াছিলেন। ২৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া বহুরূপে গৌড়ের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিয়া ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে হুসেনশাহ পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহ্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়ী হইয়া বাবর

শ্রীচৈতন্যদেবের বিশ্রামস্থল, রামকেলি

সিংহাসন অধিকার করিলে বহু সম্ভ্রান্ত আফগান গৌড়রাজ্যে আসিয়া নসরৎশাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাবর জৌনপুর জয় করিয়া বাংলা জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা হইতে আফগানগণ লাক্ষ্ণৌ আক্রমণ করিলে তিনি নসরৎশাহের সহিত সন্ধি করিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। নাসিরউদ্দীন নসরৎশাহের রাজ্যকালে গৌড়ের বারদুয়ারী বা সোনা মসজিদ, দাখিল বা দখল দরওয়াজা, কদমরসুল ও আলাউদ্দীন হুসেনশাহের সমাধি মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। হুসেনশাহের সমাধির ভিত্তি মাত্রই এখন অবশিষ্ট।

গৌড়রাজ আলাউদ্দীন হুসেনশাহ ও তৎপুত্র নাসিরউদ্দীন নসরৎশাহের সাহায্যে ও উৎসাহে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। হুসেনশাহ "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" গ্রন্থের রচয়িতা মালাধর বসুকে "গুণরাজখাঁ" উপাধি দান করেন। (পূর্ব্বভারত রেলপথের জৌগ্রাম স্টেশন দ্রষ্টব্য)। ইঁহারই সময়ে ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে বিজয় গুপ্তের ও ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে

বিপ্রদাসের "মনসা মঙ্গল" রচিত হয়। বিপ্রদাস গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিখিয়াছেন "নৃপতি হুসেনশা গৌড়ে স্বলক্ষণ" বিজয় গুপ্তের "পদ্মাপুরাণ" গ্রন্থে হুসেনশাহের গুণাবলীর উল্লেখ আছে। হুসেনশাহের পুত্র নসরৎশাহ "ভারত পাঞ্চালী" নামে মহাভারতের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহার মহাভারতে লিখিয়াছেন ;—

শ্রীযুত নায়ক সে যে নসরৎখান।
রচাইল পাঞ্চালী যে গুণের নিদান॥

হুসেন শাহ পুত্র নসরৎ শাহকে সেনাপতি পরাগল খাঁর সহিত চট্টগ্রামে মগদিগকে দমন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। এই পরাগলখাঁর আদেশে চট্টগ্রামের সুপণ্ডিত কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের অনুবাদ করেন; এই মহাভারত "পরাগলী মহাভারত" নামে খ্যাত। পরাগলখাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র ছুটি খাঁ চট্টগ্রাম অঞ্চলে হুসেনশাহের সেনাপতি নিযুক্ত হন। তাঁহার আদেশে চট্টগ্রামের শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব অনুবাদ করেন। হুসেনশাহ ও নসরৎশাহের নিকট বাংলা সাহিত্য বিশেষ ঋণী। কৃতজ্ঞ বাঙালী কবি তাঁহাদিগকে পদাবলীতে পর্য্যন্ত স্থান দিয়া সম্মান করিয়াছেন; ইহা কম গৌরবের কথা নয়। যথা

"শ্রীযুতহসন জগতভূষণ, সোহ এ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর ভণে যশরাজ খান॥"
"সে যে নসিরা শাহ জানে।
যারে হানিল মদন বাণে॥"

(দীনেশচন্দ্র সেন কৃত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য")

১৫৩২ খৃষ্টাব্দে নাসিরউদ্দীন নসরৎ শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ তিন মাসকাল রাজত্ব করিয়া পিতৃব্য গিয়াস্উদ্দীন মহমুদ শাহ কর্ত্তৃক নিহত হন। গিয়াস্উদ্দীন মহমুদ শাহের রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ শের শাহ অত্যন্ত প্রবল হন এবং ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তাঁহার সৈন্যগণ গৌড় অধিকার ও লুণ্ঠন করে। মহমুদ শাহ সম্রাট হুমায়ুনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। হুমায়ুন সসৈন্যে গৌড়াভিমুখে যাত্রা করেন, পথে মহমুদ শাহ তাঁহার সহিত মিলিত হন। ভাগলপুরের নিকট কহল্গাঁও গ্রামে পৌঁছিলে সংবাদ আসে মহমুদ শাহের বন্দী পুত্রদ্বয় গৌড়ে নিহত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান গিয়াস্উদ্দীন মহমুদ শাহ ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে শোকে অভিভূত হইয়া কহলগাঁওয়ে প্রাণত্যাগ করেন। গৌড়ের জান্ জান্ মিয়ার মস্জিদ গিয়াস্উদ্দীন মহমুদ শাহ কর্ত্তৃক ১৫৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহমুদ শাহের মৃত্যুর পর ১৫৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন গৌড় নগর অধিকার করেন। তিনি গৌড়ের "জন্নতাবাদ" বা স্বর্গপুরী এই নামকরণ করেন। শেরশাহ গৌড়ের লুণ্ঠিত সম্পত্তি রোতাস্ দুর্গে স্থানান্তরিত করেন। গৌড়ে তিন মাস অবস্থান করিবার পর সৈন্যাদি অনেকে পীড়িত হইয়া পড়িলে হুমায়ুন আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। এই যাত্রায় হুমায়ুন ছাপারঘাট নামক স্থানে শেরশাহের নিকট পরাজিত হন এবং গঙ্গায় পড়িয়া পলায়নকালে

একজন ভিস্তি তাঁহার প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু তাঁহার পত্নী ৪ সহস্র মুঘল কূলবধূর সহিত বন্দী হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত। শেরশাহ মগধ ও গৌড় রাজ্য পুনরায় অধিকার করিয়া ফরীদউদ্দীন মজঃফর শেরশাহ নাম গ্রহণ করিয়া গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরে হুমায়ুনের সহিত তাঁহার পুনরায় যুদ্ধ হয় এবং হুমায়ুন পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন এবং শেরশাহ তাঁহার সাম্রাজ্য লাভ করেন।

শেরশাহের মৃত্যুর পর গৌড়ে তাঁহার শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ স্থর ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ইনি ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে ছাপরামৌএর যুদ্ধে হিমু কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইলে তাঁহার পুত্র গিয়াস্উদ্দীন বাহাদুর শাহ গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার কিছু পরে মগধের স্থলতান স্থলেমান কররাণী গৌড়ের অধিকার প্রাপ্ত হন। ইনি পুরাতন মালদহের সোনা মস্জিদ নির্ম্মাণ করেন এবং গৌড়ের অস্বাস্থ্যকরতার জন্য গৌড়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে গৌড় ও রাজমহলের মধ্য পথে গঙ্গার চরে তাঁড়া নামক স্থানে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। স্থলেমান কররাণীর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ্ এবং তাঁহার পর অপর পুত্র দাউদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। স্থলেমান বা বায়াজিদ নিজ নামে মুদ্রাঙ্কন করিতে সাহস করেন নাই, কিন্তু দাউদ শাহ আরবী ও হিন্দি ভাষায় নিজ নামে মুদ্রা বাহির করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সম্রাট আকবরের রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা তোড়রমল্ল ও খান্খানান মুনিম খাঁ তাঁহাকে দমন করিতে প্রেরিত হন। দাউদ ভীত হইয়া গৌড় পরিত্যাগ করেন। মুঘল সৈন্য বিনা বাধায় রাজধানী তাঁড়া অধিকার করে। ঐ সময়ে কোচরাজ নরনারায়ণ "গৌড়পাশা" দাউদ শাহের বিরুদ্ধে আকবর বাদশাহকে সাহায্য করিয়াছিলেন। মুঘলদল দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে সপ্তগ্রাম হইতে হটাইয়া স্থবর্ণরেখা নদীর নিকটে একরোই বা মুঘলমারী গ্রামে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করে। দাউদ পরাজিত হইয়া কটকে পলায়ন করেন এবং তথায় আত্মসমর্পণ করিয়া ওড়িষ্যার জায়গীর পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে অনুমান হয় ম্যালেরিয়া মহামারীতে গৌড় নগরী শ্মশানে পরিণত হয়। এই বৎসর গৌড়ের মুঘল শাসনকর্ত্তা খান্খানান্ মুনিম খাঁ তাঁড়ায় দেহত্যাগ করিলে দাউদ নিজ রাজ্য পুনরাধিকারের চেষ্টা করেন। রাজমহলের নিকট দাউদ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই পরাজিত ও বন্দী হন। তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার ছিন্ন মস্তক আকবরের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। বলিতে গেলে দাউদ শাহ গৌড়ের শেষ স্বাধীন রাজা। রাজা মানসিংহের সময় পর্য্যন্ত বাংলার স্থবাদারগণ তাঁড়ায় অবস্থান করিতেন। আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধের সময় তাঁহার ভ্রাতা শাহ্ স্থজা ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁড়ায় বর্ষাকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁড়ার কোনও চিহ্নমাত্র এখন নাই। ইহা নদীগর্ভে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়াছে। দাউদ শাহের মৃত্যুর পরও আফগান প্রধানগণ গৌড় ও মগধে স্বাধীনতা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গ আরও ৫০ বৎসর মুঘল আধিপত্য স্বীকার করে নাই।

প্রাচীন গৌড়ের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

ইংরেজ বাজার শহর হইতে দক্ষিণে যে পথ কানসাট অভিমুখে গিয়াছে, ঐ পথের তিন চারি মাইল অতিক্রম করিলেই গৌড় নগরীর সীমানা আরম্ভ হয়। ঐ স্থান হইতে পশ্চিমে তিন মাইল অতিক্রম করিলে সাদুল্লাপুরের প্রাচীন ভাগীরথীর **স্নানের ঘাট, বল্লালভিটা ও বড়সাগরদীঘি** পাওয়া যায়। ইহাদের কথা আগে বলা হইয়াছে। ইহাদের কাছেই দ্বারবাসিনী দেবীর মন্দির। বড়সাগরদীঘির ধারে মখ্‌দুমশেখ অখি সিরাজউদ্দীন নামক একজন সাধকের সমাধি আছে। সুলতান হুসেন শাহ নির্ম্মিত একটি ফটক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটেই হুসেন শাহের পুত্র ও নসরত শাহের অনুজ সুলতান গিয়াসউদ্দীন মহমুদশাহ নির্ম্মিত **জান জান মিয়ার মসজিদ্‌**।

সাদুল্লাপুরের দিকে না গিয়া সোজা দক্ষিণে ইংরেজ বাজার হইতে ৭।৮ মাইল অতিক্রম করিলেই গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন সমূহ একে একে নয়নগোচর হইতে থাকে।

ইংরেজ বাজার হইতে সাত-সাড়ে সাত মাইল দূরে পথিপার্শ্বে একটা ঘেরা স্থানের মধ্যে দুইটা প্রস্তরস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দুইটি সরকারী পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত। কেহ কেহ বলেন, ঐ দুইটিতে পূর্ব্বে অপরাধীকে শূলে দেওয়া হইত এজন্য উহাদের নাম **শূলদণ্ড**।

এই স্তম্ভ দুইটি হইতে আরও কিছু (প্রায় এক মাইল) দক্ষিণ-পশ্চিমে **পিয়াসবাড়ী** দীঘি অবস্থিত। সাধারণ লোক ইহাকে "পিয়াজবাড়ী" পুকুর বলিয়া থাকে। এই স্থানে উচ্চ ভূখণ্ডের উপর একটি ডাকবাংলা আছে। গৌড় দর্শনেচ্ছু যাত্রীরা ভাড়া দিয়া এই ডাকবাংলায় থাকিয়া ইহাকে কেন্দ্র করিয়া গৌড় দর্শন করিতে পারেন। পিয়াস-বাড়ীতে সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি বিস্তীর্ণ রেশমের কারখানা আছে। আধুনিক হইলেও ইহা গৌড় যাত্রীর একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। পূর্ব্বে পিয়াসবাড়ীতে একটি প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা ছিল।

পিয়াসবাড়ী হইতে দক্ষিণদিকে যে রাস্তা গিয়াছে উহা দিয়া প্রায় আধ মাইল পথ গেলে **রামকেলি** গ্রামে উপস্থিত হওয়া যায়। এই গ্রামের প্রবেশ পথেই প্রসিদ্ধ রূপসনাতন-সেবিত মদনমোহনের ঠাকুরবাড়ী ও কেলি কদম্ব বৃক্ষ।

মদনমোহন মন্দিরের ঠিক দক্ষিণে কেলি কদম্ব বৃক্ষ। একটি বেদীর মধ্যে চারিটি বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে দুইটি তমাল ও দুইটি কদম্ব। একটি তমাল বৃক্ষ অত্যন্ত বৃহৎ। শ্রীচৈতন্য রামকেলিতে আসিয়া ইহারই ছায়ায় বিশ্রামলাভ করিয়াছিলেন। বৃক্ষটির নিম্নে একখানি নাতিবৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড রক্ষিত আছে। উহার অঙ্গে শ্রীচৈতন্যের পদচিহ্ন অঙ্কিত। শ্রীচৈতন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন রামকেলিতে এই বৃক্ষমূলে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পদচিহ্ন, মদনমোহন বিগ্রহ, রূপসনাতনের বাসাবাড়ী, রূপ গোস্বামী খনিত রূপসাগর দীঘি এবং জীব গোস্বামী দ্বারা খনিত শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড ও বিশাখাকুণ্ড নামক পুষ্করিণী আছে বলিয়া রামকেলি বৈষ্ণবের পরম পবিত্র তীর্থ। এই হেতু রামকেলির অপর নাম 'গুপ্ত বৃন্দাবন'। এখানে জ্যৈষ্ঠ মাসের

সংক্রান্তির দিন চৈতন্যদেবের আগমনের দিন স্মরণ করিয়া বৈষ্ণবদিগের সুবৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে। রূপসাগর দীঘিটি বৃহৎ, কিন্তু কুণ্ডগুলি ক্ষুদ্র। এ সকল জলাশয়েই কুম্ভীর আছে।

রূপসাগরের নিকটে দক্ষিণ দিকে বড় সোনা মস্‌জিদ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান। ইহা **বারদুয়ারী** নামেও প্রসিদ্ধ। ইহা ১৬৮ ফুট লম্বা ও ৭৫ ফুট চওড়া। বাদশাহদিগের দপ্তরখানারূপেও ইহা ব্যবহৃত হইত। ইহার এখন ধ্বংসাবস্থা, তথাপি গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগ ইহার যথাসাধ্য রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মস্‌জিদটি চতুষ্কোণ, প্রস্তর নির্ম্মিত। ইহার একটি প্রকাণ্ড দালান বা হলঘর আছে, তাহাতে দুই সারি স্তম্ভ ছিল, এখন অনেকগুলিরই ভগ্নদশা। পূর্ব্বে হলঘরের উপরে ছাদ ও ইষ্টক নির্ম্মিত ৪৪টি গম্বুজ ছিল, খিলানের আকার দেখিয়া তাহা বুঝা যায়। মস্‌জিদের উত্তরাংশে মহিলাদের বসিবার জন্য উচ্চ মঞ্চ এখনও বর্ত্তমান আছে।

এই মস্‌জিদের সম্মুখে উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ একটি জলাশয় আছে, তাহাতে পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে। ঐতিহাসিকরা বলেন, আলাউদ্দীন হুসেন শাহ এই মস্‌জিদের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র নাসিরুদ্দিন নসরৎশাহের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে উহা সম্পূর্ণ হইয়াছিল। মস্‌জিদটি নসরৎশাহের সৌন্দর্য্য বোধ ও শিল্পানুরাগের সম্যক্ পরিচায়ক। রাভেন্‌শ ইহাকে গৌড়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট হর্ম্ম্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন!

বড় সোনা মস্‌জিদ বা বারদুয়ারী হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে প্রায় এক মাইল পথ অগ্রসর হইলে মুসলমান রাজাদিগের গৌড় দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই দিকে উক্ত দুর্গের উত্তরের দ্বার অবস্থিত। ইহাই দুর্গের প্রধান প্রবেশ দ্বার ছিল। উহার নাম **দাখিল-দরওয়াজা**।

এই দুর্গ ও প্রাসাদ এক মাইল বিস্তৃত ছিল। এই দুর্গের চতুর্দ্দিকে ৮ ফুট চওড়া ও ৬৬ ফুট উচ্চ প্রস্তরমণ্ডিত ভীম প্রাচীর ছিল। এই প্রাচীর ৬৬ ফুট বা ২২ গজ উচ্চ ছিল বলিয়া এখনও "**বাইশগজী**" নামে পরিচিত। এখন প্রাচীরের বক্ষ ভেদ করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিয়াছে—প্রাচীর জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রাচীরের পাদমূলে যে গভীর পরিখা ছিল, উহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, উহাতে সর্ষপাদির চাষ আবাদ হইতেছে।

দাখিল দরওয়াজাটি ৭০ ফুট উচ্চ। উহার মধ্য দিয়া তিনটি বৃহৎকায় হস্তী পর পর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। ছোট ছোট লাল ইটে তৈয়ারী দরওয়াজার প্রাচীর গাত্রে নানাবিধ কারুকার্য্য দেখা যায়। দ্বারের দুই পার্শ্বে প্রহরীদের থাকিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। এককালে এই প্রকাণ্ড দরওয়াজার দুই দিকে চারিটি ইষ্টকের মিনার ছিল।

উত্তর দিকের দাখিল দরওয়াজা দিয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে পর পর কয়টি প্রাচীন ধ্বংস-নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়, যথা,—প্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত 'হাবেলি খাস' রাজপ্রাসাদ, বাদসাহ কবর, কদম রসুল, চিকা মস্‌জিদ, গুমটি মস্‌জিদ ইত্যাদি।

দাখিল দরওয়াজার পর কিছুদূর অগ্রসর হইলে একে একে ধ্বংসাবশিষ্ট চাঁদ দরওয়াজা, নিম-দরওয়াজা, প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া বাইশগজী প্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত বিশাল রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার প্রাচীন খাত কোনরূপে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া রহিয়াছে। রাজপ্রাসাদের প্রাচীন নাম **'হাবেলি খাস'**। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ পরিখা স্থানে স্থানে শৈবালদল ও জঙ্গলপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন এই প্রাসাদ পূর্ব্বে হিন্দু রাজাদিগের প্রাসাদ ছিল এবং তাঁহাদের আমলে ইহা অন্দরমহল ছিল। অন্দরমহলের পশ্চাতে পুষ্করিণী ও টাঁকশাল ছিল।

দাখিল দরওয়াজা, গৌড়

গৌড়ের ইতিহাস লেখকেরা গৌড়-প্রাসাদটিকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন—(১) উত্তরাংশে দরবার-গৃহ, (২) উহার দক্ষিণে অর্থাৎ মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ, (৩) সকলের দক্ষিণে হারেম অর্থাৎ বেগম মহল ছিল। এখন এই স্থান নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছাদিত।

রাজপ্রাসাদ যেখানে অবস্থিত ছিল, তাহার উত্তর-পূর্ব্বে সুলতান হুসেন শাহের বিশাল সমাধিস্থান আছে। ইহার নাম বাংলা কোট, কিন্তু ফ্রাঙ্ক্‌লিন উহাকে **বাদ্‌শা-কি-কবর** বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ফ্রাঙ্ক্‌লিন বলেন, এই সমাধি স্থানের পাষাণ-দ্বার দেখিতে

অতি সুন্দর ছিল, উহার সম্মুখভাগ ও পার্শ্বদেশ শ্বেত ও নীল মীনার কাজ করা ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত ছিল; পরন্তু চারি কোণে চারিটি গোলাপ অঙ্কিত ছিল। এখন আর কবরের বা কবরের দ্বারের মীনার সুন্দর কাজ কিছুই দেখিবার উপায় নাই—কাল সবই গ্রাস করিয়াছে।

দাখিল দরওয়াজা হইতে এক মাইল দক্ষিণে **ফিরোজ মিনার** বা ফিরোজ শাহের 'ছড়ি' দ্রষ্টব্য পদার্থ। ইহা ৮৪ ফুট উচ্চ এবং নীচের দিকে ১২টি ভুজবিশিষ্ট বহুভুজ ও

ফিরোজ মিনার, গৌড়

উপর দিকে বৃত্তাকার। ভিতরে ৭৩টি ধাপবিশিষ্ট ঘোরান সিঁড়ি আছে। পূর্ব্বে ইহার শীর্ষে একটি গম্বুজ ছিল। একখানি আরবী শিলালেখ অনুসারে বাংলার হাব্‌শী রাজা সৈইফ্-উদ্দিন ফিরোজ শাহ্ কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। স্থানীয় লোকে ইহাকে পীর-আশা-মিনার বা চিরাগদানীও বলিয়া থাকেন। শুনা যায় যে, ইহা একটা সঙ্কেতের আড্ডা স্থান ছিল। এই মিনারে আলোক জ্বালাইয়া মহানন্দাতটস্থ

নিমাসরাইএর মিনারের আলোকের সহিত গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান করা হইত। মহানন্দা ও কালিন্দী নদীর সঙ্গমস্থলে শেষোক্ত মিনারটি অবস্থিত। ফিরোজ মিনার হইতে গৌড়ের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ ও রাজমহলের গিরি শ্রেণীর ধূসর শোভা সত্যই সুন্দর মনে হয়।

ফিরোজ মিনার হইতে প্রায় একপোয়া পথ দক্ষিণে '**লুকোচুরি**' বা 'লক্ষছিপি' দরওয়াজা। ইহা গৌড় দুর্গের পূর্ব্ব দ্বার ছিল। দুর্গের উত্তর ও পূর্ব্ব দ্বারই বিদ্যমান, অন্য দুইটি দ্বার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কানিংহাম বলেন, ১৫২২ খৃষ্টাব্দে হুসেন শাহ এই দরওয়াজা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাদশাহ সাজাহানের পুত্র গৌড়ের সুবেদার শাহসুজা যখন কিছু দিনের জন্য গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, তখন এই দরওয়াজার জীর্ণসংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন। প্রবাদ, বাদশাহ বেগমরা এই দরওয়াজায় লুকোচুরি খেলিতেন।
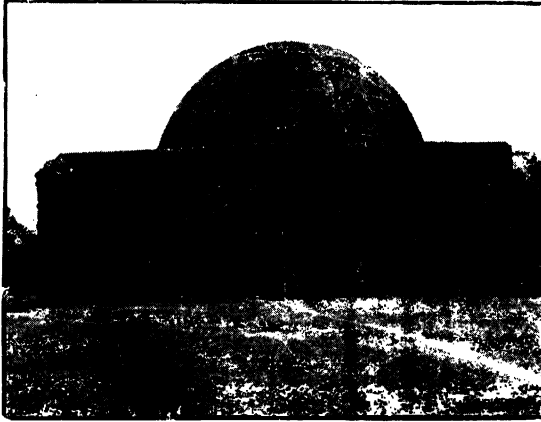
কদমরসুল মস্‌জিদ, গৌড়

এই লুকোচুরি দরওয়াজার পার্শ্ববর্ত্তী **কদম রসুল** নামক মস্‌জিদ দেখিবার জিনিষ। মুসলমানদিগের নিকট ইহা অতি পবিত্র। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে সুলতান নাসির উদ্দীন নসরৎ শাহ্ কর্ত্তৃক ইহা নিম্মিত হয়। মস্‌জিদটির একটি গুম্বজ আছে ও চারিকোণে চারিটি মিনার আছে। মিনারগুলি কৃষ্ণপ্রস্তরের। মস্‌জিদের গর্ভগৃহে একটি বেদীর উপর আর একটি ক্ষুদ্রায়তন বেদী আছে। উহার উপর কষ্টিপ্রস্তর নিম্মিত যুগল পদচিহ্ন আছে। কদম রসুল অর্থে পয়গম্বর মহম্মদের পদচিহ্ন (কদম = পদ + রসুল = পয়গম্বর)। মুসলমানরা এই পদচিহ্ন হজরত মহম্মদের বলিয়া পূজা করেন। মস্‌জিদের মধ্যস্থ কক্ষদ্বার কাষ্ঠনিৰ্ম্মিত হইলেও দেখিবার জিনিষ। উহা চারি শত বৎসরের পুরাতন। উহার তক্তার উপরে কাপড় মারিয়া পলস্তারা করা। এখনও সেই পলস্তারার কাজ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কক্ষ মধ্যে প্রকাণ্ড কাষ্ঠনিম্মিত সিন্দুক আছে। কেহ কেহ বলেন, উহার মধ্যে 'কদম' আনা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন শয়তানকে উহার মধ্যে কিছুক্ষণ

আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ পদচিহ্নটি মক্কাশরীফ হইতে আনাইয়াছিলেন এবং উহা পাণ্ডুয়ার বড়দরগাহের চিল্লাখানায় রক্ষিত ছিল।

মস্‌জিদের সম্মুখভাগ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ঐ দিকে মস্‌জিদ গাত্রের ইষ্টকের উপর নক্সার কাজ অতি সুন্দর। উহার দ্বার-শীর্ষে ডোগরা অক্ষরে শিলালেখ আছে। কদম রসুলের পার্শ্বে বিষ্ণু মন্দিরের আকারে দোচালা কুঁড়ে ঘরের অনুকরণে নির্ম্মিত একটি সৌধের মধ্যে অনেকগুলি কবর আছে, তাহাদের মধ্যে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সেনাপতি দিলীর খাঁর পুত্র ফতে খাঁর কবর উল্লেখযোগ্য।

কদম রসুলের মাত্র এক রশি দক্ষিণে প্রাচীর ভেদ করিয়া একটি গুপ্ত পথ আছে। ইহার পশ্চিমে প্রাকারগাত্রে **গুমটি দরওয়াজা** অবস্থিত। ইহার গাত্রে শ্বেত ও নীল মীনার কাজ করা ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়াছে।

গুমটি দরওয়াজার পশ্চিমে **চিকা মস্‌জিদ** আর একটি দ্রষ্টব্য পদার্থ। ইহাকে 'চামখানা' বা 'চোরখানা'ও বলে। ইহা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গুম্বজ বিশিষ্ট মস্‌জিদ। ইহারও দেওয়ালে শ্বেত ও নীল মীনার কাজ করা ইষ্টক শোভা পাইতেছে। ইহা মস্‌জিদ কি না, এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। কানিংহাম বলেন, ইহা সমাধি মন্দির, এই স্থানে সুলতান জালাল উদ্দীনের পুত্র মহমুদ শাহের কবর আছে। চিকা মস্‌জিদটিকে দেখিলে একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদের ভগ্নাংশ বলিয়া মনে হয়। ইহার শীর্ষদেশে একটি প্রকাণ্ড গুম্বজ আছে। ভিতরদিকে ইটের উপর মীনার কারুকার্য্য আছে। তলদেশ প্রস্তর-মণ্ডিত! এনামেল করা ইষ্টক দ্বারা প্রাচীর গাত্রের বাঁধন দেওয়া হইয়াছে। চিকা মস্‌জিদের চারি রশি পশ্চিমে "বাইশ গজী" অবস্থিত। চিকা মসজিদের সংলগ্ন বিস্তৃত ভূখণ্ড সম্প্রতি খনিত হইয়াছে। উহা হইতে কয়েকটি সমাধিস্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই প্রাঙ্গনটি যে পূর্ব্বে আগাগোড়া এনামেল ইট দিয়া বাঁধান ছিল, তাহার প্রমাণের অভাব নাই।

কদম রসুল হইতে অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে জিলা বোর্ডের রাস্তা ধরিয়া দক্ষিণে গেলে **তাঁতিপাড়া মস্‌জিদ** পাওয়া যায়। এটিরও ভগ্নদশা। পূর্ব্বে ইহার স্তম্ভ ও গুম্বজ আদি সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিত। এক্ষণে ইহার ছাদ ও গুম্বজ নাই। কিন্তু অভ্যন্তরস্থ দেওয়ালের গাত্রে এবং কুলুঙ্গী বা মিহরাবে সুন্দর নক্সার কার্য্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে উমর কাজী কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত বলিয়া কথিত।

বাইশ গজী হইতে জিলা বোর্ড রাস্তায় পড়িয়া কিছু উত্তরে অগ্রসর হইলে **চামকাঠি মস্‌জিদ** পাওয়া যায়। ইহা ইংরেজ বাজার হইতে নয় মাইল হইবে।

তাঁতিপাড়া মস্‌জিদ হইতে অর্দ্ধ মাইল পথ দক্ষিণে অগ্রসর হইলে লোট্টন বা **লোটন মস্‌জিদ** দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উপর একটি গুম্বজ আছে। ইহার ইষ্টকে সবুজ, হল্‌দে, নীল ও সাদা মীনার কাজ অতি সুন্দর। ঐতিহাসিকদিগের মতে

এই মস্‌জিদটি ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দে সুলতান শমস্-উদ্দীন ইউসুফ্ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ লোটন নাচওয়ালী ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। মস্‌জিদ হইলেও ঐশ্বর্য্যে ইহা যে ধনীর বিলাস ভবন হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না, তাহা ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়াও বুঝিতে পারা যায়। ঐতিহাসিক গ্রেট্ বলিয়াছেন যে সারা হিন্দুস্থানের মধ্যে তিনি এরূপ সুন্দর হাল্‌কা গাঁথুনির কারুকার্য্য খচিত সৌধ দেখেন নাই।

লোটন মস্‌জিদের উত্তর-পূর্ব্বে কিছু দূরে এবং চামকাঠি মস্‌জিদের এক মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে, উহার নাম **ছোট সাগরদীঘি**। উহা পিয়াসবাড়ী দীঘির প্রায় চতুর্গুণ বড় হইবে। ইহা হইতে পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদের জল সরবরাহ হইত বলিয়া কথিত। ইহার তীরে কয়েক ঘর কৃষকের বসবাস আছে। কিংবদন্তী, ইহা হিন্দু রাজত্বকালে খনিত হইয়াছিল এবং ধনপতি ও চাঁদ সদাগর ইহার তটে বাস করিতেন।

লোটন মস্‌জিদ হইতে পাকা রাস্তা ধরিয়া দুই মাইল দক্ষিণে যাইয়া পাঁচ খিলানের একটি পুরাতন সাঁকো পার হইয়া রাজধানীর দক্ষিণ প্রাকার ভেদ করিয়া **কোতোয়ালী দরওয়াজা** অবস্থিত। ইহার এক্ষণে ভগ্নদশা। দ্বারের উভয় পার্শ্বে সহর কোতোয়াল ও প্রহরীগণের বাস করিবার অর্দ্ধচন্দ্রাকার প্রকোষ্ঠগুলি দ্বারের সহিত ধ্বংসমুখে পতিত। এই দরওয়াজার খিলান ৫১ ফুট চওড়া এবং ভূমি হইতে ১৭ ফুট চার ইঞ্চি উচ্চ।

কোতোয়ালী দরওয়াজা শম্‌স্-উদ্দীন ইলিয়াস্ শাহের বংশের সুলতান নাসিরউদ্দীন মহমুদ শাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত। নিকটস্থ সাঁকোটিও তিনি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

কোতোয়ালী দরওয়াজা ছাড়াইয়া কিছু দক্ষিণে অগ্রসর হইলে যেখানে ১২ নং মাইল-স্‌টোন পাওয়া যায়, সেই স্থানে **বল্লদীঘি** দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বল্লাল-সেনের সময় খনিত বলিয়া কথিত। ইহার অপর নাম 'বালুয়া' দীঘি।

বল্লদীঘি হইতে দুই মাইল দক্ষিণে গৌড়ের পুরাতন শহরতলী ফিরোজপুরে ফকির নিয়ামৎ উল্লার মস্‌জিদ আছে। এই স্থানে বহু মুসলমান যাত্রী আসিয়া থাকেন।

নিয়ামৎউল্লা গুজরাট হইতে আসিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিন এখানে গুজরাটি পীরের মেলা বসে। সমাধিসৌধটি বাংলার আফগান রাজা সুলেমান কররাণির রাজত্বকালে ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নিয়ামৎউল্লার সমাধির নিকটেই টাঁকশালদীঘির ধারে **ছোট সোণা মস্‌জিদ** অবস্থিত ইহার সম্মুখভাগের প্রস্তরে উৎকীর্ণ কারুকার্য্য অতি সুন্দর। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর এই মস্‌জিদকে র‍্যাভেন্‌শ "গৌড়ের মণি" বলিয়াছেন।

ইহা বড় সোণা মস্‌জিদের মত বারান্দাওয়ালা মস্‌জিদ। এমন সুন্দর পাথরের নক্সা গৌড়ের অন্য কোন মস্‌জিদে নাই। সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের সময়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত।

গৌড়ে আরও কয়টি দেখিবার স্থান আছে। তন্মধ্যে **কাঁচাগড়, লোহাগড়, চন্দ্র সূর্য্যের প্রস্তর, গৌড়েশ্বরীর মন্দির, জহরাবাসিনী, মনস্কামনা শিব, রমাভিটা, পাতালচণ্ডী**, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জাতির অতীত জীবনস্মৃতি গৌড়ের প্রতি ধূলিকণায়, অণুপরমাণুতে, আকাশে বাতাসে মিশাইয়া আছে। কালের প্রভাবে বাঙালীর গৌড়—লক্ষ্মণসেনের লক্ষ্মণাবতী আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত, বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কিন্তু তাহা হইলেও সেই ধ্বংসস্তূপের প্রত্যেক প্রস্তর, প্রত্যেক দেউল, প্রত্যেক মন্দির ও মস্‌জিদ বাঙালী হিন্দু মুসলমানের নিকট পবিত্র। আজ মহামারীর প্রকোপে গৌড় মনুষ্য-বাসের অযোগ্য অরণ্যে পরিণত, গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া কবি আক্ষেপ করিয়াছেনঃ

"যেথা মন্ত্রীসাথ নরনাথ বসিতেন ধীর
তথা ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকারে গভীর।"

কিন্তু তাহা হইলেও সেই অরণ্য বাঙালীর নিকট পুণ্য তপোবন—পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতি বৎসর কত শত বাঙালী এই তীর্থ দর্শন করিতে যান, দর্শনান্তর অতীতের গৌরব স্মরণ করিয়া আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিয়া থাকেন।

নিমাসরাই—কলিকাতা হইতে ২১০ মাইল দূর। ইহাই পুরাতন মালদহ। পুরাতন মালদহ রাজধানী পাণ্ডুয়ার বন্দর ছিল এবং মহানন্দা ও কালিন্দীর সঙ্গমের উপর মহানন্দার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। নূতন মালদহ বা ইংরেজ বাজার হইতে জলপথে কিংবা নদী পার হইয়া একটি পাকা রাস্তা ধরিয়া নিমাসরাই বা পুরাতন মালদহে আসা যায়।

পুরাতন মালদহ পূর্ব্বে রেশম বা সুতীর কাপড়ের বিখ্যাত গঞ্জ বা আড়ং ছিল এবং এখানে সর্ব্বপ্রথমে ওলন্দাজ এবং পরে ইংরেজ ও ফরাসী ঈস্‌ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠি স্থাপিত হয়। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি কুঠি ইংরেজ বাজারে লইয়া যান। পূর্ব্বে নগরটির চারিদিকে প্রাকার ছিল এবং এখনও পারঘাটায় এই দুর্গের দুয়ার আছে। এই দরওয়াজার সম্মুখে মহানন্দার অপর পারে নদীতীরে ৫৫ ফুট উচ্চ একটি মিনার আছে। ইহা নিমাসরাই মিনার নামে পরিচিত। মিনারের গায়ে অনেক প্রস্তরখণ্ড বাহির হইয়া আছে এবং ইহা দেখিতে আগ্রার নিকটস্থ ফতেপুর শিক্‌রি নগরে আকবর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হিরণ মিনারের মত। শিকারের জন্য কিংবা রক্ষীদের শত্রু আগমন লক্ষ্য করিবার জন্য ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। প্রবাদ, দূরে শত্রু আসিতেছে দেখিতে পাইলে মিনার গাত্রের প্রস্তরখণ্ডগুলির উপরে মশাল জ্বালিয়া দিয়া গৌড় নগরের লোককে সাবধান করিয়া দেওয়া হইত পুরাতন মালদহে কয়েকটি পুরাতন মস্‌জিদ আছে, তাহাদের মধ্যে ছোট সোনা মস্‌জিদই প্রধান; ইহা বাঙলার আফ্‌গান বা পাঠান রাজা দাউদ শাহ্‌ কররানির রাজ্যকালে মুসলমান বণিক মাশুম্‌ কর্ত্তৃক ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। দুইটি বৃহৎ গম্বুজ ও একটি খিলান বিশিষ্ট এই মসজিদটি দেখিতে সুন্দর। চারিকোণে চারিটি মিনার ও প্রবেশদ্বারে সুন্দর কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর স্তম্ভ আছে। মাশুমের ভ্রাতা পুরাতন মালদহের কাট্‌রা তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। একটি প্রকাণ্ড উঠানের চারিদিকে বাড়ী তৈয়ারী করিয়াতাহার দুই দিকে দুইটি বড় দরওয়াজা রাখা হইত। ব্যবসায়ীরা

মাল পত্র লইয়া দ্বিতলে বা ত্রিতলের ঘরে থাকিতেন এবং একতলে দোকান হইত। ইহা ছাড়া ফৌতি মসজিদ বা ফুটী মস্‌জিদ এবং ফকীর শাহ্ গদার দরগাহে ফকিরের এবং একটি তোতা পাখীর কবর আছে; এই পাখীটি নমাজ আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিল। এই দরগাহের বিপরীত দিকে দুধ পীরের কবর; কবরের নিকট একটি গর্ত্তে দুধ ঢালিয়া লোকে পূজা দিয়া থাকে।

পুরাতন মালদহের পূর্ব্ব প্রান্তে 'ধর্ম্মকুণ্ড' ও 'দেবকুণ্ড' নামক দুইটি জলাশয় পাল রাজগণের সময়ে খনিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। দেবকুণ্ডের এক মাইল উত্তরে বেহুলা নদী নামে একটি ক্ষুদ্র জলধারা প্রবাহিত। প্রবাদ, বেহুলা লখিন্দরের মৃতদেহ লইয়া ভেলায় ভাসিতে ভাসিতে কালিন্দী নদী দিয়া এই নদীতে উপনীত হইয়াছিলেন। এই হেতু উহার নাম বেহুলা; ইহা নিমাসরাই স্টেশনের পূর্ব্ব দিকে নিকটেই অবস্থিত।

আদিনা—কলিকাতা হইতে ২১৪ মাইল। এই স্থানে নামিয়া মুসলমান যুগের বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজধানী পাণ্ডুয়ায় যাইতে হয়। স্টেশন হইতে সুবিখ্যাত আদিনা মস্‌জিদ প্রায় তিন মাইল দূর। ইংরেজ বাজার হইতে সরাসরি মোটরগাড়ী করিয়া নদী পার হইয়া, পুরাতন মালদহ হইয়া আদিনায় যাওয়া যায়। পুরাতন মালদহ হইতে দূরত্ব মাত্র ৬ মাইল। আদিনা স্টেশনে নামিয়া পদব্রজে বা গোরুরগাড়ীতে পাণ্ডুয়া দেখিয়া আসাই সুবিধা। পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করিতে পারিলে গোযান পাইতে কোনও অসুবিধা হয় না।

পাণ্ডুয়া—পাণ্ডুয়ার উত্তর সীমানা রায়দীঘি, পূর্ব্ব সীমানা আদিনা মসজিদ ও তাহার এক মাইল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্থান, পশ্চিম সীমানা মহানন্দা নদী এবং দক্ষিণ সীমানা শমসাবাদ। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ষোল মাইল এবং প্রস্থে প্রায় আট মাইল। ইহা 'হজরৎ পাণ্ডুয়া' নামেও অভিহিত হয়। গৌড় প্রসঙ্গে পাণ্ডুয়ার ও তাহার রাজাদের কথা বলা হইয়াছে। ইহা অতি প্রাচীন নগরী। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে ইহাই প্রাচীন কালের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। (বগুড়া স্টেশন দ্রষ্টব্য)।

পুরাতন মালদহ হইতে দিনাজপুরের রাস্তা ধরিয়া ছয় মাইল চলিলে যেখানে রেলপথে আদিনা রেল স্টেশন অবস্থিত, ঐ স্থান হইতে বন জঙ্গল পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে ধ্বংসাবশিষ্ট পাণ্ডুয়া নগরের প্রান্ত প্রায় দুই মাইল দূর। প্রথমে পড়িবে পাণ্ডুয়ার 'বড় দরগাহ্'। এই দরগাহে পীর সৈয়দ মখদুম শাহ্ জলাল তব্‌রিজীর সমাধি আছে। দরগাহে মুসলমান ফকিরদিগকে নিত্য ও আহার্য্য পানীয় দানে সেবা করা হয়। এজন্য সম্পত্তির আয় নির্দ্দিষ্ট আছে। ২২ হাজার বিঘা পীরোত্তর লইয়া এই সম্পত্তি বলিয়া দরগাহটি সাধারণতঃ বাইশ হাজারী দরগাহ নামে পরিচিত। পুরীধামে যেমন শ্রীচৈতন্যের দন্তকাষ্ঠ হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে, এই দরগার প্রাঙ্গনেও তেমনই একটি নিম্ব বৃক্ষ দেখাইয়া বলা হয় যে, ফকির সাহেবের দন্তকাষ্ঠ হইতে উহা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। রাভেন্‌শ বলেন, ফকিরের দাক্ষিণাত্যে দেহান্তর হইয়াছিল এবং সেইস্থানে তাঁহার প্রকৃত কবর আছে, এইটি তাহার নকল। দরগাহের মধ্যস্থ জুম্মা মস্‌জিদ সুলতান আলি মুবারক ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মস্‌জিদের মধ্যে যেখানে ফকির জলাল তবরিজী বসিয়া উপাসনা করিতেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলা উহার চারিদিক রৌপ্যনির্ম্মিত বেষ্টনী দ্বারা ঘিরিয়া দিয়াছিলেন। এখন আর সেই বেষ্টনী দেখিতে পাওয়া যায় না। রজবের ১লা হইতে ২২শে পর্য্যন্ত এই দরগাহে মুসলমান ফকির ও মোল্লাগণ সমবেত হইয়া থাকেন। তদুপলক্ষে ভোজ ও উৎসব হয়। ঐ সময়ে এবং সাবান মাসে এই স্থানে মেলা বসে। এই দুই মেলা উপলক্ষে ভারতের প্রায় সর্ব্ব স্থান হইতে ফকিরগণ আসিয়া থাকেন।

এই দরগাহে পাঁচটি খিলান আছে। বাহিরের চত্বরে ২টি কষ্টি প্রস্তরের স্তম্ভ আছে। চত্বরের একপার্শ্বে একটি দাড়িম্ব বৃক্ষ আছে; বন্ধ্যা নারীরা পুত্র কামনায় ইহাতে ইষ্টকখণ্ড বাঁধিয়া দিয়া থাকে। বড় দরগাহের পূর্ব্ব পার্শ্বে হিন্দু মন্দিরের আকারে একটি ছোট মস্‌জিদ আছে। উহা পূর্ব্বে মন্দির ছিল; কষ্টি প্রস্তরের উপর নক্সা দেখিয়াও মনে হয় ঐ গুলি হিন্দু বা বৌদ্ধ আমলের।

এই দরগাহ মধ্যে লক্ষ্মণসেনী দালান নামে একটি পুরাতন সৌধের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়; এই নাম কিরূপে হইল জানা যায় নাই।

দরগাহে পুঁথি মুবারক নামে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পীর জলাল তবরিজী সাহেবের জীবনী সম্বলিত একখানি পুস্তক রক্ষিত আছে।

বড় দরগাহের প্রধান প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বে পূর্ব্বমুখী **ছোট দরগাহ্‌** অবস্থিত। এক কালে এই দরগাহের ছয় হাজার বিঘা পীরোত্তর সম্পত্তি ছিল বলিয়া ইহা ছয় হাজারী দরগাহ্‌ নামেও পরিচিত। ইহার মধ্যে বিখ্যাত সাধক নূর কুতব-উল-আলম্‌ ও আলা-উল-হকের সমাধিস্থান আছে। আলা-উল হক গৌড় সাদুল্লাপুরের পীর শেখ্‌ অখি সিরাজ-উদ্দীন সাহেবের শিষ্য ছিলেন বলিয়া কথিত। তাঁহারই পুত্র প্রসিদ্ধ সাধক হজরৎ নূর-কুতব্‌-উল-আলম্‌ রাজা গণেশের সমসাময়িক ছিলেন। ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সুলতান শম্‌স্‌-উদ্দীন ইসুফ শাহ কর্ত্তৃক দরগাহ্‌টি ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া কথিত। এই কবরের পশ্চিমদিকে একতল প্রাচীন গৃহটিকে "চিল্লিখানা" বলে। এই গৃহে কুতব আলম উপাসনা করিতেন। এই দরগাহের প্রাঙ্গনে ভগ্নাবশিষ্ট 'কাজী নূর মস্‌জিদ' দেখিতে পাওয়া যায়। দরগাহর উত্তরদিকে প্রাচীরের বাহিরে ধ্বংসাবশিষ্ট স্তূপ খনন করিয়া বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত চতুষ্কোণ কষ্টি প্রস্তরের স্তম্ভ এবং উজ্জ্বল প্রস্তরখণ্ডসমূহ পাওয়া গিয়াছে। আরও কয়টি বৃত্তাকার কৃষ্ণপ্রস্তরাসনও ঐ সঙ্গে ঐ স্থান হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। এই পতিত ভূখণ্ডের পূর্ব্বপ্রান্তে **'মুরিদখানা'** নামক একটি জীর্ণ ইমারত আছে। কথিত আছে, ঐ স্থানে মুসলমান আমলে হিন্দুদিগকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইত। রাজা গণেশের পুত্র যদুও নাকি ঐ স্থানে মুসলমান হইয়া সুলতান জলাল-উদ্দীন মহম্মদ শাহ নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

ছোট দরগাহের তিনটি গুম্বজ আছে, একটি ভগ্ন। সম্মুখে প্রস্তর প্রাচীর-বেষ্টিত পুষ্করিণী আছে। প্রাঙ্গণে বিস্তর কবর দেখা যায়। বহু প্রস্তরের উপর হিন্দু দেবদেবী

অঙ্কিত আছে। এই দরগাহেও ভারতের নানা স্থান হইতে ফকির দরবেশ আসিয়া থাকেন।

ছোট দরগাহ্ হইতে কিছু উত্তরে সোনা মস্‌জিদ অবস্থিত। ইহার অপর নাম **কুতবসাহী মস্‌জিদ**। এই মস্‌জিদটি মুরিদখানার উত্তরদিকে অবস্থিত। ইহারও এখন ভগ্নদশা। পূর্ব্বে ইহার দশটি গুম্বজ ছিল, এখন একটিও নাই। তবে ভগ্ন জীর্ণ দ্বার, স্তম্ভ, মিম্বর এখনও এই স্থানে দেখা যায়। কষ্টি প্রস্তরের একটি স্মৃতিফলকে লিখিত আছে যে, এই মস্‌জিদ মুখদুম উবেদ কাজি ৯৯০ হিজিরায় (১৫৮৪ খৃঃ) ইহা নির্ম্মাণ করান।
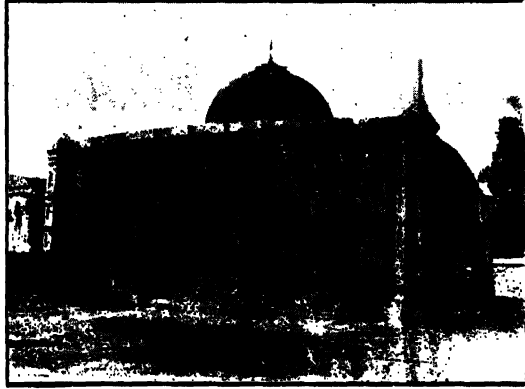
একলাখী, পাণ্ডুয়া

এই মস্‌জিদের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে **একলাখী** নামক সুবৃহৎ সমাধি সৌধ অবস্থিত। ইহার উপর একটি প্রকাণ্ড গুম্বজ আছে। ইহার দক্ষিণ দিকস্থ কষ্টি পাথরের প্রধান প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বস্থ প্রস্তরে হিন্দু মূর্ত্তি খোদিত আছে; পরন্তু দ্বারের পাষাণ চৌকাঠে বৌদ্ধ মূর্ত্তি আছে। তাহাতে মনে হয়, কোন হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ হইতে তোরণটি সংগৃহীত হইয়াছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন একলাখীর বহু প্রস্তরখণ্ডে দৃষ্ট হয়। প্রস্তরের দেওয়ালে লতা পাতা পুষ্পাদি খোদিত। ইহার ইষ্টকের গাঁথুনি অতি চমৎকার, তদুপরি নক্সার কাজ আরও সুন্দর, ঠিক গৌড়ের চিকা মস্‌জিদের মত। প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারশীর্ষে গণেশ মূর্ত্তি পাষাণে খোদিত। পূর্ব্বে চারটি মিনার ছিল, এখন ঐগুলি ধ্বংসমুখে পতিত। এই সৌধে রাজা গণেশের পুত্র যদু বা জলাল-উদ্দীনের, তাঁহার পত্নীর ও পুত্র সুলতান শম্‌স্-উদ্দীন আহম্মদ শাহের সমাধি আছে। একলাখী বাংলার পাঠান সুলতানদের স্থপতি-শিল্পের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহা নির্ম্মাণ করিতে এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। তখনকার কালের লক্ষ টাকা বড় সামান্য নহে। বোধ হয় এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম 'একলাখী' হইয়াছে। স্থানীয় মুসলমানগণ ইহাকে "একলক্ষ্মী" মসজিদ নামে

অভিহিত করেন, এবং অনেকেই বলিয়া থাকেন তাঁহারা পুরুষানুক্রমে শুনিয়া আসিতেছেন যে ইহা পূর্ব্বে একটি হিন্দু মন্দির ছিল। অনুমান ১৪১৪ হইতে ১৪২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রায় ১৫ ফুট চওড়া প্রাচীনকালের যে পথ দিয়া পাণ্ডুয়া ও আদিনা যাওয়া যায় উহার উপরটা কাঁচা বটে, কিন্তু তলদেশ ইট দিয়া প্রস্তুত। এই পথের উভয় পার্শ্বে জঙ্গলাবৃত স্থানে ভগ্ন ইষ্টকস্তূপসমূহ দেখা যায়। মুসলমান রাজত্বকালে পথের উভয়
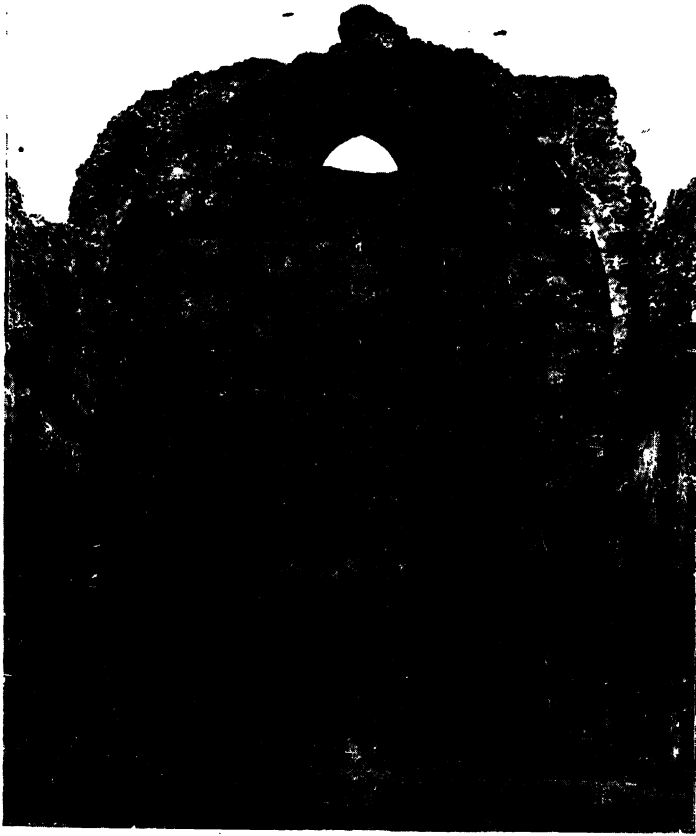
আদিনা মস্‌জিদের ভাস্কর্য্য

পার্শ্বে যে হর্ম্ম্যরাজি শোভা পাইত ইহা তাহারই নিদর্শন। এই পথে একলাখী হইতে এক মাইল উত্তরে পুরাতন কালের একটি সেতুর স্তম্ভে গণেশ প্রভৃতি মূর্ত্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন গৌড় হইতে প্রস্তরাদি উপাদান আনিয়া পাণ্ডুয়া নগরী নির্ম্মিত ও শ্রীমণ্ডিত হইয়াছিল তাহার বহু প্রমাণ এইরূপে পাওয়া যায়।

উপরোক্ত সেতু হইতে দুই মাইল উত্তরে বিশাল **আদিনা মস্‌জিদ** অবস্থিত। ইহার তিন দিকের ছাদ ও গুম্বজ পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু পশ্চিম দিকের ধ্বংসাবশেষ এখনও সগর্ব্বে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহা হুগলীর ইমামবাড়া ও মুর্শিদাবাদের কাটরা মস্‌জিদ অপেক্ষাও বড়। মস্‌জিদটি ৫০০ ফুট লম্বা ও ৩০০ ফুট চওড়া এবং ৬০ ফুট উচ্চ। এরূপ বিশাল মস্‌জিদ ভারতের অন্য কোথাও আর নির্ম্মিত হয় নাই এবং পৃথিবীতেও খুব অল্পই আছে। ফার্‌গুসানের মতে দামাস্কাসের প্রসিদ্ধ ও বিরাট জুম্মা মস্‌জিদের মাপে ও অবিকল অনুকরণে এই মস্‌জিদটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা বাংলার মুসলমান যুগের স্থাপত্য শিল্পের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

মস্‌জিদের মধ্যে একটি কষ্টি প্রস্তর-মণ্ডিত বৃহৎ প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ স্থানে আচার্য্য উপাসনা করিতেন। উপাসনার বেদীটি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত, দেখিতে ঠিক হিন্দু মন্দির বা রথের মত। ইহা যে পূর্ব্বে হিন্দু মন্দিরের অংশ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আর একটি সুবৃহৎ ব্যারাকের ন্যায় কক্ষের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়—ঐ স্থানে সহস্রাধিক লোক একত্র নমাজ করিতে পারিত।

মস্‌জিদের কয়েকটি ধ্বংসাবশিষ্ট কক্ষের প্রবেশদ্বারের কষ্টি প্রস্তরের চৌকাটে লতা পুষ্প সর্পাদি চিত্রাঙ্কিত সুন্দর কারুকার্য্য এখনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। এগুলিও পূর্ব্বে হিন্দু মন্দিরের অঙ্গ ছিল।

মস্‌জিদের অভ্যন্তর পাথরের থাম ও ইটের দেওয়াল দিয়া ১২৭টি সমভুজে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেকের উপর একটি করিয়া গুম্বজ ছিল।

মস্‌জিদের মধ্যে উপাসনা প্রকোষ্ঠ আংশিক দ্বিতল এবং ইহাতে বাদশাহের (অর্থাৎ বাংলার সুলতানের) বসিবার স্থান ছিল; বাদশাহ ঐ স্থানে গুপ্ত পথ দিয়া আসিতেন। ঐ স্থানের নাম বাদশাহকী তখৎ। কেহ কেহ বলেন এখানে বেগমেরা নমাজ পড়িতেন। আহমেদাবাদের মস্‌জিদগুলিতে এইরূপ তখৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

মস্‌জিদের অধিকাংশ স্তম্ভ, মিনার গুম্বজাদি পড়িয়া গিয়াছে, তবুও যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা দেখিবার জিনিষ। কোন কোন গোলাকার প্রস্তরস্তম্ভ এত মসৃণ যে উহার মধ্যে দর্পণের ন্যায় মুখ দেখা যায়। কোন কোন কক্ষপ্রাচীর কষ্টিপ্রস্তর দ্বারা উর্দ্ধ হইতে অধঃ পর্য্যন্ত মণ্ডিত। কক্ষপ্রাচীর গাত্রে তোগরা অক্ষরে কোরাণের বয়েত লিখিত আছে,— মর্ত্ত্যবাসি! তোমরা মাথা নামাইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া আল্লাহর উপাসনা কর।

স্থানীয় ব্যক্তিগণের মুখে শুনা যায়, পূর্ব্বে এখানে "আদিনাথ" নামক এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং "আদিনা" নামটি "আদিনাথ" নামেরই অপভ্রংশ। এই কিংবদন্তীর বলে কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানীয় সাঁওতালগণ এই মস্‌জিদ অধিকার করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট উহাদিগকে নিবৃত্ত করেন। উপাসনার বেদীর উপর উঠিবার সোপানে ছয়টি ধাপ আছে, উহার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ ধাপের গাত্রে একটি মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ গ্রথিত আছে। ঐটি কোনও হিন্দু দেবমূর্ত্তি হইবে। মস্‌জিদের গাত্রের প্রস্তরগুলিতেও কোথাও কোথাও হিন্দুর গণেশাদি দেবতার মূর্ত্তি খোদিত আছে দেখিতে

পাওয়া যায় এবং এখান হইতে বহু পাষাণনির্ম্মিত হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও হিন্দু মন্দিরের উপকরণ পাওয়া গিয়াছে। এই হেতু হ্যাভেল প্রমুখ স্থপতি শিল্পীরা অনুমান করেন যে, এই আদিনা মস্‌জিদ এবং পাণ্ডুয়া ও গৌড়ের অন্যান্য অনেক প্রাসাদ ও মস্‌জিদ পূর্ব্বতন হিন্দু মন্দির ও প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া গড়া হইয়াছে। আদিনা মস্‌জিদের খিলান ও বেদীর চারিপাশের কারুকার্য্য অতীব সুন্দর। কঠিন কষ্টি পাথর কাটিয়া

আদিনা মস্‌জিদের মধ্যস্থ কারুকার্য্য

যে ভাবে নক্সা করা হইয়াছে সেরূপ সুন্দর কারুকার্য্য দিল্লীতেও নাই। ছয়শত বৎসর-ব্যাপী মুসলমান শাসনের যুগে ভারতের যে সমস্ত প্রস্তর শিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কেবল বিজাপুরের সুলতান দ্বিতীয় ইব্রাহিম্‌ আদিল শাহের কবরের শিল্পের আদিনা মস্‌জিদের কারুকার্য্যের সহিত তুলনা হইতে পারে। সুলতান শম্‌স্‌ উদ্দীন ইলিয়াস্‌ শাহের পুত্র সিকন্দর শাহ্‌ ৭৭০ হিজিরায় (অর্থাৎ ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে) এই বিখ্যাত মস্‌জিদ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র গিয়াস-উদ্দীন আজম্‌ শাহের রাজত্ব-

কালে ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে ইহা শেষ হয়। বাদশাহ্ কী তখ্তের পশ্চাতে মস্জিদের ঠিক বাহিরে ও পশ্চিম দিকে স্থাপয়িতা সুলতান সিকন্দর শাহের প্রস্তর নির্ম্মিত সমাধি বর্ত্তমান।

মস্জিদ হইলেও ইহার অভ্যন্তরস্থ বাদশাহের বসিবার তখ্ৎ ও সম্মুখের বিস্তৃত প্রাঙ্গন দেখিয়া ইহাকে দরবার-আম বলিয়া মনে হয়।

আদিনা মস্জিদের বেদী

আদিনা মস্জিদটি গভর্ণমেণ্ট্ প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত করা হইয়াছে। ইহার প্রাঙ্গন ও চতুষ্পার্শ্বস্থ জঙ্গল পরিষ্কৃত করা হইয়াছে।

আদিনা মস্জিদের নিকট ডাক-বাংলাটি সুন্দর। ঐ স্থানে বিশ্রাম লইয়া মস্জিদ দর্শন করা বিধেয়।

আদিনা মস্‌জিদের পূর্ব্ব দিকের দ্বার অতিক্রম করিলে প্রাচীরের বাহিরে বিস্তীর্ণ বনাকীর্ণ ভূখণ্ড দেখা যায়। ঐ জঙ্গলের মধ্য দিয়া এক মাইল পথ পূর্ব্বমুখে অতিক্রম করিলে **সাতাইশ-ঘর** নামক একটি ভগ্ন স্নানাগার দেখিতে পাওয়া যায়। উহা নৃপতি সিকন্দর শাহের প্রাসাদের অংশ বলিয়া কথিত। ইহার সম্মুখে একটি দুই শত হস্ত দীর্ঘ জলাশয় আছে। লোকে বলে উহা রাজা গণেশের সময়ে খনিত হইয়াছিল।

শামশী—কলিকাতা হইতে ২২৯ মাইল। স্টেশনে পৌছিবার কিছু আগেই মহানন্দা নদীর উপর একটি রেলওয়ে সেতু আছে। স্টেশন হইতে ৮ মাইল উত্তরে চাঁচল গ্রামে একঘর বর্দ্ধিষ্ণু জমিদারের বাস আছে; মালদহ জেলার উত্তরাংশে চাঁচল জমিদারী সর্ব্বাপেক্ষা বড়। চাঁচলে দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, ডাকঘর, তারঘর প্রভৃতি আছে।

ভালুকা রোড্‌—কলিকাতা হইতে ২৩৫ মাইল। স্টেশনের পশ্চিম হইতেই মালদহ জেলার দিয়ারা অঞ্চল; বর্ষাকালে ইহা জলমগ্ন হইয়া যায়, মাঝে মাঝে উচ্চ ভূমিতে লোকের বাস। স্টেশন হইতে ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভালুকা গ্রামে এক ঘর জমিদারের বাস আছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর—কলিকাতা হইতে ২৪১ মাইল। এখানেও একঘর জমিদার আছেন। ইহার পরের স্টেশন কুমেদপুরের কিছু পর হইতে বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলার আরম্ভ। কুমেদপুরের দু স্টেশন পরে কাটিহার জংশন।

বাংলায় ভ্রমণ

প্রথম খণ্ড

—স্থান-সূচী—

দ্রষ্টব্যঃ—এই পুস্তকের যে পৃষ্ঠায় কোন স্থান সম্বন্ধে বিশিষ্ট উল্লেখ আছে, অথবা যে পৃষ্ঠা হইতে এইরূপ বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে নিম্নলিখিত সূচীতে কেবলমাত্র তাহাই উদ্ধৃত হইল। কোন একটি স্থানের পার্শ্বে একাধিক পত্রাঙ্কের উল্লেখ থাকিলে উহা একই নামের বিভিন্ন স্থান বুঝিতে হইবে।

EB—740—10,000—4-5-40—EIR.